বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সৌমিত্র শেখর

অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ

গবেষক

প্রদীপ পেরেজ

রেজিস্ট্রেশন নং: ৭৯; শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-১৫

পুনঃরেজিস্ট্রেশন নং: ১২৯; শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক প্রদীপ পেরেজ (রেজিস্ট্রেশন নং: ৭৯, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪–২০১৫; পুনঃরেজিস্ট্রেশন নং: ১২৯, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮–২০১৯) কর্তৃক উপস্থাপিত **'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারা'** শীর্ষক পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ কোথাও মুদ্রিত হয় নি এবং গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য ইতঃপূর্বে উপস্থাপন করেন নি।

(ড. সৌমিত্র শেখর)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

তারিখ:

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারপত্র

এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, 'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারা' শীর্ষক পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ আমার নিজের রচনা। এটি কোনো যৌথ রচনাকর্ম নয়। আমার জানা মতে, উল্লিখিত শিরোনামে এর পূর্বে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা সম্পন্ন হয় নি বা কোনো গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হয় নি। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশিত হয় নি এবং অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য এর আগে উপস্থাপিত হয় নি।

(প্রদীপ পেরেজ)
রেজিস্ট্রেশন নং: ৭৯; শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪–১৫
পুনঃরেজিস্ট্রেশন নং: ১২৯; শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮–১৯
পিএইচ.ডি. গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

তারিখঃ

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত-সূচি

অনূ. – অনূদিত

ইং. – ইংরেজি

এস. জে. – সোসাইটি অফ যিজাস

খ্রি. – খ্রিষ্টাব্দ

ড. – ডক্টর

জ. – জন্ম

দ্র. – দ্রষ্টব্য

পরি. সং. – পরিমার্জিত সংস্করণ

পৃ. – পৃষ্ঠা

ফা. – ফাদার

বং. – বঙ্গাব্দ

সং. – সংস্করণ

সম্পা. – সম্পাদক

ed. – editor

ibid. – ibidem

p. – page

pp. – pages

বানান রীতি: বাংলা একাডেমি প্রমিত বানান রীতি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার — ক

প্রস্তাবনা — i

প্রথম অধ্যায় — ১
বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য উত্তরাধিকার

দ্বিতীয় অধ্যায় — ২৫
সাধু আন্তোনিয়োর জীবনচরিত ও খ্রিষ্টীয় জনজীবনে তাঁর প্রভাব

তৃতীয় অধ্যায় — ৫২
সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান

- প্রথম পরিচ্ছেদ — ৫৪
  পালাগানের সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু, পূর্বাপর ঐতিহ্য, গঠন ও গীতিধর্মিতা
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ — ৬৭
  খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় রচিত পালাগান
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ — ৮৫
  সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের বিষয়বস্তু

চতুর্থ অধ্যায় — ১১২
সাধু আন্তোনিয়ো পালা এবং বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টীয় সাধনার রূপ

- প্রথম পরিচ্ছেদ — ১১৩
  সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে খ্রিষ্টীয় সাধনার স্বরূপ
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ — ১৩১
  সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের সাঙ্গীতিক ও সাহিত্যিক মূল্য

পঞ্চম অধ্যায় — ১৯০
সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাব-সংশ্লেষ

- প্রথম পরিচ্ছেদ — ১৯১
  সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে বাংলা সাহিত্যের অনুবর্তন
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ — ২১৬
  সাধু আন্তোনিয়োকেন্দ্রিক ভক্তি-বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতা

উপসংহার — ২২৭

পরিশিষ্ট ১: সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান (গানের আসর থেকে রেকর্ড করা অংশবিশেষ) — ২৩৫

পরিশিষ্ট ২: সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের গায়েন-বায়েন দলের তালিকা — ২৫০

পরিশিষ্ট ৩: সাধক আন্তোনিয়োর জীবন-কর্ম-সৃষ্টি নিয়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রচনাবলি — ২৫৬

পরিশিষ্ট ৪: খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারার আলোকচিত্র — ২৬৮

অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক গ্রন্থাবলি, পত্র-পত্রিকাসমূহ ও অন্যান্য উপাদানের তালিকা — ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সিংহভাগ ধর্মের আধারে পরিবেশিত। অন্যদিকে দেখা যায়, লোকসাহিত্য অনেকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মের আবরণ মুক্ত। কিন্তু বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্মের উদ্ভব ও প্রসারকালে ধর্মকে অবলম্বন করে বেশ কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে। এগুলিকে আমরা খ্রিষ্টীয় সাহিত্য বলে অভিহিত করতে পারি। শুধু লিখিত সাহিত্যের ধারায়ই নয়, লোকসাহিত্যের ধারায়ও খ্রিষ্টীয় সাহিত্য রচনার প্রয়াস প্রশংসার দাবিদার। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজ পর্যন্ত কেউ-ই লোকসাহিত্যের এই অজানা দিগন্তে আলোকপাত করেননি। ছোটবেলা থেকেই খ্রিষ্টীয় সাহিত্যের এই আনাঘ্রাতা দিকটি নিয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা ও কৌতূহল ছিল। স্নাতক পর্যায়ে সাহিত্য বিষয়ে অধ্যয়নকালে আমি কয়েকজন প্রাজ্ঞব্যক্তির সঙ্গে খ্রিষ্টীয় সাহিত্যের এই অনালোকিত ভাণ্ডারের ব্যাপারে আলোচনা করি। তাঁরা সবাই বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ পোষণ করেন। মূলত তাঁদের ঐকান্তিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাতেই আমি সাধু আন্তোনিয়োর পালাগান আমার সারস্বত সাধনার বিষয় করে নিই। সাধক আন্তোনিয়োর পালাগান নিয়ে গবেষণা করার এক পর্বে আমি খ্রিষ্টীয় লোকসাহিত্যের আরও প্রচুর উপকরণের সন্ধান পেয়েছি। সেগুলির সাহিত্যিক ও সাঙ্গীতিক মূল্য অসাধারণ। ভবিষ্যতে সময় সুযোগ করে সেসব অমূল্য সাহিত্য উপাদান সংগ্রহ ও সম্পাদনা করার একান্ত প্রত্যাশা পোষণ করি।

'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারা' এই বিষয়ে গবেষণাকর্মের জন্য সাধু আন্তোনিয়োর অসংখ্য অনুরাগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব পিটার পিরিছ-এর কথা মনে পড়ে। তিনিই আমাকে সর্বপ্রথম এমন সৃষ্টিশীল কাজকর্মে অনুপ্রাণিত করেন এবং খ্রিষ্টীয় লোকসাহিত্যের ভুবনে আনয়ন করেন। তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি আমি আন্তরিক ও সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সেই সঙ্গে আমার সারস্বত সাধনায় যিনি সব সময় প্রেরণা দিয়ে গেছেন, আমার মেজদাদা প্রয়াত আলেকজেণ্ডার মন্টু পিরিছকে স্মরণপূর্বক ভক্তি ও ভালবাসা জানাই। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা আমার চলার পথের পাথেয় হিসাবে পেয়েছি।

গবেষণাকর্মে ব্রতী হয়ে আমি যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি এবং যাঁরা বিষয়ানুগ তথ্য দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে যেসব গায়েন-দোহার-বায়েন আমাকে তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে পালাগানের গভীরে যেতে সহায়তা করছেন এবং গবেষণার বিষয়কে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরা হলেন পরলোকগত গায়েন যোসেফ ডেঙ্গু কস্তা, সিলভেস্টার ছিলু পালমা, বিজয় কস্তা ও অরুণ কোড়াইয়া। ঈশ্বর তাঁদের অনন্ত শান্তি প্রদান করুন। তাঁদেরই সুযোগ্য শিষ্য সুব্রত গমেজ, আন্তনি বাদু রোজারিও, যোসেফ গমেজ, মানিক গমেজ, নিকোলাস রোজারিও, ডগলাস দগু পালমা, ডমিনিক রোজারিও, আদম রোজারিও, সুনীল পেরেরা, রবি পালমা, সমর রোজারিও, বার্নাড রোজারিও, সুনীল পেরেরা, ক্লেমেন্ট কেলু কস্তা, রবি রিবেরু, আলেকজেণ্ডার জাভু গমেজ, মিলন রোজারিও, জন রোজারিও, সুরঞ্জন হালদার–

Dhaka University Institutional Repository

প্রমুখ তাঁদের অফুরন্ত সহায়তায় আমাকে ঋণী করেছেন। লোকগানের, বিশেষ করে সাধু আন্তোনিয়োর সম্মানে গীত এবং নিবেদিত লোকায়ত এই পালাগানের ধারা প্রবহমান রাখার প্রয়াসে তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও প্রয়াসের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। সেই সঙ্গে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের দলের প্রত্যেক দোহার, পাইল দোহার, গায়েন, বায়েন– সবাইকে। পালাগানের এই পরিবেশক ও পৃষ্ঠপোষকদের এমন অকৃত্রিম ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে কোনো ভাবেই আলোচ্য এই গবেষণা-কর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। তাঁরাই খ্রিষ্টীয় পালাগানের ধারাকে প্রবহমান রাখতে বদ্ধপরিকর। তাঁদের সবার জীবন ও প্রচেষ্টা সুন্দর ও সার্থক হোক– এই কামনা করি।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের গবেষণাকর্মে নিয়োজিত থাকার সুবাদে আনুষঙ্গিক আরও বেশকিছু পালাগানের পাণ্ডুলিপি, নথি ও খাতাপত্র আমাকে দেখতে ও ঘাঁটতে হয়েছে। অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আমাকে সেসব দস্তাবেজ দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কালীগঞ্জের ভেটুর গ্রামের শ্রদ্ধেয় বার্নাড মন্টু পালমা আমাকে তাঁর নিজের লেখা ও সংগ্রহে থাকা পালাগানের বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি দিয়েছেন। এ ছাড়াও ভাওয়াল এলাকার নাগরী মিশনের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রবিন কস্তা, শিক্ষক বিপিন রড্রিক্স ও তাঁদের স্নেহধন্য বিনয় লুক রড্রিক্স 'যিশুর কষ্টভোগের পালা' খুঁজে দিয়েছেন; তুমিলিয়া মিশনের ভেটুর গ্রামের উল্লাস কোড়াইয়া, আশীষ পিটার গমেজ পালাগানের সন্ধান দিয়েছেন; নাটোর জেলার বনপাড়া গ্রামের আগাথা গমেজ তাঁর কাছে রক্ষিত 'সাধ্বী আগ্নেসের পালা', একই এলাকার ভবানীপুর মিশনের অনিল গ্রেগরি 'বৈঠকি গানের খাতা' দিয়েছেন; বোর্নী মিশনের আগষ্টিন রোজারিও দিয়েছেন 'সাধু আগাপিতের পালা', এবং বরিশাল পাদ্রিশিবপুর অঞ্চলের পাভেল গমেজ, জহর গমেজ, দীপঙ্কর গমেজ ও স্বপন গমেজ– 'রামুর পালা'র পাণ্ডুলিপির সন্ধান দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সকলকে জানাই আমার অপরিসীম ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

এছাড়াও বেশ কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ও হিতাকাঙ্ক্ষী বিভিন্ন সময়ে উৎসাহ দিয়ে এবং তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় ব্রাদার চিন্তামনি দাস এস. জে., ফা. অ্যালরেড গোমেজ এস. জে. এবং ফা. চার্লস পলে এস. জে.-র কথা। তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিঃস্বার্থ উদারতা এই গবেষণাকর্মকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলেছে। অনেক সময় আমাকে সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন আমার বন্ধুবর ফা. পল কার্লোস পুত্তানপুরাকাল এস. জে., ফা. জন চিন্নাপ্পান এস. জে., ফা. রিপন রোজারিও এস. জে., ফা. জুলিয়ান দাস এস. জে., ফা. সাজু যোসেফ এস. জে.। এছাড়াও কলকাতা যিশুসংঘ প্রদেশের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ফা. জয়রাজ ভেলুস্বামী এস. জে., এবং বর্তমান অধ্যক্ষ ফা. রাফায়েল হাইড এস. জে. তাঁদের অকুণ্ঠ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশে যিশুসংঘের আঞ্চলিক প্রধান ফা. জর্জ পনোডাথ এস. জে. এবং ফা. যোসেফ মিস্ত্রী এস. জে. আমার করণীয় কাজ ও দায়িত্ব থেকে অবসর দিয়ে গবেষণার কাজকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সবার প্রতি রইল আমার অন্তহীন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারা' শিরোনামে গবেষণা-কর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সৌমিত্র শেখরের সুচিন্তিত মতামতই ছিল আমার পাথেয়। তিনি আমাকে অকাতরে তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন। তাঁর আন্তরিক উপদেশ, পরামর্শ ও সস্নেহ সাহচর্য ও সাহায্য ছাড়া এই অভিসন্দর্ভ রচনা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। তাঁকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক জামিল আহমেদ, বিশ্বধর্মদর্শন বিভাগের অধ্যাপক ফা. তপন ডি'রোজারিও, সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব ডেভিড প্রণব দাশ, খ্রিষ্টীয় সাহিত্যসেবক সুনীল পেরেরা, বনানী উচ্চসেমিনারীর অধ্যাপক ফা. সুশীল লুইস পেরেরা, ফা. দিলীপ স্টেফান কস্তা এবং সেখানকার গ্রন্থাগারিক শ্রদ্ধেয় ব্রাদার জ্যাক তেইজে– নানা সময়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ দিয়ে এবং তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়ে আমায় ধন্য করেছেন। তাঁদের সবার প্রতি রইল আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

শুধু বাংলাদেশে নয়, আমার এই গবেষণাকর্মটিকে যথাযথভাবে প্রকাশ ও উপস্থাপন করতে আমি বেশ কয়েকবার কলকাতায় গিয়েছি। কলকাতার প্রাজ্ঞজনদের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শুভা দাশগুপ্ত, ড. তপোব্রত ঘোষ, ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, সেন্ট পল উচ্চবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. সাধনা করালী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুরঞ্জন মিদ্দে– তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিয়ে গবেষণার মান ও পরিধির উৎকর্ষ সাধনে আমাকে সহায়তা করেছেন। এ ছাড়াও কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য কলা অনুষদের সচিব ড. নন্দিতা ভট্টাচার্য এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে গোথাল্‌স গ্রন্থাগার ও গবেষণা-কেন্দ্রে কাজ করার জন্য তার পরিচালক ও অধ্যক্ষ ফা. ফেলিক্স রাজ এস. জে.-র অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছি। তাঁদের সবাইকে আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে মঠবাড়ি মিশনের কাছে কুচিলাবাড়িতে জেজুইটদের গঠনকেন্দ্র নবজ্যোতি নিকেতনে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের জাতীয় উৎসব আয়োজন করার ব্যাপারে যাঁরা আমাকে সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে মাজিসবাংলা ছাত্র-যুব আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য সুবাস রোজারিও, ক্যাথরিন পিউরিফিকেশন, মেরি মিতু বাছাড়, ফিলোমিনা বীথি গমেজ, মাগ্দালেনা বর্ণা গমেজ, শ্রীলা তেরেজা সরকার, হেভেন আন্তনি গমেজ, সুমন হালদার, প্লাসিড প্রণয় গমেজ, রিচার্ড রোজারিও, বৃষ্টি সুজান গমেজ, মেরি তন্বী মণ্ডল, ফ্লোরেন্স তৃষ্ণা মণ্ডল, এ্যামি ডি'ক্রুজ– প্রমুখকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও একান্ত ভালবাসা জানাই। সেই মহতী আয়োজনে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন ধীরেন দাস, দীপক পিরিছ ও অনল পিরিছ। তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন ঢাকা ক্রেডিট, তুমিলিয়া ক্রেডিট ও ঢাকা হাউজিং-এর কয়েকজন কর্তাব্যক্তি। আমি তাঁদের সবার কাছে চিরঋণী। তাঁদের সবাইকে আমার ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই।

সাধু আন্তোনিয়োর পালাগানের আসর থেকে বিভিন্ন সময়ে পালাগানসমূহ ভিডিওতে ধারণ করার কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন রকি গমেজ, অভি ডি'কস্তা, মিল্টন রোজারিও, কলিন্স পিউরিফিকেশন ও সাগর পালমা। আবার গানগুলো শব্দযন্ত্রে ধারণ করার জন্য আমাকে সহায়তা করেছেন সুবাস রোজারিও ও তপন রোজারিও। বিভিন্ন জায়গায় সাধু আন্তোনিয়ো গানের ও উপাসনার আলোকচিত্র ধারণ করেছেন ফ্লোরেন্স রোজারিও, উইলিয়াম গমেজ ও অমিত লেনার্ড রুদ্র। এই অভিসন্দর্ভে সংযোজিত আলোকচিত্রগুলোর মধ্যে তাঁদের তোলা কিছু ছবি রয়েছে। তাঁদের সবার অমূল্য সময় আমার ব্যক্তিগত কাজের জন্য ব্যয় করে তাঁরা আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের সবাইকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানাভাবে অনুপ্রেরণা, বিভিন্ন পরামর্শ এবং সৃজনশীল ও গঠনমূলক অগণিত মতামত দিয়ে স্নেহধন্য প্রিয়াংকা ডিখার আমার প্রয়াস ও প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপদান করতে সহায়তা করেছে। অত্যন্ত ধৈর্য নিয়ে যত্নশীল ও উদারভাবে তার মূল্যবান সময় দিয়ে সে এই গবেষণার সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভ সংশোধন করে দিয়েছে। তার এই অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে তাকে শুধু ধন্যবাদ দেওয়া আমার ধৃষ্টতারই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করি। আমি জানি তার সহায়তার এই ঋণ শোধ করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তবুও তাকে আমার সস্নেহ কৃতজ্ঞতা জানাই।

সেই সঙ্গে স্মরণ করি বিগত কয়েক বছরে যেসব বাড়িতে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের আয়োজন করা হয়েছে সেসব পরিবারের সকল সদস্যদের কথা। তাঁরা গানের আসরে ভিডিও ধারণ, শব্দ ধারণ, ছবি তোলা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের অনুমতি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের আন্তরিক আতিথেয়তা ও আপ্যায়ন আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁদের সবার প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও অশেষ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

সাধু আন্তোনিয়ো সবার মঙ্গল করুন।

প্রদীপ পেরেজ

মণিপুরীপাড়া, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রস্তাবনা

১. ভূমিকা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অতুলনীয় সমৃদ্ধি বাঙালি হিসেবে আমাদের গর্বিত করে। তবে আমাদের সাহিত্যের এই উৎকর্ষ একদিনে সাধিত হয় নি; দীর্ঘ পরম্পরার ফলেই তার সিদ্ধি ঘটেছে। এই কথা ঠিক যে, অবাঙালি ইউরোপীয় সারস্বত সাধকেরা বাঙালির সাহিত্যের ধারাকে বেগবান করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সুদূর ইউরোপের, বিশেষত স্পেনীয়-পর্তুগিজ-ফরাসি-ওলন্দাজ-ইংরেজ জাতির যোগ এবং বঙ্গদেশে আগত এইসব জাতির বাংলা ভাষা শিখে গ্রন্থরচনার ইতিহাস প্রায় তিনশ বছরের প্রাচীন। বঙ্গদেশের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্ক রচনার মূল কারণ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধর্মপ্রচার। প্রথম কারণে তাঁদের হয়ত স্থানীয় ভাষা রপ্ত করার তেমন প্রয়োজন ছিল না; তবে দ্বিতীয় কারণে তাঁদের এই প্রয়োজনটি ছিল খুব বেশি। তাই তাঁরা অসংকোচে আমাদের ভাষা শিখেছেন। শুধু তা-ই নয়, চাহিদা অনুসারে ধর্মশিক্ষাদানের জন্য তাঁরা বেশ কিছু পুস্তক-পুস্তিকাও রচনা করেছেন। এই মহতী কাজে তাঁদের সঙ্গে বাঙালি হিসেবে যিনি নিজেকে প্রথম যুক্ত করেছেন, তিনি হচ্ছেন দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও ('জীবনকাল ১৭শ শতকের শেষার্ধ'– *চরিতাভিধান*, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা; পৃ. ১৯৬)। 'ভূষণার রাজপুত্র' বলে পরিচিত বাঙালিদের মধ্যে 'প্রথম' খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারী এই সাধক-প্রচারক সেই যুগের সর্বাপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তি। তিনিই প্রথম গীতিপ্রাণ বাঙালির কাছে 'পরধর্ম'কে গ্রহণীয় করে তোলার লক্ষে পালাগানের মত করে মুখে মুখে খ্রিষ্টীয় তত্ত্ব ও তথ্য প্রচার করেন। কালের সরণি বেয়ে দোম আন্তোনিয়ো প্রবর্তিত সেই ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে।

'দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও' নামটির সূত্রেই বাঙালি সমাজে 'আন্তোনিয়ো' শব্দটির পরিচিতি ঘটে। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালিই জানেন না কে এই 'আন্তোনিয়ো', কী তাঁর মাহাত্ম্য! 'আন্তোনিয়ো' যে একজন খ্রিষ্টসাধক এবং এই সাধুর নামকে নিজ নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন ধর্মান্তরিত এক বাঙালি পুরুষ, অখ্রিষ্টান বাঙালির কাছে এই তথ্য প্রায় অজানা। আর তাই অব্যাখ্যাত থেকে গেছেন 'আন্তোনিয়ো' নামের এই খ্রিষ্টপুরুষ। তবে বাঙালি খ্রিষ্টীয় পরিমণ্ডলে 'আন্তোনিয়ো', অর্থাৎ সাধু আন্তোনিয়ো স্বমহিমায় শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন। তাঁকে ঘিরে, ধর্মীয় আবহে তৈরি হয়েছে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি বৃত্ত, যে বৃত্তকে খানিকটা তুলনা করা চলে মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে রচিত বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে। মধ্যযুগে বাংলাদেশে শ্রী চৈতন্যদেব বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে জোয়ার এনেছিলেন। তিনি সাহিত্য রচনা করেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে এক জোরালো সাহিত্যবলয় গড়ে উঠেছে। ঠিক একইভাবে সাধক আন্তোনিয়ো সদর্পে সাহিত্যের আঙিনায় বিচরণ না করলেও তাঁর সামান্য কিছু খ্রিষ্টসঙ্গীত, প্রার্থনা ও প্রবচন; মোটকথা তাঁর জীবন ও আদর্শ খ্রিষ্টীয় সাহিত্য-সেবকদের সাধনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সেই দিক থেকে বিচার করলে সাধক আন্তোনিয়ো শুধু ইউরোপীয় নন, বাঙালি সারস্বত সাধকদের

মন ও মননে একটা স্বকীয় আসন করে নিয়েছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁদের চিন্তা-ভাবনার জগতকে প্রসারিত, পরিশীলিত ও সমৃদ্ধ করেছেন।

খ্রিষ্টমণ্ডলীর সাধক-সাধিকার মধ্যে সাধু আন্তোনিয়ো সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তিনি মার্টিন দ্য বুইলিওনে এবং ডোনা তেরেজো দ্য তাভেরার সন্তান এবং পর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরীতে ১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। দীক্ষার সময় তাঁর নাম রাখা হয় ফের্নান্দো। তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে খ্রিষ্টসাধক আগস্তিনের প্রবর্তিত যাজকসংঘে প্রবেশ করেন। ১২২০ সালের ১৬ই জানুয়ারি মরক্কো দেশে সাধু ফ্রান্সিসের প্রবর্তিত যাজকসংঘের ৫ জন সদস্য ধর্মশহিদ হলে তিনি সেখানে গিয়ে খ্রিষ্টবাণী প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। তখনই তাঁর নাম 'ফের্নান্দো' থেকে করা হয় 'আন্তোনিয়ো'। মরক্কো যাবার পর তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থাবস্থায় দেশে ফেরার পথে সমুদ্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তিনি ইতালির পাদুয়া নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর বাকি জীবন সেখানেই কাটে। জীবিত থাকাকালেই আন্তোনিয়ো 'সাধু' হিসেবে সমধিক পরিচিতি পান। ১২৩১ সালের ১৩ই জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সাধু আন্তোনিয়ো ছিলেন অসাধারণ যুক্তিবাদী বাগ্মী। বিরুদ্ধ মতবাদীদের কাথলিক খ্রিষ্টমতবাদে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য সফলতা দেখিয়েছেন। সমাজে বিরাজমান নানা অন্যায়-অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন এক বলিষ্ঠ ও প্রতিবাদী কণ্ঠ। কথিত আছে তিনি তাঁর জীবনকালে অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন। তাই সারা পৃথিবীর কাথলিক মণ্ডলীতে 'আশ্চর্য কর্মসাধক' হিসাবে পরিচিত আন্তোনিয়োর জীবন ঘিরে খ্রিষ্টান-সমাজে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। এই সব কিংবদন্তিসমূহকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে বাঙালি খ্রিষ্টান-পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষায় নানা রকম ধর্মীয় গীতিধারা ও কথকতা।

আমরা জানি ধর্মপ্রাণ বাঙালি জাতিকে ধর্ম থেকে আলাদা করা সহজ নয়। ধর্মাচারের মধ্যেই বাঙালির অস্তিত্বের অনেকাংশ নিহিত। এই কথা সত্য যে, খ্রিষ্টধর্ম আমাদের বাংলার দেশ-মাটি থেকে উৎপত্তি লাভ করেনি, এসেছে বাইরে থেকে। তারপরও বাঙালিজনের অনেকেরই আত্মিক আবেশে এই ধর্ম কালে কালে বাংলা দেশের মানুষের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। আর এভাবেই খ্রিষ্টধর্ম মিশে গেছে এদেশের মাটি এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে। বাঙালি খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের কাছে 'ঠাকুরের গীত' বা 'সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান' এমনই একটি সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম, সাহিত্য ও সঙ্গীতের অনুষঙ্গ হিসাবে গৃহীত। এই দেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের শুরুর সময় থেকে আজও নানা পালা-পার্বণে কিংবা বিভিন্ন উদ্দেশে বাঙালি খ্রিষ্টসম্প্রদায় যখন মানত বা ব্রত করেন, তার প্রাপ্তিতে সাধক আন্তোনিয়োর পালাগান পরিবেশনের আয়োজন করেন। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি খ্রিষ্টবিশ্বাসী জনবসতি এলাকায় এই গানের রেওয়াজ রয়েছে। প্রতিবছর বাংলাদেশের খ্রিষ্টভক্তের সবচেয়ে বড় মিলনমেলা হয় গাজিপুর জেলার নাগরী গ্রামে। সেখানে ধর্মসাধক আন্তোনিয়োর তীর্থে বিভিন্ন দেশ ও জেলা থেকে আগত বাঙালিজনের মধ্যে এই গানের আসর বসে। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত যেখানে খ্রিষ্টান জনজাতির

বসবাস রয়েছে, সেখানে সারা বছরই 'সাধ্বী আগ্নেশের পালা', ও 'সাধ্বী ফিলোমিনার পালা' উপস্থাপিত হয়। আর খ্রিষ্টীয় উপাসনাবর্ষ অনুসারে প্রায়শ্চিত্তকালে বা তপস্যাকালে বহুল প্রচলিত 'যিশুর কষ্টভোগের পালা' পরিবেশিত হয়ে থাকে।

বাঙালির ধর্মীয় এবং সামাজিক নানা উৎসব আয়োজনে যেসব লোকাচার রয়েছে, তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছে নানা সাহিত্যিক উপাদান। অলিখিত এবং লোকের মুখে মুখে প্রচলিত এসব উপাদান সংগৃহীত হলেও খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় রচিত এবং প্রচলিত বিষয়গুলো এখনও সেভাবে সংরক্ষিত ও উপস্থাপিত হয় নি। সেগুলোর সাহিত্যিক মূল্যও নিরূপণ করা হয় নি। উল্লেখকৃত শূন্যতাকে পূরণ করার একান্ত অভিলাষ থেকেই এই গবেষণার প্রয়াস। অতএব গবেষণায় বাংলা সাহিত্যের অনালোচিত এই অধ্যায়টি অনেক জটিল রন্ধ্রপথে অনুসন্ধান করে সাধ্যমত উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

খ্রিষ্টধর্মকে আশ্রয় করে বাংলাভাষায় যে অসংখ্য গীত ও পালা সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো আজ বাংলাভাষার এক মূল্যবান সম্পদ। সেগুলোর মধ্যে কিছু লিখিত রূপে পাওয়া যায়, তবে অনেকগুলোর কোনো লিখিত রূপ নেই। খ্রিষ্টপ্রেমী ভক্তদের মুখে মুখে এমন গীত এবং পালা প্রচলিত আছে। খ্রিষ্টীয় লোকগীতির এই প্রবহমানতার একটি প্রকৃষ্ট ও ঋদ্ধ ধারা হল 'ঠাকুরের গীত' বা 'সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান'। সাধক আন্তোনিয়ো-কেন্দ্রিক গীত ও পরিবেশিত পালাগানে রয়েছে বাঙালি খ্রিষ্টীয় সমাজের একটি পরিপূর্ণ ও জোরালো আবহ। এখানে ফুটে উঠেছে একটি বিশেষ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর চেতনা ও জীবনবোধ, আচার ও বিশ্বাস এবং যাপিত জীবনের নানা সূত্রসমূহ। বাংলাদেশের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী, বিশেষ করে এই ধর্মানুসারী অন্তেবাসীদের জীবনচেতনা ও বিশ্বাসের অনেকটাই জুড়ে আছে সাধু আন্তোনিয়ো-ভাবধারা, যার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে তাঁর নামে রচিত এবং তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই সব গীত ও পালাগুলোতে। সেগুলো ধর্মীয় বাতাবরণের বাইরেও আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে ধারণ করে আছে।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল যে, এই সাহিত্যধারা নানা কারণে আমাদের দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তথা লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে। সাহিত্যমোদী মানুষের আড়ালে থাকার হয়ত নানাবিধ কারণ থাকতে পারে; সেসব কারণসমূহের অনুসন্ধান মুখ্য বিষয় নয়। তবে আমাদের অন্বেষণের আসল উদ্দেশ্য হল সেসব সাহিত্যের মূল্য আবিষ্কার করা। তার সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে কি প্রভাব ফেলেছে সেই সত্যের উদ্‌ঘাটন করা। আর আমার জানা মতে, এই বিষয়ে বিচ্ছিন্ন দুয়েকটি প্রবন্ধ রচনার প্রাথমিক প্রয়াসের প্রমাণ পাওয়া গেলেও এই সম্পর্কে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার কোনো রকম তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না। অতএব এই বিষয়ে পদ্ধতিগতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার তাগিদ ও প্রয়োজনীয়তা থেকেই আমাদের আলোচ্য 'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো-ভাবধারা' শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভে খ্রিষ্টীয় প্রেক্ষাপটে আন্তোনিয়ো-ভাবধারায় রচিত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিশেষ করে লোকসাহিত্য এবং লোকসংস্কৃতির নানা দিক গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী বাঙালি রয়েছেন। তার মধ্যে আনুমানিক সাড়ে তিন লক্ষ খ্রিষ্টানের আদিনিবাস ঢাকা জেলার ভাওয়াল এবং আঠারগ্রাম অঞ্চল। উল্লেখ্য, বঙ্গের মধ্যে সেখানেই প্রথম খ্রিষ্টধর্ম প্রচার এবং প্রসার লাভ করে। দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিওর প্রচারের কল্যাণে এই অঞ্চলের মানুষই প্রথম খ্রিষ্টধর্মে আকৃষ্ট এবং দীক্ষিত হন। কালক্রমে সেখানকার বাঙালি খ্রিষ্টভক্তগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল, ভারত এমন কি ইউরোপ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। এঁদের 'ঢাকাইয়া খ্রিষ্টান' বলে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে এই সাড়ে তিন লক্ষ ঢাকাইয়া খ্রিষ্টানদের মধ্যে আন্তোনিয়ো-ভাবধারা বেশ প্রবল। অতএব বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল:

১. বহুল সংখ্যক খ্রিষ্টান জনজাতির ধর্মীয় মনোভাব ও ভাবধারাসম্পন্ন বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি কৃষ্টিকে সুচিন্তিতভাবে তুলে ধরা।
২. মুখে মুখে প্রচলিত তথা অলিখিত বাংলা সাহিত্যের এই উপাদানগুলো যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সম্পাদনা করা।
৩. লিখিতভাবে প্রাপ্ত ও গীত পালাগুলো মূল্যায়নের আওতায় আনা।
৪. পরবর্তী পর্যায়ে আরও বেশি এবং ব্যাপ্তভাবে গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা ও তার সম্ভাবনা সূচিত করা।
৫. আধুনিক প্রজন্মের কাছে বাংলা সাহিত্যের অনালোচিত ধারার পরিচয় প্রকাশ করা এবং তার সাহিত্যিক মূল্যমান নির্ণয় করা।
৬. ইতঃপূর্বে এই বিষয় নিয়ে বিশেষ কোনো গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয় নি, অতএব আরও গবেষণার নতুন সম্ভাবনা ও দিগন্ত উন্মোচিত করা।

৩. গবেষণার পরিধি

বাংলাদেশে খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর মধ্যে আন্তোনিয়ো-ভাবধারায় রচিত, লিখিত এবং অলিখিত (কিন্তু মৌখিকভাবে সুপ্রচলিত) সাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার এই গবেষণার পরিধিভুক্ত হয়েছে। অঞ্চলভেদে সাধক আন্তোনিয়ো পালায় কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু এক থাকলেও তার কথন এবং সুরে ভিন্নতা দেখা যায়। কিছু কিছু জায়গায় গানের কাহিনি আলাদা অবয়ব লাভ করে বলেও জানা গেছে। আবার এই গান পরিবেশনের মধ্যেও বিভিন্ন আঞ্চলিকতা পরিদৃষ্ট হয়। অতএব এই পরিবর্তনসমূহও আমাদের আলোচ্য গবেষণার পরিধিভুক্ত হয়েছে।

৪. গবেষণার ক্ষেত্র

এই গবেষণাকালে মাঠ-পর্যায়ে গমনের প্রয়োজনীয়তা ছিল অত্যাবশ্যক। তাই গবেষণার জন্য বাংলাদেশের যেসব জায়গায় খ্রিষ্টানদের বসবাস রয়েছে, সেই এলাকাসমূহ গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে রয়েছে বর্তমান গাজিপুর জেলার বিস্তৃত ভাওয়াল এলাকাসমূহ– নাগরী, কালীগঞ্জ, দড়িপাড়া, রাঙামাটিয়া, মঠবাড়ি, হারবাইদ, মাউসাইদ, সাভার। অন্যদিকে আঠারগ্রাম অঞ্চলের মধ্যে– নবাবগঞ্জ, বান্দুরা, হাসনাবাদ, বক্সনগর, তুইতাল, গোল্লা, শুলপুর, সোনাবাজু ইত্যাদি এলাকা প্রাধান্য পেয়েছে। সেই সঙ্গে প্রায় একশ বছর আগে ভাওয়াল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বসবাসকারী খ্রিষ্টানদের এলাকাসমূহ, যেমন– নাটোর জেলার বনপাড়া, রাজাপুর, ভবানীপুর, বোর্ণী, মানগাছা;

এবং পাবনা জেলার মথুরাপুর, ফৈলজানা, নেংড়ি– প্রভৃতি অঞ্চল এবং বৃহত্তর বরিশাল জেলার পাদ্রিশিবপুর, দেশান্তরকাঠি ও মাটিভাঙা অঞ্চল এবং খুলনা জেলার কিছু এলাকা গবেষণার আওতায় নেওয়া হয়েছে।

৫. গবেষণার উৎস এবং উপাদান

ক। প্রাথমিক উৎস এবং উপাদান

গবেষণাকর্মে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সাধু আন্তোনিয়ো পালা এবং খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় রচিত নানা গীত ও পালাসমূহ। এক্ষেত্রে গানের আসর থেকে সরাসরি ধারণকৃত গীত ও লিখিত পালাগান প্রাথমিক উৎসের মুখ্যধারা হিসাবে গৃহীত হয়েছে। সেই সঙ্গে পালাগানের কয়েকজন গায়েন বা পরিচালকের নিজেদের সুবিধের জন্য ব্যবহৃত খাতার প্রতিলিপিও এই গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে। নাটোর জেলার বনপাড়া এলাকা ছাড়াও গাজিপুর জেলার ভাওয়াল অঞ্চলে দীর্ঘদিন ঘুরে সেখানকার আঠার জন গায়েন এবং তাঁদের দলের বেশ কয়েকজন দোহার, পাইল দোহার এবং বায়েনদের সঙ্গে কথা বলে যে তথ্য পাওয়া গেছে; অর্থাৎ গানের সঙ্গে সম্পৃক্ত কুশীলবদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সেই সম্বন্ধে তাঁদের নানা চিন্তাভাবনা ও উপলব্ধি গবেষণার প্রাথমিক উৎসের অনুষঙ্গী বলে বিবেচিত। গবেষণার প্রয়াসকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য গায়েন-বায়েনদের পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও যাঁদের বাড়িতে গান করা হয়েছে এমন প্রায় দেড়শ পরিবার এবং গানের সঙ্গে পরিচিত আনুমানিক পাঁচশ খ্রিষ্টভক্তের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাঁদের মূল্যবান মতামত থেকে সংগৃহীত তথ্য; তাঁদের আলোকচিত্র– সবই এই গবেষণায় সহায়ক উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

গবেষণার প্রাথমিক উপাদানের মধ্যে গৃহীত হয়েছে সাধক আন্তোনিয়ো ছাড়াও খ্রিষ্টীয় অন্যান্য গীত ও পালার লিখিতপ্রাপ্ত পাঠসমূহ। তবে সেগুলোর সঙ্গে পালাগানের গায়েন, বায়েন, সংরক্ষক ও কলাকুশলীদের কাছে রক্ষিত খাতাপত্রও প্রাথমিক উপাদানেরই অংশ বলে বিবেচিত ও গৃহীত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

১. পালাগান গায়ক সুব্রত গমেজ-এর গাওয়া বিভিন্ন আসর থেকে শব্দধারণযন্ত্রে ধারণকৃত গান, বনপাড়া, নাটোর, ২০১৫।
২. পালাগানের গায়ক আলোকজেণ্ডার জাণ্ডু গমেজ-গীত আসর থেকে শব্দধারণযন্ত্রে ধারণকৃত গান, নাটোর, ২০১৬।
৩. পালাগান গায়ক ক্লেমেন্ট কস্তার গাওয়া আসর থেকে শব্দধারণযন্ত্রে ধারণকৃত গান, রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর।
৪. পালাগান গায়ক ডগলাস পালমা পারিবেশিত আসর থেকে শব্দধারণযন্ত্রে ধারণকৃত গান, রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর্
৫. দমিঙ্গো রোজারিও, শ্রীগুরু আন্তনির চরিতামৃত (যোসেফ রোজারিও সংকলিত পাণ্ডুলিপি), কালিকাপুর, নাটোর।
৬. দমিঙ্গো রোজারিও, শ্রীগুরু আন্তনির চরিতামৃত (অরুণ কোড়াইয়া সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি), বোয়ালি, কালীগঞ্জ, গাজিপুর।
৭. খ্রিষ্টীয় লোকসাহিত্য পৃষ্ঠপোষক ফাদার আলীচাঁন ভক্তর খাতা, চড়াখোলা, গাজিপুর।
৮. দমিঙ্গো রোজারিও ওরফে দুঙ্গু পণ্ডিতের মেয়ে-জামাই যোসেফ রোজারিওর ব্যক্তিগত খাতা, কালিকাপুর, নাটোর।
৯. পালাগান গায়ক বাদু আন্তনি রোজারিও কথিত ও লিও মধু অনুলিখিত খাতা, নাগরী, গাজিপুর।
১০. পালাকার জন রোজারিওর খাতা, বোর্ণি, নাটোর, ২০১৫।
১১. পালাগানের মাস্টার শিমন রোজারিওর ব্যক্তিগত খাতা, বনপাড়া, নাটোর, ২০১৪।
১২. দুঙ্গু পণ্ডিতের পুত্র-কন্যা-স্বজদের সাক্ষাৎকার, চড়াখোলা, ভাওয়াল, গাজিপুর, ২০১৫।

১৩. অরুণ কোড়াইয়ার সাক্ষাৎকার ও ব্যক্তিগত খাতা, বোয়ালি, ভাওয়াল, গাজিপুর, ২০১৭।

১৪. ওস্তাদ যোসেফ ডেঙ্গু কস্তার সাক্ষাৎকার, বনপাড়া, নাটোর, ২০১৫।

১৫. পালাগানের মাস্টার যোসেফ ছৈয়াল কস্তার সাক্ষাৎকার, ভবানীপুর, নাটোর, ২০১৪।

১৬. পালাগায়ক মানিক গমেজের সাক্ষাৎকার, সাভার, ঢাকা, ২০১৫।

১৭. পালাকার সুব্রত গমেজের সাক্ষাৎকার, বনপাড়া, নাটোর, ২০১৭।

১৮. পালাকার টমাস গমেজের সাক্ষাৎকার, পাদ্রিশিবপুর, বরিশাল, ২০১৫।

১৯. পালাকার আগষ্টিন গমেজের সাক্ষাৎকার, পাদ্রিশিবপুর, বরিশাল, ২০১৫।

২০. পালাগানের মাস্টার বিপিন রড্রিক্সের সাক্ষাৎকার ও ব্যক্তিগত খাতা, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজিপুর, ২০১৫।

২১. পালাগানের রচয়িতা ও পরিবেশক রবিন রোজারিওর সাক্ষাৎকার ও ব্যক্তিগত খাতা, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজিপুর, ২০১৮।

২২. পালাগান সংগ্রহকারী ফাদার যোসেফ জীবন গমেজের সাক্ষাৎকার ও ব্যক্তিগত খাতা, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম, ২০১৭।

২৩. পালাগান রচয়িতা মন্টু বার্ণাড পালমার সাক্ষাৎকার ও ব্যক্তিগত খাতা, ভেটুর, কালীগঞ্জ, গাজিপুর, ২০১৮।

২৪. পালাগান পরিবেশক সুরঞ্জন হালদারের সাক্ষাৎকার ও ব্যক্তিগত খাতা, শেলাবুনিয়া, মংলা, বাগের হাট, ২০১৫।

খ. দ্বৈতীয়িক উৎস এবং উপাদান

পালাগানের তাত্ত্বিক আলোচনার জন্যই দ্বৈতীয়িক উপাদানগুলো অনিবার্য উৎস হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এই পর্যায়ে আমি প্রথম বাংলা ভাষার, দ্বিতীয়ত ইংরেজি ভাষার ও তৃতীয়ত ফরাসি ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের সহায়তা গ্রহণ করেছি। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের তত্ত্ব অনুসন্ধানে বাংলা এবং সাধক আন্তোনিয়োর জীবনকেন্দ্রিক তথ্যালোচনায় ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় রচিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রবন্ধসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. গবেষণার পদ্ধতি

'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারা' শীর্ষক এই গবেষণা-কর্মে প্রধানত পাঁচ ধরনের গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে– (১) ক্ষেত্র-গবেষণামূলক পদ্ধতি (২) পাঠ-বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (৩) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (৪) বর্ণনামূলক পদ্ধতি এবং (৫) তুলনামূলক পদ্ধতি।

৬.১. ক্ষেত্র-গবেষণামূলক পদ্ধতি

গবেষণার পদ্ধতিতে প্রথমত ক্ষেত্র-গবেষণামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সাধক আন্তোনিয়োকেন্দ্রিক সাহিত্যের অধিকাংশ উপাদানই অলিখিত। তাই ক্ষেত্র-গবেষণায় আলোচ্য সাহিত্যের উপাদানগুলো প্রথমে সরাসরি আসর থেকে শব্দযন্ত্রে ধারণ করে সেগুলোর লিখিত রূপ দেওয়া হয়েছে। গবেষণার প্রয়োজনে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পালাগানের অনুষ্ঠান ভিডিওতে ধারণ করে তার সংরক্ষণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ক্যামেরায় ছবি তুলে সেগুলোও সংগ্রহ করার হয়েছে। এই প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে পালাগানের মাস্টার, গায়ক, বাদক, দোহার, মানতকারী এবং ভক্তশ্রোতার সঙ্গে কথা বলে বা নানা সময়ে তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে বিভিন্ন রকম তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬.২. পাঠ-বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাকর্মে প্রয়াসে মাঠ-পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের যথাযথ বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়ছে। আর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার লক্ষ্যে সংগৃহীত সাহিত্যের বিষয়বস্তু বর্ণনা, সেগুলোর ব্যাখ্যা ও টীকা রচনা থেকে শুরু করে একটা সূক্ষ্ম ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

৬.৩. ঐতিহাসিক পদ্ধতি

এই গবেষণায় বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্মের গোড়াপত্তন এবং সাধক আন্তোনিয়োর কর্ম ও জীবন ঘিরে রচিত সাহিত্যকর্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করে গবেষণা-কর্মের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক পদ্ধতির আওতায় ইতিহাসগ্রন্থ আলোচনা ও খ্রিষ্টীয় নানা দালিলিক সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তুকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলতে ঐতিহাসিক পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

৬.৪. বর্ণনামূলক পদ্ধতি

পালাগানের আলোচনায় পাশ্চাত্য ও বাংলা পালাগানের সাঙ্গীতিক ও সাহিত্যিক গুণাগুণের প্রসঙ্গে আলোকপাত করার সঙ্গে সঙ্গে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের বিষয়, কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অনুসন্ধান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সমকালীন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সমাজ-বাস্তবতার মূল্যায়নের প্রয়াসে সার্বিকভাবে বর্ণনা করতে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় রচিত এই পালাগানের বিষয়বস্তু ও স্বরূপ নির্ণয়ে এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তার ফলে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের যে অনুবর্তন ঘটেছে সেটাও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

৬.৫. তুলনামূলক পদ্ধতি

'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারা' নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সাধু আন্তোনিয়ো পালার সঙ্গে ময়মনসিংহ গীতিকা, নাথ গীতিকা ও গাজীর গান নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে এই পদ্ধতি অত্যন্ত ফলপ্রসু ভূমিকা রেখেছে। তুলনামূলক এই আলোচনায় খ্রিষ্টীয় পালাগানের সঙ্গে বাংলাদেশের ধর্মাবরণমুক্ত অন্যান্য পালাগানের মধ্যেকার ভেদরেখাটি উন্মোচিত হয়েছে এবং সাধু আন্তোনিয়ো পালার যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃতি স্পষ্ট হয়েছে।

৮. অভিসন্দর্ভের গঠন-পরিকল্পনা বা অধ্যায় পরিলেখ

ক্ষেত্র-গবেষণার ভিত্তিতে সংগৃহীত সমস্ত তথ্য-উপাত্ত ও খ্রিষ্টীয় মৌখিক ধারার গীত ও পালাগান সমূহের যথাযথ বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে 'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারা' শিরোনামে এই গবেষণা-কর্মটির ফলাফল

উপস্থাপন করা হয়েছে একটি অভিসন্দর্ভের আকারে। অভিসন্দর্ভটি বাংলা ভাষায় চলিত রূপে এবং বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে রচিত। সেই অভিসন্দর্ভের অধ্যায় পরিলেখ নিম্নরূপঃ

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায়ঃ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য উত্তরাধিকার

বঙ্গদেশে পর্তুগিজ বণিকদের আগমন, পূর্ববঙ্গে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার, খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারে জেজুইটদের প্রচেষ্টাঃ উপাসনাগৃহ বা গির্জা নির্মাণ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শুরু, গ্রন্থাদি রচনা ও অনুবাদ, খ্রিষ্টধর্মের সংস্কৃত্যায়ন বা দেশীয়করণ, সমাজসেবা ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা; প্রচারকাজ ও ধর্মশিক্ষায় গানের ব্যবহার, দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও, ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ ও পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ, নাগরীঃ খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের প্রাণকেন্দ্র, বঙ্গদেশে প্রথম খ্রিষ্টানদের অবস্থা, বঙ্গদেশে পর্তুগিজদের অবদান সমীক্ষা – ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সাধু আন্তোনিয়োর জীবনচরিত ও খ্রিষ্টীয় জনজীবনে তাঁর প্রভাব

সাধক আন্তোনিয়োর পরিবার, জন্ম ও শৈশব; খ্রিষ্টীয় যাজকসংঘে যোগদান, আগস্তিনিয়ান থেকে ফ্রান্সিসকান ধর্মসংঘে প্রবেশ, জ্বর ও ঝড়ে জীবনের মোড় পরিবর্তন, ফ্রান্সিসকান সংঘের সাধারণ সভায়, উত্তম উপদেশদাতা আন্তোনিয়ো, পাদুয়া নগরের সাধু আন্তোনিয়ো, সমাজ-সংস্কারক আন্তোনিয়ো, সমাজের কুপ্রথা ও প্রভাব দূরীকরণঃ দেউলিয়া আইন রদকরণ, ভ্রান্তমতবাদীদের বিরুদ্ধে আন্তোনিয়ো; আশ্চর্য কর্মসাধক সাধু আন্তোনিয়ো, সাধক আন্তোনিয়োর মহাপ্রয়াণ, আন্তোনিয়োকে 'সাধু' বলে ঘোষণা, মঙ্গলবার সাধু আন্তোনিয়োর বিশেষ সম্মানার্থদিবস; বাংলাদেশে সাধক আন্তোনিয়োর প্রতি ভক্তি, সাধক আন্তোনিয়ো তীর্থস্থানসমূহঃ পানজোরা, গাজিপুর; কাতুলী, পাবনা; রাজাবাড়িয়া, বরিশাল; সাধক আন্তোনিয়োর নামে গির্জাসমূহ, আন্তোনিয়োর নামে খ্রিষ্টীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, আন্তোনিয়োর নামে বিশেষ দয়া লাভ, সাধু আন্তনীর জিহ্বা প্রদর্শনী – ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান

প্রথম পরিচ্ছেদঃ পালাগানের সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু, পূর্বাপর ঐতিহ্য, গঠন ও গীতিধর্মিতা

পালাগান বা গীতিকা, ব্যালাডঃ ইউরোপীয় প্রেক্ষাপট, ব্যালাড বা ইংরেজি পালাগান, পালাগানের উৎপত্তি, পালাগানের প্রকারভেদ – ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় রচিত পালাগান

সাধ্বী আগ্নেশের পালা, যিশুর কষ্টভোগের পালা, রামুর পালা; খ্রিষ্টীয় অন্যান্য পালাগানঃ যিশুর জন্মের পালা, কুমারী মারিয়ার পালা, সাধু যোসেফের পালা, সাধু যোহনের পালা, সাধু পিতরের পালা, মারিয়া মাগ্‌দালেনার পালা, সাধু পলের পালা, সাধু আগাপিতের পালা, সাধ্বী ফিলোমিনার পালা – ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের বিষয়বস্তু

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান সংগ্রহ, পালাগানের সাধু আন্তোনিয়ো, সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের লিখিত রূপ, সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের মৌখিক রূপ, সাধু আন্তোনিয়োর পালাগানে পালাসমূহঃ পালাগানের অংশভিত্তিক কাহিনি

সংক্ষেপ: তপস্যার পালা, 'দুস্কের পালা' বা দুঃখের পালা, জন্মের পালা, ইস্কুলের পালা, পাটনীর পালা, শাস্ত্রের পালা, জাউলার পালা, সাত বালকের পালা, কেশবের পালা, উপরান রাজার পালা, মুর্দার পালা, সদাগরের পালা; পালাগানের রচয়িতা, সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের রচয়িতা – ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়: সাধু আন্তোনিয়ো পালা এবং বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টীয় সাধনার রূপ

প্রথম পরিচ্ছেদ: সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে খ্রিষ্টীয় সাধনার স্বরূপ

পালাগান গাওয়ানো ও পালাগান গাওয়ানোর রীতি, মানত করা ও মানত করার নিয়ম-কানুন, বায়না করা, গানের খরচ, গায়েন-বায়েনদের ব্যয়ভার, গানের পদ্ধতি, গায়েন ও তার দল, আন্তোনিয়ো পালাগানের গায়েন, দোহার ও পাইল দোহার, পালাগানের বায়েন, মন্দিরা দেওয়া , আন্তোনিয়ো পালাগানের কয়েকজন গায়েন: যোসেফ ডেঙ্গু কস্তা, সুব্রত গমেজ, সুনীল পেরেরা, আন্তনি রোজারিও (বাদু আন্তনি), বার্নাড রোজারিও (পোর্‌হা), অরুণ কোড়াইয়া – ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পালাগানের সাঙ্গীতিক ও সাহিত্যিক মূল্য

পালাগানের সঙ্গীতময়তা, পালাগানের সুর, পালাগানের ধুয়া, ধুয়া গাইবার উদ্দেশ্য, সাধক আন্তোনিয়ো পালাগানে ধুয়া, পালাগানে বন্দনা; পালাগানের সাহিত্যিক মূল্য, পালাগানের ছন্দ, পালাগানের অলঙ্কার, অর্থালঙ্কার: উপমা, উৎপ্রেক্ষা, বিরোধমূলক অলঙ্কার, অতিশয়োক্তি; শব্দালঙ্কার: অনুপ্রাস, যমক; শব্দগুচ্ছের একাধিক ব্যবহার, আন্তোনিয়ো পালাগানে প্রবাদ-প্রবচন, বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের ব্যবহার, পালাগানে প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস, পালাগানে সমাজচিত্র; আন্তোনিয়ো পালাগানে চরিত্র চিত্রণ: ফ্রান্সিস ভক্ত, ভেরনিকা বিবি, আন্তোনিয়ো বা আইন্তন ঠাকুর, কেশব ভক্ত, উপরান রাজা; পালাগানে ঐতিহাসিক উপাদান, পালাগানের ভাষা – ইত্যাদি।

পঞ্চম অধ্যায়: সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাব-সংশ্লেষ

প্রথম পরিচ্ছেদ: সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে বাংলা সাহিত্যের অনুবর্তন

গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান, নাথ-গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান, ময়মনসিংহ গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান, বন্দনা: ময়মনসিংহ গীতিকা ও আন্তোনিয়ো পালাগান, প্রেক্ষাপট বর্ণনা: ময়মনসিংহ গীতিকা ও আন্তোনিয়ো পালাগান, পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান, বৃষ্টি: পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও আন্তোনিয়ো পালাগানের সমন্বয়, পীর-গাজিপালা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান, সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান: লিখিত ধারায় – ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আন্তোনিয়োকেন্দ্রিক ভক্তি-বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতা

সাধু আন্তোনিয়ো তীর্থ, সাধু আন্তোনিয়োর সম্মানে নভেনা বা নবাহ, সাধু আন্তোনিয়োর পর্ব পালন, আন্তোনিয়োর কাছে মানত করা, ঠাকুরের গীত গাওয়ানো, সাধু আন্তোনিয়োর নামে রুটি-বিস্কুট বিতরণ, সাধু আন্তোনিয়োর সম্মানার্থে আল্‌তার বানানো, প্রতি মঙ্গলবার সাধু আন্তোনিয়োকে স্মরণ, সাধু আন্তোনিয়োর নামে প্রতিবেশী ও গরীব মানুষকে খাওয়ানো, সাধু আন্তোনিয়ো স্মরণার্থক বাণী, সাধক আন্তোনিয়ো মেলা, আন্তোনিয়ো নামের মাহাত্ম্য, ভাওয়াল খ্রিষ্টীয় সংস্কৃতি সমীক্ষা – ইত্যাদি।

উপসংহার

পরিশিষ্ট ১: সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান (গানের আসর থেকে রেকর্ডকৃত অংশবিশেষ)

পরিশিষ্ট ২: সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের গায়েন-বায়েন দলের তালিকা

পরিশিষ্ট ৩: সাধু আন্তোনিয়োর জীবন-কর্ম-সৃষ্টি নিয়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রচনাবলি

পরিশিষ্ট ৪: সাধু আন্তোনিয়ো ভাবধারার আলোকচিত্র

অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক গ্রন্থাবলি, পত্র-পত্রিকাসমূহ ও অন্যান্য উপাদানের তালিকা

গবেষণাকর্মটি সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করার লক্ষে গবেষণায় প্রাপ্ত বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি ও ভারসাম্য রক্ষা করে অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিভাজনটির সঙ্গে অভিসন্দর্ভের প্রারম্ভিক অংশে রয়েছে শিরোনাম, প্রত্যয়নপত্র, অঙ্গীকারপত্র, কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং সূচিপত্র। সেই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম অনুসারে এবং গবেষণাকর্মটিকে গ্রহণযোগ্য বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপনের প্রয়াসে গবেষণার সহায়ক বিভিন্ন আলোকচিত্র ও অন্যান্য পত্রও সংযোজিত হয়েছে।

৭. গবেষণার প্রত্যাশিত ফলাফল

'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারা' শিরোনামে এই গবেষণা-কর্মটি বাংলা লোকসাহিত্যের ধারায় খ্রিষ্টীয় উপাদান ও অনুষঙ্গ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করার দ্বার উন্মোচিত করবে। বর্তমান গবেষণা-কর্মটি সুনির্দিষ্ট গবেষণা-পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার মাধ্যমে একটি অভিসন্দর্ভরূপে রচিত ও ভবিষ্যতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে এই বিষয়ে আগ্রহী পাঠক-গবেষকদের একটি অভিনব ধারণা লাভের চাহিদা পূরণসহ নতুন জ্ঞান অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করবে বলে একান্তভাবে বিশ্বাস করি। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সাধক আন্তোনিয়োর উপস্থিতি ও প্রভাব সম্বন্ধে যৌক্তিক, বস্তুনিষ্ঠ এবং শিল্পসম্মত ধারণা পাওয়া যাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করি। কাজেই গবেষণার ফলাফল আমাদের লোকসাহিত্য গবেষণার ধারাকে ত্বরান্বিত করবে এবং বাংলা গবেষণার অনালোকিত পরিসরে আলোকসম্পাত করবে বলে মনে করি।

৯. উপসংহার

'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারা' শীর্ষক গবেষণাকর্মটিতে বাংলাদেশের খ্রিষ্টীয় সমাজে বহুল প্রচলিত সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের রীতিনীতি ও তার সাহিত্যিক উপাদান নিয়ে আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলা লোকায়ত সাধনার অংশ হিসাবে ও লোকসাহিত্যের আধারে পরিবেশিত এই পালাগান আমাদের দেশে খ্রিষ্টীয় জনজীবনের এক অপরিহার্য অংশ বলে বিবেচিত। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই অভিসন্দর্ভটি পাঠে বাংলা লোকসাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে একান্ত প্রত্যাশা পোষণ করছি।

‘বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারা’ শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

‘দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও’ নামটির সূত্রেই বাঙালি সমাজে ‘আন্তোনিয়ো’ শব্দটির পরিচিতি ঘটে। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালিই জানেন না কে এই ‘আন্তোনিয়ো’, কী তাঁর মাহাত্ম্য! ‘আন্তোনিয়ো’ যে একজন খ্রিষ্টসাধক এবং এই সাধুর নামকে নিজ নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন ধর্মান্তরিত এক বাঙালি পুরুষ– এই তথ্য অখ্রিষ্টান বাঙালির কাছে প্রায় অজানা। আর তাই দিনের পর দিন অব্যাখ্যাত থেকে গেছেন ‘আন্তোনিয়ো’ নামের এই খ্রিষ্টপুরুষ। তবে বাঙালি খ্রিষ্টীয় পরিমণ্ডলে ‘আন্তোনিয়ো’, অর্থাৎ সাধু আন্তোনিয়ো স্বমহিমায় শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন। তাঁকে ঘিরে, ধর্মীয় আবহে তৈরি হয়েছে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি বৃত্ত, যে বৃত্তকে খানিকটা তুলনা করা চলে মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে রচিত বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে। মধ্যযুগে বাংলাদেশে শ্রী চৈতন্যদেব বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে জোয়ার এনেছিলেন। তিনি সাহিত্য রচনা করেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে এক জোরালো সাহিত্যবলয় গড়ে উঠেছে। ঠিক একইভাবে সাধক আন্তোনিয়ো সদর্পে সাহিত্যের আঙিনায় বিচরণ না করলেও তাঁর সামান্য কিছু খ্রিষ্টসঙ্গীত, প্রার্থনা ও প্রবচন; মোটকথা তাঁর জীবন ও আদর্শ খ্রিষ্টীয় সাহিত্য-সেবকদের সাধনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সেই দিক থেকে বিচার করলে সাধক আন্তোনিয়ো শুধু ইউরোপীয় নন, বাঙালি সারস্বত সাধকদের মন ও মননে একটা সুনির্দিষ্ট ও স্বকীয় আসন করে নিয়েছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁদের চিন্তা-ভাবনার জগতকে প্রসারিত, পরিশীলিত ও সমৃদ্ধ করেছেন।

ধর্মপ্রাণ বাঙালি জাতিকে ধর্ম থেকে আলাদা করা সহজ নয়। ধর্মাচারের মধ্যেই বাঙালির অস্তিত্বের অনেকাংশ নিহিত। এই কথা সত্য যে, খ্রিষ্টধর্ম আমাদের বাংলার দেশ-মাটি থেকে উৎপত্তি লাভ করেনি, এসেছে বাইরে থেকে। তারপরও বাঙালিজনের অনেকেরই আত্মিক আবেশে এই ধর্ম কালে কালে বাংলা দেশের মানুষের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। আর এভাবেই খ্রিষ্টধর্ম মিশে গেছে এদেশের মাটি এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে। বাঙালি খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের কাছে ‘ঠাকুরের গীত’ বা ‘সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান’ এমনই একটি সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম, সাহিত্য ও সঙ্গীতের অনুষঙ্গ হিসাবে গৃহীত। এই দেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের শুরুর সময় থেকে আজও নানা পালা-পার্বণে কিংবা বিভিন্ন উদ্দেশে বাঙালি খ্রিষ্টসম্প্রদায় যখন মানত বা ব্রত করেন, তার প্রাপ্তিতে সাধক আন্তোনিয়োর পালাগান পরিবেশনের আয়োজন করেন। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি খ্রিষ্টবিশ্বাসী জনবসতি এলাকায় এই গানের রেওয়াজ রয়েছে। প্রতিবছর বাংলাদেশের খ্রিষ্টভক্তের সবচেয়ে বড় মিলনমেলা হয় গাজিপুর জেলার নাগরী গ্রামে। সেখানে ধর্মসাধক আন্তোনিয়োর তীর্থে বিভিন্ন দেশ ও জেলা থেকে আগত বাঙালিজনের মধ্যে এই গানের আসর বসে। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত যেখানে খ্রিষ্টান জনজাতির বসবাস রয়েছে, সেখানে সারা বছরই ‘সাধ্বী আগ্নেশের পালা’, ও ‘সাধ্বী ফিলোমিনার পালা’ উপস্থাপিত হয়। আর খ্রিষ্টীয় উপাসনাবর্ষ অনুসারে প্রায়শ্চিত্তকালে বা তপস্যাকালে বহুল প্রচলিত ‘যিশুর কষ্টভোগের পালা’ পরিবেশিত হয়ে থাকে।

বাঙালির ধর্মীয় এবং সামাজিক নানা উৎসব আয়োজনে যেসব লোকাচার রয়েছে, তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছে নানা সাহিত্যিক উপাদান। অলিখিত এবং লোকের মুখে মুখে প্রচলিত এসব উপাদান সংগৃহীত হলেও খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় রচিত এবং প্রচলিত বিষয়গুলো এখনও সেভাবে সংরক্ষিত ও উপস্থাপিত হয় নি। সেগুলোর সাহিত্যিক মূল্যও নিরূপণ করা হয় নি। উল্লেখকৃত শূন্যতাকে পূরণ করার একান্ত অভিলাষ থেকেই এই গবেষণার প্রয়াস। অতএব গবেষণায় বাংলা সাহিত্যের অনালোচিত এই অধ্যায়টি অনেক জটিল রন্ধ্রপথে অনুসন্ধান করে সাধ্যমত উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য, পরিধি, ক্ষেত্র, উপাদান, ফলাফল

বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ লক্ষধিক বাঙালি খ্রিষ্টবিশ্বাসীর মধ্যে আনুমানিক সাড়ে তিন লক্ষ খ্রিষ্টানের আদিনিবাস ঢাকা জেলার ভাওয়াল এবং আঠারগ্রাম অঞ্চল। এঁদের 'ঢাকাইয়া খ্রিষ্টান' বলে অভিহিত করা হয়। তারা সারা বাংলাদেশে এমনকি, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে আন্তোনিয়ো-ভাবধারা বেশ প্রবল। অতএব বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল: (১) খ্রিষ্টান জনজাতির ধর্মীয় ভাবধারাসম্পন্ন বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি কৃষ্টিকে সুচিন্তিতভাবে তুলে ধরা (২) মুখে মুখে প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের এই উপাদানগুলো যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সম্পাদনা করা (৩) লিখিতভাবে প্রাপ্ত ও গীত পালাগুলো সাহিত্যিক মূল্যায়নের আওতায় আনা (৪) আরও বেশি এবং ব্যাপ্তভাবে গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা (৫) নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা সাহিত্যের এই ধারার পরিচয় প্রকাশ এবং তার সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয় করা (৬) গবেষণার নতুন সম্ভাবনা ও দিগন্ত উন্মোচিত করা।

বাংলাদেশে খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর মধ্যে আন্তোনিয়ো-ভাবধারায় রচিত সাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার এই গবেষণার পরিধিভুক্ত হয়েছে। অঞ্চলভেদে সাধক আন্তোনিয়ো পালায় কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু এক থাকলেও তার কথন, সুর এবং পরিবেশনে ভিন্নতা দেখা যায়। অতএব এই পরিবর্তনসমূহও গবেষণার পরিধিভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকাগুলি গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে– তার মধ্যে রয়েছে গাজিপুর জেলার ভাওয়াল এলাকা এবং আঠারগ্রাম অঞ্চল প্রধান। সেই সঙ্গে নাটোর, পাবনা, বরিশাল এবং খুলনা জেলার কিছু জায়গাও এই গবেষণার আওতায় নেওয়া হয়েছে।

গবেষণাকর্মে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সাধু আন্তোনিয়ো পালা এবং খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় রচিত নানা পালাসমূহ। এক্ষেত্রে গানের আসর থেকে সরাসরি ধারণকৃত ও লিখিত পালাগান প্রাথমিক উৎস হিসাবে গৃহীত। সেই সঙ্গে পালাগানের কয়েকজন গায়েনের ব্যবহৃত খাতার প্রতিলিপিও এই গবেষণায় প্রাথমিক উৎসরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। নাটোর এবং গাজিপুর জেলায় ঘুরে সেখানকার গায়েন-বায়েন এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও যাঁদের বাড়িতে গান করা হয়েছে এমন প্রায় দেড়শ পরিবার এবং পাঁচশ খ্রিষ্টভক্তের সঙ্গে দলগত ও ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, সেই সঙ্গে তাঁদের আলোকচিত্র ও ভিডিওসমূহ– সেগুলোর সবই গবেষণায় সহায়ক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পালাগানের তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য বাংলা, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধসমূহ গবেষণার দ্বৈতীয়িক উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে। গবেষণার জন্য প্রাপ্ত উৎস ও উপাদানসমূহ এই কাজকে ত্বরান্বিত করেছে।

'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারা' শীর্ষক এই গবেষণা-কর্মে প্রধানত পাঁচ ধরনের গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে– (১) ক্ষেত্র-গবেষণামূলক পদ্ধতি (২) পাঠ বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (৩) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (৪) বর্ণনামূলক পদ্ধতি এবং (৫) তুলনামূলক পদ্ধতি।

'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারা' শিরোনামে এই গবেষণা-কর্মটি বাংলা লোকসাহিত্যের ধারায় খ্রিষ্টীয় উপাদান ও অনুষঙ্গ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করার দ্বার উন্মোচিত করবে। বর্তমান গবেষণা-কর্মটি সুনির্দিষ্ট গবেষণা-পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার মাধ্যমে একটি অভিসন্দর্ভ রূপে রচিত ও ভবিষ্যতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে এই বিষয়ে আগ্রহী পাঠক-গবেষকদের একটি অভিনব বিষয়ে ধারণা লাভের চাহিদা পূরণসহ নতুন জ্ঞান অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করবে বলে বিশ্বাস রাখি। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার উপস্থিতি ও প্রভাব সম্বন্ধে যৌক্তিক, বস্তুনিষ্ঠ এবং শিল্পসম্মত ধারণা পাওয়া যাবে। কাজেই এই গবেষণার ফলাফল আমাদের লোকসাহিত্য গবেষণার ধারাকে ত্বরান্বিত করবে এবং বাংলা গবেষণার অনালোকিত পরিসরে আলোকসম্পাত করবে বলে প্রত্যাশা করি।

প্রথম অধ্যায় : বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য উত্তরাধিকার

ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য চিন্তা-ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে। সেই কারণে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পশ্চিমা উত্তরাধিকার লক্ষণীয়। বিভিন্ন দেশের নানা মানুষ এই দেশে এসেছেন এবং এখানকার ভাষা, সাহিত্য ও রীতিনীতির সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিয়েছেন। আবার অনেকেই হয়ত বঙ্গদেশে সরাসরি আসেননি, কিন্তু তাঁদের আদর্শ ও চিন্তা-ভাবনায় পরোক্ষভাবে এখানকার মানুষকে প্রভাবিত করেছে। সাধক আন্তোনিয়ো তাঁদেরই একজন। তাঁকে কেন্দ্র করে একইসঙ্গে ভক্তি ও বিনোদনের নানা অনুষঙ্গ তৈরি হয়েছে। আর সেগুলোর পরিমাণ এত বেশি যে মানুষের জীবনেও প্রভাব ফেলেছে। সাধক আন্তোনিয়োকেন্দ্রিক সাহিত্য বাংলা লোকসাহিত্যের ধারায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় রচিত এই সব লোকজ সাহিত্যিক উপাদান সংগ্রহ করে তার যথাযথ উপস্থাপনে আমাদের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি আরও ঋদ্ধ হবে বলে একান্তভাবে বিশ্বাস করি।

অবশ্য এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাধনায় বাঙালির চেয়ে বিদেশি প্রাজ্ঞজনেরাই প্রথম মনোনিবেশ করেছেন। তাই প্রথম অধ্যায়ে আমাদের অন্বেষণের বিষয় হিসাবে আমরা নিয়েছি 'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ইউরোপীয় উত্তরাধিকার'। আলোচনার শুরুতেই বঙ্গদেশের সঙ্গে ইউরোপের সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সেই সুবাদে খ্রিষ্টধর্ম-প্রচারকদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার প্রয়াস এবং আমাদের দেশীয় ভাষায় ও ভাবে পুস্তক-পুস্তিকা রচনায় তাঁদের প্রচেষ্টা উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। আমাদের দেশে খ্রিষ্টান এবং অখ্রিষ্টান অনেক মানুষই জানেন না যে, বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারে জেজুইট ফাদারদের প্রচেষ্টা ছিল অপরিসীম। তাঁরাই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশীয় স্থাপত্যশৈলির মেলবন্ধনে বঙ্গদেশে প্রথম উপাসনাগৃহ নির্মাণ, স্থানীয় জনগণের বৌদ্ধিক বিকাশের লক্ষে তাঁরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শুরু, খ্রিষ্টীয় উপাসনা ও প্রার্থনার তাগিদে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি-পুস্তিকা রচনা ও অনুবাদ, খ্রিষ্টধর্মের সংস্কৃত্যায়ন বা দেশীয়করণের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের সমন্বয় সাধন, সমাজসেবার আকাঙ্ক্ষায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা; প্রচারকাজে ও ধর্মশিক্ষায় গানের ব্যবহার– এমনই নানা মহৎ আয়োজন যা আমাদের দেশ ও জনগণের জীবনে সুদূরপ্রসারী উপযোগিতা ও কার্যকরী ভূমিকা আনয়ন করেছে। আলোচ্য গবেষণায় সেই দিকটি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সেই পথ-পরিক্রমায় অনিবার্যভাবে সাক্ষাৎ পাই বাংলা ভাষা-সাহিত্যের অন্যতম রূপকার দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও নাম্নী এক বিদগ্ধ বঙ্গ-সন্তানের। ইতিহাসে উপেক্ষিত ভূষণার এই রাজপুত্র মগদস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়ে ভাগ্যক্রমে খ্রিষ্টান এক মিশনারির সান্নিধ্যে আসেন। সেই খ্রিষ্টসাধকের সহায়তায় খ্রিষ্টীধর্ম এবং খ্রিষ্টীয় সত্যসমূহ আত্মস্থ করে বাঙালির কাছে নবোদ্যমে প্রচার করেন। তাঁরই উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জোয়ার আসে। তিনি গানের মাধ্যমে গীতিপ্রাণ বাঙালির মন ও মননে অনায়াসে যিশুখ্রিষ্টকে তাদের অন্তরের ধন ও আপনজন হিসাবে পৌঁছে দেন। আলোচ্য গবেষণায় প্রথম আবিষ্কার করেছি যে, দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও-ই বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পালাগান রচনার প্রথম প্রয়াসী। শুধু তা-ই নয়, আলোচ্য গবেষণার ভিত্তি সেই আন্তোনিয়ো পালাগানের রচনা ও প্রচলনে তিনিই যে আদি-পুরুষ, সেই সত্যটিকেও আমরা অনায়াস দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থাপন করেছি। দোম আন্তোনিয়োর খ্রিষ্টগীতিকার মাধ্যমে প্রচারের ফলেই হাজার হাজার মানুষ সেই ধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আমরা এ-ও জেনেছি যে, দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও পর্তুগিজ ভাষা রপ্ত করে শুধু দোভাষীর কাজই করেননি, তিনি পুস্তক রচনার ক্ষেত্রেও এক নবদিগন্তের সূচনা করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম গদ্যগ্রন্থ *ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ* রচনার কৃতিত্বও তাঁরই। এ ছাড়াও বিদেশি ধর্মপ্রচারকগণ তাঁরই সাহায্য-সহযোগিতার ফলেই রচনা করেছেন *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* এবং *বাংলা পর্তুগিজ অভিধান* জাতীয় মূল্যবান গ্রন্থসমূহ। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা বঙ্গদেশে প্রথমদিকের খ্রিষ্টানদের পারিবারিক, সামাজিক, ধমীর্য় ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাই। সেই সঙ্গে বঙ্গদেশে পর্তুগিজদের অবদান সমীক্ষার সুযোগও লাভ করি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : সাধক আন্তোনিয়োর জীবনচরিত ও খ্রিষ্টীয় জনজীবনে তাঁর প্রভাব

খ্রিষ্টমণ্ডলীর সাধক-সাধিকার মধ্যে সাধু আন্তোনিয়ো সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তিনি মার্টিন দ্য বুইলিওনে এবং ডোনা তেরেজা দ্য তাভেরার সন্তান এবং পর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরীতে ১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। দীক্ষার সময় তাঁর নাম রাখা হয় ফের্নান্দো। তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে খ্রিষ্টসাধক আগস্তিনের প্রবর্তিত যাজকসংঘে প্রবেশ করেন। ১২২০ সালের ১৬ই জানুয়ারি মরক্কো দেশে সাধু ফ্রান্সিসের প্রবর্তিত যাজকসংঘের ৫ জন সদস্য ধর্মশহিদ হলে তিনি সেখানে গিয়ে খ্রিষ্টবাণী প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। তখনই তাঁর নাম 'ফের্নান্দো' থেকে করা হয় 'আন্তোনিয়ো'। মরক্কো যাবার পর তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থাবস্থায় দেশে ফেরার পথে সমুদ্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তিনি ইতালির পাদুয়া নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর বাকি জীবন সেখানেই কাটে। জীবিত থাকাকালেই আন্তোনিয়ো 'সাধু' হিসেবে সমধিক পরিচিতি পান। ১২৩১ সালের ১৩ই জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সাধু আন্তোনিয়ো ছিলেন অসাধারণ যুক্তিবাদী বাগ্মী। বিরুদ্ধ মতবাদীদের কাথলিক খ্রিষ্টমতবাদে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য সফলতা দেখিয়েছেন। সমাজে বিরাজমান নানা অন্যায়-অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন এক বলিষ্ঠ ও প্রতিবাদী কণ্ঠ। কথিত আছে তিনি তাঁর জীবনকালে অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন। তাই সারা পৃথিবীর কাথলিক মণ্ডলীতে 'আশ্চর্য কর্মসাধক' হিসাবে পরিচিত আন্তোনিয়োর জীবন ঘিরে খ্রিষ্টান-সমাজে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। এই সব কিংবদন্তিসমূহকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে বাঙালি খ্রিষ্টান-পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষায় নানা রকম ধর্মীয় গীতিধারা ও কথকতা। সেই ধারা আজও সমানভাবে প্রবহমান।

খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সাধক আন্তোনিয়ো ও তাঁর জীবন পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পেরেছি যে, পাদুয়া নগরের এই সাধু অচিরেই দিকে দিকে উত্তম উপদেশদাতা হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। শুধু মানুষের কাছে যিশুর বাণী প্রচারই নয়, খ্রিষ্টীয় আদর্শ তুলে ধরার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী। তাই সমাজ-সংস্কারক হিসাবে তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করে সমাজের কুপ্রথা ও প্রভাব দূরীকরণে, দেউলিয়া আইন রদে এবং ভ্রান্তমতবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার ছিলেন। ভক্তদের বিশ্বাস ও ভালবাসার বদৌলতে তিনি 'আশ্চর্য কর্মসাধক' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাই মহাপ্রয়াণের পর আন্তোনিয়োকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'সাধু' বলে ঘোষণা করা হয়। সেই সাধু আন্তোনিয়োই আমাদের বঙ্গদেশে খ্রিষ্টবিশ্বাসের ধারক। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমাদের অনুধ্যানের বিষয় 'সাধু আন্তোনিয়োর জীবনচরিত ও বাঙালি খ্রিষ্টজনজীবনে তাঁর প্রভাব' খুবই প্রাসঙ্গিক।

ইউরোপের খ্রিষ্টসাধককে অন্তরে ধারণ করে তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বাংলাদেশের ঢাকা জেলার ভাওয়াল এলাকায় গড়ে উঠেছে সাধক আন্তোনিয়োর সম্মানে এক তীর্থভূমি। নাগরীর জনগণ ও জনজীবনে সাধক আন্তোনিয়ো এক জাগ্রত প্রসাদদাতারূপে ভক্তদের হারানো জিনিস ফিরে পেতে তাঁর কাছে কৃত মানত ও প্রার্থনা পূরণ করেন। সেখান থেকে আমাদের দেশের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত সমস্ত অঞ্চলে তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ভক্তি-বিশ্বাস প্রকাশের একটা সুনির্দিষ্ট রীতি। তাই আমরা দেখি সপ্তাহের মঙ্গলবার সাধু আন্তোনিয়োর প্রতি নিবেদিত বিশেষ সম্মানার্থ দিবস হিসাবে বিবেচিত। বাংলাদেশে তাঁর প্রতি ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবার ফলেই সাধক আন্তোনিয়োর নামে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আরও বেশ কিছু তীর্থস্থানের গোড়াপত্তন ঘটেছে। সেই সঙ্গে সাধক আন্তোনিয়োর নামে গির্জা এবং খ্রিষ্টীয় নানা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত হচ্ছে। এমন কি পবিত্র স্মারক হিসাবে সাধু আন্তোনিয়োর জিহ্বা সুদূর ইতালির পাদুয়া শহর থেকে বাংলাদেশে এনে প্রদর্শিত হয়েছে। সাধক আন্তোনিয়োকে ঘিরে বাংলাদেশের খ্রিষ্টানদের এই ভক্তি প্রদর্শনের রীতি তথ্যে ও তত্ত্বে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান

খ্রিষ্টধর্মকে আশ্রয় করে বাংলাভাষায় যে অসংখ্য গীত ও পালা সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো আজ বাংলাভাষার এক মূল্যবান সম্পদ। সেগুলোর মধ্যে কিছু লিখিত রূপে পাওয়া যায়, তবে অনেকগুলোর কোনো লিখিত রূপ নেই। খ্রিষ্টপ্রেমী ভক্তদের মুখে মুখে এমন গীত এবং পালা প্রচলিত আছে। খ্রিষ্টীয় লোকগীতির এই প্রবহমাণতার একটি প্রকৃষ্ট ও ঋদ্ধ ধারা হল 'ঠাকুরের গীত' বা 'সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান'। সাধক আন্তোনিয়ো-কেন্দ্রিক গীত ও পরিবেশিত পালাগানে রয়েছে বাঙালি খ্রিষ্টীয় সমাজের একটি পরিপূর্ণ ও জোরালো আবহ। এখানে ফুটে উঠেছে একটি বিশেষ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর চেতনা ও জীবনবোধ, আচার ও বিশ্বাস এবং যাপিত জীবনের নানা সূত্রসমূহ। বাংলাদেশের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী, বিশেষ করে এই ধর্মানুসারী অন্তেবাসীদের জীবনচেতনা ও বিশ্বাসের অনেকটাই জুড়ে আছে সাধু আন্তোনিয়ো-ভাবধারা, যার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে তাঁর নামে রচিত এবং তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত এই সব গীত ও পালাগুলোতে। সেগুলো ধর্মীয় বাতাবরণের বাইরেও আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে ধারণ করে আছে। মানুষের জীবনসম্পৃক্ত এই গীতিকায় সাধু আন্তোনিয়োর কথা বলতে গিয়ে পালাকার যেন বাঙালির ঘরের কথাই শিল্প-সুষমায় গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপন করেছেন।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান খ্রিষ্টীয় রীতিতে প্রচলিত ও পরিবেশিত একটি শক্তিশালী লোকজ উপাদান। আমাদের দেশীয় লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ এখানে নিহিত থাকলেও তার পূর্বাপর রীতিকে আন্তোনিয়ো পালাগান ধারণ করে আছে। তাই এই গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের ধ্যেয় বিষয় 'সাধক আন্তোনিয়ো পালাগানে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান'। এই পর্বের অনুসন্ধানে প্রথমত আমরা পালাগানের সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়, তার বিষয়বস্তু আলোকপাত, পালাগানের পূর্বাপর ঐতিহ্য নিরীক্ষণ এবং তার গঠন ও গীতিধর্মিতা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের অন্বেষাকে তথ্যবহুল করার অভিপ্রায়ে আমরা বাংলা পালাগান ও ইউরোপীয় তথা ইংরেজি ব্যালাডের প্রেক্ষাপট ও প্রকারভেদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের পালাগানের ধারায় যে দিকটি সম্পূর্ণ অনালোকিত ছিল সেটি হচ্ছে খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় রচিত বিভিন্ন পালাগান নিয়ে আলোচনা। খ্রিষ্টীয় পালাগানের দীর্ঘ তালিকায় আমরা দেখি সবচেয়ে জনপ্রিয় পালা হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে– সাধ্বী আগ্নেশের পালা, যিশুর কষ্টভোগের পালা এবং রামুর পালা। উল্লেখিত এই পালাসমূহের মধ্যে যে একটি অন্তর্যোগ রয়েছে, সেটাও এই আলোচনায় যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও খ্রিষ্টীয় অন্যান্য পালাগানের মধ্যে উল্লেখ করার মতো পালাসমূহ হচ্ছে যিশুর জন্মের পালা, কুমারী মারিয়ার পালা, সাধু যোসেফের পালা, সাধু যোহনের পালা, সাধু পিতরের পালা, মারিয়া মাগ্দালেনার পালা, সাধু পলের পালা, সাধু আগাপিতের পালা, সাধ্বী ফিলোমিনার পালা ইত্যাদি। তৃতীয় ধাপে সাধক আন্তোনিয়ো পালাগানের বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের লিখিত রূপ, ও মৌখিক রূপের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের প্রচেষ্টায় মৌখিক পালাগানের জনপ্রিয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মকে সার্থক করে তোলার প্রয়াসে ৭ – ১০ অক্টোবর ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে গাজিপুরের কুচিলাবাড়ি যিশুসংঘের নবজ্যোতি নিকেতন কেন্দ্রে প্রথমবারের মত সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের জাতীয় উৎসবের করি। সেই উৎসবে বাংলাদেশে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান পরিবেশনের সবগুলি দল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সেই আয়োজন থেকে জানা যায় যে, আমাদের দেশে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান পরিবেশনের মোট ১৮টি দল রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে মাত্র একটি দলই লিখিত পালাগান পরিবেশন করে থাকে। বাকি ১৭টি দল অলিখিত পালাগান বা মৌখিক রীতির পালাগান গায়। এখানে বোঝা যায়, অখিলিত পালাগানই জনপ্রিয়তার বিচারে মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বঙ্গদেশে সাধু আন্তোনিয়োর জীবনী অবলম্বনে রচিত অলিখিত পালাগানের যে ধারাটি বর্তমানে প্রচলিত, সেই ধারাটির প্রর্বতক দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও।

চতুর্থ অধ্যায় : সাধক আন্তোনিয়ো পালা এবং বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টীয় সাধনার রূপ

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান অষ্টাদশ শতকের রচনা। এই গান একটি যুগোপযোগী লোকসাহিত্যের প্রকরণ হিসেবে বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। অথচ বাংলা লোকসাহিত্যের এই নমুনা এতদিন আমাদের অগোচরে ছিল। আন্তোনিয়ো পালাগানে সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে সুবিশাল ধারা ও ঐতিহ্য রয়েছে, সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সেই সঙ্গে খ্রিষ্টীয় জীবনাচরণের এক অনুপুঙ্খ বর্ণনায় এই পালাগান বাঙালি খ্রিষ্টানের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জীবন্ত স্বাক্ষর হয়ে উঠেছে।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান শুধু লোকসাহিত্যের উপাদান হিসাবেই বিবেচ্য নয়। ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টানের কাছে এই গান ভক্তি-বিশ্বাস প্রকাশের এক জাগ্রত মাধ্যম। তাই গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে আমাদের অনুসন্ধান 'সাধক আন্তোনিয়ো পালা এবং বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টীয় সাধনার রূপ' শীর্ষক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগে আমরা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের সাঙ্গীতিক ও সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণে ব্রতী হয়েছি। এই প্রচেষ্টায় সাধক আন্তোনিয়ো পালাগানের সঙ্গীতময়তা আবিষ্কারের লক্ষ্যে তার সুর, ধুয়া, ধুয়া গাইবার উদ্দেশ্য, পালাগানের বন্দনা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পালাগানের সুরে বাংলাদেশের ভাটিয়ালি সুরের প্রাধান্য দেখা যায়। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের ধুয়া গাইবার রীতি-নীতির মধ্যেও আমাদের দেশের অন্যান্য পালাগানের আদল এবং ধারা অনুসৃত হয়েছে। তবে পালাগানের বন্দনায় দেশীয় ঐতিহ্যের, বিশেষত ময়মনসিংহ গীতিকার অনুবর্তন লক্ষ করেছি। বিষয়টি ইতিপূর্বে কোথাও আলোচিত হয়নি। সেটা বিবেচনা করলে আমাদের এই গবেষণা ও তার প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যগুলো নতুনত্বের দাবি করতে পারে।

অন্যদিকে পালাগানের সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয়ের অভিপ্রায়ে আমরা পালাগানের ছন্দ, অলঙ্কার, প্রবাদ-প্রবচন, বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের ব্যবহার, প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস, সমাজচিত্র; চরিত্র চিত্রণ, ঐতিহাসিক উপাদান ও ভাষা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। বাংলা সাহিত্য প্রকরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমন আলোচনা আন্তোনিয়ো পালাগানকে সাহিত্যের, বিশেষ করে লোকসাহিত্যের আসরে এক অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হবে বলে মনে করি। একই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে আমাদের অভিনিবেশের লক্ষ্য ছিল সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে খ্রিষ্টীয় সাধনার স্বরূপ। তারই ফলশ্রুতিতে এই পর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান গাওয়ানোর রীতি, গান গাওয়ানোর জন্য মানত করা, মানত করার নিয়ম-কানুন, গানের জন্য বায়না করা, গানের খরচ, গায়েন-বায়েনদের ব্যয়ভার– ইত্যাদি বিষয়সমূহ লোকসাহিত্যের আলোচনা ও সমালোচনা শাখায় অদ্বিতীয়। সেই সঙ্গে পালাগান গাইবার পদ্ধতি ও রীতি-নীতি এই পর্যায়ের আলোচনায় আওতাভূক্ত হয়েছে। তার ফলে আমরা খ্রিষ্টীয় লোকজ রীতির একটি স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করি। সেই পথ ধরে যাঁরা পালাগান পরিবেশন করেন, তাঁদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেছি। পালাগানের গায়েন ও দলের বিভিন্ন সদস্য; বিশেষত দোহার ও পাইল দোহার, বায়েন প্রমুখের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর তাই সূত্র ধরে আন্তোনিয়ো পালাগানের কয়েকজন গায়েন, বিশেষত যোসেফ ডেঙ্গু কস্তা, সুব্রত গমেজ, সুনীল পেরেরা, আন্তনি রোজারিও (বাদু আন্তনি), বার্ণাড রোজারিও (পোর্‌হা) ও অরুণ কোড়াইয়ার জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রয়াসে আমরা খ্রিষ্টীয় লোককবিদের অন্তরালবর্তী জীবনের এক অজানা অধ্যায় আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছি।

এই পালাগানে লোক-কবিগণ নানা সময়ে স্বতস্ফূর্তভাবে জীবনের শাশ্বত সত্যগুলিকে উপস্থাপন করার প্রয়াসী হয়েছেন। নিষ্ঠার সঙ্গে দেশীয় ঐতিহ্যকে একটা বিদেশি এবং নতুন ধর্মের সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পের যথাযথ মেলবন্ধনরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁদের সবার মিলিত প্রচেষ্টায় এই লোককৃতি আমাদের সমাজের এবং জাতির অমূল্য এক সম্পদ হয়ে উঠেছে। অতএব সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানকে বাংলাদেশে শুধু খ্রিষ্টান সমাজেরই নয়, গোটা দেশেরই ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করা যায়।

পঞ্চম অধ্যায় : সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাব-সংশ্লেষ

বাঙালির সার্বিক সাধনায় ধর্মবোধ এবং শিল্পবোধ মিশে থাকে। অর্থাৎ গান-বাজনা, কাব্য-কবিতা, শিল্প-কলা– মোট কথা সুকোমল বৃত্তির সব ধরনের চর্চায় ধর্ম তার নিজস্ব আসন করে নেয়। পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ যে সাহিত্যের ঐতিহ্য আমাদের রয়েছে, তা থেকে লোকসাহিত্যের এই বিশেষ প্রকরণটি আলাদা নয়। শুধু ধর্মের গণ্ডির মধ্যে যদি এই পালাগান আটকে থাকে, তবে তা বৃহত্তর বা জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে না। অবশ্য বাঙালির সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনার ধারায় আমরা দেখি যে, সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান শুধু মাত্র খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই গৃহীত নয়, অন্য ধর্মাবলম্বী লোকের কাছেও যথেষ্ট সমাদর পায়। তাঁরাও অনেক সময় ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে এই সাধক পীর আন্তোনিয়োর কাছে মানত করেন। সেদিক থেকে দেখলে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান একটি সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তবুও এই কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, সব কিছু ছাপিয়ে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান যদি বাংলা সাহিত্যের, বিশেষত লোকসাহিত্যের এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে গৃহীত হতে পারে; তবেই এই গানের সত্যিকার উদ্দেশ্য সার্থক বলে পরিগণিত হবে।

আমরা জানি, বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্ম ইউরোপ থেকে এসেছে। তার বিষয়বস্তু ও আধ্যাত্মিকতাও পাশ্চাত্য অনুষঙ্গের অনুসারী। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মের বিষয় নিয়ে বঙ্গদেশে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে, বিশেষত লোকসাহিত্যের যে অবয়ব লাভ করেছে; তার মধ্যে আমাদের দেশীয় লোকজ উপাদানের অবিমিশ্র উপাদান রয়েছে। তাই গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে ‘সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাব-সংশ্লেষ’। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে বাংলা সাহিত্যের অনুবর্তন নিয়ে অনুধ্যান করেছি। সেই নিরিখে গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান, নাথ-গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান, ময়মনসিংহ গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে বন্দনা এবং প্রেক্ষাপট বর্ণনা; পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান, পীর-গাজীপালা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের তুলনামূলক আলোচনায় উদ্যোগী হয়েছি। আমরা অবাক হয়েছি খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় রচিত সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের সঙ্গে বঙ্গদেশে প্রচলিত অন্যান্য পালাগানের ধরণ ও উপস্থাপনের যে সাদৃশ্য রয়েছে, সেটা দেখে। মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে, শুধু ধর্মীয় প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সব মানুষের অন্তরাত্মায় যে মিলনাকাঙ্খার ধারা প্রবহমান তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে। তাই আলোচনার সুবিধার জন্য সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের লিখিত রূপ নিয়েও অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

অন্যদিকে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে সাধু আন্তোনিয়োকেন্দ্রিক ভক্তি-বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারই লক্ষ্যে এই পর্যায়ে সাধু আন্তোনিয়োর নামে তীর্থ, সাধু আন্তোনিয়োর সম্মানে নভেনা বা নবাহ, সাধু আন্তোনিয়োর পর্ব পালন, আন্তোনিয়োর কাছে মানত করা, ঠাকুরের গীত গাওয়ানো, সাধু আন্তোনিয়োর নামে রুটি-বিস্কুট বিতরণ, সাধু আন্তোনিয়োর আল্‌তার বানানো, প্রতি মঙ্গলবার সাধু আন্তোনিয়োকে স্মরণ, সাধু আন্তোনিয়োর নামে মানুষকে খাওয়ানো, সাধু আন্তোনিয়ো স্মরণার্থক বাণী, সাধক আন্তোনিয়ো মেলা, আন্তোনিয়ো নামের মাহাত্ম্য– প্রভৃতি বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশে বসবাসরত একটি নির্দিষ্ট জনজাতির শুধু ধর্মীয় নয়, বরং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সত্তাটাকে নিজেদের মত করে ধরতে পেরেছি। তার ফলে তারা আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে উঠেছে। তাই বলা যায়, সাধু আন্তোনিয়োকে ঘিরে খ্রিষ্টসমাজের আধ্যাত্মিক চর্চার বিষয়টি গবেষণার মাধ্যমে উপস্থাপন করা বাংলাদেশে লোকজ ধারার রূপায়ণে এক নতুন সংযোজন।

দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও একটা পালাগান প্রচলন করে দেবার পর অনেক বছর পেরিয়ে গিয়েছে। খ্রিষ্টধর্ম ও সনাতন ধর্মের অধীত জ্ঞান এবং বাংলাদেশের প্রচলিত একটা লোকমাধ্যমকে ব্যবহার করে নিজের শিল্প-কুশলতার যে বিস্তার তিনি ঘটিয়েছেন– তার গতি আজও রুদ্ধ হয়ে যায়নি। সেই সময়ে হয়ত বাংলা গীতিকা বা পালাগানের ধারাটি প্রচলিত ছিল এবং বেশ জনপ্রিয় ছিল।

মানুষ গান-বাজনা খুব পছন্দ করতেন। চিত্ত-বিনোদনের জন্য তাঁরা পালাগানের আসরে আসতেন। প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও মানুষের সামনে গানের তথা পালাগানের মোড়কে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়োর জীবনী পরিবেশন করলেন। তার ফলে মানুষের সঙ্গীত পিপাসা মিটল এবং তাঁরা নতুন এক কাহিনী বা গল্প শোনলেন। তাতে আন্তোনিয়োর আখেরে লাভ হল। মানুষ তাঁর প্রচারিত নতুন ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রয়াসে দোম আন্তোনিয়ো এমন ভাষা ব্যবহার করলেন যার ফলে এই কাহিনি আগে না শুনলেও তাঁদের কাছে আগন্তুক মনে হয়নি। কেননা রচয়িতা তখনকার প্রচলিত ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। গ্রামীণ ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষা অনায়াসে এই পালাগানে জায়গা করে নিয়েছে। নরকের বদলে দোজখ, খ্রিষ্টীয় পুরোহিতের জায়গায় পীর, কিংবা পানি, নিকলাইয়্যা– এমনই নানা ধারণা এবং শব্দাবলী মানুষের কাছে সহজেই গৃহীত হয়েছে। আন্তোনিয়ো প্রবর্তিত ভাষা আজ হয়ত পালাগানে পুরোপুরি শোনা যায় না। কেননা লোকসাহিত্যের, বিশেষত পালাগানের ভাষায় প্রাচীনত্ব রক্ষা করা যায় না। তার ভাষা পরম্পরাগতভাবে গুরু-শিষ্যের শ্রুতির ফলে পরিবর্তিত হয়। সেই সঙ্গে কিছু ধর্মগুরুদের সংকীর্ণ চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার ফলে লোককবিগণও ভাষার প্রয়োগে সচেতন হয়ে ওঠেন, যাতে তার ভাষা ধর্মের অচলায়তনে আঘাত না হানে।

শুধু ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, আন্তোনিয়ো পালাগানে উল্লেখিত কিছু কিছু প্রসঙ্গ– যেগুলো স্থানীয় মানুষের জানা ছিল, সেগুলো গৃহীত হয়েছে। তাই সাধক আন্তোনিয়োর জ্ঞানবুদ্ধির বহর জানানোর জন্য তাঁকে "চাইর বেদ চইদ্দো শাস্ত্র" পড়ানো হয়েছে। অহঙ্কারী কেশব ভক্তের পরিণাম যে খুব খারাপ হবে, তার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে রাবণ রাজা, চাঁদ সওদাগর, হরিশ্চন্দ্র রাজার সঙ্গে সঙ্গে মোছা পেকাম্বরের প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার অনুপুঙ্খ বর্ণনা আলোচ্য পালাগানে না থাকলেও যে মানুষ ও সমাজ-ব্যবস্থার কথা সেখানে বলা হয়েছে; তা বাংলাদেশেরই পরিচিত আবহ, মানুষ এবং সমাজ। এখানেও আমরা ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত চিরকালীন বাঙালি কবির মন ও মননের পরিচয় পাই। শুধু নিজের ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার মত কূপমণ্ডুক ও সাম্প্রদায়িক চিন্তা-ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে উদারনৈতিক এবং গ্রহণীয় ও সহনীয় মন-মানসিকতার কবিকূল বাঙালির মধ্যে ছিল আমাদের এই অভিসন্দর্ভে সেই সত্যটা আমরা অবাক বিঃস্ময়ে আবিষ্কার করি।

উপসংহার

নিছক ধর্মপ্রচারের জন্য এবং সাধু আন্তোনিয়োর প্রতি খ্রীষ্টভক্তদের ভক্তি প্রদর্শনের জন্য রচিত এই পালাগান কালের সোপান বেয়ে আজও ভক্ত মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। আজকের দিনেও মানুষ সাধু আন্তোনিয়োর নামে মানত করে। মানত পূর্ণ হলে গায়েন ডেকে পালাগান গাওয়ায়। বর্তমানে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ভক্তের আকূতি শোনে না বলেই তাঁরা আন্তোনিয়োর চরণে প্রণত হন। পালাগানের দলের ব্যস্ততা সেই কথা-ই বলে। গায়েন-বায়েন এবং হাজারো ভক্তের দাবি মানুষ জীবনের যে-কোনো পরিস্থিতিতে আন্তোনিয়োর কাছে প্রার্থনা করবেন। আন্তোনিয়োর গান গাওয়াবেন। ব্যক্তিপূজার বহিঃপ্রকাশ নয়, লোকমাধ্যমকে আত্মস্থ করে সাধক আন্তোনিয়োর প্রতি মানুষের যে চাওয়া-পাওয়া তা অতীতে যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল, বর্তমানে তেমনি আছে আর ভবিষ্যতে থাকবে– এই ধারণা আমার গবেষণায় উঠে এসেছে।

প্রথম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য উত্তরাধিকার

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের প্রতি পাশ্চাত্য দেশবাসীর এক গভীর আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল। আমাদের ঐশ্বর্য ও গৌরবে মুগ্ধ হয়েই স্মরণাতীত কাল থেকে এশিয়া, এবং বিশেষত ইউরোপের নানা জাতি বিভিন্ন সময়ে এই ভূখণ্ডের দরজায় করাঘাত করে গেছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের এই উপমহাদেশের মানুষের কারও মধ্যেই জাতীয় জীবনে উত্থান-পতনের সালতামামি সংরক্ষণ করে ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। তাই আমাদের সঙ্গে পশ্চিমাদেশের সম্পর্ক নির্ণয়ের ধারাবাহিক কোনো ইতিহাস আমরা দেখতে পাই না। তবুও বলতে পারি, ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের সম্বন্ধ বিচার করলে তিনটি দিক বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়; সেগুলো হচ্ছে– রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক।[১] রাজনৈতিক অবস্থান নিরূপণে আমরা লক্ষ্য করি, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের প্রাচীনতম ইতিহাস মৌর্য শাসন আমলের ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আবার ধর্মের সংযোগ খুঁজতে গেলে আমরা দেখি যিশুর সাক্ষাৎশিষ্য সাধু টমাসের ভারত আগমনের সঙ্গে জড়িত। অন্যদিকে বাণিজ্যিক যোগাযোগ নিরূপণ করতে চাইলে সেটা সঠিকভাবে সম্ভব নয়। মূলত ভারতের সঙ্গে বিদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অতি প্রাচীন কালের। তবে অর্বাচীন কালের ঐতিহাসিক উপাদান আমাদের কাছে আছে বলেই আমরা মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ ও সম্পর্কের একটা চিত্র উপস্থাপন করতে পারি। সেই সূত্র ধরে আমাদের দেশে ও গোটা ভারতবর্ষে বিদেশীদের উপস্থিতি অনুসন্ধান করা যায়।

আদিকালের মতো মধ্যযুগেও ভারতবর্ষ বিপুল ধন-সম্পদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের জন্য সারা বিশ্বে বিখ্যাত ছিল। বিশেষ করে ভারতের মসলা এবং বঙ্গদেশের মসলিন পৃথিবীর সম্পদলোভী মানুষকে সব সময়ই আকর্ষণ করেছে। তাই ইউরোপীয়গণ ভারতে বাণিজ্য করতে আসার পথ খুঁজতে শুরু করেন। পর্তুগালের রাজা প্রথম মানুয়েলের (১৪৯৫ – ১৫২১) আদেশ পাবার পর ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জুলাই চারটি জাহাজ আর তিনজন দোভাষী নিয়ে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে নাবিকনেতা ভাস্কো দা গামা ভারতবর্ষে আগমনের জন্য জলপথ আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষায় যাত্রা শুরু করেছিলেন। অনেক প্রচেষ্টার পর নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে মে তিনি মালাবারের (বর্তমান কেরালা) কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন। কালিকটের হিন্দু রাজা তাঁকে আন্তরিক আতিথেয়তা দান করেন এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেন। তারপর থেকেই পর্তুগিজ বণিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষে ভারতে যাতায়াত করতে থাকেন। তবে ভাস্কো দা গামা কর্তৃক এই যোগাযোগের সূচনা শুধু বাংলাদেশেই নয়, গোটা ভারতবর্ষের ইতিহাসেই এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। তার আগে শক, হূণ, মোগল আর পাঠানরা ভারতবর্ষে এসে রাজত্ব করলেও চিন্তার দিকে তারা কোনো নতুনত্ব আনতে পারেনি। আধুনিক

১. সবিতা চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক*, কলকাতা: নয়া প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ১

ভাবনায় ভারতকে আলোকিত করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ছিল না বললেই চলে। তারা মূলত এই দেশে তাদের আধিপত্য বিস্তার, শাসন-শোষণ ও ধন-সম্পদ দখলের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। তবে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামার আবিষ্কৃত পথ ধরে ইউরোপের রেনেসাঁ পরবর্তী আধুনিক চিন্তাধারা, রীতি-নীতি এবং সেইসঙ্গে আধুনিকতার নানা উপকরণ আমাদের এই ভূখণ্ডে এসে পৌছায়। এইচ. এইচ. ডডওয়েল মনে করেন, সম্ভবত মধ্যযুগের অন্য কোনো ঘটনা সারা পৃথিবীর সভ্যতার জন্য এত সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনেনি, যতটা ভারতবর্ষের সমুদ্রপথ আবিষ্কারের ফলে সাধিত হয়েছে।[২]

ইউরোপে তখন ভারতবর্ষের মশলা আর রেশমের খুবই চাহিদা ছিল। বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রয়োজনীতা উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। কিন্তু সেই সময়ে ভারতীয় পণ্য ইউরোপে আনা-নেওয়া করার কাজে আরব বণিকদের প্রাধান্য ছিল। তাতে তাদেরই লাভ হত সবচেয়ে বেশি। তখন ইউরোপীয়রা ভাবলেন সরাসরি ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলে ব্যবসার ক্ষেত্রে তাঁরা আরও লাভবান হবেন। তাই পর্তুগালের রাজা ও রাণী উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। তাঁরা কলম্বাসকে ভারত সন্ধানে পাঠালেন। কলম্বাস সেই অভিযানে একটা মহাদেশ আবিষ্কার করলেন ঠিকই, কিন্তু ভারতবর্ষ খুঁজে পাননি। তার পরেই ভাস্কো দা গামা কলম্বাসের স্বপ্ন পূরণে সার্থকতা লাভ করেন। পর্তুগিজ জাতির লোকেরা ভারতবর্ষে আসে মূলত তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে। পরবর্তীকালে এই বণিকদের সঙ্গে আসেন পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারকগণ। তাঁরা প্রথমদিকে জাহাজের ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের পারমার্থিক জীবনের যত্ন নেবার জন্যই জাহাজে থাকতেন। পরে সুযোগ এলে এই মিশনারিগণ ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন।[৩]

বঙ্গদেশে পর্তুগিজ বণিকদের আগমন

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, অর্থাৎ ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার নবাব হোসেন শাহের শাসনকালে প্রথম পর্তুগিজ বণিক জোয়াও কোয়েলো (João Coelho) চট্টগ্রামে তাঁর বাণিজ্যতরী নিয়ে আগমন করেন। ১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দে ডন জোয়াও দ্য সিল্‌ভেইরা (Don João De Silveira) নামে আরেক পর্তুগিজ বণিক মালদ্বীপ থেকে বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান রাজ্যে তাঁর বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হন। তারপর থেকেই বঙ্গদেশে পর্তুগিজ বণিকদের সংখ্যা ও যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। পর্তুগিজরা যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন এই এলাকার প্রধান সমুদ্রবন্দর ছিল চট্টগ্রাম। প্রথমে হোসেন শাহ্ সিল্‌ভেইরাকে ভালমতো গ্রহণ করেননি। চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে পর্তুগিজদের চলাফেরা খুব একটা সমাদৃতও হয়নি। সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষে পরবর্তী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন পর্তুগিজ নাবিক মার্টিন আলফন্সো দ্য মেল্লো। তিনি ১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচটি বাণিজ্যতরী নিয়ে চট্টগ্রামে হাজির হন। তিনিও সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ্ কর্তৃক গৃহীত হননি। ইতিমধ্যে বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিতে কিছু পরিবর্তন ঘটে। শের শাহ্ বিহার অধিকারের পর বাংলা আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তখন মাহমুদ

২. H. H. Dodwell, *The Cambridge History of India*, vol. V, Cambridge University Press, 1929, p. 1
৩. লুইস প্রভাত সরকার, *বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়*, কলকাতা: প্রভু যিশু গির্জা, ২০০২, পৃ. ৪-১০

শাহ্ পর্তুগিজদের সাহায্য চান এবং তার বিনিময়ে বঙ্গদেশে তাঁদের স্বাধীনভাবে বসবাসের ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দেবার অঙ্গীকার করেন।

১৫৩৬ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ্ গৌড় আক্রমণ করেন। পর্তুগিজ সহায়তা পেয়েও মাহমুদ শাহ্ সেই আক্রমণ ঠেকাতে পারলেন না। তিনি শের শাহের সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হলেন। তবে মাহমুদ শাহ্ পর্তুগিজদের পরামর্শ ও যুদ্ধাস্ত্র সহায়তা পাবার পর বঙ্গদেশে তাঁদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, কারখানা ও দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দান করেন। সুযোগ-সন্ধানী পর্তুগিজরা প্রথমেই ব্যাণ্ডেলের কাছে সপ্তগ্রামে এবং চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন শুরু করেন এবং বঙ্গদেশে তাদের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি পাকা করেন।[৪] কালক্রমে তাঁরা সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে বন্দরও নির্মাণ করেন। ক্রমেই তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য অভূতপূর্ব সাফল্য ও প্রসারতা পায়। ইতালীয় যাজক ও গবেষক ফাদার আরতুরো স্পেজিয়ালে মনে করেন– "বাংলার ভূমি তখনকার ভারতবর্ষের মধ্যে ঐশ্বর্যময় একটি রাষ্ট্র ছিল। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের 'স্বর্গ' বলে আখ্যায়িত ছিল, বিশেষভাবে তার মসলিন সুন্দর কাপড় উৎপাদন হতো।"[৫] এছাড়া চট্টগ্রামে সামুদ্রিক বন্দর হওয়ার ফলে নদীবন্দর সপ্তগ্রামের চেয়ে সেখানে ব্যবসা-বণিজ্যের সুবিধা ছিল বেশি। অচিরেই চট্টগ্রাম পূর্বভারতে পর্তুগিজদের বৃহত্তম উপনিবেশে পরিণত হল। অন্যদিকে সম্রাট আকবরের আনুকূল্যে ক্যাপ্টেন পেদ্রো তাভারেজ হুগলিতে জমি অধিগ্রহণ করে সুপরিকল্পিতভাবে হুগলি বন্দর নির্মাণ করেন। বন্দরকে পর্তুগিজ ভাষায় বলা হয় 'ব্যাণ্ডেল'। তাই এই নতুন বন্দর 'ব্যাণ্ডেল' নামে পরিচিতি পেল এবং আজও 'ব্যাণ্ডেল' নামেই সুপরিচিত।

১৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহের মৃত্যুর অল্প সময়ের মধ্যেই পর পর তিন বার বঙ্গদেশের শাসক পরিবর্তিত হয়। শেষে ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গদেশ মোগল সম্রাট আকবরের অধীনে চলে আসে। ইতিমধ্যেই বাংলার বিপর্যয়ে পর্তুগিজ বণিকেরা তাঁদের ভিত্তি আরও মজবুত করতে সচেষ্ট ও সফল হন। তারই ফলশ্রুতিতে বঙ্গদেশে স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার পাবার সঙ্গে সঙ্গে পেদ্রো তাভারেজ সম্রাট আকবরের কাছ থেকে একটি লিখিত 'ফরমান' আদায় করে নেন। আকবর-প্রদত্ত সেই অনুমতিপত্রের বিষয়বস্তু ছিল– "বঙ্গদেশে মিশনারিগণ খ্রিষ্টধর্ম প্রচার, গীর্জা ও কন্‌ভেন্ট নির্মাণ করতে পারবেন এবং যে সমস্ত ভারতীয় 'ইঞ্জিল' বা গস্‌পেল (মঙ্গলসমাচার) এবং খ্রিষ্টধর্মের বিধানসমূহ মান্য করে চলার আগ্রহ প্রকাশ করবে, তাদের নির্দ্বিধায় খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারবেন।"[৬] মোগল সম্রাটের বদান্যতার ফলে এই সত্যই সূচিত হয়েছিল যে, পর্তুগিজ খ্রিষ্টান মিশনারিগণ স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করতে পারবেন এবং এই প্রচারকার্য ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গির্জা ও প্রচারকেন্দ্র নির্মাণ করতে পারবেন। এছাড়াও স্থানীয় যে-সমস্ত মানুষ বাইবেল বা মঙ্গলসমাচার এবং খ্রিষ্টধর্মের বিধানসমসূহ মেনে চলার আগ্রহ প্রকাশ করবে তাদের ধর্মপ্রচারকগণ নির্দ্বিধায় খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারবেন। আকবরের দেওয়া এই সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে পর্তুগিজ বণিকেরা বঙ্গদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী বন্দরগুলিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন।

---

৪. J. J. A. Campos, *History of the Portuguese in Bengal*, Calcutta: Butterworth & Co. Ltd., 1919, p. 167
৫. আরতুরো স্পেজিয়ালে, *নোয়াখালী জেলার খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস*, যশোহর: খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র, ১৯৮৫, পৃ.১৩
৬. লুইস প্রভাত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

আকবরের পরে তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরও পর্তুগিজদের সঙ্গে একই মিত্রতা বজায় রাখেন। তার ফলে চট্টগ্রাম বন্দর ও সন্দ্বীপসহ আশেপাশের দ্বীপগুলি পুরোপুরি তাঁদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সেইসব এলাকায় শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারই নয়, ধর্মপ্রচারের প্রচেষ্টাও ব্যাপকভাবে প্রসারতা লাভ করে। অনেক ঐতিহাসিক এই সময়কে বঙ্গদেশে পর্তুগিজ বাণিজ্য ও ক্ষমতা বিস্তারের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছেন।[৭]

১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে বঙ্গদেশে পর্তুগিজ প্রভাব আস্তে আস্তে স্তিমিত হতে থাকে। ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম দখল করেন। তারপর ১৬১৬ সালে পর্তুগিজ সেনাপতি যোহন গনজালভেস আরাকানদের কাছে পরাজিত হলে সেই অঞ্চলের সমস্ত বন্দর ও দ্বীপ আরাকানীদের হস্তগত হয়। এদিকে ১৬৩২ সালে সম্রাট শাহ্ জাহানের শাসন আমলে বাংলার সুবাদার সুলতান কাশিম খান হুগলি দখল করলে এই দেশে পর্তুগিজদের আর ক্ষমতা রইল না। ইতিমধ্যে পর্তুগিজ সৈন্যরা মগ এবং আরাকান দস্যুদের সঙ্গে মিলে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে অরাজকতা চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আওরঙ্গজেবের শাসনকালে বাংলার নবার শায়েস্তা খাঁ ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম দখল করেন। তার পর থেকে বঙ্গদেশে আর পর্তুগিজ ক্ষমতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[৮] এদেশে পর্তুগিজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেলেও ধর্মপ্রচারের সম্ভাবনা কিন্তু ঠিকই ছিল। অবশ্য ধর্মপ্রচারকগণ মুনাফালোভী ও ক্ষমতালোভী পর্তুগিজদের কাজকর্মে ও আচার-আচরণে সহমত পোষণ করেননি এবং সেটা সমর্থনও করেননি। তাই মিশনারিগণ পর্তুগিজ ভক্তদের ধর্মীয় আচরণ ও বিধি মোতাবেক নানা ধরনের শাস্তি ও দণ্ড দিতেও পিছু-পা হতেন না। তার ফলশ্রুতিতে বঙ্গদেশে পর্তুগিজ প্রচারকেরা দিল্লীর সম্রাটদের পক্ষ থেকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য নানা ধরনের আনুকূল্য লাভ করেছেন।

পূর্ববঙ্গে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার

বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার, প্রসার ও খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব কোনো বিছিন্ন ঘটনা নয়, বরং সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটেই সেটা জড়িত। যিশু-খ্রিষ্টের মৃত্যুর পর তাঁর বার জন শিষ্যের অন্যতম সাধু টমাস খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন। সাধু টমাস মালাবার, অর্থাৎ বর্তমানে ভারতের কেরালা প্রদেশে বসবাসকারী ইহুদি জাতির মধ্যে খ্রিষ্টের বাণী প্রচার শুরু করেন। ক্রমে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ও কৃষ্টির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে খ্রিষ্টধর্মকে ভারতীয় জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রয়াসী হন। এইভাবে যিশুর সাক্ষাৎশিষ্য টমাস খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রিষ্টীয় ৬৮ সালে সাধু টমাসের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান ভক্তজনগণ মালাবার উপকূলে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাই খ্রিষ্টধর্ম ভারতে প্রায় দুই হাজার বছরের প্রাচীন এক ঐতিহ্যমণ্ডিত ধর্ম বলে পরিগণিত। তার পরেও ভারতে খ্রিষ্টবাণী প্রচারের নানারকম প্রয়াস দেখা যায়। ৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মহামতি আলফ্রেড বর্তমান

---

৭. Abdur Rahim Khondkar, *The Protuguese Contribution to Bengali Prose Grammar and Lexiography*, Dacca: Bangla Academy, 1976, p. 6

৮. J. J. A. Campos, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

চেন্নাই শহরে অবস্থিত সাধু টমাসের প্রধান গির্জায় ধর্মীয় কাজ সম্পাদনের জন্য একজন খ্রিষ্টযাজক প্রেরণ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৯]

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগিজ ব্যবসায়ীরাই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে তাঁদের বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে আগমন করেন। অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারকগণই সবার আগে বাংলার মাটিতে খ্রিষ্টবাণীর বীজ বপনের প্রচেষ্টা শুরু করেন। বস্তুত তাঁদের আগ্রহ, উদ্যম ও প্রয়াসের ফলে বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্ম ও খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ঠিক কবে পর্তুগীজ পুরোহিতেরা প্রথম বঙ্গে আগমন করেন, সেই তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করা দুরূহ। তবে অনুমান করা যায় যে, ১৪১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই পর্তুগিজ বণিকদের সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্য-তরীতে খ্রিষ্টবাণীর প্রচারক পুরোহিতও বঙ্গদেশে আনাগোনা করতেন। তার কারণ হিসেবে লুইস প্রভাত সরকার বলেছেন, “পর্তুগীজ রাজ-আইন অনুযায়ী প্রতিটি পর্তুগীজ জাহাজেই একাধিক ধর্মযাজক (chaplain) থাকা বাধ্যতামূলক ছিল।”[১০] তবে বঙ্গদেশে যেহেতু সেই সময়ে বসবাসকারী কোনো খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায় ছিল না, তাই ধর্মযাজকদের এইদেশে বসবাস করার প্রয়োজনও ছিল না। তাঁরা জাহাজের কর্মচারীদের মধ্যেই আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারে জেজুইটদের প্রচেষ্টা

পরবর্তী কালে দেখা যায় যে, বাণিজ্যিক কারণে এইদেশে পর্তুগিজ বণিকদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে। তাদের পারমার্থিক জীবনের কথা বিবেচনা করে বঙ্গদেশে খ্রিষ্টযাজক প্রেরণের তাগিদ দেখা দেয়। সেই সময়ে নতুন প্রতিষ্ঠিত জেজুইট সম্প্রদায় বা যিশুসংঘ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খ্রিষ্টবাণী প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। ভারতবর্ষেও খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় জেজুইট ফাদারদের, বিশেষ করে পর্তুগিজ ও স্পেনীয় যিশুসংঘী পুরোহিতদের প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। প্রাচ্যদেশে প্রথম যিশুসংঘী বাণীপ্রচারক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ১৫৪২ সালের ৬ মে ভারতে আসেন। তিনি পর্তুগালের রাজার এবং ভাতিকানের পোপের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে আগমন করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ভারতে যিশুসংঘের ভিত্তি মজবুত হয় এবং একইসঙ্গে ইউরোপীয় ধারার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই প্রয়াসে ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে দুইজন যিশুসংঘী ধর্মযাজক– ফাদার আন্তনি ভাজ এস.জে. (Father Anthony Vaz, SJ) এবং ফাদার পেদ্রো ডায়াস এস.জে., (Father Pedro Dias SJ) কোচিন থেকে বঙ্গদেশে এসে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের প্রথম কর্মযজ্ঞ শুরু করেন।[১১] তারপর ১৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ মে, ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্নান্দেজ, ফাদার দমিঙ্গো দি'সুজা, ফাদার মেলকিওর দ্য ফন্‌সেকা এবং ফাদার অন্দ্রে বভেস– নামে চারজন যিশুসংঘী কোচিন থেকে সেই সময়ে বঙ্গদেশে যিশুসংঘের প্রধান প্রচারকেন্দ্র হুগলির ব্যাণ্ডেলে

৯. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *ফিরিঙ্গি বণিক্*, কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬০
১০. লুইস প্রভাত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১১. S. A. Carvalho, *Bandel Church and Hoogly*, Krishnagar: Catholic Press, 2013, 5th edition, p. 24

এসে পৌঁছান। সেখানে কিছু প্রচারকাজ সম্পন্ন করে তাঁরা ১৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১ অক্টোবর চট্টগ্রামে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ববঙ্গে আগমন করেন এবং যশোহরের বিখ্যাত রাজা প্রতাপাদিত্যের দরবার উপস্থিত হন। তাঁরাই এই বাংলায় প্রথম খ্রিষ্টান মিশনারি হিসাবে পরিচিত।

উপাসনাগৃহ বা গির্জা নির্মাণ

চট্টগ্রামে যাবার পথে জেজুইট ফাদারগণ যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে দেখা করে মূলত খ্রিষ্টধর্মপ্রচারের পথটি সুগম করে তোলেন। রাজা জেজুইট ফাদারদের পাণ্ডিত্য ও সেবার কাজে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁর রাজ্যে ধর্মপ্রচারকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন। ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে যশোহরের রাজধানী চাঁদকানের কাছে ঈশ্বরীপুর নামক জায়গায় তিনি উপাসনাগৃহ নির্মাণের জন্য জায়গা-জমি এবং অর্থসম্পদ দান করেন। ফাদারগণ সেখানে পর্তুগিজদের সাহায্য ও আনুকূল্যে এবং স্থানীয় ভক্তদের উৎসাহ ও পরিশ্রমে একটি গির্জা নির্মাণ করেন। 'প্রভু যিশু গির্জা' নামে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি মহাড়ম্বরে সেই গির্জার উদ্বোধন করা হয়। ২০ জানুয়ারি রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁর পরিবার ও সভাসদবর্গ নিয়ে সেই গির্জা পরিদর্শনে আসেন। উল্লেখ্য, ঈশ্বরীপুরে যিশুসংঘীদের নির্মিত এই গির্জাই বঙ্গদেশের প্রথম এবং পূর্ণাঙ্গ খ্রিষ্টীয় উপাসনাগৃহ। কালের সাক্ষি এই খ্রিষ্টীয় উপাসনালয় এক সময় নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

তার কিছুদিন পর ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্নান্দেজ এবং ফাদার দমিঙ্গো দি'সুজা রাজা কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরে যান। ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দের দ্বিতীয় ভাগে ফাদার মেলকিওর দ্য ফনসেকা এবং ফাদার অন্দ্রে বভেস নামে আরো দুই জন যিশুসংঘী হুগলি থেকে শ্রীপুরে আগমন করেন। তাঁদের মধ্যে ফাদার ফনসেকাকে চাঁদকানে পাঠানো হয়। সেখানে যাবার পথে তিনি বাক্‌লা (বাখরগঞ্জ) এলে সেখানকার কিশোর রাজা রামচন্দ্রর তাঁকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের এবং উপাসনালয় নির্মাণের অনুমতি দেন। শ্রীপুর থেকে ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্নান্দেজ স্থায়ীভাবে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য ১৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম ফিরে যান। চট্টগ্রাম তখন আরাকানরাজ মেন রাজাজ্ঞীর (১৫৯৩-১৬১২) অধীনে। তিনি যিশুসংঘীদের চট্টগ্রামে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের এবং গির্জা নির্মাণের অনুমতি ও আর্থিক সাহায্য দেন। ফাদার ফার্নান্দেজ ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুন দীক্ষাগুরু যোহনের নামে সেই গির্জা উদ্বোধন করেন। ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ফাদার ফার্নান্দেজ চট্টগ্রামের দক্ষিণে দিয়াঙে আরেকটি গির্জা নির্মাণ করেন। ফাদার ব্লাসিও নুনেসের তত্ত্বাবধানে ১৬০৪ সালে তাঁরা সন্দীপেও একটি গির্জা নির্মাণ করেন। মোট কথা যিশুসংঘী পুরোহিতগণ যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেছেন। সেইসব উপাসনালয় পাশ্চাত্য স্থাপত্যধারা ও আমাদের দেশীয় স্থাপত্যরীতির অপূর্ব মেলববন্ধনের আদর্শরূপে দেখা দিয়েছিল। বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণে সেই মিশ্ররীতির ধারা আজও বিদ্যমান।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শুরু

অভিনব শিক্ষাব্যবস্থার ধারক ও বাহক বলে সারা পৃথিবীতেই যিশুসংঘের বেশ সুনাম আছে। ভারতবর্ষে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার সান্তা ফে নামক কলেজ স্থাপন করেন। গোয়ার এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই এই উপমহাদেশের প্রথম পাশ্চত্যরীতির আধুনিক মহাবিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত। ১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সেখানে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে পাঁচজন বাঙালি খ্রিষ্টান ছাত্র ছিল। সেই ধারারই অনুবর্তন ঘটে বঙ্গদেশে। ব্যাণ্ডেলের জনগণের ক্রমবর্ধমান অনুরোধে ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্নান্দেজ সেখানে একটি স্কুল এবং সাধু পল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই বঙ্গদেশে প্রথম ইউরোপীয় রীতির শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করে।

১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ফাদার ফার্নান্দেজ গোয়ায় জেজুইট অঞ্চল-প্রধানের কাছে কাছে শ্রীপুরে তাঁদের মিশনারি কাজের বর্ণনা দিয়ে একটি পত্রে যা লিখেছেন। সেখানে তিনি তিনি বঙ্গদেশে খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রথম পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায় তাঁর ও অন্যান্য জেজুইটদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত গবেষক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় সেই চিঠির বয়ান বাংলায় তর্জমা করে লিখেছেন যে, সেখানকার ছেলেদের একান্ত অনুরোধে ফাদারগণ একটা পাঠশালা শুরু করেন এবং তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেন, বঙ্গদেশের পূর্বভাগে জেজুইট মিশনের এটাই ছিল "প্রথম এবং একটি সবিশেষ মূল্যবান কার্য"।[১২]

গ্রন্থাদি রচনা ও অনুবাদ কর্ম

ধর্মপ্রচারের কাজকে ত্বরান্বিত ও বেগবান করার লক্ষে জেজুইট ফাদারগণই প্রথম ইউরোপ থেকে মুদ্রণযন্ত্র আমদানি করেন এবং এই ভূখণ্ডে পুস্তক ছাপার কাজটি সম্পন্ন করেন। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে গোয়ায় এই ছাপার মেশিন আনয়ন করা হয়। ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জেলার শ্রীপুরে ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্নান্দেজ নবদীক্ষিত খ্রিষ্টান ছেলেমেয়েদের অনুরোধে ধর্মশিক্ষার জন্য প্রশ্নোত্তরে 'খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা' শীর্ষক এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ফাদার ফার্নান্দেসের পুস্তিকাটি খ্রিষ্টধর্মের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক প্রশ্নোত্তরময় একটি ক্যাটেকিজম সহায়িকা। তাঁর কড়চাধর্মী পুঁথিটি শুধু ছোটদের জন্যই নয়, বয়স্ক– এমনকি সেই সময় বঙ্গদেশে কর্মরত পর্তুগিজদের জন্য এবং তাঁদের স্থানীয় কর্মচারীদের ধর্মশিক্ষা দেবার জন্যও বেশ সহায়ক ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত গবেষক ড. সুকুমার সেন মনে করেন সমগ্র বাংলা ভাষার মধ্যে এটিই প্রথম পুস্তক রচনা।[১৩] একই বছর যশোহর রাজ্যের রাজধানী চাঁদকানে অন্য এক যিশুসংঘী পুরোহিত দমিঙ্গো দি'সুজা আরেকটি 'খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা' বই রচনা করেন।

১৬৮২ খ্রিষ্টাব্দে ফাদার মার্কোস আন্তোনিয়ো সন্তুচ্চি, ফাদার ইগ্নাসিউস গমেজ এবং ফাদার মানুয়েল সয়রবা– এই তিন জন জেজুইট পুরোহিত মিলে বাংলা ভাষার শব্দ-তালিকা, ব্যাকরণ সংকলন, খ্রিষ্টীয় প্রার্থনামালা, খ্রিষ্টধর্মের মূলশিক্ষা, ঈশ্বরের দশ

---

১২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, কলকাতা: ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭০, পৃ. ২১
১৩. প্রাগুক্ত

আজ্ঞা এবং কাথলিক মণ্ডলীর পালনীয় আজ্ঞাবলিসহ খ্রিষ্টধর্ম-কেন্দ্রিক নানা পুস্তক-পুস্তিকা অনুবাদ ও রচনা করেন। ১৭১২–১৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজের মাইলাপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ ফ্রান্সিসকো লেইন এস.জে.-র সফরসঙ্গী ফাদার আন্তোনিয়ো ক্লদিয়স বার্বিয়ে এস.জে. বেশ কিছুদিন বঙ্গদেশে মিশনারি হিসাবে কাজ করেন এবং সহজ বাংলায় একটি ধর্মপুস্তিকা রচনা করেন। অবশ্য প্রার্থনা ও গীতের সঙ্কলন বিশেষ সেই সব পুস্তিকার কোনো অনুলিপি কোথাও পাওয়া যায় না। তবে বাংলা গদ্যসাহিত্য চর্চার আরম্ভ ও বিকাশে জেজুইট ফাদারদের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই।

খ্রিষ্টধর্মের সংস্কৃত্যায়ন বা দেশীয়করণ

শুরুতে বঙ্গদেশে খ্রিষ্টান মিশনারিদের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তাঁরা সংস্কৃত ভাষা জানতেন না। এমনকি কেউ কেউ বাংলা ভাষাও ভালভাবে রপ্ত করেননি। তাই ধর্মপ্রচারের সময় হয় পর্তুগিজ ভাষা ব্যবহার করতেন, নয় দোভাষীর সাহায্য নিতেন। তবে কয়েকজন জেজুইট পুরোহিত শুরু থেকেই বঙ্গদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহী এবং শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এদেশে আগমনের পর তাঁদের প্রথম কাজই ছিল স্থানীয় ভাষা ও কৃষ্টির সম্যক পরিচয় লাভ করা এবং সেগুলো রপ্ত করা। তাঁরা বঙ্গদেশের পূর্বাপর ধর্মের প্রতিও বেশ সহনশীল ছিলেন। দেশীয় লোকদের ধর্মাচার ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সত্যিকার অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করতেন। দক্ষিণ ভারতে কর্মরত ইতালীয় যিশুসংঘী রবের্তো দে নবিলির (১৫৭৭-১৬৫৬) আদর্শে তাঁরা ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করতেন। সেগুলির ইতিবাচক দিক ও গঠনমূলক বিষয়সমূহ গ্রহণে ছিলেন তৎপর। সেইসঙ্গে বিষয়গুলি দেশকালের সময়োপযোগী করে ভাবতেন ও উপস্থাপন করতেন। তার ফলে মানুষের কাছে তাঁরা সহজেই গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বঙ্গদেশে খ্রিষ্টমণ্ডলী বিভিন্ন অবস্থানের মানুষ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান ও ভেদবুদ্ধি ছিল প্রকট। সেই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ধর্মপ্রচারকগণ নব্যদ্ভূত খ্রিষ্টানদের লৌকিক জীবনের বাঙালিত্ব ঘুচিয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু যিশুসংঘীরা চেয়েছেন বাঙালি জাতি খ্রিষ্টান হয়েও যাতে তাঁদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা করে। এই প্রচেষ্টায় ফাদার পিটার গমেজ, ফাদার বেনেডিক্ট রড্রিক্স এবং ফাদার জন দ্য ক্রুজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা দেবমূর্তির প্রতি তাঁরা কোনোরকম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন না বরং হিন্দুদের আরাধনার রীতিতে ছিলেন সশ্রদ্ধ। হিন্দুধর্মের সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের অমিল নয়, কোথায় সামঞ্জস্য রয়েছে সেটা খুঁজে বের করতেই তাঁরা তৎপর ছিলেন। তাঁরা শান্তিপুর ও নবদ্বীপধামে শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবশিষ্যদের সঙ্গে হিন্দুধর্মের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। উপরন্তু শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্ম ও ভক্তিধর্মের সঙ্গে যিশুখ্রিষ্ট প্রচারিত প্রেমধর্ম ও সেবাধর্মের সঙ্গতি বিধান করতে তাঁরা প্রয়াসী হন। হিন্দু ও খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে এই সমন্বয় সাধনের ইতিহাসে এই পুরোহিতদের প্রচেষ্টা চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।[১৪]

---

১৪. লুইস প্রভাত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

সমাজসেবা ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা

হুগলিতে কলেজ স্থাপনের পর জনগণ ফাদারদের একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ জানান। কেননা সেখানে সুষ্ঠু চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অনাহার এবং নানা রোগব্যাধি গরিব মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। ফাদার এস.এ. কার্ভালো, এস.ডি.বি. সেই সময়ের দীনদরিদ্র লোকদের বিষয়ে লিখেছেন যে, মানুষের বাড়ির কাছাকাছি, রাস্তা-ঘাটে, মাঠে-প্রান্তরে, নদীর তীরে– আশ্রয়হীন মানুষ, রোগাক্রান্ত মানুষ, এমনকি অনেক মৃতদেহও পড়ে থাকত। এমন মানবেতর দৃশ্য ফাদারদের মনকে খুবই পীড়া দেয়। তাই মৃত্যুপথযাত্রী অসহায় মানুষের কথা বিবেচনা করে, তাঁদের শেষজীবনে একটু ভালবাসার ছোঁয়া দিতে জেজুইট ফাদারগণ হুগলিতে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র ও একটি সেবাকেন্দ্র শুরু করেন।[১৫]

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে বঙ্গদেশে পর্তুগিজ আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা, মোগল সাম্রাজ্য অখণ্ড রাখার ইচ্ছা, এবং আরাকানরাজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মনোভাব– এই দুই কারণে বঙ্গদেশের নানা জায়গায় যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। অন্যদিকে মগ এবং পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ মানুষের শান্তি বিনষ্ট করত। এইসব যুদ্ধ, কলহ এবং ডাকাতির ফলে সাধারণ মানুষই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হত। তার পরিণতি ছিল অভাব-অনটন এবং অসুস্থতা। পঙ্গু এবং বিকলাঙ্গ মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাত নারী এবং শিশুরা। জেজুইটগণ এই অসহায় নারী আর অনাথ শিশুদের সেবাযত্ন ও দেখাশোনার দায়িত্ব নিতেন। শুধু যিশুর বাণী প্রচারই নয়, যিশুভক্তদের রক্ষা করাও তাঁরা নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাই তাঁরা চট্টগ্রামে একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে খ্রিষ্টান মিশনারিরা যে অনাথ আশ্রমের প্রসার ঘটিয়েছেন, চট্টগ্রামেই তার শুরু।

আমরা জানি যে, বঙ্গদেশে জেজুইট ধর্মসংঘের যাজকগণই প্রথম খ্রিষ্টবাণী প্রচার করেন। তবে তাঁদের পরে কালক্রমে আগষ্টিন সম্প্রদায়ের যাজকগণ পূর্ববঙ্গে তাঁদের প্রচারের ক্ষেত্র এবং কাজ প্রসারিত করেন। তৎকালে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ঢাকা নগরী ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য খুবই বিখ্যাত ছিল। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খাঁ ঢাকাকে সমগ্র বাংলার রাজধানীতে পরিণত করেন। ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবার ফলে সম্রাট আকবরের বদান্যতায় পর্তুগিজ ব্যাবসায়ীগণ ঢাকায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে আগষ্টিন সম্প্রদায়ের যাজকগণ ঢাকায় প্রথম খ্রিষ্টধর্মের গোড়াপত্তন করেন।[১৬] ঢাকার নারিন্দায় 'স্বর্গোন্নীতা রাণীর গির্জা' নির্মাণের কিছুকালের মধ্যেই তাঁদের প্রচেষ্টায় ঢাকার কাছাকাছি শ্রীপুর, লরিকুল ও বাত্রাবুতে গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭] ক্রমে ঢাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ঢাকার তেজগাঁও-এ গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তেজগাঁও 'জপমালা রাণীর গির্জা' নামে ঐতিহ্যবাহী উপসনালয়টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর এটিই পূর্ববঙ্গের প্রধান গির্জায় পরিণত হয়। তেজগাঁও ছাড়াও ঢাকার অদূরে হাস্নাবাদ এবং বরিশালের পাদ্রিশিবপুর, নোয়াখালি এবং তারও অনেক আগে চট্টগ্রামে পর্তুগিজদের বসতি ছিল। সেইসব এলাকায় ছোট-বড় গির্জাও স্থাপিত হয়। তবে ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে

১৫. S. A. Carvalho SDB, *Siege of Hoogly*, Calcutta, p 21
১৬. যেরোম ডি' কস্তা, *বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী*, পৃ. ১১
১৭. J. J. A. Campos, Ibid., p. 100

শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক চট্টগ্রাম দখলের পর পর্তুগিজদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সঙ্কুচিত হলেও পর্তুগিজ মিশনারিদের ধর্মপ্রচার আরও একশ বছর বেগবান ছিল। সেই সময়ের মধ্যে তাঁরা বাংলার বিভিন্ন জায়গায় খ্রিষ্টবাণী প্রচার করেন এবং উপাসনালয়সহ খ্রিষ্টান অঞ্চল গড়ে তোলেন।

প্রচারকাজ ও ধর্মশিক্ষায় গানের ব্যবহার

শিক্ষার ব্যাপারে বিদেশি ধর্মযাজকদের কোনোরকম কার্পণ্য ছিল না। তাঁরা চাইতেন তাঁদের দ্বারা দীক্ষিত জনগণ যাতে সার্বিক দিক দিয়ে বিকশিত হতে পারেন। তাঁরা জানতেন, শিক্ষাই মানুষের মন থেকে সব কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করে দিতে পারে। তাঁরা অবগত ছিলেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুরু করার মাধ্যমেই খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের বীজ বপন করা সহজতর। অতএব বঙ্গদেশে যাতে শিক্ষার প্রসার ঘটে তার জন্য শুরুতেই নাগরীতে একটি স্কুল চালু করা হয়।

সেই সময় স্কুলে অন্যান্য শিক্ষার চেয়ে ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষাই দেওয়া হত বেশি। তবে ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি "অনেক গান শেখানো হতো যা সব খ্রীষ্টানরা জানত। তারা গান করতো এবং অন্য লোকের প্রশ্ন করলে তারা তাদের অর্থ বুঝিয়ে দিত।"[১৮] সেই সময় কি কি গান ভক্তদের মধ্যে প্রচলিত ছিল সেটা স্পষ্ট করে বলা যায় না। তবে ফাদার মনোএল দা আসসুম্পসাওঁ রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামান্তরে 'ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামক গ্রন্থে কিছু গান এবং পদ্য সঙ্কলিত হয়েছে। তেমন গানই যে খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোনো যুক্তি নেই। 'ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এ এমনই একটি গান হচ্ছে,

> হে বাবা যেশুশ বালক নির্মল,
> বিবি মারিয়ার সিদ্ধি ধর্মফলঃ
> আমার দয়ার যেশুশ।
> হে বাবা যেশুশ, হে সোনার বাবা,
> তোমাকে আমি তোই কোরি তোমার সেবা,
> আমার দয়ার যেশুশ।
> হে সোন্দর যেশুশ, হে সোন্দর আরসি,
> তোমারে বেশ সোন্দর দেখি,
> আমার দয়ার যেশুশ।[১৯]

এছাড়াও সমসাময়িক কালে রচিত দুয়েকটি গানের সন্ধান পাওয়া যায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত খ্রিষ্টীয় উপসানায় ব্যবহৃত গানের বই 'গীতাবলী'তে । সেখানে 'প্রাচীন বাংলা খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত' শিরোনামে কয়েকটি গান আছে। সেগুলোর মধ্যে অষ্টাদশ শতক রচিত যিশুর মহিমা-বিষয়ক একটি গান আছে। গানটি হচ্ছে–

> আমার বালকগণে, সকলে আনন্দ মনে,
> যীশুস নাম সংকীর্ত্তনে করি তাহার বন্দনা।
> চন্দ্র সূর্য্য আদি করি, আছে যার আজ্ঞাকারি,
> বাহার পদ পরিহরি, মিছা করি কুবাসনা।

১৮. জুলিয়ান গমেজ, *তিনশো বছর আগে*, কলকাতা: সাধ্বী তেরেজার গীর্জা, ১৯৬৫, পৃ. ৫৫
১৯. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪

জানি তিনি দয়াময়, ধর্মশাস্ত্রে এই কয়,
যবে তাহার দয়া হয়, ঘুচিবে সব যাতনা।[২০]

এমনই গানের ধারা বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের শুরু থেকে আজ অবধি চলে আসছে। তবে গোড়ার দিকে সেসব গানের যে ভাষা এবং ভাব ছিল, বর্তমানে তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

শিক্ষার পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন আনার ব্যাপারে ফাদারদের প্রচেষ্টা ছিল নিরলস। তারই ফলশ্রুতিতে পর্তুগিজ ফাদারগণ বাঙালি হিন্দুদের পারিবারিক জীবনে নিকট আত্মীয়দের যে সম্বোধনে ডাকা হতো তারও পরিবর্তন ঘটিয়ে সেখানে পর্তুগিজ অভিধার প্রচলন করেন। বঙ্গদেশে বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলের খ্রিষ্টানদের মধ্যে আজও সেইসব সম্বোধন প্রচলিত আছে। এইসব শব্দের মধ্যে পাদু (ধর্ম বাবা), মাদি (ধর্ম মা), পুতু (কাকা), নানু (বড় দাদা), মানা (বড় দিদি), কেন্দু (বড় দিদির বর), কোমার্দি (বৌদি এবং ভগ্নিপতির দিদি ও বোন), কোম্পার্দি (বৌদি এবং ভগ্নিপতির দাদা ও ভাই) ইত্যাদি।

এই অঞ্চলে কতগুলো প্রাচীন প্রথা প্রচলিত ছিল। বাঙালির নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রধান প্রধান খ্রিষ্টীয় পর্বগুলোতে মহাসমারোহে শোভাযাত্রাসহ আড়ম্বরপূর্ণ উপাসনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। ধর্মীয় পার্বণ ঘিরে মাঝে মাঝেই মেলার আয়োজন করা হত, আর সে-সব মেলায় অনেক লোকের সমাগম হত। অবশ্য স্থানীয় জনগণকে খ্রিষ্টধর্মে আকৃষ্ট করাই এসব অনুষ্ঠান করার পেছনে মুখ্য কারণ ছিল। ফাদারগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে যিশুখ্রিষ্টের কথা শুনানো ছাড়াও হাটে-বাজারে এবং মেলার মতো লোক-সমাগমে গিয়ে ধর্মপ্রচার করতেন। তবে প্রচারের প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তাঁরা খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ক প্রচার-পুস্তিকা বিলি করতেন। এদিক থেকে বিচার করলে বাংলা ভাষার, বিশেষত বাংলা গদ্যের রচনা, বিকাশ ও মুদ্রণে খ্রিষ্টান ফাদারদের অসামান্য অবদান রয়েছে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাগরী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। দোম আন্তোনিয়ো এই নাগরীতে বসেই রচনা করেছেন 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'। এছাড়াও তিনি পর্তুগিজ পাদ্রিদের সঙ্গে মিলে রচনা করেন 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ", বাংলা ব্যাকরণ এবং 'বাংলা-পর্তুগিজ ও পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ' জাতীয় মূল্যবান গ্রন্থ, যা বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যগ্রন্থ ও অভিধান হিসেবে স্বীকৃত।

দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাণী প্রচারের জন্য গিয়ে সেখানকার ভাষা রপ্ত করে সেই ভাষায় খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুবাদ ও গ্রন্থাদি রচনা করার ব্যাপারে জেজুইট সম্প্রদায়ের পাদ্রিদের নাম সুবিদিত। প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আজও তাঁদের কাজের বর্ণনা দিয়ে তাঁরা সংঘের সদর দপ্তরে নিয়মিত পত্র লিখে থাকেন। ষোড়শ শতকে বঙ্গদেশে তাঁদের ধারণা দিয়ে তাঁরা গোয়া ও রোমের দপ্তরে

২০. কমল কোড়াইয়া (সম্পা.), *গীতাবলী* (খ্রীষ্টীয় গানের বই), ঢাকা: প্রতিবেশী প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ৮৪

অসংখ্য চিঠি লিখেছেন। জেজুইটদের লেখা চিঠি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাস রচনায় যেমন, তেমনই আমাদের ভারতবর্ষ– এমন কি বঙ্গদেশের ইতিহাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "জেসুইট *Letters* কেবল ধর্মপ্রচারের ইতিহাস নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক শূন্যস্থান এগুলি থেকে আহরিত সংবাদে পূর্ণ হয়েছে। জেসুইট পত্রগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক বইতে আলোচিত হয়েছে। দোম আন্তনিওর জীবনের ইতিহাসেও জেসুইট পত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ।"[২১] সেই আন্তেনিয়োর জীবন ও কাজকর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বৈকি।

বাঙালি খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হলেন বাংলার বার ভূঁইয়াদের অন্যতম ফরিদপুর শহরের কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ভূষণা রাজ্যের রাজপুত্র খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত বাংলা ভাষা-সাহিত্যের অন্যতম রূপকার দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও। সেই যুগে এই স্বনামধন্য বঙ্গসন্তান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন যে, তাঁকে ঘিরে সারা ভারতবর্ষে এমনকি ইউরোপের অনেক জায়গায় এক প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। শুধু বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবেই নয়, একজন নিষ্ঠাবান খ্রিষ্টান, খ্রিষ্টধর্ম বিশারদ, খ্রিষ্টধর্মের সার্থক প্রচারক– হিসেবেও দোম আন্তোনিয়ো রোজারিও সেই যুগে বাঙালিদের মধ্যে ছিলেন সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তিত্ব।

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও গবেষক জেজুইট ফাদার হেনরি হস্টেন *Bengal past an present* নিবন্ধে 'The Three First Type-Printed Bengali Books' আলোচনা প্রসঙ্গে দোম আন্তোনিয়ো নামক এই অপরিচিত লেখকের সঙ্গে বাঙালির প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় দোম আন্তোনিয়োর 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' পুস্তকটি প্রকাশিত হলে শিক্ষিত বাঙালির কাছে দোম আন্তোনিয়োর পরিচিতি আরও বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-অধ্যাপক ড. তারাপদ মুখোপধ্যায় লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত দোম আন্তোনিয়োর সমকালে বঙ্গদেশে কর্মরত পর্তুগিজ জেজুইট মিশনারিদের লেখা অনেক চিঠিপত্র ও প্রতিবেদন থেকে কয়েকটি পত্রের ইংরেজি অনুবাদ সংগ্রহ করে দোম আন্তোনিয়োর এক সংক্ষিপ্ত এবং তথ্যনির্ভর জীবনী প্রকাশ করেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'ইতিহাসে উপেক্ষিত' এই রাজপুত্র বাঙালির মরমে ও মননে স্থায়ী আসন লাভ করেন।

দোম আন্তোনিয়ো ছিলেন বাংলাদেশের ফরিদপুর এলাকার ভূষণা রাজ্যের রাজপুত্র। তারাপদ মুখোপাধ্যায় জেজুইটদের পত্র ঘেঁটে তাঁর জন্মসাল নির্ধারণ করেছেন ১৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দ।[২২] মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও কলহ-বিবাদে লিপ্ত হবার পর আরাকান রাজ্যের মগেরা এবং তাদের অনুগত জলদস্যুরা বাংলার লোকালয়ে গিয়ে লুটতরাজ চালাত এবং অনেক মানুষকে বন্দী করে

২১. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, *ইতিহাসে উপেক্ষিত*, কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪, পৃ. ৪
২২. প্রগুক্ত, পৃ. ৪৩

নিয়ে যেত। একবার ভূষণা রাজ্য থেকে তারা বেশকিছু লোকজন ধরে নিয়ে যায়। তারমধ্যে ভূষণার বালক রাজপুত্রও বন্দী হন। জেজুইট পত্র অনুসারে ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মগ দস্যুরা তাঁকে অপহরণ করে চট্টগ্রাম নিয়ে যায়। মগেরা ছেলেটির বংশপরিচয় জানার পর তাদের জাহাজের নাবিকের হাতে তাকে তুলে দিল। নাবিক ছেলেটিকে জাহাজে রাখলেন। তার যথাযথ পরিচর্যা করলেন। কিন্তু ছেলেটি নিজের জাত বিসর্জন না দেবার প্রতিজ্ঞায় জাহাজের খাবার বা জল স্পর্শ করল না। অনন্যোপায় হয়ে জাহাজের নাবিক ছেলেটিকে তাঁর বন্ধু মানোএল ডি' রোজারিও নামে আগস্টিনিয়ান এক পাদ্রির কাছে রেখে যান। ফাদার মনোএল আগ্রহের সঙ্গে ছেলেটিকে গ্রহণ করলেন। ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থে সঙ্কলিত একটি চিঠিতে সেইসময় পূর্ববঙ্গে কর্মরত একজন জেজুইট ফাদার তাঁর কর্তৃপক্ষের কাছে দোম আন্তোনিয়োর খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার কাহিনিটি বিস্তারিতভাবে বলতে গিয়ে লিখেছেন:

> তাঁর উদ্দেশ্য আদরযত্নে মন ভুলিয়ে যদি ছেলেটিকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা যায়। কিন্তু ছেলেটিকে ভালানো সহজ হল না। রাত হলে ছেলেটিকে একটি ঘরে রেখে মনোএল তাঁর নিজের ঘরে গেলেন। ঠিক করলেন পরদিন আবার চেষ্টা করবেন। রাত্রে সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন এক তুমুল কাণ্ড! ছেলেটি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলছে কে ওকে মেরে ফেলেছে। মনোএল আর বাড়ির সকলে ছুটে এসে দেখলেন ছেলেটি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে, তাঁর চোখে জল। ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করলে ছেলেটি আঙুল দিয়ে সেন্ট আন্তনিওর মূর্তিটি দেখিয়ে নিজের ভাষায় বলল, আন্তনী তাঁর হাতের দড়ি দিয়ে ওকে মারছিলেন। ছেলেটি আরও বলল, আন্তনিও ওকে আদেশ করেছেন খাওয়া দাওয়া করে খ্রীষ্টান হতে। এই ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়ে কাল বিলম্ব না করে মনোএল ছেলেটিকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করলেন। দীক্ষান্তে ছেলেটির নাম হল দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিও। তার রাজবংশের চিহ্নটুকু টিকে রইল নামের অগ্রভাগে। গভীর নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দোম আন্তোনিয়ো মনোএলের কাছে খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব ও পর্তুগিজ ভাষা শিক্ষা করতে লাগলেন। খ্রীষ্টধর্মতত্ত্বে তাঁর আগ্রহ এত প্রবল এবং অধ্যয়নে তার অভিনিবেশ এমন গভীর যে মাত্র ২৩ বছর বয়সে দোম আন্তনিও খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব এবং লিখিত ও কথ্য পর্তুগীস ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। ... নিজের জাতের একটি মেয়েকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে তিনি বিবাহ করলেন। তারপর স্বামী-স্ত্রী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বল্পকালের মধ্যে দোম আন্তনিও বুঝতে পারলেন পর্তুগীস ভাষায় খ্রীষ্টধর্মের মহিমা ব্যাখ্যা করলে বাঙালি হিন্দুর কাছে তা সহজবোধ্য হয় না। তাই তিনি স্থির করলেন দেশী ভাষায় অর্থাৎ বাংলায় খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব অনুবাদ করবেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন ধর্মতত্ত্ব ভাষান্তরিত করা দুরূহ কাজ। তথাপি ঈশ্বর প্রণোদিত হয়ে সহজে অল্পকালের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের মূল তত্ত্বগুলি তিনি বাংলা ভাষায় সুন্দরভাবে অনুবাদ করে ফেললেন। নিজের অধ্যবসায় এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের ধর্মের দুরূহ তত্ত্ব জেনে সাধারণের মধ্যে মুখে মুখে সহজভাবে ব্যাখ্যা করতেও সক্ষম হলেন।[২৩]

দোম আন্তোনিয়োর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারী ওই পুরোহিতের বর্ণনার সঙ্গে মি. জুলিয়ান গমেজের বর্ণনার মিল পাওয়া যায়। তিনি তাঁর *তিনশো বছর আগে* নামক পুস্তিকায় লিখেছেন,

> [...] ছেলেটিকে খুব গুণসম্পন্ন দেখে তারা তাকে কোনরকম কষ্টভোগ করতে না দিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে লালন পালন করার চেষ্টা করে। কিন্তু ছেলেটি তাদের দেওয়া কোন খাবার খেতে রাজি হয় না। কাপ্তেন তখন তাকে ফাদার রোজারিও নামে একজন পাদ্রীর তত্ত্বাবধানে স্থলপথে চট্টগ্রামে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। পাদ্রী রোজারিও তাকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই সে ধর্মশিক্ষা শুনবে না। অবশেষে হতাশ হয়ে ফাদার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। গভীর রাত। হঠাৎ ছেলেটির কান্না শুনে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তারা এসে দেখে দারুণ ভয়ে ছেলেটি কাঁপছে। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, 'ঐ পাদ্রী মহাশয় (সাধু আন্তনীর ছবি দেখিয়ে) আমাকে মেরেছেন, খেতে বলছেন ও খ্রীষ্টান হতে আদেশ করছেন।' সকলে তখন জানুপেতে বসে সাধু আন্তোনিয়োকে তাঁর অলৌকিক কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন। ছেলেটি তাঁর কাছে নিদর্শন চাইলে আন্তনী তাঁর গলায় একটি ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দেন, তাঁর মৃত্যুর অবধি চিহ্নটি বিদ্যমান ছিল। পরদিন সে দীক্ষা নেয় এবং তার নাম রাখা হয় আন্তোনিয়োয়। তার দীক্ষা দাতা ফাদার রোজারিওর নাম অনুযায়ী তাঁর পদবী হলো দো রোজারিও। আর তাঁর উচ্চবংশ এবং রাজপুত্রের নিদর্শন স্বরূপ তাঁর নামের আগে 'দোম' কথাটি ব্যবহার করা

২৩. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

হতো। অল্প বয়সেই তিনি পর্তুগিজ ভাষা লিখতে ও পড়তে শিক্ষা করেন এবং ভালোভাবে খ্রীষ্টধর্ম অধ্যয়ন করেন।[২৪]

দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও ছিলেন একজন অসাধারণ বাগ্মী। তাঁর বাগ্মিতায় বাঙালি এমনভাবে অভিভূত হয়েছিল যে অল্পসময়ের মধ্যে তিনি হাজার হাজার স্থানীয় মানুষকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তাঁর বাগ্মিতার খ্যাতি কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর ধর্মপ্রচার সাফল্য লাভ করেছে প্রচারের সময় তাঁর গান গাইবার দক্ষতায়। তিনি নিজে ছিলেন বাঙালি। তাই বাঙালির মন-মানসিকতা তিনি ভাল বুঝতেন। তিনি জানতেন যদি বাঙালিকে ভুলাতে বা মজাতে হয় তা সে গানের মধ্য দিয়েই সম্ভব। তাই তিনি যে গানকেই খ্রিষ্টবাণী প্রচারের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবেন তা কত-না নিশ্চিত। এই গানের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টকে মানুষের প্রাণে সঞ্চারিত করাই ছিল তার একান্ত প্রচেষ্টা।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জেজুইট ফাদার আন্তোনিয়ো সন্তুচ্চির একটি পত্র সংকলন করেছেন তাঁর গ্রন্থে। সেখানে ফাদার সন্তুচ্চি দোম আন্তোনিয়োর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে দোম আন্তোনিয়োর শারীরিক এবং মানসিক বিবরণ দিয়ে লিখেছেন,

> দোম আন্তনিও লোকটি বেঁটেখাটো। গায়ের রং কালো। মুখখানা কৃশ এবং একটু রুক্ষও। দেখে মনে হয় তাঁর বয়স চল্লিশ, কিন্তু আসল বয়স চল্লিশের নিচে। বয়সের তুলনায় তাঁকে বয়স্ক দেখায়। ঐহিক ঐশ্বর্য বলতে তাঁর কিছু নেই, কিন্তু পারমার্থিক ঐশ্বর্যের দ্যুতিতে তিনি ভাস্বর। ... আলাপ আলোচনা করে আমার ধারণা হল খ্রীষ্টধর্মে তাঁর পাণ্ডিত্য প্রগাঢ় এবং খ্রীষ্টধর্ম সাধনায় তিনি একাগ্রচিত্ত।[২৫]

খ্রিষ্টের বাণী ও আদর্শ সবার কাছে পৌছে দেবার আন্তরিক আকঙ্ক্ষা থেকে তিনি তাঁর জীবনের সব কিছু ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন। তবে প্রতিমুহূর্তে তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হত। তিনি জেজুইট আর আগষ্টিনিয়ান– এই দুইদল খ্রিষ্টান মিশনারিদের বিবাদের জাঁতাকলে অনবরত দীর্ণ হচ্ছিলেন। এমকি তাঁর সঙ্গে আগষ্টিনিয়ান পাদ্রিরা প্রায়শঃ ক্রীতদাসের মতো আচরণ করতেন। তারপরও তিনি যিশুখ্রিষ্টের বাণী প্রচাওে কখনও পিছু-পা হননি। তাঁর অনুগামী ভক্তদের গ্রামের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশটির বেশি। একটি গ্রাম থেকে আরেকটি গ্রামের দূরত্ব ছিল অনেক। ফাদার সন্তুচ্চির কথানুসারে একটি গ্রাম থেকে আরেকটি গ্রামে যেতে তিন-চার দিন সময় লাগত। আবার কোনো কোনোটিতে যেতে লাগত আট-দশ দিন।[২৬]

এত দৈন্যদশা ও মানসিক অশান্তির মধ্যে থেকেও দোম আন্তোনিয়ো সৃষ্টিশীল কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্যে কখনও কোনো অবহেলা করেননি। তিনি নিজের চেষ্টায় তাঁর জন্মস্থান ভূষণা এবং কর্মস্থল নাগরী এলাকায় প্রায় ত্রিশ

২৪. জুলিয়ান গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২
২৫. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

হাজার লোককে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন বলে ফাদার সন্তুচ্চি তাঁর কর্তৃপক্ষের কাছে লিখেছেন। সেই সঙ্গে তিনি তাঁর আদর্শ মতো সমস্ত মিশনারিদের প্রচার কাজে একাগ্রচিত্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।[২৭]

'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'

দোম আন্তোনিয়ো গ্রন্থকার হিসেবেও সমধিক পরিচিত। তাঁর লেখা 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামের গ্রন্থের সঙ্গে কমবেশি আমরা সবাই পরিচিত। ধর্মশিক্ষা দানের জন্য লেখা এই বইয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের তুলনায় খ্রিষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সমসাময়িক স্থানীয় কথ্য ভাষায় লেখা এই বইটি বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন। এই কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে বাংলা গদ্যরীতির প্রচলনে এই গ্রন্থ এক অসামান্য দলিল হিসেবে গৃহীত। আলোচ্য পুস্তক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

> নাগরী গ্রামের সন্ত নিকোলাস তলেন্তিনো মিশনের ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানগণ কৃষক শ্রেণীভুক্ত ছিল, এবং তাহারা পর্তুগিজ ভাষা তো দূরের কথা, মাতৃভাষা বাংলাতেও লিখিতে পড়িতে জানিত কিনা সন্দেহ। এই কৃষিপ্রধান হিন্দু-মুসলিম জনগোষ্ঠির মনোভাবের প্রতি চাহিয়াই তিনি এই পুস্তক রচনা করিয়া ছিলেন, মূল উদ্দেশ্য ছিল তর্কে হিন্দুদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া রোমান কাথলিক ধর্মের মহিমা বৃদ্ধি করা।[২৮]

এই গ্রন্থ নিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক আলোচনা করা হয়েছে। বইটি ছিল হাতে লেখা। রচিত হয়েছিল ১৬৭০ সাল নাগাদ। তিনি জীবিত থাকতে সেটা প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পর, অর্থাৎ ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে সেটা ছাপার জন্য পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে পাঠানো হয়। বইটি তিনি লিখেছিলেন বাংলায়। কিন্তু ফাদারেরা নিজেদের সুবিধের জন্য রোমান হরফে তা লিখে নেন। কলকাতায় বসবাসকারী জন্মসূত্রে ঢাকার মানুষ জুলিয়ান গমেজের মনে হয়েছে, "রাজকুমারের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই গ্রন্থ। তিনি বাংলা ভায়ায় প্রথম গদ্যের সূচনা করার কৃতিত্বের অংশীদার। তাঁর আগে গদ্যে এই রকম একটা গোটা বই কেউ রচনা করেননি- করলেও তার পুঁথি এখনো আবিষ্কার হয়নি। আন্তেনিয়োর বইটির ভাষা সরল, দুয়েকটা সংস্কৃত শ্লোকও আছে এবং সেই যুগের কথা বলার ভাষাকেই প্রধানভাবে নেওয়া হয়েছে।"[২৯]

এই গ্রন্থে তিনি একজন ব্রাহ্মণ ও একজন রোমান কাথলিকের কথাবার্তার মাধ্যমে প্রচলিত হিন্দুধর্মের অসারতা এবং অযৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে বিভিন্ন অবতারগণ পরম পবিত্র ভগবান হবার উপযুক্ত নন। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করলেও তার মধ্যে নানা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে তিনি আসল কাহিনির চেয়ে নানা জনশ্রুতির উপর বেশি নির্ভর করেছেন বলে মনে হয়। অতএব সূক্ষ্মভাবে দেখলে মনে হয় হিন্দুশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান হয়ত তাঁর ছিল না। আন্তোনিয়ো ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। তাই তাঁর লেখার মধ্যেই সেটা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর গ্রন্থে পূর্ববঙ্গের বহু শব্দ ও প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। এই পূর্ববঙ্গীয় ভাষা থেকে প্রাচীন বাংলা সমন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
২৮. অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮, পৃ. ২৯
২৯. জুলিয়ান গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়– যুর্দো (যুদ্ধ), ছাওয়াল (ছেলে), জর্ম (জন্ম), রাইতে (রাতে), বরো (বড়)– এমন প্রচুর শব্দ গ্রন্থের উৎকর্ষ সাধন করেছে। এই শব্দসমূহের মধ্যে বেশকিছু আজও ভাওয়াল খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ

এতদিন পর্যন্ত আমরা দোম আন্তোনিয়োর লেখা 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' এই একটি মাত্র পুস্তকের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। কয়েক বছর আগে ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় আরও একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনার সঙ্গে দোম আন্তোনিয়োর যোগ আছে বলে দাবি করেছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের রচনা সম্পর্কে এক নতুন বিতর্কের সূচনা করেছে। সেই বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ'। পুঁথিটি ছিল নামহীন এবং তারিখ বিহীন। তবে এক টুকরো সাদা কাগজে 'A Vocabulary, Portuguese and Bengali' এই নামটি লিখে পুঁথির মলাটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া ছিল। অথচ এই মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা বা প্রণেতা হিসেবে এতদিন পর্যন্ত আমরা পর্তুগিজ পাদ্রি মনোএল দা আসুম্পসাওঁ বলেই জানতাম। গ্রন্থকার সম্বন্ধে পাদ্রি মনোএলের তথ্য উপস্থাপন করেছিলেন কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার কলেজের গবেষক ফাদার হেনরি হস্টেন এস. জে.। মনে হয় ফাদার হস্টেন ঐতিহাসিক সত্যে নয়, বরং তাঁর নিজের মনগড়া একটা ধরণার উপর ভিত্তি করেই এই তথ্যের অবতারণা করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

অন্যদিকে ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এ সংরক্ষিত এই বইয়ের পুঁথি ঘেঁটে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, "বাংলা-পর্তুগীস শব্দকোষের লিপিকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ সে সমন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"[৩০] তিনি প্রমাণ করেছেন এই গ্রন্থের লিপিকর ছিলেন দুইজন। তাঁদের মধ্যে একজন বিদেশি, যিনি বাংলা জানতেন, অন্যজন পর্তুগিজ জানা বাঙালি। তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত– "শব্দকোষের পরিকল্পনা দ্বিতীয় লিপিকরের। ... দ্বিতীয় লিপিকরের পরিকল্পনানুসারে বাংলা জানা পর্তুগীস লিপিকরের সহায়তায় শব্দকোষখানি সংকলিত হয়েছিল। দ্বিতীয় লিপিকর দোম আন্তনিও।"[৩১] এই শব্দকোষের পরিশিষ্টে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামক অংশে হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনায় কতগুলি শ্লোক রয়েছে। এই শ্লোকগুলি দোম আন্তোনিয়ো রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

ইংরেজ প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মারসডেন ভারতে অবস্থানকালে বিভিন্ন পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। সেগুলির মধ্যে এই 'পর্তুগিজ বাংলা শব্দকোষ' অন্যতম। ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের তথ্য অনুযায়ী সেই পুঁথি বর্তমানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এ সংরক্ষিত আছে। সেইসঙ্গে তাঁর সঙ্গত অনুমান, "এই শব্দকোষের অন্যতম সঙ্কলক বা সম্পাদক দোম আন্তনিও।"[৩২] তার কারণ 'পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ' পুঁথিটির কোনো নাম প্রযুক্ত হয়নি। তার মধ্যে রচনাকারের কোনো

৩০. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, *ইতিহাসে উপেক্ষিত*, পৃ. ৫৪
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

নাম উল্লেখও করা নেই। এমনকি বইটির রচনাকাল সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সাল-তারিখও উল্লেখ করা হয়নি। শুধুমাত্র এক টুকরা সাদা কাগজে 'A Vocabulary, Protuguese and Bengali' এই নামটি লিখে পুঁথির মলাটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ইংরেজি নামেই পুঁথিটি মারসডেনের তালিকায় নির্দেশিত হয়েছে। তারাপদ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, মারসডেনের সংগ্রহের আরও একাধিক পুঁথির মলাটে একই হাতের লেখায় পুঁথির নাম নির্দেশিত। তাই ড. মুখোপাধ্যায়ের অভিমত– "নামটি সম্ভবত মারসডেনের দেওয়া এবং তাঁরই হাতে লেখা। ডেনিসন রস *Bulletin of the School of Oriental Studies,* London পত্রিকায় 'The manuscripts collected by William Marsden with special reference to two copies of Almedia's history of Etheopia' নামক প্রবন্ধে ১৯২১ সালে সর্বপ্রথম এই পুঁথির কথা উল্লেখ করেন। তার পর থেকেই বিদগ্ধ মহলে এই বই নিয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরি হয়।

অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে, 'পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ' পুঁথির মধ্যে ২৫৫টি পাতা রয়েছে। প্রতিটি পাতার একদিকে সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। সেই বিচারে বলা যায় পুঁথিটিতে পৃষ্ঠার সংখ্যা ৫১০। এগুলোর মধ্যে প্রথম দিকের তিনটি এবং শেষের দিকের একটিতে কোনো পত্রাঙ্ক নেই। প্রথম দিকের পাতার সংখ্যাগুলি কলমের কালিতে লেখা আর শেষের দিকের মোট এগারটি পাতার সংখ্যা (২৪১-২৫১) পেন্সিল দিয়ে লেখা। মারসডেনের সংগ্রহের অন্যান্য পুঁথির মতো 'পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ'-এর পুঁথিটিও চামড়ায় বাঁধাই করা। পুঁথির প্রতিটি পাতার মাঝখানে লম্বালম্বি ভাবে ভাঁজ করা রয়েছে। তারফলে ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের অনুমান: "খুব সম্ভবত পর্তুগীস শব্দগুলি একদিকে এবং বাংলা শব্দগুলি অন্যদিকে লিখবার জন্য এইরকম ভাঁজ করা হয়েছিল।[৩৩] পুঁথিতে পর্তুগিজ শব্দগুলি আকারাদিক্রমে সাজানো রয়েছে। আর সেগুলোর পাশে বাংলা অক্ষরে রয়েছে বাংলা প্রতিশব্দ। মজার বিষয় হল প্রতিটি পর্তুগিজ শব্দের গড়ে তিনটি করে বাংলা প্রতিশব্দ লেখা হয়েছে। একজন অবাঙালি বাংলা শিখে প্রতিটি বাংলা শব্দের তিনটি করে প্রতিশব্দ জানবেন, সেটা এত সহজ নয়। আর সেই তথ্য গ্রহণ করারও অবিবেচকের কাজ বলেই মনে হবে।

এই ব্যাকরণ গ্রন্থটি রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি নয়, বরং লাতিন ব্যাকরণের ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে একটি পরিচয়লিপি রয়েছে। কিন্তু পরিচয় পত্রটির মধ্যে কারও কোনো স্বাক্ষর নেই। তবে পরিচয়ের পর বইয়ের প্রস্তাবনাটি পাদ্রি মনোয়েলের রচনা বলে মনে করা হয়। তিনি সেখানে পাঠকদের বইটি মনযোগ সহকারে পাঠ করার সবিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন। সেখানে তিনি এ-ও বলেছেন যে, গ্রন্থের বাংলা থেকে পর্তুগিজ অনুবাদটুকুই শুধু তাঁর নিজেই রচনা। বইয়ের বাদবাকি অংশ বাঙালি খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের মধ্যে প্রাজ্ঞ ও সুপরিচিত তথা ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়োর একান্ত নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার ফল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

৩৩. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

নাগরী: খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের প্রাণকেন্দ্র

বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে খ্রিষ্টধর্মের গোড়াপত্তন, প্রচার, প্রসার ও বিস্তারে যে জায়গাটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি তার নাম নাগরী। ঢাকা জেলার সমগ্র ভাওয়াল এলাকায় এবং পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, অধুনা নাটোর ও পাবনা জেলার কিছু অঞ্চলে খ্রিষ্টধর্মের প্রসারে নাগরী তথা ভাওয়ালের অবদান অপরিসীম। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, নাগরী ভাওয়াল পরগণার একটি অংশ মাত্র। এই নাগরী-কেন্দ্রিক ভাওয়াল এলাকায় ঠিক কবে থেকে প্রথম খ্রিষ্টধর্ম প্রচার শুরু হয় তার সঠিক তথ্য আজও জানা যায়নি। তৎকালীন নাগরী তথা ভাওয়াল এলাকায় কর্মরত ফাদারদের চিঠিপত্র ও নথিপত্র বিশ্লেষণ করে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে যেরোম ডি'কস্তা লিখেছেন, "ফরিদপুর জেলার ভূষণার আন্তইন (অর্থাৎ আন্তনিও বা আন্তনী) নামক একজন সাধারণ খ্রিষ্টভক্তের দ্বারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের ফলে বিশেষতঃ ঢাকার উত্তরে ভাওয়াল রাজ্যে (নাগরী, তুমিলিয়া, রাঙ্গামাটিয়া, মঠবাড়ি ও মাউসাইদ) এবং সম্ভবত ঢাকার দক্ষিণে হাসনাবাদ, গোল্লা এলাকায় বহু কাথলিকের উৎপত্তি হয়েছে।"[৩৪] আন্তইন ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নিজের এলাকা ভূষণায় স্ত্রী, কাকা-কাকীসহ তাঁর কিছু আত্মীয়-স্বজনকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি জনসমক্ষে কথোপকথন, গান ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করতেন। অনেকের ধারণা তিনি নাকি কিছু অলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন।[৩৫] কথিত আছে নাগরীকে কেন্দ্র করে ভাওয়াল এলাকায় ১৬৭৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনহাজার নিম্নবর্ণের হিন্দুকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক আরও লিখেছেন যে, সেই সময়ে "আন্তইন দা রোজারিও কর্তৃক ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানের সংখ্যা ২৭০০ থেকে ৩০,০০০ কিন্তু দীক্ষাস্নান ব্যতীত এসব নতুন খ্রিষ্টান বিশেষ কোনো ধর্মীয় শিক্ষা পাননি।"[৩৬] অন্যদিকে আরও কিছু ঐতিহাসিক আন্তোনিয়ো কর্তৃক ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানের সংখ্যা ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৭] অবশ্য তিনি ভাওয়াল আসার আগে অর্থাৎ ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ভূষণা রাজ্যের কোষাভাঙায় আগষ্টিন সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকদের সঙ্গে প্রচারকাজে ব্যাপৃত ছিলেন। সেখানেও স্বজাতি মানুষের কাছে এবং আশে পাশে অন্যান্য জায়গার লোকজনকে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তাদের দীক্ষা দেন।

ভাওয়ালে খ্রিষ্টানদের নতুন ধর্মযাত্রার প্রাক্কালে এই এলাকায় আগষ্টিন সম্প্রদায়ের ফাদারদের প্রচারকর্ম শুরু হয়। সেই সময় অনেক খ্রিষ্টানই ভূমিহীন অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ জোতদারদের অত্যাচারে জর্জরিত ছিলেন। তাঁদের এই অবস্থার নিষ্কৃতি সাধনের লক্ষ্যে ১৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ফাদার লুই দস্ আঞ্জস (Luis dos Anjus) ভাওয়াল পরগণার নাগরী গ্রামটি ক্রয় করেন এবং কোষাভাঙার খ্রিষ্টানদের সেখানে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। সেখানে তিনি একটি মাটির গির্জাঘর নির্মাণ করেন। সাধু নিকোলাস টলেন্টিনুর নামে উৎসর্গীকৃত এই গীর্জাটিই ছিল নাগরীর প্রথম গির্জা। পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে নাগরীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সেই জায়গাকে কেন্দ্র করে আগষ্টিন সম্প্রদায়ের ফাদারগণ বঙ্গদেশের নানা স্থানে বিশেষত

৩৪. যেরোম ডি' কস্তা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৩৫. J. J. A. Campos, *The History of the Portuguese in India*, pp. 247-248
৩৬. যেরোম ডি' কস্তা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৩৭. J. J. A. Campos, Ibid., pp. 247-248

ফরিদপুরের ভূষণা ও লরিকুল, ঢাকার দক্ষিণে হাসনাবাদ ও হোসেনপুর, বরিশালের পাদ্রিশিবপুর, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট, এমনকি আসামের রাঙ্গামাটিতে গিয়ে খ্রিষ্টবাণী প্রচার ও খ্রিষ্টভক্তদের সেবা-যত্ন করতেন। নাগরী শুধু ধর্মপ্রচারের জন্যই নয়, পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের বিকাশেও প্রাথমিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বঙ্গদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে খ্রিষ্টানদের অবস্থা

১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার শুরু হয়। প্রথমদিকে হয়তো প্রচারের ক্ষেত্রে সফলতা আসেনি। সেই যুগে খ্রিষ্টধর্ম এবং খ্রিষ্টান বলতে বঙ্গদেশের মানুষ যা বুঝতো, তা সবই বিদেশি এবং ভিন্ন জাত-ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রচারকগণ ছিলেন স্থানীয় মানুষদের কাছে আগন্তুক। তাই নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাত ও উত্থান-পতনের মধ্যেও ধর্মপ্রচারকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম ছিল অবিচলিত। তাঁদের এই কঠোর সাধনার ফলে যিশুখ্রিষ্টের নাম ও বাণী প্রচারিত হতে থাকে এই বাংলাদেশে। আস্তে আস্তে স্থানীয় মানুষ ধর্মপ্রচারক ফাদারদের কাছাকাছি আসতে থাকেন। তাঁদের সংস্পর্শে এসে অনেকেই এই নতুন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্মের প্রদীপ জ্বলাবার আগে যে সলতে পাকানোর প্রয়াসকালীন সময়ের খ্রিষ্টভক্তদের বর্ণনা দিয়ে ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, ভবিষ্যতের পক্ষে আশাপ্রদ সেই খ্রিষ্টসমাজ ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ের কয়েক দশকের মধ্যে বাংলাদেশে পাঁচ ধরনের খ্রিষ্টভক্তদের কথা উল্লেখ করেছেন ঐতিহাসিক লুইস প্রভাত সরকার। সেই খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে ছিলেন– (১) এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য লিপ্ত পর্তুগিজগণ (২) মোগল সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত পর্তুগিজগণ এবং ইন্দো-পর্তুগিজ ফিরিঙ্গি (৩) পর্তুগিজ জলদস্যুদের দ্বারা অপহৃত এবং দেশীয় লোক (৪) বণিক ও মিশনারিদের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত দেশীয় লোক এবং (৫) পর্তুগিজদের অধীনে বেশকিছু সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী এবং চাকর-চাকরানি, যাদের আগষ্টিনিয়ান ফাদারগণ খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন।[৩৮] অন্যদিকে লেখক গবেষক যেরোম ডি'কস্তার মতে, বাংলাদেশে তখন তিন ধরনের খ্রিষ্টবিশ্বাসী ছিল– (১) কুঠি ও ব্যবসায় কর্মরত ইউরোপীয়গণ (২) ভাড়াটে সৈন্য (এরা মোগলদের অধীনে কর্মরত খাঁটি পর্তুগিজ-ভারতীয় সংমিশ্রণজাত সন্তান ছিলেন) এবং (৩) খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত স্থানীয় জনগণ।[৩৯]

অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, ঢাকা জেলার ভাওয়াল তথা নাগরী এলাকার অধিকাংশ খ্রিষ্টানই নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদের বংশধর। তারা আন্তোনিয়ো দা রোজারিও কর্তৃক খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত। এছাড়াও বঙ্গদেশে তখন কিছু গুপ্ত খ্রিষ্টান ছিল। আগে তারা ছিল ইসলাম ধর্মের অনুসারী। তখনকার মোগল সম্রাট কর্তৃক অত্যাচারিত হবার ভয়ে তারা প্রকাশ্যে

৩৮. লুইস প্রভাত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৩৯. যেরোম ডি' কস্তা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত না। আগষ্টিন দলের ফাদার আম্ব্রোশিও প্রতি বছর এমন প্রায় ৩০০ জন ভক্তকে গোপনে দীক্ষাস্নান দিতেন।[৪০]

বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উষালগ্নে খ্রিষ্টানদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। তবুও নানা-নথিপত্র ঘেঁটে ঐতিহাসিক লুইস প্রভাত সরকার অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপট বিচার-বিশ্লেষণ করে তিন ধরনের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত ধনবান ব্যক্তিদের তালিকায় ছিলেন পর্তুগিজ বণিক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ। তাঁদের জীবন-যাপন ছিল বিলাস-বহুল ও ব্যয় সাপেক্ষ। নানা আমোদ-প্রমোদমূলক অনুষ্ঠান এবং পানাহারের আয়োজনে তাঁদের যেন কোনো ক্লান্তি ছিল না। দ্বিতীয়ত মোগল সেনাবাহিনীতে কর্মরত পর্তুগিজ ও ফিরিঙ্গিগণ, যাদের বলা যায় উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং খ্রিষ্টান সমাজের প্রতিপত্তিশালী এক দল। তাঁরা তাঁদের চেয়ে অর্থনৈতিক ও প্রভাবের দিক থেকে নীচু অবস্থানের মানুষের উপর মাঝে মাঝেই জোর খাটাতেন। তাঁরা জোর-জুলুম করে তাঁদের মতামত ও বিশ্বাস অন্যদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। তৃতীয়ত হচ্ছেন হিন্দু ও মুলসমান সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত কৃষক ও দিনমজুর শ্রেণিভূক্ত। এই শ্রেণীর লোকরা অধিকাংশই নিরক্ষর ও দরিদ্র ছিলেন বলে দাবি করেছেন লুইস প্রভাত সরকার।[৪১] শ্রী সরকারের এই দাবির সত্যতা নিয়ে ইদানিং অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। অনেক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার পর বাংলাদেশে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ঐতিহ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে কয়েক জনের মনে হয়েছে যে স্থানীয় জনগণ, যারা খ্রিষ্টধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের সবার অবস্থানই যে দরিদ্রসীমার নীচে ছিল তা আদৌ সত্য নয়। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম অতুল স্পষ্ট করেই বলেছেন,

> কোনো লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এ ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, তার প্রমাণ স্পষ্ট আমাদের পরিবারের হাতে রক্ষিত জায়গা সম্পত্তির পুরাতন কাগজপত্র। নগদ অর্থ দিয়ে তারা পর্তুগিজ জমিদারী এস্টেট থেকে সাধ্য সামর্থ্য অনুযায়ী এবং প্রয়োজন ও পরিমাণ মতো জমি পত্তন নিয়েছিলেন। বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রায় শতবর্ষ পূর্বের সি.সি. রেকর্ডে জায়গা-জমির কাগজপত্রে এই তথ্যাদি পাওয়া যায়।[৪২]

অবশ্য এইকথা ঠিক যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেই সময়কার খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান অসাম্য তাঁদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থানে তেমন বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। খ্রিষ্টীয় সমাজের মধ্যে বিদ্যমান এই সাম্য বা সৌভ্রাতৃত্বের নীতি স্থানীয় অনেক মানুষকেই খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। সেই সময়ে নবদীক্ষিত খ্রিষ্টভক্তদের খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীর নাম দেওয়া হত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বাপ্তিস্মের সময় দীক্ষাদাতা পুরোহিতের পারিবারিক নামটি অর্থাৎ পদবিটি দীক্ষাপ্রার্থীর নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত। দীক্ষার পর থেকে কাউকে আর দেশীয় নাম এবং আগেকার পদবি ব্যবহার করতে দেওয়া হত না। মনে করা হত দীক্ষা গ্রহণ করে একজন স্থানীয় মানুষ যেমন নতুন মানুষ হয়ে ওঠেন, তেমনি তাঁর নাম ও পদবি বদলের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ে ওঠেন খ্রিষ্টের অনুসারী, এক নতুন পথের পথিক। তখন থেকে যিশুখ্রিষ্টই যেন তাঁর জীবনের কর্ণধার। নাম এবং পদবি পরিবর্তনের ফলে তাঁদের মধ্যে এক ধরনের ইতিবাচক প্রভাব ও দিকের উল্লেখ

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৪১. লুইস প্রভাত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৪২. উইলিয়াম অতুল, 'ঐতিহাসিক ভাওয়াল', নাগরী, ২০০০, পৃ. ৭

করেছেন জুলিয়ান গমেজ। কেননা সেই সময়ে বঙ্গদেশে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল।[৪৩] দোম আন্তনিও যে তাঁর স্বগোত্রের এক মেয়েকে বিয়ে করেন, যার মধ্যে তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর জাতিভেদে বিশ্বাসের প্রমাণ বলে মনে করে। অথচ নতুন ধর্মমতে দীক্ষিত খ্রিষ্টানদের মধ্যে আর কোনো ভেদাভেদ থাকে না বলে দাবি করেছেন জুলিয়ান গমেজ। তাঁর মতে,

> এই নতুন নামকরণের ফলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়েছে। প্রথমতঃ খ্রীষ্টানদের একটা নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল, দ্বিতীয়তঃ নতুন খ্রীষ্টানরা এসেছিলো বিভিন্ন জাত ও ধর্ম থেকে। কেউ ছিল খাস মোগল, কেউ পারসী, কেউ ব্রাক্ষণ, কেউ বৌদ্ধ- তাদের পূর্বের ভেদাভেদ তুলে দিয়ে খ্রীষ্টধর্মের আদর্শ অনুযায়ী সকলকে একই পর্যায়ে ফেলার প্রয়োজনীয়তা ছিল। নাম আর পদবী পরিবর্তনের ফলে কারও মধ্যে জাতিভেদ জ্ঞান, আত্মদৈন্য বা গর্ববোধ করার কোন কারণ থাকতো না।[৪৪]

তখনকার যুগে প্রযুক্ত এই পর্তুগিজ নাম ও পদবি আজও পূর্ববঙ্গের এবং পশ্চিমবঙ্গের বেশকিছু কিছু বাঙালি খ্রিষ্টানদের মধ্যে বংশানুক্রমে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তাদের মধ্যে– আঞ্জুস, এসেনসন, কস্তা, ডি' কস্তা, কাম্পু, ডি' কাম্পু, কুইয়া, কুলেন্তনু, কোড়াইয়া, ক্রুজ, ডি' ক্রুজ, গডিনু, গনজালভেস, গমেজ, টসকানু, টলেন্টিনু, ডায়েস, দরেস, পেরেরা, পেরেইরা, পিরিছ, পেরেজ, পিউরিফিকেশন, ম্যাকফিল্ড, রোজারিও, ডি' রোজারিও, রেগো– ইত্যাদি প্রধান। এই ধরনের পদবী পরিবর্তনের ফলে আজও বাংলাদেশের নানা জায়গায় যাঁরা খ্রিষ্টধর্মের বিষয়ে বিশেষ ওয়াকিবহাল নন, তাঁরা এখন মনে করেন যে এদেশের খ্রিষ্টধর্মানুসারীগণ বিদেশি মানুষ। তবে উল্লেখ্য বর্তমানে প্রতিটি খ্রিষ্টানই তাঁর খ্রিষ্টীয় নামের সঙ্গে একটি দেশীয় নাম বা বাংলা নাম ব্যবহার করেন। এখন আর আগের মতো কাউকে নাম পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয় না।

নবদীক্ষিত খ্রিষ্টান সমাজ যাতে কোনোমতে পূর্ববিশ্বাস ও সমাজে ফিরে যেতে না পারেন সেই সঙ্গে নিজেদের নতুন পরিচয়ে পরিচিত হতে পারে সেইজন্য প্রায় সমস্ত বাঙালি প্রথা এবং পার্বণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খ্রিষ্টীয় পূজা-পার্বণের প্রচলন করা হল। বাঙালি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে সমঞ্জস্য বজায় রেখে উৎসবকালীন খাবার প্রস্তুতের প্রচলন আজও চোখে পড়ে। বাংলাদেশে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় বড়দিনের সময় কেক নয় বরং পৌষ-পার্বণের সমসাময়িক এই মহান উৎসবে নানারকম পিঠে তৈরি করে থাকেন। আবার যিশুখ্রিষ্টের পুনরুত্থান বা পাস্কাপর্বের সময় উৎসবকালীন খাওয়া-দাওয়া হিসেবে আয়োজন করা হয় খই, মুড়ি, মুড়কি, দুধ, দই, মিষ্টি, রসগোল্লা, কলা– ইত্যাদি। এছাড়াও শিশুদের দীক্ষাস্নান, অন্যান্য খ্রিষ্টীয় আচার-অনুষ্ঠানসহ বিবাহের আগে কনে-দেখা এবং বাগ্‌দানসহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে আনন্দের আসর বসত। বিবাহোত্তর আনুষ্ঠানিকতাও খুব ঘটা করে আয়োজন করা হত। লোকদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া এবং আমোদ-উৎসব করার প্রবণতা ছিল বেশি। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের সময় নানা ধরনের বিনোদন অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। আর সেসব আয়োজনে বিদেশি মিশনারিদের আগ্রহও ছিল দেখার মতো। কেননা সেসব অনুষ্ঠানের সময় অনেক মানুষের সমাগত হতো। নব্য খ্রিষ্টানদের আনন্দ করতে দেখে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠতেন। সেই সময়ে পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যেও স্থানীয়করণের প্রক্রিয়া চলে আসে। নানা অনুষ্ঠানে মানুষ দেশীয় পোষাক পরেই অংশগ্রহণ করতেন।

৪৩. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
৪৪. জুলিয়ান গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

বঙ্গদেশে পর্তুগিজদের অবদান সমীক্ষা

কোনো দেশের সঙ্গে সেই দেশের জাতি এবং তার ভাষার একটা অন্তরঙ্গ যোগ থাকে। তাই কোনো দেশকে সঠিকভাবে জানতে হলে সেই দেশের ভাষা সম্বন্ধে জানা দরকার। সেইসঙ্গে তার ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকার দরকার। আর কোনো দেশের ইতিহাসে শুধু রাজ-রাজড়া কিংবা শাসন-প্রশাসনের বিষয় জানলেই চলে না, সেই দেশের ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য ও চিত্রকর্মও জানতে হয়। ব্যক্তি-মানুষের কোনো চিন্তা, কোনো ধ্যানলব্ধ সত্যকে তার গণ্ডি ছাড়িয়ে সবার কাছে জানাবার তাগিদ অনুভূত হলে সেই ভাষাকে অনুবাদ করতে হয়। মানুষের জীবনের চাহিদা যেমন অগণিত, তেমনি ভাষা শেখার কারণও বহুবিধ। ইউরোপীয় জাতির মানুষেরা শুধু আমাদের ভূখণ্ডকে চিনতে এবং এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে জানতেই যে এই দেশে এসেছিলেন– এই কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তাঁদের আসল লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যের প্রয়াস ও প্রসার। তাঁরা জানতেন ভারতবর্ষের ভাষা না শিখলে তাঁদের পক্ষে মানুষের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া সহজসাধ্য হবে না। সেই সঙ্গে তাঁদের ব্যবসাও বিস্তার লাভ করবে না। অতএব তাঁরা আমাদের ভাষা আয়ত্ব করার চেষ্ট শুরু করেন।

ষোড়শ শতকে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় খুব বেশি ছিল না। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ বা আসা যাওয়া ছিল কষ্টসাধ্য, সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। তাই যাঁরা এখানে আসতেন তাঁরা আর নিজেদের দেশে ফিরে যাবার সঙ্কল্প ও চেষ্টা করতেন না। এই দেশেই কোনো এক স্থানে একত্রে জোটবদ্ধ হয়ে বসবাস করতেন। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে এবং এদেশের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ফলে আস্তে আস্তে তাঁরা অনেকেই আমাদের দেশীয় জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা আমাদের ভাষা শেখেন এবং নিজেদের প্রয়োজনে সেই ভাষার যথাযথ প্রয়োগও করেন।[৪৫]

প্রথমদিকে যেসব ইউরোপীয় জাতি বঙ্গদেশে এসে বসবাস করেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অন্তরের টানে আমাদের দেশ-ভূমিকে নিজেদের দ্বিতীয় বাসস্থান করে নিয়েছেন। তবে বণিকদের লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য। নিজেদের দেশের ব্যবসার বিস্তার ঘটানোর জন্য তাঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থরক্ষাই ছিল আসল বিবেচ্য। অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্মের প্রচারকদের অদম্য প্রচেষ্টা ছিল এইদেশের মানুষের পাপে পতিত আত্মাকে যিশুখ্রিষ্টের ছত্রছায়াতলে এনে তাদের মুক্তি সাধন করা। যেহেতু ধর্ম প্রচারের লক্ষে হলেও বঙ্গদেশের প্রতি তাঁদের ইতিবাচক মনোভাব ও আকর্ষণ ছিল, সেহেতু এদেশের মানুষের প্রতি তাদের প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা মানুষের সার্বিক জীবনে কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেছেন।

মিশনারিগণ জানতেন যে, এদেশের মানুষের কাছাকাছি যেতে হলে তাদের আচার-আচরণ, জীবন-যাত্রা ও ভাষা-বুলি জানতে হবে; আয়ত্ব করতে হবে। খ্রিষ্টবাণী প্রচারকদের এদেশে আসার পর প্রধান কাজ ছিল বাংলা ভাষা রপ্ত করা। এই বিষয়ে এ. কে. প্রিয়লকার বলেছেন,

---

৪৫. Sushil Kumar De, *Bengali Literature in the 19th Century*, Calcutta: Firma K L Mukhopadhyay, 1962, pp. 48-49

> During the early period so great an importance was attached to the role of Indian languages in the work of evangelisation that the Concilio Provincial in 1606 ordered that no cleric should be placed in charge of a parish unless he leanrt the local language; and that parish priests who were ignorant of local languages would automatically lose their positions if they fail to pass an examination in the local language within six months.[৪৬]

উল্লেখ্য, খ্রিষ্টবাণী প্রচারকদের মধ্যে এই নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে। তবে অনেকের অভিমত যাঁরা এই দেশে প্রচার কাজে এসেছেন বা আসেন, তাঁরা এখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি, ভাষাবুলি, বেশভূষা, খাদ্যাভ্যাস জেনেই নিজেদের ইচ্ছায় আসেন। তাঁরা সমস্ত অবস্থা ও ব্যবস্থা মেনে নিয়েই আসেন। অতএব ভাষা এবং এইদেশের রীতি-নীতি শেখার ব্যাপারে তাঁদের একান্ত আগ্রহ ও প্রচেষ্টা থাকবে সেটা অবধারিত।

আমাদের বঙ্গদেশে ঔপনিবেশিক শাসকরাজার প্রধান লক্ষ্য ছিল যে-কোনো উপায়ে নিজেদের দেশের স্বার্থ রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করা। সেই সুবাদে পর্তুগিজ বণিকদের আসল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের বাণিজ্যের প্রসার ও ব্যাপ্তি ঘটানো। সেইসঙ্গে খ্রিষ্টীয় মিশনারিদের অদম্য চেষ্টা ছিল এই দেশের মানুষের 'পতিত' আত্মাকে আজীবন নরকদশার অন্ধকার থেকে রক্ষা করে খ্রিষ্টের আলোকধামে নিয়ে যাওয়া। তাই বাংলা ভাষা শেখার ব্যাপারে তাঁদের কোনো কার্পণ্য ছিলনা; বরং সেটা তাঁদের নিজেদেরই একটা একান্ত প্রয়োজন এবং তাগিদ বলে মনে হয়েছে। আর কাজ চালাবার মতো ভাষা রপ্ত করতে না পারলে বঙ্গদেশে তাঁদের আসার সত্যিকার অর্থ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। তাই দেখা গেছে মিশনারিদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই সঠিক ও সুন্দরভাবে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করতেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতি সবিতা চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, "মিশনারিগণ জানিতেন, এ দেশের মানুষের নিকট পৌঁছিতে হইলে ইহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী ও ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচার কেন্দ্রের কর্মিগণের তাই প্রথম প্রয়াস ছিল এই দেশের ভাষা সুন্দরভাবে শিখিয়া লওয়া– এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলনা।"[৪৭]

ইউরোপীয়গণের ভারত আগমনের প্রথমদিকে বাংলাদেশের সমুদ্র ও নদীকূল বৈদেশিক বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির বাণিজ্যিক ভাষা ছিল পর্তুগিজ। এই কথা থেকেই অনুমান করা যায় যে, সেই সময় পর্তুগিজ ভাষার চাহিদা ও প্রয়োজন ছিল ব্যাপক। যদিও বাণিজ্যিক কারণেই এই ভাষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তবুও তার বিস্তার ও জনপ্রিয়তা সবার মধ্যেই একটা বিশেষ স্থান করে নেয়। এমনকি পর্তুগিজ ভাষা বঙ্গদেশের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোতে সর্বজনবোধ্য ভাষা (Lingua-franca) হিসেবে পরিগণিত হত।[৪৮] আর তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের প্রায় সমুদ্রোপকূলবর্তী সমস্ত বাণিজ্য বন্দরগুলিতেই পর্তুগিজ ভাষায় মনের ভাব আদান-

---

৪৬. A. K. Priolkar, *Printing Press in India*, Bombay: Marathi Samshodhana Mandala, 1958, pp. 23-24
৪৭. সবিতা চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৪৮. Sushil Kumar De, *Bengali Literature in the 19th Century*, p. 58

প্রদান করা হত।[৪৯] তা সত্ত্বেও অনেক পর্তুগিজই বাংলা দেশের ভাষাকে নিজেদের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন। সেই সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যে বিদেশি লেখক বিষয়ক গবেষক সবিতা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন–

> যে-সকল ইউরোপীয় বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই বাঙ্গালা গদ্যের এই অবহেলিত অমসৃণ রূপটির মধ্যে সম্ভাবনার অগ্নি লক্ষ্য করিয়াছিলেন– তাঁহারা বাঙ্গালা গদ্যে কোন অমর সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্যের অপ্রমেয় সিসৃক্ষা-সৃষ্টিতে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না। ... যেখানে ইউরোপীয়গণ সর্বোত্তম বাঙ্গালা গদ্য রচনা করিলেন সেখানেও তাঁহারা সর্বত্র রচনায় বাঙ্গালা গদ্যের পরিচর্যাশীলিত রূপ- বিধানে সক্ষম হইয়াছেন– তাহা নহে। তবে তাঁহাদের প্রচেষ্টা অবশ্যই অকৃত্রিম ও আন্তরিক ছিল।[৫০]

বিদেশিদের মধ্যে সর্বপ্রথম পর্তুগিজ বণিকদের মাধ্যমেই বহির্বিশ্বের সঙ্গে বঙ্গদেশের যোগাযোগ শুরু হয়। অবশ্য সেই যোগসূত্র স্থাপিত হয় মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। তাঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমদানি তামাক আর মরিচ। অল্পদিনের মধ্যেই লঙ্কা মরিচ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, পর্তুগিজরা আনার আগে পর্যন্ত ভারতীয় রান্নায় গোল মরিচ আর আদা ছাড়া ঝালের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তামাকও জনপ্রিয় হয়েছিল অল্পকালের মধ্যে। পর্তুগিজরা তামাক এনেছিলেন ষোল শতকে। কিন্তু সতের শতকের প্রথম দিকেই তার ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্রাট আকবর পর্যন্ত তামাকের ভক্ত হয়েছিলেন। বিলাসদ্রব্য হিসাবে তামাক এত কম সময়ের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে, বঙ্গদেশে তামাকের মহিমা কীর্তন করে একাধিক কাব্য লেখা হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে। বাণিজ্যিক উৎপাদন হিসাবে আলু অর্থাৎ গোল আলুও দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।[৫১]

বদনাম সত্ত্বেও আজও পর্তুগিজদের কথা বঙ্গদেশে স্মরণ করা হয় তার একটা বড় কারণ হল নানা ধরনের ফল ও কৃষিদ্রব্য আমদানি এবং অন্যটা হল বাংলা ভাষায় তাঁদের অবদান। তাদের সঙ্গে কাজ কারবার জন্য ভারতের উপকূলে তখন ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা চালু হয়েছিল, যাকে বলা যায় এক ধরনের ভাঙা পর্তুগিজ। বাংলা ভাষায় এখনও সেই ভাঙা পর্তুগিজের ছাপ রয়ে গেছে। বাংলা ভাষায় পর্তুগিজ শব্দের সংখ্যা আরবি-ফারসি অথবা ইংরেজির মতো হাজার হাজার নয়, কিন্তু "যে শতাধিক পর্তুগিজ শব্দ বাংলা ভাষায় এখনো চালু রয়ে গেছে, তাদের কোনো বিকল্প নেই।"[৫২]

আমাদের ঘরবাড়ির নানা অনুষঙ্গ পর্তুগিজ শব্দ থেকে আমরা অনায়াসেই গ্রহণ করেছি। সেইসব শব্দের মধ্যে– বারান্দা, জানালা, কামরা, গুদাম, গরাদ প্রধান। আবার জায়গা-জমির ক্ষেত্রে বর্গা শব্দটিও পর্তুগিজ থেকে গৃহীত। ধাতুর মধ্যে ইস্পাত শব্দটি এসেছে পর্তুগিজ ভাষা থেকে। অন্যদিকে ঘর-গৃহস্থালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ; যেমন– চাবি, আলমারি, পেরেক, আলপিন, বালতি, গামলা, পিপা, পিরিচ, বয়াম, বোতল, ক্যানেস্তারা, সাবান শব্দগুলো পর্তুগিজ শব্দভাণ্ডারের অবদান। পোষাক-আশাক এবং সেইসঙ্গে প্রযুক্ত জিনিসও আমরা পাই পর্তুগিজ শব্দভাণ্ডার থেকে; যেমন– তোয়ালে, কামিজ, সায়া,

---

৪৯. J. J. A. Campos, *History of the Portuguese in Bengal*, p. 48
৫০. সবিতা চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৫১. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৬, পৃ. ৮৭
৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

ফিতা, বোতাম, ইস্তিরি, আয়া– ইত্যাদি। এমনই আমাদের নিত্যব্যবহৃত বহু শব্দ এসেছে পর্তুগিজ ভাষা থেকে। এমনকি বহু খাবার এবং ফলের নামও এসেছে পর্তুগিজ ভাষা থেকে। যেমন, আনারস শব্দের মূল হল পর্তুগিজ আনানাস। রসালো বলেই এই শব্দের শেষ অংশ 'নাস' বাংলায় পরিবর্তিত হয়ে 'রস' রূপ লাভ করেছে। এছাড়াও ফলের মধ্যে রয়েছে– পেয়ারা, নোনা, পেঁপে, কাজুবাদাম; সবজির মধ্যে বাঁধাকপি, খাবারের মধ্যে পাউরুটি, বিস্কুট, সাগু; পানীয়ের মধ্যে কফি, সালসা– ইত্যাদি।

আমরা আগেই দেখেছি, পর্তুগিজদের মাধ্যমেই ইউরোপের সঙ্গে বঙ্গদেশের প্রথম যোগাযোগ ঘটেছিল। সেই যোগ স্থাপিত হয়েছে প্রধানত ব্যবসার প্রয়োজনে। চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে বঙ্গদেশে পর্তুগিজ কোনো প্রভাব পড়েছিল বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। পর্তুগিজদের দৌলতে বঙ্গদেশের সঙ্গে বর্হিবাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, দেশে নতুন ফল এসেছে, নতুন খাবার এসেছে, নতুন ফুল এসেছে, নতুন ধরনের বস্ত্র এসেছে। খ্রিষ্টানধর্মের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে বঙ্গদেশের।[৫৩]

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধক আন্তোনিয়োর জীবনচরিত ও খ্রিষ্টীয় জনজীবনে তাঁর প্রভাব

কাথলিক বিশ্বাস মতে একজন সাধু বা সাধ্বী হচ্ছেন যিশু খ্রিষ্টের একনিষ্ঠ ভক্ত। এই পৃথিবীতে ধার্মিক জীবন যাপনের ফলে তিনি সসম্মানে স্বর্গে সমাসীন। এই জগতে তিনি ঈশ্বরের আদেশ ও ইচ্ছাকে সর্বতোভাবে পালন করেছেন– তারই ফলশ্রুতিতে ঈশ্বর তাঁকে স্বর্গে গৌরবান্বিত করেছেন। একজন ভক্ত তিনি যতই পুণ্য জীবন যাপন করেন না কেন– বেঁচে থাকতে তাকে সাধু বা সাধ্বী ঘোষণা করা হয় না। তাকে হয়ত 'জীবন্ত' সাধু বা সাধ্বী বলা হতে পারে। কলকাতার মাদার তেরেজাও বেঁচে থাকতে অনেকেই তাঁকে 'জীবন্ত সাধ্বী' বলে অভিহিত করেছেন। তবে একজন খ্রিষ্ট-সাধক বা সাধিকা আদর্শ খ্রিষ্টীয় জীবন যাপনের পর মৃত্যুবরণ করলে তাঁর মধ্যস্থতায় কোনো সাধারণ ব্যক্তি যদি বিশেষ কোনো ঐশানুগ্রহ লাভ করে– তবেই তাঁকে সাধু বা সাধ্বী বলে ঘোষণা করা হয়। সহজ কথায় বলতে গেলে, সেই সাধক-সাধিকার নামে অলৌকিক কাজ সম্পন্ন হতে হয়। তবে সেই আশ্চর্য কাজের প্রমাণ এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা দরকার। আরও স্পষ্ট করে বললে, কোনো সাধু বা সাধ্বীর মাধ্যমে প্রার্থনা করে কেউ যদি সুস্থতা লাভ করে; তবে সেক্ষেত্রে ডাক্তারের পরীক্ষা এবং সনদ প্রয়োজন বৈকি।

ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে কাথলিকদের এই সাধু-সাধ্বী তর্পণ হচ্ছে খ্রিষ্টধর্মের পরম পুণ্যজনদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার একটি প্রচলিত রীতি। সাধু-সাধ্বীর স্বরূপ বর্ণনা করে ফাদার দিলীপ এস. কস্তা বলেছেন, "কাথলিক মণ্ডলীতে সাধু-সন্তগণ ঈশ্বরের প্রীতিভাজন, আশীর্বাদিত ব্যক্তিত্ব, পুণ্যকর্মের অধিকারী এবং মণ্ডলীতে পূজনীয়, বরণীয় এবং অনুকরণীয় আদর্শ। সাধু-সাধ্বী সম্মানসূচক উপধিটি দেওয়া হয় পুণ্যভাজন ব্যক্তির পুণ্যকর্মের উপর ভিত্তি করে এবং তাঁদের মরণের পরে।"[১] ফাদার দিলীপের কথায় বুঝি তিনি সাধু-সাধ্বীর অবস্থানকে পরিষ্কার করার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাঁর আলোচনায়। তবে তাঁর বর্ণিত 'সম্মানসূচক উপাধিটি' কিন্তু জাগতিক নয়; পারমার্থিক। অন্যদিকে রাজশাহী খ্রিষ্টধর্মপ্রদেশের ধর্মপালক বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেছেন, "সাধু-সাধ্বীগণ ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তাঁরা স্বর্গে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকেন। তাঁদের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের বহু দান ও আশীর্বাদ লাভ করে থাকি। তাই আমরা তাঁদের ভালবাসি ও সম্মান করি।"[২] বিশপের কথায় বোঝা যায় যে, স্বর্গে অবস্থিত সাধু-সাধ্বীদের সঙ্গে এই পৃথিবীতে আমাদের একটা আত্মিক যোগা থাকে। সচরাচর আমরা তাঁদেরই স্মরণ করি, যাঁরা এই পৃথিবীতে বড় কিছু করে গেছেন; দুনিয়ায় মহৎ কিছু দিয়ে গেছেন। মোট কথা তাঁদের কথা ও কাজের মাধ্যমে পৃথিবীকে আরও সুন্দর অবস্থানে নিয়ে গেছেন।

---

১. দিলীপ এস. কস্তা, 'পাল-পুরোহিতের বাণী', অনুগ্রহ, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, ২০১৬, কাতুলী, পৃ. ১
২. বিশপ জের্ভাস রোজারিও, 'বিশপ মহোদয়ের বাণী', অনুগ্রহ, পৃ. ক

কাথলিক মতবাদে বিশ্বাসী ভক্তজনেরা আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ হিসাবে সাধু-সাধ্বীদের মৃত্যুবরণের দিনটাকে পর্বদিন হিসাবে স্মরণ ও সম্মান করে। সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কাথলিক খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের একটি পুরাতন প্রথা। তাই খ্রিষ্টমণ্ডলীতে অনেক সাধু-সাধ্বী আছেন। যাঁরা সাধু-সাধ্বীর সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন– "পোপ, সন্ন্যাসী, ধর্মযাজক, ভক্তবিশ্বাসী, নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, দাস-দাসী-ভৃত্যসহ আরো অনেকেই।"[৩] ফাদার দিলীপের প্রণীত তালিকার বাইরেও আমরা দেখি, কাথলিক মণ্ডলীতে রাজা-রাণী, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী, কবি-সাহিত্যিক, লেখক-সম্পাদক, শিক্ষক-অধ্যাপক, কারাবন্দি জনগণ, ধর্মান্তরিত জনসাধারণ, ভিনদেশে বাণী-প্রচারক, ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠাতা, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, ঐশতাত্ত্বিক– এমনই নানা পেশা ও অবস্থানের মানুষ। খ্রিষ্টীয় পঞ্জিকায় যত সাধু সাধ্বীর নাম আছে পাদুয়ার সাধু আন্তোনিয়ো "নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টমণ্ডলীতে সর্বশ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট সাধুদের অন্যতম।"[৪]

সাধক আন্তোনিয়োর জীবনী রচনা করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তার দুইটি কারণ উল্লেখ করেছেন সি. এম. এন্টনী। তিনি মনে করেন, সেই কারণগুলোর মধ্যে– প্রথমত বহুদিন ধরে এই সাধকের জীবনকথা কিংবদন্তির ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন; দ্বিতীয়ত সাধু আন্তোনিয়োর গৌরবান্বিত ঐতিহ্য সত্যান্বেষণের পক্ষে এক বড় অন্তরায়।[৫] আমরা জানি, এমন মহান সাধকের জীবন ঘিরে ঐতিহাসিকতার চেয়ে মানুষের আবেগমথিত চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বেশি। অথচ ইতিহাসের সঙ্গে ঐতিহ্যের যথাযথ মেলবন্ধন হলেই আমরা আন্তোনিয়োর মতো প্রখ্যাত সাধকের জীবন, মনস্তত্ব, দর্শন, জনপ্রিয়তা– মোট কথা তাঁর সুমহান ঐতিহ্য ও অস্তিত্ব যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারব। ফ্রান্সিসকান সংঘের বিখ্যাত আলোচক এম. লিয়োঁ দে কেরভালের কথার সুত্র ধরে সি. এম. এন্টনি বলেছেন– "সাধু আন্তোনিয়োর জীবনের অনেক কিংবদন্তি কাহিনি শুধু প্রমাণ সাপেক্ষই নয়: এমনকি ঐতিহাসিকভাবেও অসম্ভব।"[৬] সমালোচকের এই অভিমত আমরাও গ্রহণ করতে পারি।

সত্যানুসন্ধানে ভাবাবেগের চেয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক উপাদান বিশ্লেষণ করার মাধ্যমেই একজন মহান ব্যক্তিকে আমরা মানুষের কাছে আরও গ্রহণীয় করে তুলতে পারি। তবে তার জন্য সেই ব্যক্তির তথ্যসমূহ সঠিকভাবে সংগ্রহ করা দরকার। কেননা "ত্রয়োদশ শতকের জীবন ঘিরে যেসব উপাদান পাওয়া যায়, তার স্বল্পতাও সাধু আন্তোনিয়োর যথাযথ জীবনী রচনার বড় একটা বাধা।"[৭] তবুও আমাদের এই প্রচেষ্টায় আমরা সাধক আন্তোনিয়োর জীবনের লৌকিক ও অলৌকিক উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করে যুগ যুগ ধরে তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ বোঝার চেষ্টা করতে পারি। সেই সঙ্গে তাঁকে আমাদের যুগের বিজ্ঞানমনস্ক ও চিন্তাশীল মানুষের কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে পারি।

---

৩. দিলীপ এস. কস্তা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
৪. পাস্কাল ফার্নান্দো, ও.এফ.এম., অনুবাদ তিমির সিংহ, ও জন এঙ্গেলবার্ট, *পাদুয়ার সাধু আন্তনি*, কলকাতা: খ্রিষ্টপূজন প্রকাশনী, পৃ. ১
৫. C. M. Antony, *Saint Antony of Padua: The Miracle Worker*, London: Longmans, Green and Co., 1911, p. x
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. xi
৭. প্রাগুক্ত

সাধক আন্তোনিয়োর পরিবার, জন্ম ও শৈশব

পর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরীতে ১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট আন্তোনিয়ো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মার্টিন দ্য বুইলিওনে ছিলেন একজন বিখ্যাত রাজকর্মচারী। অন্যদিকে তাঁর মা ডোনা তেরেজা দ্য তাভেরা ছিলেন প্রাচীন ও অভিজাত বংশের এক ধর্মপ্রাণ নারী। তৎকালীন পর্তুগালের জাতীয় এবং ধর্মীয় রীতি অনুসারে জন্মের আট দিন পর তাঁকে দীক্ষাস্নাত করা হয়।[৮] তখন তাঁর নাম দেওয়া হয় ফের্নান্দো দ্য বুইলিওনে। তাঁদের বাড়িতে একটি ধর্মীয় বাতাবরণ ছিল। "পর্তুগিজ মায়েরা তাঁদের সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় সেই ব্যাপারে সঠিক শিক্ষা দিতেন। একই ভাবে ডোনা তেরেজা তাঁর ছোট্ট রাজপুত্রকে শিশু থাকতেই খ্রিষ্টীয় প্রার্থনার ধারা ও ধর্মীয় রীতিনীতি সব শিখিয়েছিলেন।"[৯] এই ধর্মীয় বিষয়গুলোর মধ্যে হচ্ছে প্রাত্যহিক প্রার্থনা, বাইবেলের নবসন্ধির মর্মসত্য ও খ্রিষ্টীয় আচার-আচরণ। ডোনা তেরেজা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। তিনি যেহেতু একনিষ্ঠ কাথলিক পরিবারের সন্তান, তাই সন্তানকেও পবিত্র বাইবেলের শিক্ষায় যথার্থ শিক্ষিত করে তোলেন। এ ছাড়াও তেরেজা বীর ও যোদ্ধা পরিবারের কন্যা। তাই পারিবারিক ঐতিহ্য মেনেই তিনি সন্তানকে পরিবারের বীরত্বগাথা, সাধু-সাধ্বীদের অমর জীবনকথা এবং প্রথম যুগের খ্রিষ্টানদের আত্মত্যাগের কাহিনি শোনাতেন। টমাস এফ. ওয়ার্ড ফের্নান্দোর মা ডোনা তেরেজার সম্বন্ধে বলেছেন, "এই ধর্মবতী নারী কাথলিক বিশ্বাসের পরম্পরায় তাঁর সন্তানের সামনে পুণ্যবতী কুমারী মারিয়ার স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত করতেন।"[১০]

বুইলিওনে পরিবার লিসবন শহরে খ্রিষ্টজননী কুমারী মারিয়ার নামে নিবেদিত মহাগির্জার পাশেই বসবাস করত। এই কাথেড্রাল গির্জা সারা পর্তুগালে বিখ্যাত ছিল। তাঁর বয়স যখন সাত বছর, তখন তাঁকে কাথেড্রাল গির্জার স্কুলে ভর্তি করা হয়। এখানেই শিশু ফের্নান্দো পবিত্র শাস্ত্র, লাতিন ভাষা, ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, কলাবিদ্যা, শব্দোচ্চারণ ও তার প্রকাশভঙ্গি, ভাষাতত্ত্ব এবং সামসঙ্গীত আবৃত্তি– শিক্ষা গ্রহণ করেন।[১১] আন্তোনিয়োর বস্তুনিষ্ঠ জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি, ফের্নান্দো প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লাতিন ভাষা ও ধর্মীয় সঙ্গীত আয়ত্ব করেছিলেন। প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত ফের্নান্দোর মধ্যে নতুন বিষয়সমূহ আয়ত্ব করার একটা সহজাত প্রবৃত্তি ছিল। তাঁর শৈশবের শিক্ষা সম্পর্কে জীবনীকার বলেছেন, আন্তোনিয়োর সময়ে "শিক্ষালাভের জন্য মহোপসনালয়ে যেতে হত। এখানে সাধারণ লেখাপড়ার সঙ্গে সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র, চারুকলা– ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত এবং প্রার্থনা ও ধর্মীয় শিক্ষার চর্চাও হত।"[১২]

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৯. Mabel Farnum, Ibid., p. 14
১০. Thomas F. Ward, Ibid., p. 12
১১. C. M. Antony, Ibid., p. 2
১২. জি. আগষ্টিন ও এন্টন সুব্রত মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

ফের্নান্দোর বাবা তাঁর কাজকর্ম নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকতেন। তাই তাঁকে বড় করে তোলবার দায়িত্ব পড়ে তাঁর মা ডোনা তেরেজার উপর। তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সেই কর্তব্য তিনি যথাযথ ভাবে পালন করেছেন। সন্তানের ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে তাঁর প্রয়াস ও প্রচেষ্টা ছিল অপরিসীম। সেটাকে তিনি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেছেন। সম্পূর্ণভাবে খ্রিষ্টীয় জীবন সাধনায় নিবেদিত মা হিসাবে তাঁর সন্তানের শিক্ষায় যিশুর জীবনাদর্শকে প্রতিফলিত করেছেন। অন্যদিকে বীরবংশধরের কন্যা হিসাবে তিনি পুত্রের মধ্যে উচ্চমার্গের জীবনদর্শন প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন।[১৩]

পুণ্যবতী কুমারী মারিয়ার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় বিগলিত এই নারী তাঁর সন্তানকে কুমারী মারিয়ার কোলে নিবেদন করেছেন। শৈশবেই ফের্নান্দো তাঁর ভক্তি ও বুদ্ধির সমূহ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কেউ খ্রিষ্টধর্মের পরম সত্য– পবিত্র ত্রিত্ব ঈশ্বর, পুণ্যবতী কুমারী মারিয়া এবং সাধু-সাধ্বীদের জীবনকথা নিয়ে আলাপ করলেই তিনি বেশি খুশি হতেন।[১৪] তবে খ্রিষ্টধর্ম সংক্রান্ত ইতিহাস, উপাসনারীতি, বিশ্বাসসূত্র– প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশি।[১৫] স্কুলে পড়ার সময়েই তাঁকে সমস্ত গুণের আদর্শ বলে অভিহিত করা হয়।[১৬]

খ্রিষ্টীয় যাজকসংঘে যোগদান

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফের্নান্দোর চারিদিকে মায়াজালের বিস্তার ঘটে। ধনী পরিবারের সন্তান, সুদর্শন চেহারা অধিকারী হবার সুবাদে তাঁর সামনে নানা প্রলোভন হাতছানি দেয়। তিনি যে শহরে জন্ম নিয়েছেন, সেই লিসবনের জীবযাত্রাও জৌলুসতায় ও ইন্দ্রিলালসায় ভরপুর ছিল। কিন্তু “আন্তোনিয়ো জাগতিকতার মোহে নিজেকে নিমজ্জিত করেননি, বরং আধ্যাত্মিকতার আদর্শে বীরপদর্পে এগিয়ে গেছেন।”[১৭] জীবনীকারের কথা থেকে বোঝা যায় যে, ফের্নান্দো ছিলেন অন্যান্য কিশোরদের চেয়ে একেবারে আলাদা। ছোট বেলাতেই তিনি সংসার এবং সাংসারিক মোহ থেকে দূরে থাকার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। কথিত আছে, পাঁচ বছর বয়সে আন্তোনিয়ো কুমারীগণের রাণী মারিয়ার নামে উৎসর্গীকৃত স্থানীয় গির্জার বেদির সামনে দাঁড়িয়ে এই ব্রত গ্রহণ করেন যে, তিনি চিরদিনের জন্য ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করবেন।[১৮] সেই কারণে তিনি বাড়ির কাছেই আগস্তিনিয়ান যাজকসংঘের মঠ থেকে সন্ন্যাসীদের আদলে পোষাক পরার অনুমতি গ্রহণ করেন। তাঁর এই আত্মনিবেদিত জীবনের আকাঙ্ক্ষায় ১২১০ সালে মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি স্থানীয় আগস্তিনিয়ান যাজক সম্প্রদায়ের মঠে যোগদান করেন।

---

১৩. Thomas F. Ward, Ibid., p. 12
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১৫. প্রাগুক্ত
১৬. প্রাগুক্ত
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১৮. Clementinus Deymann, Ibid., p. 22

লিসবনে আগস্তিনিয়ান সংঘের সাধু ভিনসেন্ট মঠে গিয়ে তাঁর মনে হল জীবনের লক্ষ্য যেন এবার পূরণের পথে। তিনি কিন্তু পরিবারের ইচ্ছাকে এক প্রকার অগ্রাহ্য করেই আগস্তিনের আশ্রমে প্রবেশ করেন। পরিবারে ধর্মীয় বাতাবরণ থাকলেও ফের্নান্দোর নিবেদিত জীবনে কারও সায় ছিল না। যাহোক, লিসবন মঠে প্রায় দশ বছর যাবত কঠোর তপস্যা ও অশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে বাইবেল, ঐশতত্ত্ব এবং খ্রিষ্টমণ্ডলীর আইন-কানুন অধ্যয়ন করেন। তাঁর জীবনীকার ক্লেমেন্তিনুস দ্যেমেন এই সম্বন্ধে বলেছেন, "He loved prayer, silence and meditation and with a zeal that was more than earthly; he delighted in the study of the Sacred Scriptures, and the writings of the Fathers and Doctors of the Church."[১৯]

ফের্নান্দো ছিলেন কঠোর অধ্যবসায়ী। ধর্মীয় জীবন যাপনের একাগ্রতায় লিসবন শহরে আগস্তিনিয়ান যাজকদের শ্বেতশুভ্র পোষাক পেয়ে তিনি বেশ আনন্দেই ছিলেন। সত্যিকথা বলতে কি– ব্রতীয় জীবনে থাকাকালীন সময়ে তিনি কোনোভাবেই সাংসারিক জীবনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। তিনি যখন বুঝতে পারতেন– কোন বিষয়গুলি তার যাজকীয় জীবনের জন্য ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। অতএব তিনি সেগুলো থেকে সব সময় দূরে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

তারপরও তাঁর শান্তির জীবনে ব্যাঘাত ঘটল। তাঁর পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, ভাইবোন এবং বন্ধুরা তাঁকে প্রায়ই বিরক্ত করত। ধর্মীয় জীবনের চৌহিদ্দি থেকে বেরিয়ে এসে পৃথিবীতে সুখের সংসার গড়ার বুদ্ধি দিত।[২০] তাঁর পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুরা যে এসে তাঁকে বিরক্ত করত এবং ধর্মীয় জীবন ছেড়ে সাংসারিক জীবন যাপনের কথা বলত– এই সাক্ষ্য আমরা আন্তোনিয়োর জীবনীকার ক্লেমেন্তিনুস দ্যেমের বর্ণনায়ও পাই।[২১] তার ফলে তাঁর ধ্যান-সাধনায় ও ভক্তি-প্রার্থনায় ব্যাঘাত ঘটত। তিনি নীরবে নির্বিঘ্নে মঠে সময় কাটাতে পারতেন না। তাই তিনি নিজেই তাঁর কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানালেন– যাতে তাঁকে দূরে অন্য কোনো আশ্রমে পাঠানো হয়। তাঁর সেই আবেদন গৃহীতও হয়। কিছুদিন পর তাঁকে কোয়েম্বারা শহরের সান্তা ক্রুজ আশ্রমে বদলি করা হয়। সেই নতুন মঠেও তিনি তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যে সবার মন আকর্ষণ করেন। ক্লেমেন্তিনুস দ্যেমান বলেছেন, "He was consequently transferred to the monastery of the Holy Cross near the city of Coimbra. Here he continued his religious and holy life, to the edification of all who had the happiness to come near him."[২২] ১২১৯ খ্রিষ্টাব্দে এখানেই তিনি যাজকপদে অভিষিক্ত হন এবং পুরোপুরি একজন 'অপর খ্রিষ্ট' হয়ে ওঠেন।

---

১৯. Ibid., p. 5
২০. Thomas F. Ward, Ibid., p. 16
২১. Clementinus Deymann, Ibid., p. 5
২২. Ibid

আগস্তিনিয়ান থেকে ফ্রান্সিসকান ধর্মসংঘে প্রবেশ

কোয়েম্বারা আশ্রমে যাবার পর আন্তোনিয়োকে অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব দেওয়া হল। মঠে কোনো মানুষ এলে তিনি তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতেন। লোকদের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করতেন। তিনি দেখতেন, প্রায়ই কর্কষ খয়েরি রঙের আলখাল্লা পরিহিত ফ্রান্সিসকান সংঘের সন্ন্যাসীরা আশ্রমে খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য নিতে আসত। ফের্নান্দো তাঁদের গ্রহণ করতেন এবং আতিথেয়তায় আনন্দ পেতেন। এই ভাবে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি ফ্রান্সিসকান সংঘের জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারেন। তাঁদের সহজ সরল জীবন যাপন ও কঠোর তপস্যা ফের্নান্দোকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। দ্যেমেনের কথায় আমরা জানতে পারি "Their modesty and humily pleased him very much, and he desired to join them."[২৩] তার পর থেকে ফের্নান্দো আরও গভীর অধ্যবসায় ও প্রার্থনা করতে লাগলেন। কঠোর আত্মত্যাগ ও সাধনার বলেই তিনি আগস্তিনিয়ান ধর্মসংঘ ত্যাগ করে সাধু ফ্রান্সিসের অনুসারী হবার জন্য অন্তরে ঈশ্বরের নির্দেশনা লাভ করেন।

সেই সময়ে আরেকটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটে। সেই বিষয়টি তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। একদিন তিনি জানতে পারেন নবপ্রতিষ্ঠিত ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসংঘের পাঁচজন সদস্য মরক্কো দেশে সারাসিনদের কাছে খ্রিষ্টবাণী প্রচার করতে গিয়ে শহিদ মৃত্যুবরণ করেন। ১২২০ সালের ১৬ই জানুয়ারিতে সংঘটিত এই ঘটনা তাঁর মনে স্থায়ীভাবে রেখাপাত করে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সেই সন্ন্যাসীদের চিনতেন। মরক্কো যাবার পথে ব্রাদার বার্নাড, ব্রাদার পিটার, ব্রাদার অটো, ব্রাদার একোরসিয়াস এবং ব্রাদার এডজুটাস– ফের্নান্দোর মঠে এসেছিলেন এবং কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। তিনিও সেখানে গিয়ে একইভাবে খ্রিষ্টের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার গভীর বাসনা পোষণ করতে লাগলেন। ফের্নান্দো খুব ভালভাবেই জানতেন যে, আগস্তিনিয়ান সংঘের যাজক হিসাবে তাঁর আকাঙ্ক্ষা সহজে পূর্ণ হতে পারে না। কেননা ভিন্ন ধর্মালম্বী মানুষের মধ্যে খ্রিষ্টবাণী প্রচারের কাজ সেই সময়ে আগস্তিনিয়ান ধর্মসংঘের কর্মকাণ্ডের আওতাভূক্ত ছিল না। অন্যদিকে এইকাজে ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাস-সংঘের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। ফের্নান্দো নিজের জীবনে ঈশ্বরের অভিপ্রায় সুনির্দিষ্টভাবে খুঁজে পাবার লক্ষে গভীর প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকার করতে লাগলেন। আন্তোনিয়োর জীবনীকার ক্লেমেন্তিনুস দ্যেমেন বলেছেন, "তিনি ফ্রান্সিসকান সংঘের সদস্যদের অনুসরণ করার একটি স্পষ্ট আহ্বান শুনতে পেলেন। বিশ্বাসের বরপুত্রদের মতোই যিশুখ্রিষ্টের প্রেমের জন্য শহীদ মৃত্যুবরণের পাত্র থেকে পান করার নিমন্ত্রণ পেলেন।"[২৪]

---

২৩. Ibid., p. 6
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

তাঁর সেই সময়ের অভিব্যক্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ব্রাদার রিংকু হিউবার্ট কস্তা সিএসসি লিখেছেন, “একজন ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসী হয়ে দূর-দূরান্তে গিয়ে, যেখানে যিশুর বাণী এখনও কেউ শোনেনি, তাদের মধ্যে সেই বাণী প্রচার করার মধ্য দিয়ে সাক্ষ্যমরের মৃত্যুবরণ করার মনোবাসনা তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। খ্রিষ্টবাণী প্রচারে ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসীদের বীরত্ব তাঁকে মনে প্রাণে একজন ফ্রান্সিসকান হতে উদ্বুদ্ধ করল।”[২৫] তবে সেই কাজ যে খুব সহজ ছিল, তা নয়। তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে তাঁকে অনেক অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করতে হয়েছে।

ইতিমধ্যেই পোপ ষষ্ঠ আদ্রিয়ান এক ঘোষণাপত্রে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কোনো সন্ন্যাসী যদি তাঁর ধর্মসংঘ ত্যাগ করতে চায় তবে শুধু কর্তৃপক্ষের অনুমতিই যথেষ্ট নয়; তাকে মঠের সমস্ত সন্ন্যাসী-সদস্যের সম্মতি নিতে হবে।[২৬] অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাইলেন। শুরুতেই তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হল। কেননা ফের্নান্দো দশ বছর আগস্তিনিয়ানদের সঙ্গে ছিলেন। সংঘের সবাই তাঁর আন্তরিকতা, ধার্মিকতা, পবিত্রতা ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসার ঐকান্তকতায় সশ্রদ্ধ ছিলেন। “তাঁর সংঘের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য থেকে শুরু করে পরিচালক-কর্তৃপক্ষ– সবার জন্যই তিনি ছিলেন এক অনুকরণীয় আদর্শ। তাই তাঁদের কেউই তাঁকে সংঘ থেকে হারাতে চাননি।”[২৭] কিন্তু তিনি দমে যাবার পাত্র নন। অবশেষে তাঁর একাগ্রতার কাছে কর্তৃপক্ষের যুক্তি হার মানল। এক মর্মস্পর্শী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ১২২১ খ্রিষ্টাব্দে আগস্তিনিয়ান সম্প্রদায়ের স্বেত-শুভ্র পোষাক অধ্যক্ষকে ফেরত দিয়ে তিনি ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাস-সংঘের কর্কশ খয়েরী রঙের পোষাক পরিধান করলেন। শুরু হল তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

ফ্রান্সিসকান সংঘে প্রবেশ করে ডন ফের্নান্দো দ্য বুইলিওনে নিজের নাম পরিবর্তন করার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নতুন ধর্মসংঘে নতুন নাম নিয়ে একেবারে নতুন ভাবে জীবন শুরু করার বাসনা পোষণ করলেন। তিনি প্রাচ্যদেশীয় মরুবাসী সাধুগুরু আন্তোনিয়োর নাম গ্রহণ করলেন। এখানে বলা দরকার যে, অলিভারে অবস্থিত ফ্রান্সিসকান মঠটি সেই সাধক আন্তোনিয়োর নামে উৎসর্গীকৃত ছিল। মরুবাসী এই সাধক কঠোর দরিদ্র জীবন যাপন ও কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য সুবিদিত। তিনি সামান্য লবণ দিয়ে সামান্য রুটি খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। নিজের হাতে ঝুড়ি বানিয়ে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।[২৮] তাই মরুভূমির এই কঠোর সাধক আন্তোনিয়োর আধ্যাত্মিক জীবনে আদর্শ হিসাবে পথ দেখিয়েছেন। সেইসঙ্গে ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাস-সংঘের কঠোর ও নিয়মানুবর্তী জীবনই তাঁকে নিঃস্বার্থভাবে আরও মানুষের কাছাকাছি যাবার জন্য নতুন করে প্রেরণা দিয়েছে।

---

২৫. হিউবার্ট কস্তা সিএসসি, ‘অলৌকিক কর্মসাধক সাধু আন্তনী’, আশীর্বাদ, সাধু আন্তনীর পার্বণ সংখ্যা, কমলাপুর যুবসমিতি, ২০১৫, পৃ. ৩৮
২৬. C. M. Antony, Ibid., p. 5
২৭. Mabel Farnum, Ibid., p. 49
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

জ্বর ও ঝড়ে জীবনের মোড় পরিবর্তন

সারাসিনদের কাছে গিয়ে খ্রিষ্টবাণী প্রচারের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু তাঁর অন্তর থেকে কোনো সময়েই নিভে যাননি। শেষে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মরক্কো যাবার অনুমতি পেয়ে তাঁর আর আনন্দের সীমা রইল না। তবে আন্তোনিয়োকে ঘিরে ঈশ্বরের হয়ত ভিন্ন পরিকল্পনা ছিল। তার ফলে মরক্কো যাবার পর পরই তিনি মারণ-জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষ তাঁকে পুনরায় পর্তুগালে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। দেশে ফেরার পথে তাঁদের জাহাজ ভূমধ্যসাগরে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ে । শেষে সেই জাহাজ এসে সিসিলি দ্বীপে ভিড়ে। জীবনীকারের ভাষায়– "Contrary winds, however, dashed his vessel on the shores of Sicily instead of Portugal. But in these winds was the direction of Providence."[২৯] সিসিলি দ্বীপে নামার পর আন্তোনিয়ো মেসিনা শহরে তাঁদের সংঘের একটা মঠে গেলেন। তখন মঠের গুরু বাইরে ছিলেন। কয়েকদিন পর আন্তোনিয়ো জানতে পারলেন যে, তাঁদের মঠে খাবারজলের প্রকট সমস্যা। সন্ন্যাসীরা দূর থেকে জল বয়ে এনে ব্যবহার করেন। আন্তোনিয়ো আশ্রমে একটা কুয়ো খুঁড়লেন। সবাই বলল যে, সেখানে পেয়জল পাওয়া যাবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেখানে সুপেয় জল পাওয়া গেল। তাতে সবাই খুব খুশি হলেন। তবে আশ্রমগুরু ফিরে এসে সেই কাহিনি শোনার পর খুশি না হয়ে বরং আন্তোনিয়োর উপর খুব রেগে গেলেন। তাঁর মতে, নিজেদের কুয়োর জল ব্যবহার করা সন্ন্যাসীদের জন্য কঠোর পরিশ্রমের যে বিধান রয়েছে তার পরিপন্থী। তাই তিনি আন্তোনিয়োকে শাস্তিস্বরূপ দুই মাস রান্না ঘরে কাজ করতে বললেন। আন্তোনিয়ো বাধ্য হয়ে তা-ই করলেন। তার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়ে গেল।[৩০]

মেসিনা শহরে থাকতেই তিনি জানতে পারলেন, শীঘ্রই আসিসি নগরে ফ্রান্সিসকান সংঘের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তিনি সেই সভায় অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে লাগলেন। তাঁর এই ইচ্ছার একমাত্র কারণ ছিল সংঘপ্রতিষ্ঠাতা সাধক ফ্রান্সিস আসিসিকে এক পলক দেখা। তাঁর একান্ত আগ্রহ দেখে ও সবিনয় অনুরোধ শুনে আশ্রমকর্তা তাঁকে সাধারণ-সভায় নিয়ে যাবার জন্য রাজি হলেন। সেটা ছিল আন্তোনিয়োর জীবনে যেন হাতে স্বর্গ পাওয়া।

ফ্রান্সিসকান সংঘের সাধারণ-সভায়

১২২১ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মে আসিসি নগরের পরতিউনকুলা নামক স্থানে ফ্রান্সিসকান সংঘের সাধারণ অধিবেশন শুরু হয়। আন্তোনিয়ো সময়মতো সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি তাঁর সংঘ-প্রতিষ্ঠাতা ফ্রান্সিসকে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলেন। সেই সাধারণ-সভায় কার্ডিনাল, বিশপসহ বিভিন্ন দেশ ও জায়গা থেকে প্রায় তিন হাজার সদস্যের সমন্বয়ে এই সভায় প্রতিষ্ঠাতা এবং সংঘপ্রধান ফ্রান্সিস আসিসি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে তাঁর স্বপ্ন সফল হল। আন্তোনিয়ো ফ্রান্সিসকে দেখে মনে খুবই

২৯. Clementinus Deymann, Ibid., p. 6
৩০. Mabel Farnum, Ibid., p. 6

শান্তি অনুভব করলেন। তিনি তাঁর মধ্যে ঐশরিক গুনাগুন উপলব্ধি করলেন। ফ্রান্সিসের সরলতা ও ঐশানুভূতি আন্তোনিয়োকে তাঁর নিজের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আরও সুনিশ্চিত করে তুলল। সাধারণ-সভার দিনগুলি তাঁর কাছে জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত এবং পরম দিন বলে মনে হতে লাগল। তিনি শুধু ফ্রান্সিসের দর্শন লাভের আশায় থাকতেন। সাত দিন পর সাধারণ অধিবেশন শেষ হল। আন্তোনিয়ো নতুন নতুন অনেক সংঘভ্রাতার সঙ্গে পরিচিত হলেন। তাঁরা সবাই ঈশ্বরের মহত্তর মাহিমা ও মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য যিশুর আদর্শে প্রতিষ্ঠাতা ফ্রান্সিস নির্দেশিত নিঃস্বতা, ব্রহ্মচর্য্য ও আনুগত্যের ব্রত পালন করেন।

অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আন্তোনিয়ো ব্যক্তিগতভাবে ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে পারলেন না। তখনও পর্যন্ত ফ্রান্সিস তাঁর সংঘের এই নতুন সদস্য আন্তোনিয়োকে চিনতেন না। তাই তাঁকে বাদ দিয়েই অন্যদের বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্মে নিয়োজিত করলেন। এই প্রসঙ্গে টমাস ওয়ার্ড বলেছেন, “সাধারণ অধিবেশন শেষ হলে সবাই যাঁর যাঁর মতো নিজেদের মঠে ফিরে গেলেন। একজন শিক্ষানবীশ মনে করে কোনো প্রভিন্সিয়ালও আন্তোনিয়োকে কাজের জন্য সঙ্গে নিতে চাননি। এ ছাড়া তাঁকে দেখে সুস্থ এবং শারীরিক ভাবে কর্মক্ষমও মনে হয়নি।”[৩১] তাঁর এই মন্তব্যের সত্যতা পাই আরও একজন জীবনীকারের তথ্যে। দ্যেমেনও একইভাবে বলেছেন, “সত্যিকথা বলতে কি, ফ্রান্সিসকান সংঘের কোনো সদস্যই এই দুর্বল অসুস্থ এবং অপরিচিত বিদেশি সংঘভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কোনোরকম আগ্রহ পোষণ করেননি।[৩২] শেষে ব্রাদার গ্রাসিয়ানো তাঁকে বলোন শহরের আশ্রমে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলেন। তিনি তাতে রাজি হলেন এবং তাঁর সঙ্গে সেখানে গেলেন। ক্লেমেন্তিনুস দ্যেমেন বলেছেন, “Here he occupied his time principally in prayer, meditation and humble work until it pleased Divine Providence to elevate him to a place among the most ullustrious men.”[৩৩] তখনও তিনি জানতেন না যে তাঁর জীবনে অনেক বড় কিছু অপেক্ষা করছে; তাঁকে নিয়ে ঈশ্বরের এক মহান পরিকল্পনা রয়েছে। এ যেন বাইবেলের সেই বাণী সত্যতা লাভ করেছে– “তিনি তো সেই প্রস্তর যা গৃহনির্মাতারা তুচ্ছ করেছেন, অথচ যা হয়ে উঠেছে সংযোগ-প্রস্তর।”[৩৪]

উত্তম উপদেশদাতা আন্তোনিয়ো

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে আন্তেনিয়ো মন্তে পাওলো আশ্রমে বদলি হন। সেখান থেকে একদিন তিনি ফরলি নামক জায়গার এক মঠে তাঁরই কয়েকজন ফ্রান্সিসকান সংঘভ্রাতা এবং কয়েকজন ডমিনিকান ব্রাদারের যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান। অনুষ্ঠানের পরে সেই মঠের অধ্যক্ষ সচরাচর তুখোড় প্রচারক হিসাবে পরিচিত ডমিনিকান সংঘের সদস্যদের উপদেশ দেবার

৩১. Thomas F. Ward, Ibid., p. 21
৩২. Clementinus Deymann, Ibid., p. 7
৩৩. Ibid.
৩৪. সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও খ্রীষ্টিয়াঁ মিংগো এস. জে. (অনু.), *মঙ্গলবার্তা বাইবেল*, ঢাকা: প্রতিবেশী প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ৩১৭

অনুরোধ জানালেন। কিন্তু কেউ-ই তাঁর সেই অনুরোধ রাখতে চাইলেন না। শেষে আশ্রমগুরু আন্তোনিয়োকে ধর্মভাষণ দেবার নির্দেশ দিলেন। জীবনে প্রথমবার বহু সংখক মানুষের সামনে কথা বলতে শুরুতে তিনি একটু সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। তাই তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে অনুনয় বিনয়ের সুরে তাঁর অপারগতা প্রকাশ করেন। তাঁর মনে হয়েছে যে, ধর্মভাষণ দেবার চেয়ে তিনি থালা-বাসন ধোয়ার কাজটিই ভালভাবে করতে জানেন। কিন্তু তিনি বাধ্যতার ব্রত গ্রহণ করেছেন বলে শেষে তাঁর অভিভাবকের কথামতো প্রচার করলেন। তাঁর উপদেশ শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। বাইবেলে বাণীর এমন সুন্দর ও যথার্থ ব্যাখ্যা তাঁরা যেন আগে কখনও শোনেননি। এই প্রসঙ্গে ব্রাদার রিংকু হিউবার্ট কস্তা সিএসসি লিখেছেন, “তিনি পবিত্র আত্মায় আলোকিত হয়ে এমন এক প্রবক্তিক উপদেশবাণী সবার সামনে রাখলেন, যা শুনে সকলে বিঃস্মিত হয়ে পড়লেন।[৩৫]

এই উপদেশ দেবার পরই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মর্মস্পর্শী ধর্মভাষণের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সেই সংবাদ একদিন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধক ফ্রান্সিসের কানেও গেল। তিনি আন্তোনিয়োকে আরও একাগ্রতার সঙ্গে ঐশতত্ত্ব পড়ার নির্দেশ দেন। অনুগত শিষ্যের মতোই আন্তোনিয়ো সংঘপিতার সেই সুমন্ত্রণা গ্রহণ করেন। শুধু ধর্মীয় দায়িত্বই নয়, ১২২৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইতালির রোমানা প্রদেশের শাসকের উপদেশদাতা নিযুক্ত হন। একইসঙ্গে তিনি অন্য মানুষের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা হিসাবেও বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পালন করেন। তার পরের বছর তাঁর সংঘপিতা স্বয়ং ফ্রান্সিস তাঁকে ধর্মসংঘের ঐশতাত্ত্বিক পরামর্শদাতা মনোনীত করেন। এই কথা স্মর্তব্য: “আন্তোনিয়ো জীবনৎকালে তাঁর ধর্মসংঘের সবচেয়ে বিদগ্ধ ঐশতাত্ত্বিক হিসাবে পরিগণিত ও গৃহীত হয়েছিলেন।”[৩৬] ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ফ্রান্সিসকান সংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদান করেন। সেই বছরই তাঁকে রোমানা প্রদেশের প্রধান প্রচারকপদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পালনও করেন। তিনি জানতেন, তাঁর মুখ দিয়ে স্বয়ং ঈশ্বরই প্রচার করেন। তিনি নিজে একজন উপলক্ষ মাত্র। অতএব তাঁর এই দায়িত্ব মানবিক নয়, ঐশরিক।

ইতিমধ্যেই ইতালির সর্বত্র বাণী-প্রচারক হিসাবে আন্তোনিয়োর সুনাম বাড়তে লাগল। ইতালির আসিসি, ফ্লোরেন্স, মিলানো, ক্রেমোনা, ব্রেসা, ত্রেন্তো, ভেরোনা, মান্তুয়া– প্রভৃতি শহর ঘুরে শেষে ভেনিসের মধ্য দিয়ে ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পাদুয়া শহরে পদার্পণ করেন। পাদুয়াকেই তিনি পৃথিবীতে তাঁর শেষ আবাসস্থল রূপে বেছে নেন। এভাবেই তাঁর নতুন কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠল মূলত ইতালি। জীবনীকার লিখেছেন, “সাধু ফ্রান্সিস ও তাঁর শিষ্যদের মতোই তিনি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যেতেন এবং মঠে-গির্জায়, হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে– যেখানেই সুযোগ পেতেন, সেখানেই প্রভুর বাণী প্রচার করতেন। মানুষের আত্মিক মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি সর্বদাই অদম্য উৎসাহী ছিলেন।”[৩৭] তবে পাদুয়া নগরে তাঁর অবস্থান ও প্রচার-ই তাঁকে অমরত্ব এনে

৩৫. রিংকু হিউবার্ট কস্তা সিএসসি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৩৬. C. M. Antony, Ibid., p. 67
৩৭. পাস্কাল ফার্নান্দো, ও.এফ.এম., অনুবাদ, তিমির সিংহ, এস. জে. ও জন এঙ্গেলবার্ট, এস. জে., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

দিয়েছে। সেখানকার আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই তাঁকে 'সাধু', অর্থাৎ 'একমাত্র সাধু' বলে জানত এবং মানত। অবশ্য জীবনের এক পর্যায়ে তিনি ফ্রান্সে খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধমতবাদী মধ্যে প্রচার কাজ করে বহু অবিশ্বাসীর মন পরিবর্তন করে কাথলিক ধর্মমতে ফিরিয়ে আনেন। খ্রিষ্টমণ্ডলীর হারানো মেষগুলি ঈশ্বরের একনিষ্ঠ ভক্তপালের মধ্যে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন অদম্য এক বাণী-প্রচারক। তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হবার পথে আর কোনো বাধা রইল না।

পাদুয়া নগরের সাধু আন্তোনিয়ো

ত্রয়োদশ শতকে ইতালির প্রধান শহরগুলোর মধ্যে পাদুয়া ছিল অন্যতম। সেই প্রাচীনকাল থেকেই শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থভূমি হিসাবে পাদুয়া শহর সুপরিচিত। মাইকেল এঞ্জেলো ও জত্তো দি বন্দনের চিত্রকলাসমৃদ্ধ নগরী পাদুয়া যুগ যুগ ধরে দেশ-বিদেশের শিল্পপ্রেমী মানুষকে আকর্ষণ করেছে। সেই শহরেই আন্তোনিয়োকে পাঠানোর মনস্থির করলেন ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের কর্ণধার। আন্তোনিয়ো খুব ভালভাবেই জানতেন যে, নানা ঐহিত্য ও চাকচিক্য থাকা সত্ত্বেও পাদুয়া ছিল দুর্বৃত্তদের শহর। সেখানে মানুষের নানা অরাজকতা ও অসদাচারণ ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনি এ-ও জানতেন যে, তাঁর পক্ষে সেখানে কাজ করা সহজসাধ্য হবে না। তবুও তিনি সেখানে যাবার ব্যাপারে আগ্রহী ও আন্তরিক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সেখানে সাধু ফ্রান্সিসের যে আদর্শ তিনি প্রচার করবেন বলে স্থির করেছেন, সেটা সফলকাম হবেই। তাঁর সেই লক্ষ্য থেকে তিনি এক পা-ও সরবেন না বলে তিনি মনে গভীর সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন।[৩৮] ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে পাদুয়ার লোকেরা যখন শুনল যে, বিখ্যাত প্রচারক আন্তোনিয়ো তাঁদের নগরে আসবেন, তখন অনেক মানুষ তাঁর কাছে যাবার জন্য মনস্থির করল। কিন্তু তিনি যখন এলেন, তখন ধারণার চেয়েও অনেক বেশি মানুষ তাঁর কথা শুনতে এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করতে গেল। মেবেল ফারনুম লিখেছেন, "পাদুয়া নগরে তাঁর আগমনকে এত গুরুত্ব দেওয়া হল যে, সেখানকার ব্যবসাকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, কল-কারখানা– সমস্ত বন্ধ রাখা হল যাতে সবাই তাঁর উপদেশ শুনতে পারে।"[৩৯]

ততদিনে সবাই জেনে গেছে যে, ধর্মপ্রাণ সাধক আন্তোনিয়ো খুব সুন্দর উপদেশ দিতে পারেন। অত্যন্ত দক্ষ ধর্মোপদেষ্টা হিসাবে অচিরেই তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ধর্মভাষণ দেবার আয়োজনে পাদুয়া নগরীর প্রধান গির্জায় মানুষের জায়গা সঙ্কুলান হত না। তাই শীঘ্রই আন্তোনিয়ো বিশাল ফাঁকা মাঠে প্রচার করতে লাগলেন। সেখানেও প্রচুর ভিড় হত। মাঝে মাঝে এক-একটি ধর্মসভায় ত্রিশ হাজার পর্যন্ত মানুষ জড় হত।[৪০] লোকেরা নীরব, শান্ত ও ধ্যানমগ্ন হয়ে তাঁর কথা শুনত। তিনি কথা বলার সময় মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত কোনো যেত। পাদুয়া নগরেই সাধক আন্তোনিয়ো তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন। সেখানে তাঁর অবস্থান, প্রচার ও আশ্চর্য কাজ সারা পৃথিবীতে সুবিদিত। তাই তাঁকে 'পাদুয়ার সাধু

৩৮. Mabel Farnum, Ibid., p. 141
৩৯. Ibid.
৪০. Ibid., p. 142

আন্তোনিয়ো' বলে অভিহিত করা হয়। পাদুয়া আসার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই পীড়িত অবস্থায়ই তিনি প্রতিদিন তাঁর প্রচারকাজ চালিয়ে যেতেন। সেই প্রচেষ্টায় বিশ্বাস ও ভালবাসার গুণে তাঁর বাণী ঘোষণা যেন মানুষের অন্তরে অলৌকিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে লাগল।[৪১]

সমাজ সংস্কারক আন্তোনিয়ো

আন্তোনিয়োর সময়ে পাদুয়া ধন-সম্পদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই সেখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত (১২২২) হয়ে গেছে। সেখানে অবশ্য কাথারিস্ত ভ্রান্তমতাবলম্বীদের উপস্থিতি তখনও টের পাওয়া যায়নি। তবে অন্যান্য অনাচারে পাদুয়া পরিপূর্ণ ছিল। মানুষ মানুষকে মর্যাদা দিত না। ধনীরা গরিবদের পণ্য বলে মনে করত। টাকা-পয়সার জন্য মানুষ সবই করতে পারত। তিনি যখন প্রচার শুরু করলেন, তখন সমস্ত প্রত্যাশার চেয়ে অতিরিক্ত শুভ ফলাফল ঘটতে লাগল। পাপপ্রবণ মানুষ তাঁর ধর্মভাষণ শুনে চোখের জল ফেলত। ঘোর অপরাধীরাও তাঁর কাছে এসে নতুন পথের সন্ধান পেতে লাগল। তাঁর কথাগুলো যেন তীক্ষ্ণধার তরবারির মতো মানুষের অন্তরাত্মা বিদীর্ণ করত।[৪২]

১. সমাজের কুপ্রথা ও খারাপ প্রভাব দূরীকরণ

আন্তোনিয়োর এই গুণের পরিচয় পেয়ে খ্রিষ্টমণ্ডলীর নেতৃবর্গ তাঁকে সমাজ ও মণ্ডলীর অন্যায় ও অন্যায্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জোরালোভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। সমাজে ভোগবিলাসিতা, জমিদার মহাজনদের শোষণ, খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রতিনিধিদের বিষয়লোলুপতা ও আরামপ্রিয়তা– এমনই নানা নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের সমালোচনায় আন্তোনিয়ো ছিলেন এক সাহসী কণ্ঠস্বর। ধর্মভাষণ দেবার সময় আন্তোনিয়ো প্রথমে সমাজের মন্দদিকগুলির কারণ অনুধাবনের চেষ্টা করতেন। তার পরে সেগুলো প্রতিকারের উপায় খুঁজে বের করতেন। তবে তিনি যে শুধু মানুষের দোষ ধরার জন্যই সেসব করতেন, তা নয়। তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে মানুষের আচরণের নেতিবাচক দিকসমূহ উল্লেখ করতেন। সবাইকে সন্তানতুল্য বলে মনে করতেন। তাই জীবনীকারের ভাষ্যমতে, "তাঁর দেওয়া উপদেশ সর্বত্র ফলপ্রসু হত।"[৪৩]

সমাজে যাঁরা প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন তাঁদের পোষাক-আশাক ও খাদ্য-পানীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপচয় হত। তিনি সেসব মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে তাঁদের এই উদাসীনতা সম্বন্ধে সচেতন করে দিতেন। সমাজে চোর-ডাকাত এবং দেহপোজীবিনীদের দৌরাত্ম্যে শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। আন্তোনিয়ো তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনেন।

---

৪১. Thomas F. Ward, Ibid., p. 68
৪২. Thomas F. Ward, Ibid., p. 26
৪৩. মনোজ বিশ্বাস, *পাদুয়ার সাধু আন্তোনিয়ো*, পৃ. ২২-২৩

২. দেউলিয়া আইন রদকরণ

আন্তোনিয়ো তাঁর বাণী প্রচারের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক– এই দুই দিকেই খেয়াল রাখতেন। সেই সময়ে ইতালিতে কিছু সামাজিক সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। দরিদ্র কৃষক এবং প্রজাদের উপর সামন্ত প্রভুদের শোষণ ও অত্যাচার ছিল শোচনীয়। এছাড়াও সুদখোরদের অত্যাচারে সাধারণ ও গরীব মানুষ ছিল জর্জরিত। কেউ টাকা ধার নিলে তাঁকে ২৮% সুদ গুনতে হত। তার ফলে গরিব মানুষ দিনে দিনে আরও গরিব হতে লাগল। এমনকি কেউ কেউ ৬০% সুদ নিত বলেও আন্তোনিয়োর কাছে খবর এসেছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল– সরকারের পক্ষ থেকে দেনাদারদের কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করা হত না। প্রচলিত 'দেউলিয়া আইন'-এর জোরে তাদের নিয়ে পাওনাদারেরা যা খুশি তা-ই করতে পারত। এমন কি, ধার করা টাকা ফেরত না দিতে পারলে তারা ঋণ-গ্রহীতার স্থাবর-অস্থাবর ধন-সম্পদ দখল করে নিতে পারত। সেসব সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে পারত। শেষে ঋণী মানুষকে কারাগারেও নিক্ষেপ করতে পারত। তাতে করে গরিব মানুষের অবস্থা দিন দিন শুধু খারাপই হত। দেশের আইন বা সরকারও তাদের পক্ষে ছিল না। আন্তোনিয়োর বিবেক সবসময় তাদের জন্য কল্যাণকর কিছু করার লক্ষে তাড়িত হত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আইন-প্রণেতাদের মন পরিবর্তনের জন্য শুধু প্রার্থনা করে, তাঁদের বিনীতভাবে ঈশ্বরের বাণী শুনিয়ে এবং সুন্দর কথায় মঙ্গলবাণীর মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা দিয়ে– সেই শয়তানিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাঁকে আরও বাস্তবতার কাছাকাছি যেতে হবে।

তাই সত্যিকারের প্রবক্তা ও সমাজ-সংস্কারকের মতো আন্তোনিয়ো পাদুয়াবাসীকে এই অতিরিক্ত সুদ-গ্রহণের ব্যাপারে সাবধান করতে লাগলেন। সুদখোর মানুষকে 'শহরের সবচেয়ে বড় শত্রু' বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর যেহেতু সব ধরনের মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল, সেহেতু রাষ্ট্রীয় নেতাদের কাছে তিনি ছিলেন এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাই তিনি কর্তৃপক্ষের প্রতি চাপ সৃষ্টি করে ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ মার্চ এই 'দেউলিয়া আইন' রদ করতে সমর্থ হন। এই আইনে দেনাদারদের অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি আন্তোনিয়োর অনুরাগ এবং তাদের স্থায়ী সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়ে সাধুর জীবনীকার মেবেল ফারনুম বেশ জোর দিয়েই বলেছেন–

> One of Anthony's principal preoccupations concerned the loan sharks of Padua, who had made it a long practice to fleece the poor out of their last coins, even confiscating their homes, their clothing and having them throwon into jail, where they languished without hope of release. The unjust rate of interest exacted by these rapacious men sometime scaled as high as sisty per cent. No pleasing could soften the userers' hearts. That is until Anthony came on the scene. Anthony began to fight as soon as he became aware of the evil. Little by little, he succeded in bringing about a better order of things. Later as a result of his fearless crusade Padua passed a law in favour of poor debtors, forbidding their creditors to imprison them if they had given over all their property in part payement of their debt.[৪৪]

---

৪৪. Mabel Farnum, Ibid., pp. 142-143

৩. ভ্রান্তমতবাদীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার

আন্তোনিয়োর সময়ে ইতালিতে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী কতিপয় মানুষের মধ্যে কিছু ভ্রান্তমতবাদ প্রচলিত ছিল। তাদের মধ্যে আলবিজেনসীয় ও ওয়ালডেনসীয় প্রধান। আলবিজেনসীয় মতবাদীরা খ্রিষ্টধর্মের কিছু মৌলিক বিশ্বাস অস্বীকার করত। তারা উপাসনা, সরকারি কর্তৃত্ব, মালিকানাস্বত্ব, বিবাহ ব্যবস্থা স্বীকার করতে চাইত না। তাদের নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা মাঝে মাঝেই হিংস্র হয়ে উঠত। হিংস্রতার আশ্রয় নিয়ে তারা দেশ ও মণ্ডলীর শাসনকেও ধ্বংস করতে চাইত। অন্যদিকে ওয়ালডেনসীয় মতবাদীরা নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো মণ্ডলীর বাইরে গিয়ে খ্রিষ্টীয় কাজকর্মের অধিকার আদায় করতে তোড়জোর শুরু করে। নিজেদের যিশুর প্রকৃত শিষ্য বলে দাবিও করে তারা। এই পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে আন্তোনিয়ো তাদের মোকাবেলায় সচেষ্ট হন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ বাগ্মী। জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ কথার মাধ্যমে সেইসময়ে প্রচলিত এসব ভ্রান্তমতাবলম্বীদের তিনি পরাস্ত করছেন এবং তাদের কাথলিক ধর্মমতে ফিরিয়ে এনেছেন। তার ফলে আন্তোনিয়োর বিরুদ্ধে তাদের পক্ষের অনেক মানুষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি তাঁকে হত্যা করবার জন্যও অনেকে সুযোগ খুঁজতে থাকে।

ধর্মভাষণে জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনার জন্য তাঁর কাছে ইউরোপের বড় বড় শহরের কাথলিক কার্ডিনাল, বিশপ ও যাজকদের কাছে থেকে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি যাতে তাঁর শাণিত ভাষায় কাথলিক বিশ্বাসের পরিপন্থী মান-মানসিকতাকে পর্যুদস্ত করেন। তাই আন্তোনিয়ো পর্যায়ক্রমে ফ্রান্সের মঁপেলিয়ে, তুলুজ এবং ইতালির বলোন, পাদুয়া– প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন। ফ্রান্সে থাকার সময় তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ভুলে ভ্রান্তমতাবলম্বীদের নির্মূল করেছেন। তাঁর যুক্তির সামনে বিরুদ্ধমতবাদীরা কোনোভাবে দাঁড়াতেই পারত না। লোকেরা তাঁকে 'বিভ্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে শক্ত হাতুড়ি' বলে অভিহিত করত।[৪৫] অনেক মানুষ তাদের নিজেদের ভ্রান্ত ও মনগড়া অবস্থান বদল করে খ্রিষ্টবিশ্বাসে ফিরে আসতে লাগল। প্রতিটি প্রচারের পরই তাঁর ভাষণ শোনার জন্য ভক্তের সংখ্যা বাড়তে লাগল। প্রচার শেষ করার পর বহু নারী-পুরুষ কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে এসে ক্ষমা চাইত।[৪৬] পরবর্তীতে নতুন জীবনের আলোকরেখা ধরে পথ চলতে পারত।

আন্তোনিয়ো তাঁর প্রচার জীবনের অনেক সময় ফরাসি দেশে ব্যয় করেছেন। তাঁর আশ্চর্য কাজের মধ্যে অনেকগুলি ফ্রান্সে সম্পন্ন করেছেন। তিনি খুব সুন্দর ভাষণ দিতে পারতেন। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল নতুন ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর তুলনা পাওয়া ভার। তিনি ছয়টি ভাষায় অনায়াসে মনের ভাব আদান-প্রদান করতে পারতেন। তবে পর্তুগিজ, ইতালীয়, লাতিন,

৪৫. Thomas F. Ward, Ibid., p. 30
৪৬. Ibid.

স্পেনীয় ও ফরাসি– ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল ঈর্ষণীয়। আন্তোনিয়ো যে ভাষায়ই ধর্মভাষণ দিতেন না কেন, সেগুলো তিনি লিখে নিতেন লাতিন ভাষায়।[৪৭] লাতিন ছিল সেই সময়ের ইউরোপে একমাত্র গৃহীত ভাষা।

দীর্ঘ সময় ধরে প্রচার করার ফলে মাঝে মাঝে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু ভক্তেরা সেই অবস্থা উপেক্ষা করে তাঁর কাছে ভিড় জমাত। তাঁকে এক নজর দেখার জন্য, তাঁর পোষাক একটু ছোঁয়ার জন্য মানুষ উৎসুক হয়ে থাকত। তার একটু স্পর্শ পেলেই যেন মানুষ স্বর্গীয় শান্তি অনুভব করত। এমনকি কয়েকজন অগোচরে তাঁর পোষাকের প্রান্তদেশ থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে পবিত্র স্মারক হিসাবে কাছে রেখে দিত।[৪৮]

সাধক আন্তোনিয়োর জীবন ও কর্ম নিয়ে যিনি সবচেয়ে তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন সেই সি. এম. এন্টনী তাঁর আলোচনায় বলেছেন, "গৃহযুদ্ধ ও ভ্রান্তমতবাদীদের অত্যাচারে পীড়িত ইতালিতে ঈশ্বর সাধু আন্তোনিয়োকে নিরাময় সাধনের জন্যই পাঠিয়েছিলেন।"[৪৯] বর্তমান যুগের এক এবং অখণ্ড ইতালির সঙ্গে মধ্যযুগীয় খণ্ডিত ইতালির কোনো তুলনা চলে না। সেই সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সাধক আন্তোনিয়োর প্রচার ও সংস্কার কাজের সমস্যা ও ঝুঁকির বিষয়টি অস্বীকার করার উপায় নেই। একই ভূখণ্ডের ছোট ছোট রাজ্য ও বড় বড় শহরগুলোর মধ্যে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। তাদের পারস্পরিক অশান্ত ও অহঙ্কারী মনোভাব, দীর্ঘমেয়াদী শত্রুতা; এক শহরের বিরুদ্ধে আরেক শহরের অভিযোগ ও প্রতিবাদ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পুরো দেশটাই ছিল সংঘাতে পরিপূর্ণ। কুচক্রান্ত করে পরস্পরকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টাই ছিল রাজ্যগুলোর লক্ষ্য। গোটা দেশটকে রাজনৈতিকভাবে একত্রীকরণের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। অদূরদর্শিতা যেন সেই সময়ের ইতালির মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রতিটি শহর নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টায় ছিল সুযোগ সন্ধানী। উপরন্তু কোনো শহরে যদি দুই-তিনটা দল থাকত, সেগুলো নিজেদের সিদ্ধান্ত ও অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ করার ব্যাপারে ছিল একগুঁয়ে। দিগন্তরেখার বাইরে তাকিয়ে অন্যের মধ্যে ভাল ও মহত্তর কিছু দেখার দৃষ্টি তাদের ছিল না। তাই বলা যায়– দ্বাদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত ইতালির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল সঙ্কট ও সংঘাতে পরিপূর্ণ। তবে পরবর্তীকালে সেই সমসা থেকে মানুষ অনেকটাই বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। যাহোক, এয়োদশ শতকের ইতালি কাব্য-কবিতা, শিল্প-চিত্রকলা ও ধর্মীয় সংস্কারক-সাধকের এক অভূতপূর্ব বিকাশের যুগ বলে বিবেচিত। আন্তোনিয়ো সেই আলোকোজ্জ্বল যুগেরই সূর্য-সন্তান। তাঁর সম্বন্ধে মেবেল ফারনুম যা বলেছেন, এখানে তা প্রণিধানযোগ্য–

> আন্তেনিয়ো এমন বাণী-প্রচারক ছিলেন যে, তিনি তাঁর সম্পূর্ণ অস্তিত্ব দিয়ে ঈশ্বরের বাণী ও আদর্শ প্রচার করতেন। তাঁর উপস্থিতি ভক্তদের কাছে যেন খ্রিষ্টেরই উপস্থিতি বলে পরিগণিত হত। এই কারণেই সারা দুনিয়ায় তাঁর এত অনুরাগী ভক্ত রয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে সন্ন্যাসী, আবার অন্যদিকে খ্রিষ্টের বাণী-প্রচারক। বাণী প্রচারের সঙ্গে তিনি কঠোর তপস্যায় ব্রতী হতেন। উপবাস, আত্মসংযম ও প্রার্থনায় তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। কোনো কিছুর বিনিময়ে তিনি সেগুলো ছাড়তে পারেননি। তাঁর জীবনে এই সাধনা আদর্শ দেখেই অগণিত মানুষ

৪৭. C. M. Antony, Ibid., p. 41
৪৮. Mabel Farnum, Ibid., p. 142
৪৯. C. M. Antony, Ibid., p. 24

শক্তি পেতেন। আন্তোনিয়োর কথা শুনে উদ্দেশ্যহীন মানুষ নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেতেন। তাঁর দৃঢ় মনোবলের কাছে অসৎ মানুষ সততার শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তাঁর বিশ্বাসের গভীরতায় ও যুক্তির সত্যতায় ভ্রান্তমতাবলম্বী মানুষ সত্যের সন্ধান পেতেন।[৫০]

আশ্চর্য কর্মসাধক সাধু আন্তোনিয়ো

ফ্রান্সিসকান সংঘের বিখ্যাত আলোচক এম. লিয়োঁ দে কেরভালের কথার সুত্র ধরে সি. এম. এন্টনি বলেছেন– "সাধক আন্তোনিয়োর জীবনের অনেক কিংবদন্তি কাহিনিই শুধু প্রমাণ সাপেক্ষ নয়: এমনকি ঐতিহাসিক ভাবেও অসম্ভব।"[৫১] সমালোচকের এই অভিমত আমরাও গ্রহণ করতে পারি। সাধক আন্তোনিয়োর প্রতি ভক্তি-ভালবাসা থেকে ভাবাবেগের ফলে তাঁর জীবন ঘিরে বিভিন্ন কল্প-কাহিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করাটা আধুনিক যুগের মানুষের পরিচায়ক নয়। সাধু আন্তোনিয়োর জীবনের সঙ্গে অনেক আশ্চর্য ঘটনাবলী জড়িত আছে। তিনি জীবিতকালে বেশকিছু অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করেছেন। আবার তাঁর মৃত্যুর পরও অনেক আশ্চর্যকর্ম সংঘটিত হয়েছে। *The Miracles of Saint Anthony of Padua* গ্রন্থের লেখক জোসেফ এ. কেলার আন্তোনিয়োর জীবনসম্পৃক্ত অলৌকিক কাজসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত– আন্তোনিয়ো জীবিত থাকাকালীন তিনি নিজে চব্বিশটি আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করেছেন। দ্বিতীয়ত– তাঁর মৃত্যুর পর সংঘটিত অলৌকিক কাজের সংখ্যা তেতাল্লিশটি। তৃতীয়ত– আধুনিককালে তাঁর নামে কোনো প্রার্থনা করার ফলে সেই প্রার্থনা সিদ্ধ হয়েছে এমন আশ্চর্য কাজ একচল্লিশটি।[৫২]

আন্তোনিয়োর জীবৎকালে সংঘটিত অনেক আশ্চর্য কাজের কথা বিশ্বাসীভক্তের মধ্যে প্রচলিত আছে। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা যাক। আন্তোনিয়ো যখন ছোট ছিলেন তখন প্রার্থনার সময় শয়তান ভয়ঙ্কর রূপ ধরে তাঁর কাছে এলে তিনি মার্বেল পাথরের ধারের উপর ক্রুশের চিহ্ন এঁকে দিলে পর শয়তান ভীষণ শব্দ করে ভয়ে পালিয়ে যায়।[৫৩] শৈশবে একদিন তাঁর বাবা তাঁকে জমিতে শস্য নষ্টকারী পাখি তাড়াতে পাঠান। তিনি এক পর্যায়ে যেসব পাখি শস্য খেতে আসে সেগুলোকে ডেকে এনে একটি ঘরে আটকে রেখে গির্জায় প্রার্থনা করতে যান। একবার তাঁর বিরোধীদের বিষ মেশানো খাবার খেয়েও তাঁর কোনো ক্ষতি হয়নি। একবার রিমিনি নামক জায়গায় প্রচারের সময় তাঁর বিরুদ্ধবাদী লোকেরা সেখান থেকে চলে গেলে তিনি সমুদ্রের মাছদের আহ্বান করেন তাতে মাছেরা জল থেকে মাথা তুলে ভাসতে থাকে এবং তিনি তাদের কাছে প্রচার করেন।[৫৪] কথিত আছে যে একবার খোলা মাঠের উপদেশ দেবার সময় হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত হলে তিনি প্রার্থনার শক্তিতে তা বন্ধ করে দেন।

৫০. Thomas F. Ward, Ibid., p. 6
৫১. C. M. Antony, Ibid., p. xi
৫২. Joseph A. Keller, *Miracles of Saint Anthony of Padua*, London: Aterna Press, 1899, pp. 1-3
৫৩. C. M. Antony, Ibid., p. 4
৫৪. Joseph A. Keller, Ibid., pp. 1-3

অন্য এক সময় ন্যায়বিচার সম্পাদনের জন্য তিনি মৃত ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করে তাকে জীবিত করার পরে সেই ব্যক্তি অভিযুক্তকে নির্দোষ বলে রায় দেন।[৫৫]

দয়ার অবতার সাধু আন্তোনিয়ো একদিন রাস্তায় এক পিতার কোলে তার পঙ্গু মেয়েকে দেখতে পান। তাতে তাঁর খুব দয়া হয়। তিনি মেয়েটিকে আর্শীবাদ করতেই মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে হেঁটে বেড়াতে শুরু করে।[৫৬] আরেকবার শোকার্তের আশ্রয় আন্তোনিয়ো এক মৃতশিশুকে জীবন দান করে তার মায়ের কষ্ট লাঘব করেন।[৫৭] আরাধ্য সংস্কারের প্রতি আন্তোনিয়োর ভক্তি ছিল অপরিসীম। একবার প্রার্থনার সময় তাঁর সামনে থেকে ঘরের দেওয়াল সরে যায় এবং তিনি আরাধ্য সংস্কারে উপস্থিত যিশুকে দেখতে পান। আরাধ্য সংস্কারে যিশুর উপস্থিতিকে বিরোধীদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য তিনি একদিন আদেশ করলে একটি গাধা ঘাস খাওয়া বাদ দিয়ে আরাধ্য সংস্কারের সামনে জানুপাত করে। একবার একজন গাড়িচালক তার গাড়িতে করে ঘুমন্ত একটি ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিল। আন্তোনিয়ো তাকে কিছু পাথর বয়ে দেবার অনুরোধ করলে সে উত্তর দেয় যে, গাড়িতে মৃতদেহ আছে; অতএব সে কাঠ নিতে পারবে না। আন্তোনিয়োর সঙ্গে ছল-চাতুরী করার ফলে গাড়ির ছেলেটি সত্যি সত্যিই মারা যায়। শেষে চালকের অনুতাপে আন্তোনিয়ো ছেলের প্রাণ ফিরিয়ে দেন। আন্তোনিয়ো একই সময়ে দুই জায়গায় উপস্থিত থাকতে পারতেন। একই সময়ে দুই জায়গায় অবস্থান করাকে বলা হয় দ্বৈত উপস্থিতি বা 'বাইলোকেশন'। আন্তোনিয়োর জীবনে এই দ্বৈত উপস্থিতির ঘটনা নাকি অনেকবারই ঘটেছে।[৫৮]

আন্তোনিয়োর মৃত্যুর পরও বেশকিছু অলৌকিক কর্ম সংগঠিত হয়েছে। একজন পঙ্গু মহিলা আন্তোনিয়োর সমাধিতে গিয়ে প্রার্থনা করার পর তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। আবার এক যুবক মাটির গর্তে চাপা পড়ে। অনেকক্ষণ পর তাকে তোলা হলেও সে মারা যায়নি। ছেলেটি স্বীকার করে যে, সাধু আন্তোনিয়োই তাকে মাটির নিচে রক্ষা করেছেন। সাধু আন্তোনিয়োর কাছে প্রার্থনা করে একবার এক মা জলে ডুবে মৃত তাঁর ছেলেকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পান। আরও একবার কুষ্ঠরোগী সাধু আন্তোনিয়োর কৃপা ভিক্ষা করেও রোগমুক্ত হয়।

সাধক আন্তোনিয়োর রুটি নিয়েও এক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। পাদুয়া নগরে যখন আন্তোনিয়োর নামে এক মহামন্দির নির্মাণ করা হয় তখন তার পাশে থাকা একটি শিশু জলে ডুবে মারা যায়। তার মা সাধু আন্তোনিয়োর কাছে মানত করলেন যে, শিশুটি বেঁচে উঠলে তিনি শিশুর ওজন-সমান রুটি গরিবদের দেবেন। শিশুটি নাকি বেঁচে যায়। সেদিন থেকে এই প্রথা চালু হল যে ভক্তদের মনোবাসনা পূরণের জন্য সাধুর কাছে রুটি উৎসর্গ করা হয়।[৫৯] পরে এই রুটিগুলি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

---

৫৫. Ibid., p. 10
৫৬. Ibid., p. 18
৫৭. Ibid., p. 8
৫৮. Ibid., p. 16
৫৯. Raymund Pennafort OFM, Ibid., p. 5

আবার সাধু আন্তোনিয়োর মঙ্গল প্রার্থনায় বর পেলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রুটি দেওয়া হয়। "অনেকে সুস্থতা লাভের জন্য সাধুর প্রসাদ হিসাবে এই রুটি গ্রহণ করে থাকেন।"[৬০] বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ রুটি প্রদান ও গ্রহণের এই রীতি আজও ভক্তদের মধ্যে সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। জাগতিক এই রুটি ভক্তের বিশ্বাসের গুণে পারমার্থিক বলে গৃহীত হয়। তাই সাধু আন্তোনিয়োর পর্ব পালনের সময় মহাপ্রার্থনার পর উপস্থিত সবার জন্য আশীর্বাদিত রুটি বিলানো হয়। ভক্তগণ উপাসনার পর যখন বাড়িতে ফিরে যান, তখন তাঁদের আত্মীয়-পরিজন সবাই আন্তোনিয়োর আশীর্বাদের সেই রুটি খেতে চান।

খ্রিষ্টানদের মধ্যে কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে বা কোনো জায়গায় কিছু রেখে ভুলে গেলে তা ফিরে পাবার জন্য সাধু আন্তোনিয়োর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করার রীতি রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশে আন্তোনিয়োর জীবনী রচয়িতা মার্ক ডি' কস্তা বলেছেন, "সাধু আন্তনী যেমন পাণ্ডুলিপি হারিয়ে আশ্চর্যজনক ভাবে আবার ফিরে পেয়েছিলেন সেই কথা আজও স্মরণ করে খ্রীষ্টভক্তগণ তাঁদের হারানো দ্রব্য ফিরে পাওয়ার জন্য সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করে থাকেন।"[৬১] আন্তোনিয়োকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে আরও একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে। তাঁর সঙ্গে শিশু-যিশুর নাকি এক ঐকান্তিক ও অপার্থিব সম্পর্কে ছিল। শিশু-যিশু নাকি সাধু আন্তোনিয়োর কোলে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইতালির পাদুয়া নগরীর কাছে তিসো নামে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে তিনি মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতেন। ১২২৯ সালে এক রাতে তিসো সাধুর ঘরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখেন যে আন্তোনিয়োর ঘর থেকে উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কাছে গিয়ে লক্ষ করেন স্বর্গীয় শিশুর রূপ ধরে যিশু তাঁর কোলে বসে কথা বলছেন। তাই সাধু আন্তোনিয়োর ছবিতে বা মূর্তিতে সবসময় দেখা যায় তিনি শিশু-যিশুকে কোলে নিয়ে আছেন। শিশুদের প্রতি সাধক আন্তেনিয়োর গভীর ভালবাসা ছিল। তিনি বিপদে আপদে সব সময় তাদের পাশে দাঁড়াতেন। শিশুদের প্রতি সাধকের এই মহানুভবতা এবং শিশুর মতো সরলতার জন্যই শিশু যিশু তাঁর কোলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন বলে ভক্তদের বিশ্বাস।

সাধক আন্তোনিয়োকে অনেক সময় 'আশ্চর্য কর্মসাধক' বলেই মানুষ গ্রহণ করেন। কিন্তু খ্রিষ্টীয় আদর্শ প্রচার ও প্রকাশে সমাজের অবহেলিত ও দীনহীন মানুষের পক্ষাবলম্বন করাও যে সত্যিকারের খ্রিষ্টসেবকের লক্ষ্য হওয়া দরকার, সেই বিষয়টা আমরা ভুলে যাই। এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ব্রাদার রিংকু হিউবার্ট কস্তা তাঁর 'অলৌকিক কর্মসাধক সাধু আন্তনী' নামক

---

৬০. মনোজ বিশ্বাস, *পাদুয়ার সাধু আন্তোনিয়ো*, পৃ. ৭৮
৬১. মার্ক ডি' কস্তা, *অলৌকিক কর্মসাধক পাদুয়ার সাধু আন্তনী*, পৃ.১৩

প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বলেছেন, “সাধু আন্তনী তাঁর গভীর আধ্যাত্মিকতাসমৃদ্ধ প্রার্থনাশীল জীবন দ্বারা ধর্মভ্রষ্ট, পাপী, উচ্ছৃঙ্খল, মাতাল, দস্যু, নির্মম শাসক ও হত্যাকারীদের মন পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছেন।”[৬২]

সাধক আন্তোনিয়োর মহাপ্রয়াণ

সাধক আন্তোনিয়ো বিরামহীন ব্যক্তিগত প্রার্থনা, কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণ, দীর্ঘক্ষণ উপবাসের মাধ্যমে শরীরকে বশে আনার চেষ্টা করতেন। ধর্মভাষণ প্রস্তুতির জন্য তিনি অনেক পড়াশুনা করতেন। পরিশ্রম ও অযত্ন অবহেলার দরুণ তাঁর শরীরে কঠিন রোগ বাসা বাঁধে। তিনি কখনও তাঁর কষ্টের কথা বলতেন না।[৬৩] ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই জুন তিনি পাদুয়া নগরীর আসিলা নামক স্থানে সাধ্বী ক্লারার কনভেন্টে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে গোটা ইতলিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। তবে বিশেষ করে তাঁর প্রিয় নগরী পাদুয়ার মানুষ পথে বেরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, ‘আমাদের সাধু নেই, আমাদের সাধু বেঁচে নেই’। ১৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সমাধি খুলে দেখা গেল তাঁর শরীরের অন্য সব অংশ মাটির সঙ্গে মিশে গেলেও জিহ্বাটি ছিল জীবিত মানুষের জিহ্বার মতোই সজীব সতেজ।[৬৪]

আন্তোনিয়োকে ‘সাধু’ বলে ঘোষণা

খ্রিষ্টধর্মে সিদ্ধ পুরুষ ও নারীদের তাঁদের নামে সংঘটিত অলৌকিক কাজের প্রমাণে সাধু বা সাধ্বী বলে ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকেই তাঁদের মধ্যস্থতায় বিশ্বাসী ভক্তগণ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে থাকেন। কারও ক্ষেত্রে সাধু ঘোষণা করতে অনেক সময় লাগে। আবার কারও বেলায় খুব কম সময় লাগে। যতটুকু জানা যায় যে আন্তোনিয়োর বেলায় সবচেয়ে কম সময় লেগেছিল। মৃত্যুর প্রায় এক বছরের মধ্যেই অর্থাৎ, ১২৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে মে ইতালির স্পেলেতো নামক স্থানে তাঁকে ‘সাধু’ বলে ঘোষণা করা হয়। আন্তোনিয়ো ‘সাধক’ থেকে ‘সাধু’ হয়ে যান। সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে আন্তোনিয়োর মা-বাবা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সাধু ঘোষণা করার দিন তাঁর নামে উনচল্লিশটি আশ্চর্য কাজ সংঘটিত হবার কথা ঘোষণা করা হয়। সেই বছরেই ১৩ই জুন তাঁর পর্বদিন পালন করার আজ্ঞা জারি করা হয়।

মৃত্যুর তিথিতে সেই সাধু বা সাধ্বীর প্রতি খ্রিষ্টভক্তগণের বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতিকে ‘পর্বদিন’ বলা হয়। পোপ নবম গ্রেগরি যিনি আন্তোনিয়োকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন এবং অনেকবার তাঁর প্রচার শুনেছেন; এমনকি কয়েকটি আশ্চর্য কাজেরও স্বাক্ষি হয়েছেন– তিনিই তাঁকে সাধু বলে ঘোষণা করেছেন। পোপ গ্রেগরি আন্তোনিয়োকে স্বর্গ-সাধুর স্বীকৃতি দেবার সময় তাঁকে ‘প্রিয়তম অলৌকিক কর্মসাধক’ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।[৬৫] ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি পোপ দ্বাদশ পিউস

---

৬২. রিংকু হিউবার্ট কস্তা সিএসসি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৬৩. C. M. Antony, Ibid., p. 46
৬৪. Joseph A. Keller, Ibid., p. 19
৬৫. পাস্কাল ফার্নান্দো, ও.এফ.এম., অনুবাদ তিমির সিংহ, এস.জে. ও জন এঙ্গেলবার্ট, এস.জে., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

তাঁকে 'মণ্ডলীর আচার্য' বলে ঘোষণা করেন। এই কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, সাধু আন্তোনিয়ো তাঁর জীবনাদর্শ প্রচার ও অলৌকিক কাজের মাধ্যমে তাঁর আরাধ্যদেবতা পরম করুণাময় ঈশ্বরের মহিমাই ঘোষণা করতেন। আর ঈশ্বরও তাঁর আপনজন হিসাবে আন্তোনিয়োকে এক সুউচ্চ আসনে আসীন করেছেন।

মঙ্গলবার সাধু আন্তোনিয়োর বিশেষ দিবস

সাধক আন্তোনিয়োর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নানা পর্যায়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা তাঁকে ঘিরে বিশ্বাসের নানা রীতি বা নিয়ম-নীতি বের করেছেন। সেগুলো আজও তাঁর ভক্তজনেরা ভক্তি ভরে স্মরণ করে থাকেন। প্রথমেই উল্লেখ করা যাক মঙ্গলবারে সাধু আন্তোনিয়োকে ভক্তি জ্ঞাপনের বিষয়টি।

সাধু আন্তোনিয়ো ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জুন মৃত্যুবরণ করেন। সেদিন ছিল শুক্রবার। সেদিন তাঁকে সমাহিত করা হয়নি। আসলে তাঁর মৃতদেহ কোথায় সমাহিত হবে সেটা নিয়ে প্রচণ্ড মতবিরোধ ছিল। তার ফলে তাঁর সমাধি দেওয়া হয় ১৭ জুন, মঙ্গলবার। সেদিন তাঁকে ঘিরে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি। সেদিন নাকি সাধুর নামে নানা অলৌকিক কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। তাই ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টানেরা আজও প্রতি মঙ্গলবার তাঁর চরণে সমবেত হয়। তাঁদের বিশ্বাস সাধু আন্তোনিয়ো তাঁদের মনের বাসনা পূর্ণ করবেন। সেই রীতি মেনেই পাদুয়া নগরীতে ও সারা বিশ্বে মঙ্গলবার সাধু আন্তোনিয়োর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য নিবেদিত।

বাংলাদেশে ভাওয়ালের নাগরীতেও মঙ্গলবার সাধু আন্তোনিয়োর জন্য বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেদিন তাঁর তীর্থস্থান পানজোরা গির্জিকার মহোপসনায় অনেক মানুষের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। সেখানে শুধু নাগরীর মানুষই নন, আশে-পাশের অন্যান্য ধর্মাঞ্চল; এমনকি অনেক দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তগণ তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত দেউলে সমবেত হন। সারা বছরই ভক্তজনগণের আগমনের এই ধারা সমানভাবে প্রবহমান। সেটা আন্তোনিয়োর প্রতি ভক্তমানুষের অকুণ্ঠ ভক্তি ও ভালবাসারই একান্ত বহিঃপ্রকাশ।

সাধু আন্তোনিয়োকে ঘিরে সারা পৃথিবীতে কাথলিকদের মধ্যে ধর্মীয় নানা রীতি প্রচলিত আছে। তার মাধ্যমে এই সত্য প্রকাশিত হয় যে, আমাদের আলোচ্য সাধকের প্রতি মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা অপরিসীম। ভক্তের বিশ্বাস তাঁর মতো জাগ্রত সিদ্ধপুরুষ পৃথিবীতে নেই। তিনি সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ ভক্ত-বিশ্বাসীদের অন্তরের মণিকোঠায় বাস করেন। ভক্তগণ তাঁকে আন্তরিকভাবে ভালবাসেন। তাঁর কাছে তাঁরা যে-কোনো সময় প্রার্থনা জানান। আর তিনিও তাঁদের দুঃখে-কষ্টে, বিপদে-আপদে এবং নানা প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে থাকেন। ভক্তদের চাহিদা মোতাবেক তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। দিন দিন তাঁর

অনুগত ভক্তের সংখ্যা বেড়েই চলছে। আধুনিকতার সমস্ত প্রভাবসমূহ পাশ কাটিয়ে মানুষ তাঁর শরণ নেয়। জীবনীকার তাই বলেছেন,

> ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাই সাধু আন্তনির শরণ নেয়। বহু শিল্পী, পণ্ডিত, স্থাপতি, লেখক আপন আপন কলাকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাঁর নামে গীর্জা ও উপাসনালয় স্থাপিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি গীর্জায় তাঁর মূর্তি আছে, প্রায় প্রতিটি খ্রীষ্টান বাড়িতে তাঁর ছবি আছে। মা মারীয়া ও সাধু যোসেফের সঙ্গেই সাধু আন্তোনির নামও গভীর ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বহু ভক্তের মুখেই।[৬৬]

বাংলাদেশে সাধক আন্তোনিয়োর প্রতি ভক্তি

সাধক আন্তোনিয়ো সব দেশের সব কালের। তাঁর এই সর্বজনীনতার বিষয়ে এটা বললে অতিরঞ্জিত হবে না যে, যিশুখ্রিষ্টের মা পুণ্যময়ী মারিয়া ও তাঁর স্বামী সাধু যোসেফের পর পাদুয়ার সাধু আন্তোনিয়ো ছাড়া সারাবিশ্বের কাথলিক ধর্মপন্থী মানুষ আর কোনো সাধু বা সাধ্বীকে এত বেশি স্মরণ করেন না। সাধু আন্তোনিয়ো সারা পৃথিবীর কাথলিক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের কাছে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও জনপ্রিয় সাধু বলে পরিগণিত। তিনি সদা জাগ্রত। সব সময় ভক্তের অনুনয় বিনয় শোনেন। আপনজন হিসাবে ভক্তকে নানা দয়া দানে ধন্য করেন। ক্লেমেন্তিনুস দ্যেমান বলেন, "খ্রিষ্টমণ্ডলীতে পাদুয়ার সাধু আন্তোনিয়োর মতো কোনো সাধক নেই যিনি সারা পৃথিবীর খ্রিষ্টভক্তদের দ্বারা পূজিত হন। তার আসল কারণ হল– তিনি সব ধরনের মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধানের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন।"[৬৭] আন্তোনিয়োর প্রতি ভক্ত মানুষের ভক্তি দিন-দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাধক আন্তোনিয়ো তীর্থস্থানসমূহ

মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ঐশসান্নিধ্য লাভ করার আকাঙ্ক্ষা প্রধান। বিভিন্ন সাধু ব্যক্তিদের প্রতি এবং তাঁদের জাগ্রত ক্রিয়াশক্তির উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করে মানুষ ধর্মীয় নানা রীতিনীতি মেনে বিভিন্ন পুণ্যস্থানে গিয়ে ঈশ্বরের স্পর্শ পেতে চায়। আমাদের দেশেও সব ধর্মের মানুষের মধ্যে তীর্থ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান সব ধর্মেই বিশেষত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোতে তীর্থ ও তীর্থস্থানের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। খ্রিষ্টধর্মেও ভক্তগণ বিভিন্ন পুণ্যস্থানে গিয়ে সাধু-সাধ্বীদের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সমবেত হয়। এই ক্ষেত্রে বেশির ভাগ তীর্থস্থানই আমাদের বিশ্বাসের ঐতিহ্য ও স্বাক্ষ্য বহন করে। সেই কৃষ্টি ভক্তজনগণকে তাদের বিশ্বাসের গভীরে যেতে সহায়তা করে। তাই বলা যায় খ্রিষ্টীয় আদর্শ ও বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে তীর্থস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। খ্রিষ্টীয় মাণ্ডলিক আইনের ১২৩০ নং ধারায় তীর্থস্থানের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করে বলা হয়েছে, "স্থানীয় পর্যায়ের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রী বিশ্বাসীগণ প্রায়ই যেখানে সমবেত হন– সেই গির্জা বা কোনো পবিত্র স্থানকেই

---

৬৬. পাস্কাল ফার্নান্দো, ও.এফ.এম., অনুবাদ তিমির সিংহ, এস,জে. ও জন এঙ্গেলবার্ট, এস.জে., প্রাগুক্ত, পৃ. ১
৬৭. Clementinus Deymann, Ibid., p. 4

তীর্থস্থান বলা হয়।" সেই জন্য যে-কোনো তীর্থস্থানের একটি বিশেষ ধর্মীয় ঐতিহ্য থাকে। তার একটা লিখিত এমনকি অলিখিত ইতিহাস থাকে। আমাদের বাংলাদেশে সাধক আন্তোনিয়োর নামে নির্মিত ও নিবেদিত তীর্থস্থানগুলো নিয়ে আলোকপাত করার দাবি রাখে।

১। পানজোরা, গাজিপুর: প্রতিবছর পাদুয়ার সাধু আন্তোনিয়োর সবচেয়ে বড় তীর্থযাত্রা হয় এই পানজোরা তীর্থস্থানে। সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভক্ত জনসাধারণের পদচারণায় মুখর পানজোরা তীর্থস্থান ঘিরে নানা কিংবদন্তি কাহিনি প্রচলিত আছে। ক্যাথরিন পিরিছ নাম্নী এক দয়াবতী কাথলিক নারী যখন তাঁর জমি মিশনারি ফাদারদের দান করেন, তখন সেটা ছিল এক জঙ্গল। সিস্টার মেরি অমিয়া এসএমআরএ লিখেছেন, "ক্যাথরিন সম্ভবত এই পানজোরায় বসবাস করতেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এখানে একটি চ্যাপেল নির্মাণ করা হয়। সম্ভাব্য সময় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ। ইটের তৈরি ঐ চ্যাপেল সাধু আন্তনীর নামে উৎসর্গীকৃত ছিল। সাধু আন্তনীর পালাগান নাগরী ও ভাওয়াল অঞ্চলে সে সময় থেকেই প্রচলিত এবং সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তি নাগরী অঞ্চলের খ্রীষ্টবিশ্বাসের ঐতিহ্য।"[৬৮]

খ্রিষ্টমণ্ডলীর পঞ্জিকা অনুসারে সাধু আন্তোনিয়োর স্মরণ-দিবস ১৩ই জুন। কিন্তু নাগরীতে আন্তোনিয়োর উৎসব সেই তারিখে অনুষ্ঠিত হয় না। সেটার সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখও নির্ধারিত করা হয়নি। নাগরীর তীর্থ হয় খ্রিষ্টীয় পঞ্জিকা অনুসারে ভস্ম বুধবারের আগের শুক্রবার। সেটা সচরাচর ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো এক সময় হয়ে থাকে। পানজোরার চ্যাপেল অনেক পুরনো হলেও আন্তোনিয়োর পর্ব পালন বেশ অর্বাচীন প্রথা। শোনা যায় যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে বেশ ছোট পরিসরে এই পার্বণ পালিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে পংকজ প্লাসিড রড্রিক্স লিখেছেন, "১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হতে সাধু আন্তনীর পার্বণ ঘটা করে পালন শুরু হয়।"[৬৯] পর্ব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা আগে চত্বরের গ্রটোতে করা হত। তারপর এক সময় সেটা অস্থায়ী মঞ্চে করা হত। বর্তমানে সেখানে খুব বড় এবং উঁচু করে স্থায়ী মঞ্চ করা হয়েছে। "বর্তমানে পানজোরা সাধু আন্তনীর তীর্থ পুণ্যভূমি সকলের অত্যন্ত সুপরিচিত ও প্রিয় হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বাসের এক তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে। ... মানুষ সাধু আন্তনীর প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শনার্থে প্রার্থনা করতে ও মানত পূরণ করতে আসে। ... বৎসরের প্রতিদিনই মানুষ প্রার্থনা ও মানত পূরণ করার জন্য বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে এখানে আসে।"[৭০]

২। কাতুলী, পাবনা: পাবনা জেলার মথুরাপুর ধর্মপল্লীর অধীনস্ত কাতুলী গ্রামে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে একটি স্কুল শুরু হয়। তবে ১৯৮৮ সালে পাকা ঘর করার পর স্কুলের নামকরণ করা হয় সাধু আন্তোনিয়ো স্কুল। ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কাতুলীতে সাধু আন্তোনিয়োর পর্ব উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এখানে সাধু আন্তোনিয়োর পর্ব পালনে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ প্রদান করেন ইতালীয়

৬৮. মেরী অমিয়া এসএমআরএ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৬৯. পংকজ প্লাসিড রড্রিকস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৭০. মেরী অমিয়া এসএমআরএ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

মিশনারি ফাদার কার্লো বুজ্জি পিমে। পরবর্তীকালে মথুরাপুরের পালক-পুরোহিত ফাদার পৌল ডি'রোজারিও পর্বোৎসবকে আরও বেগবান ও প্রাণবন্ত করে তোলেন। কাতুলী তীর্থকেন্দ্রে আন্তোনিয়োর পর্ব উপলক্ষে এখন নয়দিন ধরে নবাহ করা হয়। ভক্তদের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য নানা আয়োজন ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। দিন দিন ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের প্রায় সব ধর্মপল্লী থেকেই ভক্তজনগণ এখানে তীর্থ করতে আসেন। ভক্তজনগণের হিসাব দিতে গিয়ে ফাদার দিলীপ এস. কস্তা লিখেছেন, "প্রতি বছর গড়ে প্রায় তিন হাজার খ্রীষ্টভক্ত এই পর্বোৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকেন।"[৭১]

পাবনা জেলার কাতুলীতেও গাজিপুর জেলার পানজোরার মতো সাধুর নির্দিষ্ট পর্বদিন ১৩ই জুন নয়, বরং ভস্ম বুধারের আগের শুক্রবার উদ্‌যাপন করা হয়। কাতুলী তীর্থস্থান যেই ফাদারের অধীনে নিয়ন্ত্রিত সেই দিলীপ এস. কস্তা জানাচ্ছেন– "২০১২ খ্রিষ্টাব্দে কাতুলীতে একটি গির্জা নির্মাণ করা হয়েছে এবং রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ায় একটি তীর্থস্থান হিসাবে সাধু আন্তনীর পর্ব উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। সাধু আন্তনীর স্কুল, গির্জা ও মাঠসহ এই চত্বরে ভক্তবিশ্বাসীদের আনাগোনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধু আন্তনীর পর্ব উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ভক্তবিশ্বাসীদের জীবন আরো গভীর হচ্ছে বলেই সবার বিশ্বাস।"[৭২]

৩। রাজাবাড়িয়া, বরিশাল: বাংলাদেশে পর্তুগিজ মিশনারিদের দ্বারা দীক্ষিত খ্রিষ্টানদের মধ্যে সাধক আন্তোনিয়োর প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার আধিক্য দেখা যায়। দক্ষিণবঙ্গের পাদ্রিশিবপুরে পর্তুগিজদের পদচারণা শুরু হয় ষোড়শ শতকের শুরুতেই। সেখানে একটি গির্জাও স্থাপিত হয়। পাদ্রিশিবপুরের উপকেন্দ্র রাজাবাড়িয়ার আদিখ্রিষ্টান লাজারুশ গমেজ, খ্রিষ্টফার গমেজ, দিলীপ গোমেজ, তপন গোমেজ, সাগর গোমেজ– প্রমুখের নিরলস প্রচেষ্টায় এবং কলম্বিয়ান ও ইতালীয় মিশনারিদের সহায়তায় সাধু আন্তোনিয়োর গির্জা স্থাপিত হয় ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে। তারপর ছোট পরিসরে প্রতি বছর সাধু আন্তোনিয়োর পর্ব পালিত হতে থাকে। ইতিমধ্যেই সেখানে নতুন গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরও বাহ্যিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে।

সেই ধারায় ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ সাধু আন্তোনিয়োর পর্ব উপলক্ষে মহোপসনায় বরিশাল ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি রাজাবাড়িয়াকে সেই ধর্মপ্রদেশের তীর্থস্থান হিসাবে ঘোষণা করেন। তার পর থেকেই সেখানে বিশ্বাসী মানুষের আগাগোনা বৃদ্ধি পায়। প্রতিবছর ঘটা করে পর্ব পালিত হয়। কালক্রমে আশে-পাশের অন্যান্য ধর্মপল্লী– পাদ্রিশিবপুর, বরিশাল, গৌরনদী, ঘোড়ার পার, নারিকেল বাড়ি থেকেও ভক্তগণ পর্বে অংশগ্রহণ করেন। বরিশাল ধর্মপ্রদেশের খ্রিষ্টযাজক লিটন ফ্রান্সিস গোমেজ বলেন, "সম্প্রীতির এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বরিশাল কাথলিক ধর্মপ্রদেশের পাদ্রিশিবপুর ধর্মপল্লীর অন্তর্গত মুসলিম অধ্যুষিত রাজাবাড়িয়া উপধর্মপল্লী সাধু আন্তনীর তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।"[৭৩]

---

৭১. দিলীপ এস. কস্তা, 'তীর্থযাত্রা: অন্তরে শুদ্ধতা ও পরিবর্তনের আহ্বান', অনুগ্রহ, পৃ. ৩
৭২. দিলীপ এস. কস্তা, 'পাল-পুরোহিতের বাণী', অনুগ্রহ, পৃ. ১
৭৩. লিটন ফ্রান্সিস গোমেজ, 'সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান: রাজাবাড়িয়া', প্রতিবেশী, বর্ষ ৭৬, সংখ্যা ৪২, ১৩-১৯ নভেম্বর ২০১৬, পৃ. ১০

সাধক আন্তোনিয়োর নামে অন্যান্য গির্জাসমূহ

বাংলাদেশে সাধু আন্তোনিয়োর উপরোল্লিখিত তিনটি তীর্থস্থান বাদেও কিছু ধর্মপল্লী বা খ্রিষ্টধর্মাঞ্চল রয়েছে যেখানে গির্জাঘরগুলো সাধু আন্তোনিয়োর নামে নিবেদিত। তবে আঠারগ্রাম অঞ্চলে পাদুয়ার সাধু আন্তোনিয়োর গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গোল্লা ধর্মপল্লীর উপকেন্দ্র বক্সনগরে। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই গির্জায় ১৩ই জুন সাধুর পর্ব পালিত হয়। অন্যান্য জায়গার মানুষও সাধু আন্তোনিয়োর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা থেকে নিজেদের মতো করে উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেছেন।

১. সাধু আন্তোনিয়োর গির্জা, বক্সনগর, নবাবগঞ্জ: ১৬৮২ থেকে ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বক্সনগরে খ্রিষ্টানদের বসতি শুরু হয়। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই উপাসনাগৃহ ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়। তারপর ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তৎকালীন বিশপ আগষ্টিন যোসেফ লুয়াস-এর প্রচেষ্টায় নতুন একটি গির্জা নির্মিত হলে তখন থেকেই কাথলিকপন্থীদের উপাসনা-পঞ্জিকা অনুসারে ১৩ই জুন সাধুর পর্ব পালিত হয়। পরিশেষে ২০০5 খ্রিষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর বর্তমান আধুনিক গির্জাঘরটি আর্শীবাদ করা হয়। বর্তমানে এখানে সাধু আন্তোনিয়োর পর্বের সময় শুধু আঠারগ্রামের মানুষই অংশগ্রহণ করেন না, সমগ্র ভাওয়াল এলাকা থেকেও লোকজনের আগাগোনা চোখে পড়ে। কালক্রমে বক্সনগর হয়ে উঠেছে সাধু আন্তোনিয়োর এক মিলনমেলার আধার।

২. সাধু আন্তোনিয়ো গির্জা, কমলাপুর, সাভার, ঢাকা: কথিত আছে কমলাপুরে 'হলুদ সাধু' নামক জনৈক আন্তোনিয়ো-ভক্ত প্রথম নিজের উদ্যোগে গ্রামের কয়েকজন মানুষ ডেকে আন্তোনিয়োর উৎসব করতেন। আন্তোনিয়োর পালাগান সভায় উপস্থিত সবাইকে খিচুড়ি খাওয়াতেন। সেটাই কালক্রমে বড় পর্বের আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গা থেকে হাজার হাজার মানুষ এখানে সাধু সাধক আন্তোনিয়োর উৎসব করতে আসেন। কমলাপুর আন্তোনিয়ো পর্বের একটা বিশেষ দিক হল সেদিন যত মানুষই অনুষ্ঠানে আসুন না কেন– সবার জন্য খিচুড়ি খাওয়ার আয়োজন করা হয়। গ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান ও স্বেচ্ছাশ্রমে এই আয়োজন ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে।

৩. সাধু আন্তোনিয়োর গির্জা, শিমুলিয়া, ফুলবাড়িয়া, গাজিপুর: ভাওয়াল বনের মধ্যে অবস্থিত রাজবংশী জনসমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই গির্জা হাল আমলের নিদর্শন। মূলত কেওয়াচালা মিশনের যাজকদের তত্বাবধানে এই গির্জায় সহকারী হিসাবে রয়েছে শান্তিরাণী সন্ন্যাসিনী সংঘের ভগিনীগণ।

৪. চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের অধীন নোয়াখালি জেলার সোনাপুর ধর্মপল্লীর অধীনস্ত এসবালিয়া গির্জা সাধু আন্তোনিয়োর নামে নিবেদিত। প্রথম পর্যায়ে যখন বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারিত হয়, তখন থেকেই এই এলাকায় খ্রিষ্টানদের বসতি ছিল। তবে তাদের ধর্মীয় জীবনের যত্ন নেবার তেমন কোনো আয়োজন ছিল না। পরে সেখানে একটি গির্জা স্থাপিত হয়।

৫. সাধু আন্তোনিয়োর আশ্রম, দস্তামপুর, ঠাকুরগাঁওঃ ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের ফাদারগণ এখানকার দায়িত্বে আছেন। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এখানে মূলত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করে।

৬. সাধু আন্তোনিয়োর গির্জা, মহিপাড়া, রাজশাহী: ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই গির্জার অধীনে প্রায় তিন হাজার খ্রিষ্টভক্ত রয়েছেন। তাদের সেবাযত্ন করার জন্য বর্তমানে দুই জন পুরোহিত সার্বক্ষণিক ভাবে এখানে থাকেন।

৭. সাধু আন্তোনিয়োর গির্জা, রাজাই, সুনামগঞ্জ: নতুন যাত্রা শুরু করা সিলেট ধর্মপ্রদেশে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি নতুন ধর্মপল্লী রাজাই। প্রায় পাঁচশো আদিবাসী ভক্তদের নিয়ে ফাদার যোসেফ তপ্ন এই ধর্মপল্লী শুরু করেন। এখানে মূলত খাসিয়া জনজাতির বসবাস রয়েছে।

আন্তোনিয়োর নামে খ্রিষ্টীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

বাংলাদেশে শুধু ঢাকার খ্রিষ্টানদের মধ্যেই সাধু আন্তোনয়ো জনপ্রিয় নন। অন্যান্য এলাকার ভক্তদের মধ্যে, এমনকি আদিবাসী খ্রিষ্টানদের মধ্যেও দিন দিন তাঁর প্রতি গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস জাগ্রত হচ্ছে। তাই দেখি বিভিন্ন এলাকায় উপাসনাগৃহ ছাড়াও খ্রিষ্টীয় নানা প্রতিষ্ঠান সাধু আন্তোনিয়োর নামে উৎসর্গীকৃত। সেইসব প্রতিষ্ঠানে সাধুর জীবনের আদর্শগুলো সাধারণ মানুষ অনুশীলন ও অনুকরণ করার চেষ্টা করে। সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. সাধু আন্তোনিয়ো কনভেন্ট, পানজোরা, গাজিপুর– প্রেরিতগণের রাণী সিস্টারদের আশ্রম।

২. সাধু আন্তোনিয়ো ছাত্রী নিবাস, পানজোরা, গাজিপুর– পানজোরা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবাসস্থল।

৩. সাধু আন্তোনিয়ো প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিমুলিয়া, ফুলবাড়িয়া, গাজিপুর– শান্তিরাণী সিস্টারদের পরিচালিত স্কুল।

৪. সাধু আন্তোনিয়োর প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহিপাড়া, রাজশাহী– ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে শুরু মহিপাড়া মিশনের স্কুল।

৫. সাধু আন্তোনিয়োর প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাতুলী, পাবনা– মথুরাপুর ধর্মপল্লীর অধীন ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে শুরু স্কুল।

৬. সাধু আন্তোনিয়ো প্রাথমিক বিদ্যালয়, দস্তমপুর, ঠাকুরগাঁও– শান্তিরাণী সিস্টারদের পরিচালিত স্কুল।

৭. সাধু আন্তোনিয়ো শিশু সদন, দস্তমপুর, ঠাকুরগাঁও– আদিবাসী শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত পাঠভবন।

৮. সাধু আন্তোনিয়ো প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজাই, সুনামগঞ্জ– মূলত আদিবাসী শিশুদের জন্য স্কুল।

আন্তোনিয়োর নামে বিশেষ দয়া লাভ

পোপ ফ্রান্সিস ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ঈশ্বরের অপরিসীম করুণা ও ভালবাসা লাভের স্মরণার্থক 'দয়ার পুণ্যবর্ষ' ঘোষণা করেন। সেই দয়ার বর্ষে নাগরীর পানজোরা তীর্থকেন্দ্রে সার্বক্ষণিক দুই জন যাজক থাকার ব্যবস্থা করেন। যে-কোনো মানুষ এলে যাতে তাঁর কাছে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। তবে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের লক্ষ্য

ছিল মানুষ সেই পুরোহিতের কাছে পাপস্বীকার করে তাদের পাপের ক্ষমা এবং অন্তরে শান্তি লাভ করবেন। এই প্রসঙ্গে সেই যাজকদের একজন ফাদার আবেল বি. রোজারিও বলেছেন,

> পানজোরা সাধু আন্তনীর চ্যাপেলের পুণ্য দরজা খোলা হয় ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দে। ঐদিনে ... পানজোরাতে বহু খ্রীষ্টভক্তের সমাগম হয়েছে এবং হচ্ছে। খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যে বিশেষ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তীর্থযাত্রীগণ পুণ্য দরজা দিয়ে গির্জায় প্রবেশ করে ধ্যান প্রার্থনা করে, উপদেশবাণী শ্রবণ করে, আরাধনায় অংশগ্রহণ করে, পুনর্মিলন সংস্কার গ্রহণ কওে এবং শেষে পবিত্র খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ কওে ও পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করে দেহে মনে আত্মায় সতেজ হয়ে গ্রামে ফিরে যায়। তাদের চোখে মুখে একটা প্রশান্তি ও একটা তৃপ্তি পরিলক্ষিত হয়।[৭৪]

সাধু আন্তোনিয়োর আশীর্বাদে মানুষ নতুন জীবন ফিরে পায় আর তাঁর প্রতি মানুষের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে বলেই মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ এই আয়োজন করেছেন।

সাধু আন্তনীর জিহ্বা প্রদর্শনী

১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর বত্রিশ বছর পর তাঁর নামে নির্মিত নতুন মহাগির্জায় দেহাবশেষ স্থানান্তরের জন্য সমাধি খোলা হয়। তখন দেখা গেল তাঁর জিহ্বা বাদে শরীরের বাকি সব অঙ্গই নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর জিহ্বা পুরো অক্ষত আছে। সেই জিহ্বার কোনো পরিবর্তন হয়নি, রঙও বদলায়নি। ভক্তদের বিশ্বাস, তিনি যেহেতু তাঁর জিহ্বা দিয়ে ঈশ্বরের মহিমাগান করেছেন, প্রভু যিশুর বাণী প্রচার করেছেন– তাই সেই জিহ্বার ক্ষয় নেই, লয় নেই।[৭৫]

সেই অক্ষত জিহ্বা ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি সাধক আন্তোনিয়োর জিহ্বা ভক্তদের দর্শনের জন্য বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। সেদিন বিমানবন্দর থেকে সোজা ঢাকা তেজগাঁও গির্জায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ সেই জিহ্বা দেখে আন্তোনিয়োর উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। পরদিন ২রা ফেব্রুয়ারি সেটা নবাবগঞ্জের বক্সনগর গির্জায় সমগ্র আঠারগ্রাম অঞ্চলের খ্রিষ্টভক্তদের জন্য সেটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। একই দিন বিকালে সেই জিহ্বা বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় আন্তোনিয়ো তীর্থস্থান নাগরীর পানজোরায় স্থানান্তরিত করা হয়। সেদিন সন্ধ্যায় তীর্থমন্দিরে স্থানীয় মানুষের ভীড়ে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। পরদিন ছিল সাধু আন্তোনিয়োর মহাপর্ব। সেখানে সারা বাংলাদেশ থেকে আগত ভক্তজনগণের স্রোত বয়ে যায়। সেদিনের মহোপসনায় প্রায় লক্ষাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। উপাসনার সময় মূল বেদিমঞ্চে সেই জিহ্বা রাখা ছিল। তাঁর আর্শীবাদ লাভ করার জন্য মানুষের আগ্রহ ও ঐকান্তিকতার সীমা ছিল না।

তারপর পর্যায়ক্রমে সেই রেলিক চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে সকল ভক্তদের ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিটি জায়গায় হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি সাধু আন্তোনিয়োর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা সুনিশ্চিত করে।

---

৭৪. আবেল বি. রোজারিও, 'জয়ন্তী বর্ষ– দয়ার বর্ষ', যাজকীয় রজত জয়ন্তী স্মরণিকা, সাধু নিকোলাস গির্জা, নাগরী, ২০১৬, পৃ. ৪৫
৭৫. Thomas F. Ward, Ibid., p. 69

এই প্রসঙ্গে এলড্রিক বিশ্বাস বলেন, "মানুষের উপচে-পড়া ভীড় ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে মহান সাধু আন্তনীর জীবন্ত জিহ্বার প্রতি ভক্তি ও সম্মান জানানো দৃশ্যপট বাংলাদেশে এক অনন্য ইতিহাস হয়ে থাকবে।"[৭৬]

ইউরোপীয় বাণী-প্রচারকদের প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশে খ্রিষ্টবাণীর বীজ রোপিত হয়েছি ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে। আজ প্রায় সাড়ে চারশো বছর পেরিয়ে এই দেশে খ্রিষ্টধর্ম ও খ্রিষ্ট-সম্প্রদায় স্থায়ীভাবে তার শিকড় প্রোথিত করেছে। বঙ্গদেশে খ্রিষ্টবাণী প্রচারের ক্ষেত্রে সাধু আন্তোনিয়োর অনুগ্রহ ও কৃপা রয়েছে বলে জনশ্রুতি ও লোকভক্তি ও বিশ্বাস রয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাসবেত্তা ফাদার দিলীপ এস. কস্তা।[৭৭] সাধক আন্তোনিয়ো ইতালির পাদুয়া নগরী থেকে বাংলাদেশের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে পূজনীয় হয়ে উঠেছেন– সেটা তাঁর বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার ফলে। তিনি যেমন ইউরোপের, তেমনি আমাদের দেশের প্রতিটি খ্রিষ্টভক্তের অন্তরের কাঙ্খিত সাধু পুরুষ। সাধক আন্তোনিয়ো বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য অনুরাগীর আপনজন। তাঁর প্রসাদ ও মধ্যস্থতায় সব মানুষই আশিসধন্য জীবন যাপন করে বলে তাদের বিশ্বাস।

৭৬. এলড্রিক বিশ্বাস, 'মহান সাধু আন্তনীর জীবন্ত জিহ্বা', শঙ্খ, সম্পাদক: নোবেল গমেজ, দোয়ানী স্বপ্নের নীড় যুবসংঘ, ২০১৮, পৃ. ১১
৭৭. দিলীপ এস. কস্তা, 'খ্রীষ্টীয় লৌকিক সংস্কৃতি ও সাধু আন্তনী ভক্তি', অনুগ্রহ, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব ২০১৮, কাতুলী, পৃ. ২

তৃতীয় অধ্যায়

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ও বাঙালির ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি– মোটকথা জীবন-ধারণের ও চিত্ত-বিনোদনের সমস্ত উপকরণ নিয়েই স্বজাতি এবং বিজাতি মহলে প্রভূত চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক এবং লেখালেখি চলে আসছে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত পণ্ডিতমহলের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণে বাঙালি জাতির যেসব বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকটভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল– তার গীতিপ্রাণতা। অর্থাৎ গীতিপ্রাণ জাতি হিসেবেই বাঙালি সমধিক পরিচিত। ভাব প্রকাশের ঊষালগ্ন থেকেই বাঙালির সত্তার সঙ্গে মিশে আছে সঙ্গীতে। সাধনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুন্দর ও সার্থক মাধ্যম হিসেবেও গানকে বেছে নিয়েছে বাঙালি। বাঙালির জীবনে ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গেই হোক, অথবা বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গেই হোক; কিংবা ঈশ্বরের সঙ্গেই হোক– সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করার জন্য সঙ্গীত সব সময়ই একটা বিশেষ স্থান দখল করেছে। তাই বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সম্বন্ধে তার গ্রহণযোগ্য পরিচয় দিতে গিয়ে সাহিত্য বিশারদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন,

> বাংলাদেশকে জানিতে হইলে গানের মধ্য দিয়া ইহাকে জানা যত সহজ, আর কোন বিষয়ের মধ্য দিয়াই তাহা তত সহজ নহে। প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম কাল পর্যন্ত বাঙ্গালীর সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদই তাহার সঙ্গীত। বাঙ্গালীর ধ্যান-ধারণা, সামাজিক আচার-আচারণ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি সবই সঙ্গীত সাধনায় যে বৈচিত্র্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিতে না পারিলে বাঙ্গালীর চরিত্র এবং তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাইবে না।[১]

আবহমানকাল থেকেই বাংলার আকাশে বাতাসে মিশে আছে সঙ্গীতের মোহন সুর। তাই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে সঙ্গীত। বাংলা ও বাঙালির সার্বিক জীবনবোধের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে যুক্ত হয়ে আছে গান। নবম শতাব্দীর দিকে বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন স্বরূপ আমরা যে চর্যাগীতির কথা জানতে পেরেছি, সেগুলিও মূলত কতগুলি গান বা সঙ্গীতেরই সমাহার। তবে এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চর্যাগীতিকাগুলির মধ্যে বিশেষ এক ধর্মসম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের নিগূঢ় তত্ত্বকথার অবতারণা করা হয়েছে। সেই তত্ত্বকথার মধ্যেও বাঙালির আত্মানুসন্ধান বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটকেও বাঞ্ছিত করে তুলেছে। সেই সঙ্গে আমরা দেখি চরম বাস্তবতার মধ্যেও আমাদের অতি পরিচিত আবহে মানব-মানবীর প্রেম-ভালবাসা ও মিলন-বিরহের ঐকান্তিকতা বাংলার প্রাচীন জীবন-যাত্রাকে বাণীবদ্ধ রূপ দিয়েছে চর্যাগীতি। চর্যাগীতিকার এই সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই সেটা বাঙালির অন্তরের কাছের জিনিস হয়ে উঠেছে। সত্যি কথা বলতে কি, বাঙালি চর্যাগীতির এই 'সান্ধ্যভাষা'র আবহেই তার নিজের স্বরূপ খুঁজে পেয়েছে।

---

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর*, কলকাতা: এ মুখার্জী, ১৯৬৬, প্রথম খণ্ড. পৃ.া৷

মোটকথা, আমাদের এই আদি গীতিকবিতা তার সঙ্গীতময়তার জন্যই একটি সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। চর্যাগীতির সঙ্গীতধর্মিতা এবং তার সঙ্গে বাঙালি জাতির চিরকালীন সংযোগ স্থাপনের দিকটি নির্দেশ করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "তত্ত্বকথাও সরস গীতির মধ্য দিয়ে পরিবেশন করিবার নিপুণতা একমাত্র বাঙ্গালীরই আছে। অন্যান্য জাতীর মধ্যে জীবন-জিজ্ঞাসা দর্শন-শাস্ত্রের নীরস সূত্রের রূপ লাভ করে, বাঙ্গালীর মধ্যে তাহা অতি সহজেই কাব্য ও গীতি হইয়া উঠে। তাহার নিদর্শন বাংলার ধর্ম-সঙ্গীতের সর্বত্রই পাওয়া যায়।"[২] বাঙালির আনন্দ-বেদনা প্রকাশের উদ্দিষ্ট সত্তা হিসাবে ঈশ্বরকে বেছে নিয়ে তাঁর কাছে সব প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির অব্যক্ত কথামালা সঙ্গীতে রূপ দিয়ে পরমের পদতলে নিবেদন করা হয়েছে। সেখান থেকে সেই সঙ্গীতের সুর যথার্থ পরিবেশকের উপস্থাপনে আপামর ভক্তমানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করে এক অপার্থিব আবহের সৃষ্টি করেছে।

বাংলা সাহিত্য বিকাশের ধারায় বৌদ্ধদোহা গানগুলিতে রয়েছে সহজ সাধন-পদ্ধতি সম্পর্কিত কিছু গূঢ় তত্ত্বকথার উপাদান। বাঙালি ভাবুকের জীবনদৃষ্টি ও অধ্যাত্ম-চিন্তার স্বকীয়তার গুণে সেইসব গান অনায়াসে সুন্দর সঙ্গীতের রূপ পরিগ্রহ করেছে। তেমনিভাবে কবি জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ' গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে গোবিন্দের আরাধনা। জয়দেব-পরবর্তী সমস্ত বৈষ্ণব কবিরা বার বার বলতে চেয়েছেন বাংলাদেশে 'কানু বিনা গীত নাই'। অন্যদিকে শাক্ত সাধকের গানে মায়ের চরণে ভক্তের আকুতি গোপন থাকে না। শুধু তা-ই নয়, বাংলা সাহিত্যাকাশের সর্বাপেক্ষা দেদীপ্যমান জ্যোতিষ্ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখ্য পরিচয় কিন্তু গীতিকবি হিসেবেই। গীতিকাব্য রচনার গুণেই আজ তিনি বিশ্বকবির মর্যাদা অর্জন করেছেন। আবার দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী গীতিকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, সাধক রাম প্রসাদ, কমলাকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন– প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক বাংলা গীতিসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের লোকগায়কদের মধ্যে লালন ফকির, সিরাজ সাঁই, দুদ্দু শাহ্, হাসন রাজা, রাধারমণ শীল, বিজয় সরকার, রামকানাই দাস, আব্বাস উদ্দিন, জসীমউদ্‌দীন, দূরবীন শাহ্, ভবা পাগলা, তরুণ দাস. সত্যানন্দ দাস, অধীন শেখ, আব্দুল করিম– প্রমুখ কবি-সাধক ও সঙ্গীতকার আমাদের লোকসঙ্গীতকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন।

বাঙালির সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে গান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান গান ছাড়া হয় না বললেই চলে। মার্গসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত– এই দুই ধারার সঙ্গীতই বাঙালির চেতনার রাজ্যে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছে। তবে লোকগানের মধ্যে যেন এক বাঙালির জন্মগত অধিকার রয়েছে। তাই লোকসঙ্গীতের সমৃদ্ধ শাখা পালাগানে বাঙালির বিচরণ, ঐতিহ্য, অধিকার ও চেতনা– নিয়ে আমাদের এই আলোচনা বর্তমান প্রেক্ষাপটে এক স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবি রাখে।

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

প্রথম পরিচ্ছেদ

পালাগানের সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু, পূর্বাপর ঐতিহ্য, গঠন ও গীতিধর্মিতা

ভারতীয় আনন্দবাদের উৎসরূপে সঙ্গীত গৃহীত। সঙ্গীত আমাদের আনন্দ দেয়। আবার সঙ্গীত মনকে পরিশীলিত করে। ফলে গান এবং গানের অনুষঙ্গ আমাদের পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবীর সঙ্গেও মিলেমিশে একাকার। তাই সচ্চিদানন্দ দেবাদিদেব মহাদেবের হাতে রয়েছে শিঙা ডমরু। আনন্দের পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের হাতে মোহন বাঁশি। আবার মঙ্গলস্বরূপা সরস্বতীর হাতে আমরা দেখি সুরযন্ত্র বীণা। তবে এই কথা ঠিক যে, সঙ্গীত শুধু জাগতিক বা ইন্দ্রিয়গত আনন্দের উপকরণ নয়, তার মধ্যে এক ধরনের মাঙ্গলিক এবং পারত্রিক অভিব্যক্তি জড়িয়ে আছে।

বাংলাদেশে প্রধানত দুই ধারার গান প্রচলিত আছে। এক ধরনের গান হচ্ছে প্রথাগত ধারার অনুবর্তী যাকে আমরা বলতে পারি মার্গসঙ্গীত। অন্যদিকে বাঙালির একেবারে নিজস্ব সঙ্গীত-সম্পদ হিসেবে রয়েছে লোকসঙ্গীত। মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি-বিশেষ তার নিজস্ব প্রচেষ্টার বলে স্বকীয়তা এবং দক্ষতা লাভ করতে পারেন। কিন্তু লোকসঙ্গীতের বেলায় এই ব্যক্তিগত চেষ্টা অনেক সময় কোনো কাজে লাগে না। লোকসমাজের যে-কোনো ব্যক্তিই সেই সঙ্গীতে অনায়াস দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। সেই বিচারে লোকগীতি প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব রসবস্তু। একান্তই তার নিজের সম্পদ। অন্যদিকে নাগরিক সমাজের মধ্যে প্রচলিত যে মার্গসঙ্গীত, তার কোনো রসবস্তুর সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের এমন নিবিড় যোগাযোগ সচরাচর দেখা যায় না। তাই বাংলা লোকসঙ্গীতের একনিষ্ঠ গবেষক ড. রীণা দত্ত বলেছেন, "বাঙালির সঙ্গীত চিন্তার উন্মেষ ঘটে গ্রামীণ পর্যায়ে। কারণ বাংলার সঙ্গীতের উৎসই হল গ্রাম। বাংলার আদি সঙ্গীতশিল্পী সবাই প্রায় গ্রামীণ পর্যায়ের লোক। তাদের সঙ্গীত সৃষ্টির মধ্যে এক অভূতপূর্ব মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়।"[৩]

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, নানা ভাবে ও প্রভাবে পরিপুষ্ট হয়ে বাংলার লোকসঙ্গীত বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাঙালির সঙ্গীত-সাধনা তার সার্বিক জীবন-সাধনারই অঙ্গরূপে বিবেচিত হতে পারে। এই রূপগুলিকে আমরা বলতে পারি– ঘরের রূপ, বাইরের রূপ, মন্দিরের রূপ, আসরের রূপ, আবার একান্তভাবে নির্জনে আস্বাদনের রূপ। এইসব সাঙ্গীতিক রূপের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের বেশকিছু ধারা লক্ষ্য করা যায়– সেগুলির মধ্যে কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, পাঁচালি, গীতিকা বা পালা, কড়চা ইত্যাদি। আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে যথাযথ ভাবে পরিতৃপ্ত করার জন্য গানের এই ধারাগুলির প্রতিটিই আলাদা আলাদা এবং বিশদভাবে আলোচনার দাবি রাখে। আমাদের পক্ষে এই সীমিত পরিসরে তার গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। আর আমাদের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় যেহেতু পালাগান, তাই এবার আমরা পালাগানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি।

---

৩. রীণা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসঙ্গীত*, কলকাতা: মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, পৃ. ৪০

পালাগান বা গীতিকা

লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির তুলনায় পালাগান অর্বাচীন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সাহিত্যেই পালাগান বা গীতিকার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। পালাগান বা গীতিকা নামের মধ্যেই তার কিছু বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। পালাগান মূলত কাহিনিধর্মী অখ্যায়িকা। কাব্য ও সুরের যথার্থ মেলবন্ধনে গায়কদের মুখে মুখে গীত হয়। পালাগানে কোনো লিখিত রূপ নেই। পরম্পরাগত ভাবে এই গান গায়কেরা রপ্ত করেন। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ক কোষগ্রন্থ 'বাংলাপিডিয়া'য় সমবারুচন্দ্র মহান্ত বলেছেন,

> পালাগান কাহিনীমূলক লোকগীতি। পাঁচালির ছন্দে রচিত দেবতার কথা বা ধর্মসঙ্গীতও পালা নামে পরিচিত। ... পালাগান প্রধানত পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যানভাব নিয়ে রচিত। ... পালাগানে প্রস্তাবনা ও গৌরচন্দ্রিকা থাকে। এতে গদ্যের অংশ কম থাকে এবং তত্ত্বব্যাখ্যা, শ্লোক ও দীর্ঘগানের সংখ্যা বেশি থাকে। ... গ্রামের অমার্জিত ভাষা, লোকগীতির রাগিণীভিত্তিক ছন্দ এবং আঞ্চলিক শব্দে পালাগান রচিত হয়। ... যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে পালাগানেরও আঙ্গিক এবং বিষয়গত পরিবর্তন ঘটেছে। পৌরাণিক ও দেব-দেবীর কাহিনীর পরিবর্তে বিভিন্ন সামাজিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘটনা নিয়েও পালাগান রচিত হয়েছে।[৪]

উপরোক্ত সংজ্ঞার্থে পালাগানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আভাসিত হলেও তার মধ্যে পালাগানের সঠিক স্বরূপ ফুটে উঠেছে বলে মনে হয় না। তাই বাংলা পালাগান স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। বাংলা পালাগানের আলোচনায় ব্রতী হতে গেলে প্রথমেই স্মরণে আসে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের কথা। তিনি বাংলা পালাগান বা লোকগীতি সংগ্রহের ধারায় এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের ময়মনসিংহ এলাকা থেকে প্রাথমিকভাবে আখ্যানমূলক লোকগীতি সংগৃহীত হয়। এই ধরনের আখ্যায়িককাকে তিনি 'গীতিকা' নামে অভিহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় যে, 'মৈমনসিংহ গীতিকা', 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'– প্রভৃতি নামগুলি শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনেরই দেওয়া।[৫]

আবার আধুনিক কালে আমরা দেখি যে, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। তাঁর মতে বাংলা আখ্যানধর্মী লোকগীতির সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ নিরূপণে ইংরেজি ব্যালাডের আদর্শ অনুসরণ করা দরকার। তিনি বলেছেন, "ইংরেজি ballad কথাটিকে বাংলায় গীতিকা বলিয়া অনুবাদ করা হয়।"[৬] অতএব ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর পূর্বসুরী শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনের মতোই লোকসাহিত্যের এই গীতিধর্মী শাখাটিকে 'গীতিকা' বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী।[৭] অন্যদিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সার্থক ঐতিহাসিক ও সমালোচক ড. সুকুমার সেন এই গীতিকাধর্মী লোক-আখ্যায়িকার যথাযথ স্বরূপ

৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশে জাতীয় জ্ঞানকোষ* (খণ্ড ৫), সমবারুচন্দ্র মহান্ত, 'পালাগান', ঢাকা: বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৩৯০-৩৯১
৫. দীনেশচন্দ্র সেন, *মৈমনসিংহ গীতিকা*, কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩, পৃ. ১
৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউজ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৩, পৃ. ৪০০
৭. প্রাগুক্ত

বিশ্লেষণ না করলেও তাকে 'গাথা কবিতা' বলে অভিহিত করছেন। তবে সুকুমার সেনের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, দীনেশচন্দ্র প্রদত্ত 'গীতিকা' অভিধায় তাঁর কোনো আপত্তি নেই।[৮]

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের পূর্বসূত্র আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা পালাগান বা গীতিকার মধ্যে তার রসদ খোঁজ করেছেন। এই প্রসঙ্গে পালাগান বা গীতিকার অভিধা হিসেবে তিনি 'গীতি আখ্যায়িকা' এবং 'গীতি আখ্যান' এই শব্দ দুটি ব্যবহারের পক্ষপাতী।[৯] অন্যদিকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র অসম্পূর্ণতা দেখে পূর্ববঙ্গের নানা জায়গায় ঘুরে এই ধরনের গান সংগ্রহ করেন শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক। দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগ্রহ করে এই আখ্যান লোক-কাব্যগুলি 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নাম দিয়ে তিনি সাত খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। সেগুলোর প্রকৃতি ও স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভূমিকায় তিনি এগুলিকে 'পালাগান' এবং 'পালা' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন, "সুপ্রাচীন কাল হইতে পূর্ববঙ্গে পল্লীকবি রচিত সত্য ঘটনামূলক পালাগানের প্রচলন আছে।"[১০] এদিকে বাংলাদেশের খ্যাতনামা লোকসাহিত্য বিশারদ ড. আশরাফ সিদ্দিকী পালাগানকে 'গীতিকা' বা 'গাথা' বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, "... গাথা গানগুলো by the people, for the people, এবং of the people; এগুলো creation of the masses rather than classes."[১১] একইভাবে ড. আশরাফ সিদ্দিকীর ভাবশিষ্য এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মযহারুল ইসলাম পালাগানের প্রতিশব্দ করেছেন 'লোক গীতিকা' বা 'লোক গাথা'।[১২] আবার চিত্তরঞ্জন দেব পালাগানকে বলেছেন 'লোক-গীতি-কথা'। তাঁর অভিমত: "লোক-গীতি-কথা শুধুমাত্র ক্ষণিকের ভাব বা অবস্থা বর্ণনাতেই শেষ নয়– এর ভিতর একটা দৃঢ়ভিত্তিক কাহিনী থাকবে এবং এই কাহিনীই তার প্রাণস্বরূপ। এর ভিতর ঘাত-প্রতিঘাত নাটকীয় রীতি-নীতি সবই বিদ্যমান।"[১৩] তবে 'লোক গীতি-কথা' নামকরণের মাধ্যমে ড. চিত্তরঞ্জন দেব পালাগানের লৌকিক চরিত্র, গীতিধর্মিতা ও আখ্যানধর্মিতা– এই তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছেন।

বাংলা পালাগানের প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা গীতিকা, গাথা, গীতি-আখ্যায়িকা, গীতি-অখ্যান, লোক-গীতিকা, লোক-গাথা, লোক-গীতি-কথা, গাথা-কাব্য, প্রাচীন পল্লীগাথা, পালা– প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তবে পালাগান সম্পর্কে নিজস্ব অভিধায় অবস্থানকালে এবং তার স্বরূপ তুলে ধরার প্রচেষ্টায় প্রায় প্রত্যেক বিশেষজ্ঞই পালা এবং পালাগান– শব্দদুটি কমবেশি ব্যবহার করেছেন। আবার গীতিকা কথাটির প্রতিও অনেক সমালোচকের পক্ষপাত পরিদৃষ্ট হয়। এই দুটি বিষয়ে বিশদ হতে গিয়ে বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ড. মফিজুল ইসলাম বলেছেন, "গীতিকা ও পালাগান লোক-কবিদের দ্বারা রচিত। পালাগান একশ্ন প্রধান কিন্তু গীতিকা কাহিনী প্রধান। পূর্বে পালাগান বলতে বোঝানো হতো তাকে, যাতে সঙ্গীতের প্রাধান্য থাকতো বেশি। কিন্তু আজকাল বাংলাদেশের ক্ষেতে-খামারে কিষাণেরা যে এক ধরনের কিস্‌সামূলক গান গায়, তাদেরও

৮. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড-অপরার্ধ, কলকাতা: ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭০, পৃ. ৬০২
৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ. ১৩
১০. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, (সম্পা.), *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭০, পৃ. ১৫
১১. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোক সাহিত্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃ. ৪৪
১২. মযহারুল ইসলাম, *ফোক্‌লোর পরিচিতি ও লোক সাহিত্যের পঠন-পাঠন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃ. ৪২৬
১৩. চিত্তরঞ্জন দেব, *বাংলার লোক-গীত-কথা*, কলকাতা: প্রকাশক, ১৯৮৯, পৃ. ৪

পালাগান বলা হয়ে থাকে।"[১৪] পালাগানের রূপ ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে, সে ব্যাপারে ড. আশরাফ সিদ্দিকীও সচেতন। তিনি মনে করেন, "পালাগান বলতে আগে যা বোঝানো হতো তা যাত্রারই কিছুটা সংস্কৃত রূপ। এতে কাহিনীর অংশ অতি অল্প, গানই বেশি।"[১৫] বাংলা পালাগানের এই বিবর্তন খুব বেশি দিনের নয়। তবে এই গীতি-আখ্যান শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্তর পেরিয়ে এসেছে। এই স্তর অতিক্রমণকালে গ্রহণ-বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যে তার নবায়নও ঘটেছে, সেই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই ড. মফিজুল ইসলাম বলেছেন, "সময়ের সাথে সাথে পালাগানের আঙ্গিকেও এসেছে পরিবর্তন। অনেক পরিচিত রূপকথা নিয়েও রচিত হয়েছে পালাগান। আঙ্গিকের দিক থেকে এগুলো না হয়েছে পালাগান না যাত্রা, না গীতিকা– এ এক নতুন ধরনের সৃষ্টি।"[১৬] ড. মফিজুল ইসলাম কিন্তু এই নতুন ধরনের সৃষ্টির কথা বললেও সেই সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত কোনো ধারণা দেননি বা বিশদভাবে তার কোনো আলোচনাও করেননি।

বাংলাদেশে এই পর্যন্ত বেশকিছু পালাগানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখনও হয়ত অনেক পালাগান রয়েছে যেগুলো সংগ্রহ করা হয়নি বা আমাদের গোচরে আসেনি। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার নানা জায়গায় ঘুরে যদি সব পালাগান সংগ্রহ ও প্রকাশ করা যায় তবে সংখ্যায়, বিষয়বৈচিত্র্যে ও সাহিত্যেগুণে– সেগুলি পাশ্চাত্য এবং ইংরেজি ব্যালাডকেও ছড়িয়ে যাবে। তবুও নানাজনের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত এইসব আখ্যানমূলক লোক-গীতিকাসমূহের মধ্যে যেসব গীতিকায় 'পালা' অভিধা প্রযুক্ত হয়েছে তার উল্লেখ করা অপ্রসাঙ্গিক নয় বলে মনে করি। ড. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় এবং শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সংকলিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় যে সমস্ত পালাগান সন্নিবেশিত হয়েছে তাদের মধ্যে– দস্যু কেনারামের পালা, মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা, কাজল-রেখার পালা, শ্যাম রায়ের পালা, কমলারাণীর পালা, সন্নমালার পালা, রাজা রঘুর পালা, দেওয়ান ঈশা খাঁর পালা, হরিণকুমার জিরালনী কন্যার পালা, পীর বাতাসী কন্যার পালা, আমিনা বিবি পালা, নছব মালুম পালা, কমল কন্যার পালা, ভেলুয়া সুন্দরী পালা, আমির সাধুর পালা, কমল সদাইগরের পালা, সখিনা বিবির পালা, পীরবানু বেগমের পালা– প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব পালার মধ্যে ধর্মীয় ভাবের চেয়ে নরনারীর প্রেম-প্রণয়োপাখ্যানই বেশি বাণীবদ্ধ হয়েছে।

ব্যালাড: ইউরোপীয় প্রেক্ষাপট

বাংলা পালাগানের প্রতিশব্দ হিসেবে ইংরেজি 'ব্যালাড' শব্দটি পণ্ডিতমহলে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অবশ্য আঙ্গিকগত দিক থেকে বাংলা পালাগান ও ইংরেজি ব্যালাডের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবুও প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষত বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটির সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের ব্যালাডের সামঞ্জস্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

---

১৪. মফিজুল ইসলাম (সম্পা.) *লোক সাহিত্য সংকলন-৪৬*, *রংপুরের পালাগান*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ক
১৫. আশরাফ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
১৬. মফিজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ক

শিক্ষিত সমাজে ব্যালাডের স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা যদিও বেশি দিনের নয়, তবুও তার উদ্ভব কিন্তু অর্বাচীনকালের বলে মেনে নেওয়া যায় না। যতটুকু জানা যায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পণ্ডিতেরা প্রথম ব্যালাডের অস্তিত্বের সন্ধান করতে পেরেছেন। অবশ্য সেই সময় তার প্রচার ও প্রসার তেমন ব্যাপক এবং জোরালো ছিল না। সেকালে ব্যালাডের সংখ্যাও ছিল অতি নগণ্য। তার পরবর্তী সময়ে, অর্থাৎ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের দিকে ইউরোপের কিছু দেশে ব্যালাডের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটতে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ডেনমার্কে এই ধারার সাহিত্য কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অবশ্য প্রাচীন সেই ব্যালাডের সঙ্গে পরবর্তী কালের ব্যালাডের মিল ছিল কম। প্রথম দিকে জার্মানিতে যেসব ব্যালাড রচিত হয়েছিল তার রচনাকাল চর্তুদশ শতাব্দীর শুরুতে। অন্যদিকে স্পেন দেশে ব্যালাডের প্রচলন হয় চতুর্দশ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। ফ্রান্সে তারও পরে, অর্থাৎ পঞ্চাদশ শতকের মধ্যভাগে ফরাসি ব্যালাডের সূত্রপাত হয়। অতএব বোঝা যাচ্ছে ব্যালাড খুব একটা প্রাচীন কালের সৃষ্টি নয়। মধ্যযুগের বেশ কিছু সময় পরে সাহিত্যের এই বিশেষ আঙ্গিকটির উদ্ভব ঘটেছে। সমগ্র ইউরোপের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে দুই-একটি ছাড়া আর কোনো ব্যালাডের সন্ধান পাওয়া যায় না। সমালোচক ম্যাথিউ হডগার্টের মতে, "Even if the earliest possible date, the 13th century be accepted for the whole of Europe, the ballad is still one of the later forms of medieval literature."[১৭] তবে তুলনামূলকভাবে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সময়কালকে সত্যিকার অর্থে ব্যালাড রচনার যথার্থ সূচনাপর্ব বলে অভিহিত করা যায়।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যে আখ্যানমূলক লোকগীতিকা ব্যালাড বলে অভিহিত করা হত। অবশ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই সাহিত্য-প্রকরণের নাম আলাদা হলেও ভাব ও আঙ্গিকের দিক থেকে যেমন সাদৃশ্য, তেমনি বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়ে বিশদ হতে গিয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন,

> সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়া সকল দিক দিয়াই যে ইহাদের ভাব ও অঙ্গগত ঐক্য আছে, তাহা নহে– কেবল মাত্র এই সকল বিষয় ইহাদের মধ্যে মিল দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন ইহা আখ্যানমূলক হয়, ইহা আবৃত্তি করিবার বদলে গীত হয় ও প্রকাশ-ভঙ্গির দিক দিয়া ইহার লৌকিক বৈশিষ্ট্য (folk character) অক্ষুণ্ণ থাকে, অর্থাৎ আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতে যে একটি বিশিষ্ট লৌকিক ছন্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহার ব্যতিক্রম করিয়া গীতিকা রচিত হয় না এবং জনশ্রুতিমূলক (tarditional) বিষয়ই ইহার ভিত্তি। ইহার মধ্যে রচয়িতার একটি আত্মনির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ পায়। একটি মাত্র ঘটনা ইহার লক্ষ্য, গীতি-সংলাপ ও ঘটনা-প্রবাহের ভিতর দিয়া ইহার কাহিনী শেষ পর্যন্ত দ্রুত সঞ্চারিত হইয়া যায়।[১৮]

ব্যালাডকে আমার যে নামেই অভিহিত করি না কেন, তার মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশের এই সাহিত্য প্রকরণে পাওয়া যায়। ব্যালাডে গানের মাধ্যমে কাহিনি পরিবেশিত হয়। এক্ষেত্রে মৌখিক ধারা অনুসরণ করা হয়। তাই ইউরোপীয় ব্যালাডের এই সব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ইংরেজি ব্যালাডেরও রূপগত এবং প্রকরণগত সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়।

---

১৭. M. J. C. Hodgart, *The Ballads*, London: Hutchinson University Library, 1950, P. 73
১৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

পাশ্চাত্য লোকসাহিত্য, পুরাণ ও ইতিকথার অভিধান-সম্পাদক মারিয়া লিচ তাঁর *Standard Dictionaly of Folklore, Mythology and Legend* নামক অভিধানের প্রথম খণ্ডে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যালাডের যে বিভিন্ন নাম রয়েছে, তার উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে আমরা জানতে পারি, রাশিয়ার ব্যালাড 'বাইলিনা' (bylina) নামে পরিচিত। বাইলিনার সঙ্গে বীরত্ব-গাথার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাইলিনায় নাটকীয়তা কম থাকে। বাস্তবতার সঙ্গে রাশিয়ার গীতিকার সংযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু নায়ক চরিত্রে গুরুত্ব আরোপের ফলে বাইলিনার নায়ক চরিত্রের মধ্যে মহাকাব্যের নায়কোচিত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। অন্যদিকে ইউক্রেনে ব্যালাডকে বলা হয় 'দুমি' (dumi)। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সেই দেশের ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে দুমি রচিত হয়ে থাকে। স্তবকে বিভক্ত দুমির সুর খুব সুন্দর হয়। গার্হস্থ্য প্রেম-পরিণয় এবং তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা, কুটিলতা, পরিণামে মৃত্যু– এমনই জীবনানুভূতির বাস্তব নানা বিষয়বস্তু নিয়ে দুমির চরিত্রগুলি অনেকাংশে নৈর্ব্যক্তিক। আবার ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা নিয়েও দুমি রচিত হতে দেখা গেছে।

স্পেন দেশে সুগঠিত বর্ণনাত্মক সঙ্গীত 'রোমান্সেরো' (romancero) বলে পরিচিত। ঐতিহ্যের অনুসারী স্পেনীয় ব্যালাডে একদিকে ঐতিহাসিক আবার অন্যদিকে অতিপ্রাকৃত ঘটনারও সন্নিবেশ দেখা যায়। প্রাচীন মহাকাব্যের কাহিনি নিয়ে রচিত স্পেনের ব্যালাডে সংঘাত ও বীরত্ব পাশাপাশি অবস্থান করে। আবার ডেনমার্কের ভিসে (vise) ইংরেজি ব্যালাডের সঙ্গে অনেকাংশেই সঙ্গতিপূর্ণ। বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ড্যানিস ব্যালাডে ঐতিহাসিক, অতিপ্রাকৃত, আবস্তব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম-প্রীতি ও হিংসা-ঘৃণার সমন্বয়ে বাস্তব ঘটনার বিচিত্র সমাহার চোখে পড়ে। ফরাসি দেশের 'পাস্তুরেলা' (pastourella) সত্যিকার অর্থে ব্যালাডধর্মী না হলেও ব্যালাডের সঙ্গে তার সাযূজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। জার্মানির ব্যালাডে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন চরিত্র ও অশরীরী আত্মার সাক্ষাৎ মেলে। তেমনিভাবে সাইবেরিয়ায় 'জুনাকা পেসম' (junacka pesme) নামে অভিহিত ব্যালাডে আজগুবি ও অবাস্তব বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা দেখা যায়।[১৯]

ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের সমস্ত ব্যালাডই মূলত ইংরেজি ব্যালাড। তাই ইংরেজি ব্যালাডের প্রাচুর্য অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে এই কথা স্বীকার করতেই হয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যালাডের বিভিন্ন নামের সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বরূপেরও কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। একই সঙ্গে ব্যালাডের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত সংযোগ ও বহিরঙ্গ পার্থক্যের বিষয়টি গ্রহণ করে নিয়ে মারিয়া লিচের সিদ্ধান্ত : "This type of folk-song varies considerably with time and place."[২০]

১৯. Maria Leach (ed.), *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*, Vol. I, New York: The Macmillan Company, 1949, p. 110
২০. Ibid.

ব্যালাড বা ইংরেজি পালাগান

ইংরেজি ব্যালাডও মূলত পাশ্চাত্য ব্যালাড। তবে ইউরোপের অন্যান্য দেশের ব্যালাডের চেয়ে তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। তাই ইংরেজি ব্যালাড নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা দরকার বলে মনে করি। ইংরেজি ব্যালাডের সংজ্ঞার্থ নিরুপণ করতে গিয়ে সমালোচক জেরাল্ড গর্ডন হল বলেছেন, "A ballad is a folk-song that tells a story with stress on the crucial situation, tells it by letting the action unfold itself in event and speech, and tells it objectively with little comments on instruction personal bias."[২১] জেরাল্ড প্রদত্ত এই সংজ্ঞার্থ থেকে ব্যালাডের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কয়েকটি সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ব্যালাডের মধ্যে লোকগীতির ভাব সবচেয়ে বেশি। তাতে একটি সঙ্কটময় কাহিনি থাকে। এই কাহিনি যথাযথভাবে অগ্রসর হবার জন্য ঘটনা ও সংলাপের আশ্রয় নিয়ে থাকে। লেখক বা কথকের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা কিংবা মতামত অথবা মন্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা সেখানে খুব বেশি থাকে না। এক্ষেত্রে গায়েন বা গায়ক কিংবা রচয়িতা সম্পূর্ণ আন্তনির্লিপ্ত হয়ে নৈর্বক্তিকভাবে কাহিনি উপস্থাপনে প্রয়াসী হন। ব্যালাডের মধ্যে ঘটনা বা কাহিনির সন্নিবেশ সম্বন্ধে অন্যান্য সমালোচকগণও সহমত পোষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'The World Book Encyclopedia'য় বলা হয়েছে–

> Ballad is a short poem that tells a story of some heroic deed, romance, event in history or legend. Ballad originated among the common people. No one knows who wrote them. Some poems imitate the popular ballad, and these are usually knows as literary ballads. Some of the songs sung by the minstrels of the Middle Ages were ballads... Originally, ballads were menat to be sung. They often contain a chorus or repeat certain lines as a re-frain. The typical ballad consists of stanzas which repeat regular pattern.[২২]

এখানেও পালাগানের সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে; অর্থাৎ, পালাগান হল এক ধরনের সঙ্গীত– যার মধ্য দিয়ে একটি গল্প উপস্থাপন করা হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে, গানকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে বলা গল্পই হচ্ছে পালাগান। আবার এ-ও বলা হয়েছে যে, পালাগান হচ্ছে গানের উপযোগী করে রচিত কবিতা, যার গঠন সরল এবং ছন্দও তেমনি সহজ সরল। পালাগান কয়েকটি স্তবকে বিভক্ত। গায়ক বা রচয়িতার কোনো ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি তাতে স্থান পায় না। রচয়িতার ব্যক্তিগত জীবন, জীবনবোধ, চিন্তাধারা– পালাগানে কোনোভাবেই রূপায়িত হতে পারে না। সেখানে কোনো একটা এলাকা ও তার লোকজন, এমনকি সমগ্র একটা দেশ বা জাতির সমবেত চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটতে পারে। পালাগানের গোষ্ঠী-চেতনার স্বরূপ সম্বন্ধে রবার্ট গ্রোভস বলেছেন, "The ballad proper is best understood not primarily as a narrative poem or as a song, but as a song and chorus evolved by the group mind which is more than the sum of the individual

---

২১. Gerould Gorden Hall, *The Ballad of Tradition*. Oxford: The Clarendon Press, 1932, p. 11
২২. *The World Book Encyclopedia*, vol. 2, Chicago: World Book, 2003, p. 35

mind that composes it, more than the conviction of the strongest or most active clique."[২৩] সমালোচক রবার্ট গ্রোভস এখানে বলতে চেয়েছেন যে, যথার্থ ব্যালাড শুধু বর্ণনাধর্মী গান বা কাব্যই নয়, বরং তা সঙ্গীত এবং সেই সঙ্গীত হচ্ছে সম্মিলিত সঙ্গীত। সেই সঙ্গীতে ব্যক্তিমনের নয়, বরং গোষ্ঠী-মানুষের মনোভাব ও অভিব্যক্তিই ব্যক্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোনো জোরালো বা শক্তিধর দলের বলিষ্ঠ ও দৃঢ় বিশ্বাসই নয়, তার চেয়েও বড় এবং ব্যাপক অর্থাৎ, সম্মিলিত মানুষের সার্বিক জীবন তাতে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে ফুটে ওঠে।

ব্যালাড সব সময়ই গাওয়া হয়, সচরাচর আবৃত্তি করা হয় না। ব্যালাড যেহেতু দীর্ঘ সঙ্গীত, সেহেতু তারসঙ্গে প্রায়শ দেশীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। তারফলে দেখা যায় ব্যালাডের সুরও হয় বেশ সহজ সরল। বর্ণনাপ্রধান গান বলে ব্যালাডে প্রচলিত রীতির জনপ্রিয় সুর সংযোজিত হয়। তবে ব্যালাডে সুর থাকলেও কাহিনিই তার মুখ্য অবলম্বন। সুরকে আমরা তার আশ্রয় বলতে পারি। ব্যালাডে সুরের প্রাধান্য অস্বীকার করে মারিয়া লিচ বলেছেন,

> A ballad is a story of the four elements common to all narratives, action, character, setting and theme- the ballad emphasizes the first. Setting is casual theme is often impied. Characters are usually types and even more individual and underdeveloped, but action carries the interest. The action is usualy highly dramatic.[২৪]

ব্যালাডের সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনায় প্রধান বিচার্য বিষয় হচ্ছে কাহিনি। অতএব সেদিক থেকে চিন্তা করলে ব্যালাড আখ্যায়িকা পদবাচ্য। আখ্যায়িকার একেবারে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে– ক্রিয়া, চরিত্র, পরিবেশ উপস্থাপনা এবং বিষয়বস্তু প্রধান। তবে ব্যালাডে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য বা গুরুত্ব লাভ করে তার action বা ক্রিয়া। সেইসঙ্গে আমরা দেখি ব্যালাডে কিছু চরিত্র থাকে। তবে সেগুলি সাধারণ শ্রেণির, প্রায়ই অপরিণত। নাটকের চরিত্রের মতো ব্যালাডের চরিত্র এত সুস্পষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত নয়। ব্যালাডের চরিত্রগুলো আদর্শায়িত এবং অধিকাংশ সময় একটি ছাঁচে গড়া। দুই-একটি চরিত্র সামান্য স্বাতন্ত্র্য লাভ করলেও পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হয় না। আবার পরিবেশের শিল্পসম্মত উপস্থাপনাও ব্যালাডে লক্ষণীয়। মোটকথা ব্যালাডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ বা কৌতূহল জাগ্রত করে ক্রিয়া বা action। এখানে ক্রিয়া উচ্চনাট্যগুণসম্পন্ন হয়ে থাকে। তার ফলে ঘটনার উত্থান পতন হয় চমকপ্রদ।

আমরা দেখেছি যে, বাংলা পালাগানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষত তার নামকরণ ও প্রকরণ নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। এখানে এই বিষয়ে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে ইংরেজি ব্যালাডের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় 'পালাগান' শব্দটির প্রচলন থাকলেও ব্যালাড আর পালাগানের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দুই-ই বিদ্যমান। এই বিষয়ে আলোকপাত করে ড. মযহারুল ইসলাম বলেছেন, "ইংরেজি ব্যালাডগুলোর প্রকৃতি আর বাংলা গীতিকার প্রকৃতি ঠিক এক নয়। ইংরেজি ব্যালাডে যেসব বৈশিষ্ট্য

---

২৩. Goves Robert, *The English Ballad*, London: Oxford University Press, 1927, p. 13
২৪. Maria Leach, Ibid., p.106

না হলে ব্যালাড পদবাচ্য হতে পারে না, বাংলা গীতিকায় হয়তো তা একেবারেই অনুপস্থিত। আবার বাংলা লোকগীতিকায় যে সমস্ত বিষয় প্রায় অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান, সে সব হয়ত ইংরেজী ব্যালাডে খুঁজতে যাওয়া বৃথা।”[২৫] তবুও আমরা বলতে পারি, বাংলা পালাগানের বিভিন্ন নাম বা প্রতিশব্দ থাকলেও পালাগানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ কিন্তু তাদের মধ্যে অক্ষুন্ন রয়েছে। বাংলা পালাগান মূলত মৌখিক ধারাটিকে আশ্রয় করে বিকশিত। বাংলা ভাষার জন্মলগ্ন থেকেই পালাগান তাকে অবলম্বন করে আছে। বাংলার লৌকিক পালাগান তাই বাংলা সাহিত্যেরও এক অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত।

পালাগানের প্রকারভেদ

ব্যালাড বা পালাগানের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করতে গিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক উইলিয়াম হেনরি হাডসন যে কথা বলেছেন, তার মধ্যেই পালাগানের বিভিন্নতার কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর মতে–

> Ballad is a short story in verse; a form which appears to have arisen spontaneously in almost all literatures, and represents one of the earliest stages in the evolution of the poetic art... Their themes are commonly furnished by the more elementary aspects of life; large space is given in them to tales of adventure, fighting, deeds of prowess and valour; they have frequently a strong infusion of supernaturalism, while love, harted, pity, and in the simpler interests of domestic lot, receive a full share of attention... In method and style they are characterised by straightforwardness and rapidity of narration and a certain childlike naivete action, often crude, they are often, too, astonishingly eneragetic, and while habitually garrulous in matters of detail, they seldom linger over description or concern themselves about motives and passions, save as these translate themselves immediately action. Many of these ballads have immense dramatic power and wonderful metrical beauty, and for this reason they must be assigned to a distinct place among the great imperishable things of our literature.[২৬]

অন্যভাবে বলা যায়, পালাগান হচ্ছে কাব্যাকারে পরিবেশিত ছোটগল্প। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালাগানের জন্ম হয়েছে। পালাগানের মধ্যে গায়েনের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি নয়, বরং তাঁর সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সৃষ্টিশীলতার অঙ্গ হিসেবে পালাগানের মধ্যে কাব্যগুণের সমাহার থাকা আবশ্যক। পৃথিবী এবং মানব-জীবনের যে-কোনো বিষয়কে অবলম্বন করেই পালাগান রচিত হতে পারে। তাই তার মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন. “গীতিকা বা ব্যালাডের সিংহভাগ অধিকার করে আছে প্রেম বা প্রণয়। তাই বলে অবিমিশ্র প্রেমকাহিনীই গীতিকাগুলির একমাত্র উপজীব্য নয়।”[২৭] অর্থাৎ, ড. চক্রবর্তী পালাগানের কাহিনির বিশালতা সম্বন্ধে সচেতন।

বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ ‘বাংলাপিডিয়া’য় পালাগানের সংজ্ঞার্থ এবং তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলা হয়েছে, “পালাগান প্রধানত পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যানভাগ নিয়ে রচিত। ... যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালাগানের আঙ্গিক ও বিষয়গত পরিবর্তন

২৫. মযহারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬
২৬. William Henry Hudson, *An Introduction to the Study of Literature*, London: George G. Harrap & Co. Ltd. 1963, p 104
২৭. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ. ৬৩

ঘটেছে। পৌরাণিক ও দেব-দেবীর কাহিনির পরিবর্তে বিভিন্ন সামাজিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘটনা নিয়েও পালাগান রচিত হয়েছে। ... অনেক বাস্তব ঘটনা নিয়েও প্রচুর পালাগীতি রচিত হয়েছে।"[২৮] এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বাংলা পালাগান বা গীতিকাগুলির শ্রেণিবিভাজন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে করা যেতে পারে। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে তিনটি বিভাগের কথা বলেছেন ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী। এইকথা অনস্বীকার্য যে ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীকৃত শ্রেণিবিভাগের মধ্যে একটা ব্যাপ্তি রয়েছে। সেক্ষেত্রে তিনি সমস্ত পালাগুলিই কোনো না কোনো ভাগে বা অংশে ফেলার পক্ষপাতী। তাই তাঁর মতে পালাগানগুলি বিভক্ত হতে পারে– বিষয়বস্তু অনুসারে, জনপ্রিয়তার নিরিখে এবং ভৌগলিক অঞ্চলভেদে।[২৯]

অন্যদিকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য আবার বাংলা গীতিকাগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন– "প্রথমতঃ নাথ-গীতিকা, দ্বিতীয়তঃ মৈমনসিংহ-গীতিকা ও তৃতীয়তঃ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা।"[৩০] আশুতোষ ভট্টাচার্য এই শ্রেণীবিভাজনের মধ্যে ধর্মীয় এবং অঞ্চলভিত্তিক পালাগানের স্বরূপ ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে তাঁর অভিমত যে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। বিশেষত, মৈমনসিংহ গীতিকা তো পূর্ববঙ্গ গীতিকারই আওতাভুক্ত। অবশ্য ড. ভট্টাচার্য স্বীকার করে নিয়েছেন যে, পূর্ববঙ্গ গীতিকার দুই-তৃতীয়াংশই মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত।[৩১] আবার বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য বাংলা পালাগান বা গাথাকাব্যকে মোট পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলি হচ্ছে– প্রণয় গাথা, ঐতিহাসিক বা ইতিহাস মিশ্রিত গাথা, ধর্মাশ্রিত গাথা, নীতিকথাশ্রিত গাথা এবং বারমাসী গাথা। ড. বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর আলোচনায় লোকগীতিকার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য আখ্যান কাব্য-কবিতা গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৩২]

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরকৃত ব্যালাডের, বিশেষত ইংরেজি ব্যালাডের বিষয়বস্তুর যে আধিক্য দেখা যায়, তাতে তাদের একটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা অনেক সময় সম্ভব নয়। তবুও সাহিত্যের সমালোচকগণ পাশ্চাত্য দেশের ব্যালাডগুলির একটি সাধারণভাবে গ্রাহ্য বিভাজন করেছেন। এই বিভক্তিকরণে বিষয়গত ব্যাপ্তির প্রতি একটা সুবিচারের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। সেক্ষেত্রে কোনো বিষয় বাদ দেবার সম্ভাবনা থাকে না। বিদেশি পণ্ডিতদের মধ্যে আমারা দেখি ম্যাথিউ হডগার্ট তাঁর *The Ballads* গ্রন্থে ব্যালাডের শ্রেণীবিভাগ করেছেন এইভাবে–

১। আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত ব্যালাড (Ballads belonging to the common stock of international folk-song)।

ক) ঐন্দ্রজালিক বিষয় সম্বলিত ব্যালাড (Ballads of magic)।

---

২৮. সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০
২৯. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩
৩০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১১
৩১. প্রাগুক্ত
৩২. বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য, *বাংলা গাথাকাব্য*, কলকাতা: মডার্ণ বুব এজেন্সী প্রাইভেট লিসিটেড, ১৯৬২, পৃ. ১৪

খ) প্রেমবিষয়ক ও বিয়োগান্তক বা বিষাদান্তক ব্যালাড (Romantic and tragic ballds)।

২। মধ্যযুগীয় চারণ-গীতিমূলক ব্যালাড (Ballads from the repertoire of late medidiaval minstrelsy)।

৩। জোতদার তালুকদার শ্রেণির মানুষদের নিয়ে রচিত চারণ-গীতিমূলক ব্যালাড (Ballads of yeoman minstrelsy)।

৪। ঐতিহাসিক ব্যালাড (Historical ballads)।

ক) সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক, তথা জাতীয় ঘটনা অবলম্বনে ইতিহাসাশ্রিত ব্যালাড (Fully historical, dealing with real national events)।

খ) অর্ধ-ঐতিহাসিক অর্থাৎ কম গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থানীয় ঘটনা অবলম্বনে ইতিহাসকল্পধর্মী ব্যালাড (Semi-historical, dealing more vaguely with minor and local events)।

৫। ব্যাঙ্গাত্মক ব্যালাড (Comic ballads)।[৩৩]

আচার্য ম্যাথিউ জন কাল্ডওয়েল হডগার্টকৃত গীতিকার প্রধান বিভাগ ও উপবিভাগ করে আলোচনার একটি বিশেষ সুবিধা আছে। এক্ষেত্রে ব্যালাডের ব্যাপ্তির প্রতি সুবিচার করা যায়। এখানে কোনো বিষয়কেই বাদ দেওয়ার প্রশ্ন আসে না। অবশ্য এই বিভাজনের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক মানসিকতা কাজ করে। পৃথিবীর যে-কোনো দেশের ব্যালাডই এই বিভাগের আওতায় পড়ে বলে মনে হয়। তার ফলে আমরা ব্যালাডের বহুমুখী সম্ভাবনাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারি।

অন্যদিকে জর্জ ক্লিন্টন ডেন্সমোর ওডেল সাধারণভাবে পালাগান বা ব্যালাডের চারটি বিভাগ উল্লেখ করে আলোচনা করেছেন–

১। ঐতিহাসিক ব্যালাড (Historical Ballads),

২। প্রেম-ভালবাসা বিষয়ক ব্যালাড (Ballads of the Affections),

৩। সংস্কারাবদ্ধ ব্যালাড (Ballads of the Superstitions),

৪। হাস্যরসাত্মক ব্যালাড (Humorous Ballads)।[৩৪]

ওডেলকৃত বিভাগগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক ব্যালাডে জাতীয় জীবনের নানা বিষয়ভিত্তিক ব্যালাড থাকলেও যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কিত ব্যালাডই বিবেচিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে প্রেম-ভালবাসা পর্যায়ের ব্যালাডগুলির মধ্যে রয়েছে মানব হৃদয়ের প্রেম-বিরহ ও আনন্দ-বেদনার সাঙ্গীতিক ও সাহিত্যিক প্রকাশ। আবার অলৌকিক ঘটনা এবং অশরীরী আত্মার বিমূর্ত প্রকাশ ঘটেছে সংস্কারাবদ্ধ ব্যালাডে। আর হাস্যরসাত্মক ব্যালাডের মধ্যে স্থান পেয়েছে রাজনৈতিক বিপর্যয় ও তজ্জনিত নীচতা এবং মানুষের ছল-চাতুরীর এক জীবন্ত আলেখ্য।

৩৩. M. J. C. Hodgart, Ibid., p.14
৩৪. George Clinton Densmore Odell, *Simile and Metaphor in the English and Schottish Ballads*, United States: Hardpress Publishing, 2012, p.9

ইংরেজি ব্যালাড ও বাংলা পালাগানের সার্বিক দিক এবং বিষয়বস্তু বিচার-বিবেচনা করে ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী আধুনিক কালে গীতিকা বা পালাগানকে মোট চৌদ্দটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, সেগুলো হচ্ছে–

১। অলৌকিক কাহিনিকেন্দ্রিক পালাগান বা supernatural ballads,

২। ধর্মীয় পালাগান বা religious ballads,

৩। রোমান্টিক বিয়োগান্তক পালাগান বা ballads of romantic tragedies,

৪। প্রেমকেন্দ্রিক পালাগান বা ballads of love and sentiments,

৫। রাখালিয়া পালাগান বা pastoral ballads,

৬। গৃহবিবাদ-সম্পর্কিত পালাগান বা ballads of dramatic tragedies,

৭। ঐতিহাসিক পালাগান বা historical ballads,

৮। অর্ধ-ঐতিহাসিক পালাগান বা semi-historical ballads,

৯। অপমৃত্যু ও বিপদ-বিষয়ক পালাগান বা ballads of accidental and diasters,

১০। দস্যুবৃত্তি-বিষয়ক পালাগান বা ballads of outlaws or pirates,

১১। আঞ্চলিক গীতিকাধর্মী পালাগান বা regional ballads,

১২। লোকনায়ক-বিষয়ক পালাগান বা ballads of folk-heroes,

১৩। ধাঁধাকেন্দ্রিক পালাগান বা ballads of riddles,

১৪। হাস্যকাহিনি-নির্ভর পালাগান বা humorous ballads।[৩৫]

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী পালাগানের এই শ্রেণিবিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ও বাংলা পালাগানের কিছু উদাহরণও তুলে ধরেছেন।[৩৬] এখানে আমরা খেয়াল করি, পালাগানের যে-কোনো বিষয়বস্তু এই বিভাগের মধ্যেকার কোনো একটিতে পড়তে বাধ্য। তাঁর বিভাগ নির্ণয়ের মধ্যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ছাড়াও পৃথিবীর যে-কোনো দেশ বা প্রদেশের ব্যালাড স্থান পাবার যোগ্য। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ড. বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য এবং ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী– উভয়েই ধর্মাশ্রিত গাথা বা ধর্মীয় গীতিকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। অথচ আমরা খেয়াল করি যে, পূর্ববঙ্গের সমস্ত পালাগান পর্যালোচনা করেও এ পর্যন্ত কোনো সমালোচকই নাথ গীতিকা ছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় পালাগানের কথা উল্লেখ করেননি।

---

৩৫. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

ভাবতে অবাক লাগে যে, ধর্মপ্রাণ বাঙালি তার চিন্তা-চেতনার গভীরে ধর্মবোধকে এত শ্রদ্ধা ও যত্নে লালিত করার পরও পালাগান রচনার বেলায় এক আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করেছেন। পালাগানের সূতিকাগার এই বাংলাদেশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গের পালাগানে ধর্মীয় ভাব ও বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেনি বললেই চলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন দেবদেবী-কেন্দ্রিক পালাগানের প্রচলন দেখা যায়। তবে এইসব দেবদেবী মূলত লৌকিক দেবদেবী। তাই সেইসব লৌকিক দেবদেবী উল্লিখিত অঞ্চলের বিশেষত্বকে পরিস্ফুট করে এবং একইসঙ্গে লৌকিক দেবদেবীনির্ভর পালাগানগুলি মানুষের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় দিকগুলো অকপটে উদঘাটন করে। সম্প্রতি এক ক্ষেত্র-গবেষণার ভিত্তিতে ড. দেবব্রত নস্কর পশ্চিমবঙ্গের শুধু চব্বিশ পরগণা জেলায় প্রচলিত চার শ্রেণির পালাগানের সন্ধান দিয়েছেন। সেগুলি হচ্ছে– দেবীপালা, দেবপালা, বিবি পালা এবং পীর ও গাজীপালা।[৩৭]

তবে বাংলাদেশে প্রচলিত পালাগানের মধ্যে লোকাশ্রিত বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী লোককবিদের মধ্যে ধর্মীয় উপাদান ঘিরে পালাগান রচনার প্রয়াস দেখা যায়। খ্রিষ্টীয় ভাব ও বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত এইসব পালাগানের প্রচলন খ্রিষ্টানদের মধ্যে এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বাংলাদেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে তার ব্যাপ্তি ঘটেনি বলেই সেগুলো এখনও অনেকের কাছেই অজানা রয়ে গেছে। এই গবেষণায় সেই অজানা দিকটাই তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

---

৩৭. দেবব্রত নস্কর, *চব্বিশ পরগণার দেবদেবী পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ. ২৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় রচিত পালাগান

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ববঙ্গে অধুনা বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারকালে যিশু-খ্রিষ্টের পুণ্যজীবন এবং কতিপয় খ্রিষ্টসাধক ও সাধিকাকে কেন্দ্র পালাগান রচিত হতে দেখা যায়। ঢাকা জেলার ভাওয়াল এলাকায় প্রচলিত যিশু-খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ, ক্রুশ বহন, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে কেন্দ্র করে রচিত 'যিশুর কষ্টভোগের পালা' এবং পঞ্চদশ শতকের প্রখ্যাত খ্রিষ্টসাধিকা সাধ্বী আগ্নেশের জীবনী ভিত্তিক 'সাধ্বী আগ্নেশের পালা', খ্রিষ্টীয় সমাজে সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং পরিবেশিত পালাগান। আবার দক্ষিণবঙ্গের বরিশাল এলাকায় বিপুল প্রচলিত 'রামুর পালা' বিষয়বস্তুর হৃদয়গ্রাহিতায় এবং উপস্থাপনের প্রাণবন্ততায় একটা স্বকীয় মর্যাদা লাভ করেছে। তবে বাংলাদেশের সর্বত্র খ্রিষ্টসমাজে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রচলিত পালাগান হচ্ছে ইতালির পাদুয়া নগরীর খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়োর জীবনচরিতকে আশ্রয় করে রচিত 'সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান' বা 'ঠাকুরের গীত'। এইসব পালাগানে যিশুখ্রিষ্টের জন্ম, যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান এবং মহিয়সী আগ্নেশ ও পরমপুরুষ আন্তোনিয়োর অলৌকিক কর্মজীবন অসামান্য কথা ও সুললিত সুরের মেলবন্ধন শুধু খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভক্তচিত্তেই ধর্ম ও ভক্তিভাবের উদ্রেক করেনি, বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঢাকার ভাওয়াল এলাকার সব মানুষের মনে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

সাধ্বী আগ্নেশের পালা

যিশু-খ্রিষ্টের মা কুমারী মারিয়ার সঙ্গে যে সাত জন প্রধান নারী কাথলিক ধর্মপঞ্জিকার উপাসনায় স্মরণ করা হয় তাদের মধ্যে সাধ্বী আগ্নেশ অন্যতম। তিনি ২৯১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রোমের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। রোমে প্রথমদিকের খ্রিষ্টানদের জন্য অনুপ্রেরণাদানকারী এক কিশোরী। সেই সময়ে রোমের নতুন খ্রিষ্টানদের উপর অত্যাচার চলছিল। তাঁর জীবন ঘিরে নানা কিংবদন্তি কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। সেগুলোর সবই যে সত্য সেটা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে তাঁর শহীদ মৃত্যু বরণের কাহিনি ঐতিহাসিকভাবে সত্য। ৩০৪ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি রোমসম্রাট ডায়োক্লেশিয়াসের আমলে মাত্র তেরো বছর বয়সে নিজের শারীরিক শুচিতা রক্ষার জন্য শহিদ মৃত্যু বরণ করেন। কথিত আছে যে, সুন্দর ও সুশ্রী চেহাহার জন্য অনেক যুবকই তাঁর প্রণয়প্রার্থী ও পাণিপ্রার্থী ছিল। তিনি সবার প্রেম উপেক্ষা করে যিশুর প্রেমে জীবন নিবেদন করার ব্রত গ্রহণ করেন। দেহমনের শুচিতা রক্ষার জন্য আজীবন কুমারী থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক প্রণয়প্রার্থী প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রশাসকের কাছে তাঁর খ্রিষ্টবিশ্বাসের ব্যাপারে নালিশ জানায়। সেই সময় রোমে খ্রিষ্টধর্ম নিষিদ্ধ থাকার ফলে প্রশাসক সেম্প্রোনিউস তাঁকে দণ্ডিত করেন। তাঁকে যারা শারীরিকভাবে অবমাননা করেছিল তারা সবাই অন্ধ হয়ে যায়। এমনকি তাঁর প্রণয়প্রার্থী প্রশাসকের ছেলেরও মৃত্যু হয়। সাধ্বী আগ্নেশ প্রার্থনা করে তাকে জীবিত করে তোলেন। তবুও তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে পুড়িয়ে মারার

আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যভাবে কাঠে আগুন ধরেনি বলে এক জল্লাদ তলোয়ার দিয়ে তাঁর শিরোশ্ছেদ করে। আজও পৃথিবীর কাথলিক অধ্যুষিত বিভিন্ন দেশে সাধ্বী আগ্নেশের পর্বদিনের আগের সন্ধ্যায় (২০ জানুয়ারি) কুমারী মেয়েরা ব্রত পালন করে যাতে তারা ভাল স্বামী পায়। এই প্রচলিত রীতিকে কবি জন কীট্স তাঁর The Eve of Saint Agnes নামক বিখ্যাত কবিতায় অমরতা দিয়েছেন। সেই কাহিনিকে উপলক্ষ করে বাংলাদেশেও খ্রিষ্টান গীতিকবিগণ পালাগান রচনা করেছেন।

সাধ্বী আগ্নেশের পালার পাঁচটি পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি। সেগুলোর মধ্যে চারটি খাতার উপরে নামকরণ রয়েছে 'সাধ্বী আগ্নেশের পালা'। তবে নাটোর জেলার বোর্ণী খ্রিষ্টানপল্লীর অধিবাসী আগস্টিন রোজারিওর কাছে একটি খাতা আছে। সেই খাতার উপর লেখা রয়েছে 'সাধ্বী আগ্নেশের নাটিকা'। আবার একই খাতার ভেতরের পাতায় লেখা– 'লীলা সঙ্গীত– সিদ্ধা আগ্নেশের নাটিকা'। তবে কি ঢাকা, কি নাটোর– সব জায়গায় এই রচনা 'সাধ্বী আগ্নেশের পালা' বলেই সমধিক পরিচিত। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নাটোর জেলার বনপাড়া খ্রিষ্টান ধর্মপল্লীতে আমি প্রথম এই পালা-নাটক পরিবেশিত হতে দেখেছি। সেখানে তখন ছাতিয়ান গাছা গ্রামের জের্ভাস রোজারিও খ্রিষ্টধর্মের যাজকপদে অভিষিক্ত হবার উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের দ্বিতীয় দিন এই পালা পরিবেশিত হয়। সেখানকার বাহিমালি ও ছাতিয়ানগাছা– এই দুই গ্রামের অধিবাসীদের যৌথ প্রচেষ্টায় সন্ধ্যারাতে পালা শুরু হয়, আর শেষ হয় মধ্যরাতে। তখনও নাটক বা পালায় নারীদের অভিনয় করতে দেখা যেত না। তাই সেখানে সব অভিনেতা ও কলাকুশীলবগণ ছিলেন পুরুষ। সাধ্বী আগ্নেশের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ছাতিয়ানগাছা গ্রামের আব্রাহাম ডি'ক্রুজ। তাঁর নারীসুলভ সংলাপ, গান ও অভিনয় আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

সাধ্বী আগ্নেশের পালা হচ্ছে গীতিনাটক। সেটা সচরাচর মঞ্চে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। সেখানেও আমরা সাধারণ পালাগানের মতোই শুরুতে বন্দনা গাইতে শুনি। তবে অন্যান্য পালাগানের মতো এখানে বন্দনায় পরমেশ্বর, স্বর্গদূত, কুমারী মারিয়া, গুরুজন, ওস্তাদ বা সভাজনের বন্দনা পরিলক্ষিত হয় না। সেখানে সরাসরি যিশুর বন্দনা গীত হয়– "ঈশ্বর নন্দন যীশু, ভজ দিন যায়,/ বিষয় বিশ্বে ভুল না মন, তারে চিনে লও নিশ্চয়।"[৩৮] বন্দনার মধ্যে যিশুনাম ভজনা না করলে নিদানকালে সমূহ বিপদে পড়ার সম্ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে আমরা আদর্শায়িত খ্রিষ্টীয় জীবনেরও একটা ইঙ্গিত পাই এই বন্দনায়। সেখানে বলা হয়েছে– "হিংসা নিন্দা মিথ্যা ত্যাজ, ভজরে মন যীশু ভজ।" শুধু তা-ই নয়, ভক্ত-শ্রোতার প্রতি পালাকারের আহ্বান– "যীশু ভজ কথা শুন, কুচিন্তা কর বর্জন,/ বাজাইয়া নামের ভেরী ষড়রিপু কর বিসর্জন।"[৩৯]

পালানাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখি আগ্নেশের মাতা তার পিতার কাছে আগ্নেশের বিবাহেচ্ছুক পাত্রদের পীড়াপীড়ির পরও যে তিনি বিয়ে করতে চান না– সেই ব্যাপারে তাঁর উৎকণ্ঠার কথা জানান। কিন্তু মেয়ে যে এখনও বিয়ের বয়সে

৩৮. *লীলা সঙ্গীত– সিদ্ধা আগ্নেশের নাটিকা*, পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১
৩৯. প্রগুক্ত

উপনীত হয়নি, সেই কথাটাই পিতা জোর দিয়ে বলেন। তিনি জানেন, "আগ্নেশের অসীম রূপ হল গো প্রাণের টান,/ মানবচক্ষে কন্টক হয়ে হারাল জীবন।"[৪০] পালায় পদকর্তার গানে এই কথাটা সত্য যে, আগ্নেশের প্রণয়ীরা তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে নয়, বরং "মোহিত হয়ে তার ভুবনমোহিনী রূপে" তাকে বিয়ে করতে চায়। আগ্নেশের বাবা-মা কন্যার কুমারী থাকার পক্ষে সম্মত নন, তাই পালায় বর্ণিত 'জনৈকা বৃদ্ধা' তাকে সহায়তা করতে প্রস্তুত। তাঁরই কাছে আগ্নেশ তার জীবনমন যিশুকে সমর্পণের সত্যটি প্রকাশ করেন–

> জীবন যৌবন সঁপিয়াছি আমি, হব যীশুর নামে সন্ন্যাসিনী,
> হৃদয় আসন পেতে রাখব তার তরেতে, পুষ্প হারে পূজব আজীবন।[৪১]

দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা দেখি 'প্রার্থনার মন্দিরে আগ্নেশ ধ্যানে মগ্ন'। সে তার অন্তরের ঠাকুরকে বলছেন, "হে দয়াময় যীশু, আমার জীবন যৌবন,/ সকলি তোমার শ্রীপাদপদ্মে করি সমর্পণ।"[৪২] তারপর সখীর সঙ্গে কথোপকথনে আগ্নেশ জানান তাঁর পড়াশুনায় কোনো আগ্রহ নেই। তিনি 'ধর্মকর্ম' নিয়ে জীবন কাটাতে চান। তাঁর মিনতি– "জ্বালাতন আর করিস না লো অই প্রিয় সখি,/ যীশুর প্রেম পাবার আশে ঝরে মোর আঁখি।"[৪৩]

তৃতীয় দৃশ্যে বিচারপতি সিম্প্রোনিউসের পুত্র প্রকবিন ও তার বন্ধু বিবাহের আলোচনায় ব্যস্ত। সেখানে শোনা যায় বিচারকের পুত্র "সুশীলা, সুশিক্ষিতা, পরমা সুন্দরী, সুলক্ষণা ও সর্ব গুণান্বিতা কন্যা"[৪৪] খুঁজছে। প্রকবিনকে তার বন্ধু খ্রিষ্টানকন্যা আগ্নেশের রূপগুণের কথা বলে। সে খ্রিষ্টধর্ম সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তার পরের দৃশ্যে আমরা দেখি আগ্নেশের স্কুল থেকে ফেরার পথে প্রকবিন ও তার বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে তাঁকে দেখার অপেক্ষায়। একদিকে আগ্নেশ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চান এবং সখিকে অনায়াসে বলেন,

> চল গো সখী চল স্বভবনে,
> আমার মাতৃদেবী চিন্তায় আছে আমার বিহনে।[৪৫]

এদিকে বিচারকপুত্র প্রকবিনের লাম্পট্য ধরা পড়ে সেই সময়। সে দিশেহারা হয়ে যায় আগ্নেশের রূপে। সে অনায়াসে বলতে পারে "কি সুলক্ষণে হেরিয়ে এ বালিকার পরিনু রূপের ফাঁদে"।[৪৬] তবে তখন তার রূপ বর্ণনায় লোককবি যেন বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

---

৪০. প্রাগুক্ত
৪১. প্রাগুক্ত
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৪৬. প্রাগুক্ত

পালাগানে আগ্নেশ চরিত্রটি আদর্শায়িত করার চেষ্টা আছে। সত্যিকথা বলতে এসব পালাগান রচিত হয়েছিল মূলত ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। অন্য ধর্মের তুলনায় খ্রিষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের অভিলাষ এখানে স্পষ্ট ধরা পড়ে। বঙ্গসাহিত্যের প্রথমদিকের গদ্য রচনায়ও এই উদ্দেশ্য লক্ষণীয়। দোম আন্তনিয়োর 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'ই হোক আর হ্যানা ক্যাথেরিন মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার উপাখ্যান'ই হোক– খ্রিষ্টধর্মের মহত্ত ঘোষণা করার লোভ কেউ-ই সম্বরণ করতে পারেন না। আগ্নেশের পালায় আমরা পাই, রোমীয় বিচারপতির পুত্র প্রকবিন তার বন্ধুকে বলছে– "বন্ধু আমরা তো রোমীয় দেবদেবীর উপাসক। বহু কালাবধি আমাদের পূর্বপুরুষগণ সেই সব দেবদেবীর পূজা করে আসছেন। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মটা যে কেমন তাহা জানার জন্য চেষ্টা করেনি, সে বিষয়ে আপনি কিছু জানেন?"[৪৭] উত্তরে বন্ধু বলে– "ঐ ধর্মটা নাকি বড়ই পবিত্র ও বহু নিগূঢ়তত্ত্বে পরিপূর্ণ আছে। সেই ধর্মের সাহায্যে বহু অলৌকিক কার্য সাধিত হইতেছে।"[৪৮] তার কথা শুনে প্রকবিন সহজেই বলে– "তাহলে দেখা যায় ঐ ধর্মই ঈশ্বরের প্রভাবে পূর্ণতা আছে। তাই দিন দিন মানবগণ খ্রীষ্টান ধর্মে যোগদান করছে।"[৪৯]

একইভাবে স্বর্গদূতের হাতে পুত্রহত্যার খবর পেয়ে বিচারপতি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "এখন জানতে পারলুম যে, ঈশ্বর ইহার প্রতি সহায়, ঈশ্বর ইহার রক্ষাকর্তা, নইলে এরূপ ঘটনা ঘটবে কেন?"[৫০] তাঁর অনুচরও কথায় সায় দিয়ে বলে– "আজ্ঞে মহাশয়, খ্রীষ্টানদের মধ্যে এরূপ অলৌকিক কাজ সর্বদাই ঘটে থাকে।"[৫১] শেষ পর্যন্ত বিচারপতিও খ্রিষ্টধর্মের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন। আর বিধর্মী পৌত্তলিকের মুখে উচ্চারিত 'বড়ই পবিত্র' খ্রিষ্টধর্মকে মহৎ করে দেখানোর প্রচেষ্টা থেকেই পালাগানে আমরা দেখি সাধ্বী আগ্নেশ সমস্ত নীচতার উর্ধ্বে উঠে শত সমস্যার মধ্যেও কাউকে তিরষ্কার করে না। ইতিমধ্যে আগ্নেশের প্রণয়ী প্রকবিন প্রত্যাখ্যাত হবার পর কঠিন রূপ ধারণ করলেও তার নামে সখীদের কাছে কোনো কটুকথা শুনতে সে নারাজ। সে বলে– "মিছে কেন জ্বালাস সখি পরনিন্দা করে/ যাহার যেমন অভিরুচি তাহাই তিনি করে।"[৫২] তারপরই তাঁর মধ্যে খ্রিষ্টধর্মেও মাহাত্ম্য তুলে ধরে ধর্মপ্রচারের প্রচেষ্টা দেখি–

> পরনিন্দা করিস না, ধর্মে তাহা করে মানা,
> সখি রে তুই পরনিন্দা করে রসনা কলুষিত করিস না।[৫৩]

খ্রিষ্টধর্মের দয়ামায়া ও ক্ষমার দিকটা তুলে ধরার জন্য সাধ্বী আগ্নেশ তার সতীত্ব নষ্ট করার প্রয়াসী প্রকবিনকে তার পিতার অনুরোধে বাঁচিয়ে তুলতে তৎপর। সে তার পরম পিতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলে– " হে করুণাসিন্ধু বিপদবন্ধু, এই

৪৭. প্রাগুক্ত
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৪৯. প্রাগুক্ত
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৫২. প্রাগুক্ত
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

অজ্ঞানদিগকে তোমার মহিমা দেখাও। তাহাদিগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। এদেরকে ক্ষমা কর। এরা কি করছে তাহা জানে না। এ যুবককে পুনর্জীবিত কর। তোমার কৃপা দান কর।"[৫৪]

আগ্নেশ চরিত্রটি কাথলিক বিশ্বাসে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী হয়ে ধর্মকর্মে জীবন সমর্পণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। যেসব পরিবারের ছেলে-মেয়েরা ধর্মপথে যায়, সমাজে ও মণ্ডলীতে তাদের আলাদা সম্মান দেওয়া হয়। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে অনেক পিতামাতা ও গুরুজনই তাঁদের সন্তানদের এই যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে যাবার জন্য অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেন। পালার আমরা প্রথম দৃশ্যে দেখি আগ্নেশের প্রতিবেশী বৃদ্ধা তার মায়ের কাছে অনুযোগ করে বলছে, "বাগদান করো না! সাবধান করছি, কারণ আগ্নেশ স্বয়ং আমার কাছে প্রকাশ করেছে যে, সে কখনও বিবাহ করবে না। সে প্রভু যীশুর নামে জীবন উৎসর্গ করবে।"[৫৫] তারপরই সেই বৃদ্ধা আগ্নেশকে জিজ্ঞাসা করে– "তোমার বিষয় নিয়ে আমি তোমার জনক জননীর সঙ্গে আলাপ করেছি। তুমি ব্রতধারিণী হবে কি?"[৫৬] আগ্নেশ তখন উত্তর দেয়– "আজ্ঞে তা হব, আমি প্রভু যীশুর নামে ব্রত ধারণ করব"।[৫৭] এদিকে তার বাবা-মাও এই সিদ্ধান্তে খুশিই হন। তার পিতা খুব সহজেই বলেন– "প্রিয় কন্যে, অদ্য হতে তোমাকে আমরা ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করলেম।"[৫৮] পরবর্তী কালে আগ্নেশের পাণিপ্রার্থী প্রকবিন তার পিতার সঙ্গে দেখা করতে এলেও তিনি একই কথা আরও জোর দিয়ে বলেন– "কন্যার বিবাহের বাগ্‌দান করা আমার পক্ষে বড়ই অসাধ্য, কারণ মেয়েটি যে খ্রীষ্টের নামে চিরকৌমার্য ব্রত ধারণ করেছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দেওয়া আমার উচিত নয়।"[৫৯]

বিবাহিত জীবনের উপযোগিতা সাধ্বী আগ্নেশের পালাগানের মধ্যে অস্বীকার করা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য তুলে ধরতে আগ্নেশের মাকে সান্ত্বনা দিতে সন্তানের মুখ দিয়ে পদকর্তা উচ্চারণ করেন– "এ জগত তো শুধু প্রবাস স্থান, নিজ বাটিতে তো একদিন যেতেই হবে। সেখানে আমাদের মিলন হবে। তখন আমরা অনন্ত সুখ ভোগ করব।"[৬০] আর সেই বিশ্বাস থেকেই আগ্নেশ বলে– "থাকবে না থাকবে না গো, কারও জীবন থাকবে না ভবে,/ একদিন ধরা ছেড়ে যেতে হবে, ইহধামে আর কয়দিন রবে ?[৬১]

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৫৬. প্রাগুক্ত
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৬০. প্রাগুক্ত
৬১. প্রাগুক্ত

তার কথার প্রতিধ্বনি করে আগ্নেশের বাবাও বলেন, "এই জগতের সুখ ভোগ সকলই শুধু অসারের অসার, কেবল প্রভুই সার। খ্রীষ্টকে পেলে আর কোনো দুঃখই থাকে না মা।"[৬২]

আমরা জানি, বাংলা যাত্রাপালা ও নাটকে বিবেকের ভূমিকা থাকে। আগ্নেশের পালায়ও আমরা বিবেকের ভূমিকায় 'জনৈক পাগলের উপস্থিতি' দেখতে পাই। এই পৃথিবীতে যে এক অদ্ভূত খেলা চলছে সেই কথাটা বোঝাবার জন্যই এই পাগলের অবতারণা। তার মুখে আমরা অনিত্য সংসারের প্রেক্ষাপট জানতে পারি। সে বলে–

ভালবাসা ভবের আশা, ও তোর কার কয়দিন রবে ভবে,
ছোট ছেলে দুধের পিপাসা, দুধ দিয়ে মিটাবে আশা;
ও তোর সেই ছেলেটি দু'দিন পরে চক্ষে আঙ্গুল দিবে ভবে।[৬৩]

এই বিবেক বা পাগল সহজিয়া সাধনপন্থীদের মতোই নিজেকে জানলে যে পরমের সন্ধান পাওয়া যায়, এই বিশ্বের সব কিছু, সব মানুষ– জানা যায় সেই কথাটি বলতে চায়। পালায় আমরা পাগলের মুখে শুনি– "আপন জনম চিন না রে, আপন বল কারে ভবে,/ হৃদিপটে কপাট খোল, আপন দেখতে পাবে ভবে।"[৬৪] নিজেকে জানার মধ্যে দিয়েই তাঁকে জানা যায়, পরমকে জানা যায়। অতএব সেই আকাঙ্ক্ষাটাই যাতে মানুষের সবচেয়ে বড় হয় এবং জাগতিক সুখ ভোগ আর বিত্তবৈভবের পেছনে ছুটে মানুষ যেন শুধু ইন্দ্রিয়াসক্তিকে প্রাধান্য না দেয়; সেই আহ্বানও শুনি পাগলের মুখে–

এই দুনিয়া গোলাক-ধাঁধাঁ ভাই মায়া বাঁধে এ সংসার,
এ দেহ তোর আপন নয়রে শিয়াল কুকুরে করবে সংহার।
মুদিলে আঁখি সবই ফাঁকি ভেবে দেখ মন কেবা কার,
এ দেহ তোর হবে মাটি শিয়াল কুকুরে করবে সংহার।[৬৫]

এই পৃথিবীর মানুষ হয়ত কারও ধর্মের উপর কিংবা ধর্মবোধের উপর আঘাত হানতে পারে, কিন্তু সত্যিকার ভাবে কোনো ধর্মকে ধ্বংস করতে পারে না, সেই কথাটিও পাগল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। তার কণ্ঠে আমরা শুনি– "লাগলি তোরা দল বেঁধে (করতে) খ্রীষ্টধর্মের সর্বনাশ,/ পারবি না রে কিছু করতে আছেন মোদের খ্রীষ্টরাজ।"[৬৬]

আমরা জানি সচরাচর পালা বা নাটকের বিবেক জাতীয় চরিত্র কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা বিশ্বাসের অধীন নয়, কিন্তু আগ্নেশের পালাগানের এই পাগল যেন খ্রিষ্টবিশ্বাসেরই ধারক ও বাহক। তার মাধ্যমে পালাকার নিজের ধর্মবিশ্বাস ও আদর্শকে প্রতিফলিত করেন। ধর্মপ্রচারের মনোবাসনা খ্রিষ্টীয় প্রতিটি পালাগানের মধ্যেই কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। সত্যি কথা হল, খ্রিষ্টধর্মকে এই দেশের মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্য করার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা থেকেই এই সব পালাগান রচিত হয়েছে। বাংলাদেশে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জীবনাচরণ দেখে বলতে পারি তাঁদের সেই চেষ্টায় তাঁরা অনেকাংশেই সফল।

---

৬২. প্রাগুক্ত
৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫

যিশুর কষ্টভোগের পালা

যিশু-খ্রিষ্টের যন্ত্রণাময় মৃত্যুবরণ ও গৌরবময় পুনরুত্থান সাধনের বিশ্বাসটিই খ্রিষ্টধর্মের ভিত্তি। এই ধর্মীয় কাহিনিকে সাঙ্গীতিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপনের লক্ষেই যিশুর কষ্টভোগের পালাগান বিরচিত। কষ্টভোগের পালাগানকে অনেক জায়গায় শুধুমাত্র 'কষ্টের গীত' নামে অভিহিত করা হয়। এই পালা নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঘটনাক্রমে তিনটি পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়েছি। তার মধ্যে একটি হাতে লেখা। হস্তাক্ষরের খাতাটি নাটোর জেলার বোর্ণী মারিয়াবাদ খ্রিষ্টধর্মপল্লী থেকে প্রাপ্ত। অন্যদিকে নাটোর জেলারই ভবানীপুর গ্রামের 'গায়ক দল' প্রচারিত ও প্রকাশিত কম্পিউটারে ছাপা 'কষ্টের গানের বই' নতুন আঙ্গিকে মুদ্রিত হয় ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে। পুরাতন আঙ্গিকটির প্রসঙ্গে তেমন কিছু জানা যায় না। শুনেছি সেটা টাইপরাইটারে লেখা ছিল এবং মূল খাতা যোসেফ ছৈয়াল কস্তার কাছে রক্ষিত ছিল। যাহোক, উল্লেখ্য ছাপা গ্রন্থটি স্বর্গীয় হিরণ গ্রেগরি ও স্বগীর্য় শিমন কোড়াইয়া উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই দুই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সেই এলাকায় কষ্টের পালা গানের প্রচলন শুরু করেন।

এই বই প্রথম ছাপা হয় ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে। কেননা এখানে বইটির ছোট্ট পরিচয় দেবার পর সংগ্রাহকের– "ভ্রাতৃগণ, তোমাদের প্রার্থনায় আমাদের স্মরণ রেখো" কথাটির পর এই তারিখ লেখা আছে।[৬৭] আর তৃতীয় বইটি সাভারের ধরেণ্ডা গ্রামের বার্নাড পেরেরার খাতা থেকে জ্যাকলিন লিভা গমেজ কম্পিউটারে টাইপ করেছেন। 'যীশু খৃষ্টের কষ্টের গান' শীর্ষক শিরোনামে মুদ্রিত গ্রন্থটিতে কোথাও কোনো তারিখ উল্লেখ করা নেই। বইটিতে কিছু তথ্যের ভুলও চোখে পড়ে। এমনকি এই পালার রচয়িতার নাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'দোমিঙ্গো গমেজ'। কিন্তু সেটা হবে দোমিঙ্গো রোজারিও; যাঁর সম্পূর্ণ নাম পিটার ডমিনিক রোজারিও বা দোমিঙ্গো রোজারিও ওরফে দুঙ্গু পণ্ডিত।

ভবানীপুরের প্রকাশিত খাতায় কষ্টভোগের পালার বিষয়ে অল্প কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে পালার বিষয় ও পালাকারের পরিচয় দিতে গিয়ে অল্পকথায় যেটুকু লেখা আছে, সেটা এই পালার সম্বন্ধে সামান্য ধারণা দেয়। সেখানে বলা হয়েছে– "জগৎ সৃষ্টি থেকে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম, দুঃখ ভোগ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহন পর্যন্ত (মহোপবাস কাল সময়ের জন্য) গান।"[৬৮] শুধু তা-ই নয়, সেই খাতায় এই পালার রচয়িতা এবং গান রচনার কারণও নির্দেশ করা হয়েছে। আমরা খাতায় পাই– "আনুমানিক ৪০/৪৫ বৎসর পূর্বে ঢাকা জেলার চড়াখোলা গ্রামের স্বর্গীয় দুঙ্গু ডমিনিক রোজারিও (পণ্ডিত) এই গান রচনা করিয়া খ্রীষ্টীয় সমাজে খ্রীষ্টবাণী প্রচারের জন্য এক সুমহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।"[৬৯]

---

৬৭. *কষ্টের গানের বই*, ভবানীপুর, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ১।
৬৮. প্রাগুক্ত
৬৯. প্রাগুক্ত

যদিও কষ্টভোগের পালা শুধু যিশুর দুঃখময় জীবনের কাহিনি, তবুও এখানে আমরা বাইবেলের পুরাতন নিয়মের কিছু অংশ দেখতে পাই। যিশুর এই পৃথিবীতে আবির্ভাবের ও মৃত্যুবরণের প্রেক্ষাপট বর্ণনার জন্যই এই সংযোজন বলে মনে করি। খ্রিষ্টের আগমন যে ঐতিহাসিক ঘটনা সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও পুরাতন নিয়মের কিছু ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। পুরাতন নিয়ম থেকে আমরা দেখি ঈশ্বর কর্তৃক জগত সৃষ্টির কাহিনি দিয়ে গান শুরু করা হয়েছে। তারপর বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ঈশ্বর স্বর্গদূতদের সৃষ্টি করেছেন। স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল বলে তিনি তাদের পতন ঘটান। অতপর ঈশ্বর তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেন। আদি মানব-মানবী এদেন বাগানে সুখের সংসার করছিল। সহসা তাঁরা পাপকর্ম করে, ফলে তাদেরও দণ্ড পেতে হয়। তখন ঈশ্বর ত্রাণকর্তা পাঠানোর অঙ্গীকার করেন। তারপরও আদম-হবার পুত্র কাইন তাঁর আপন ভাই আবেলকে হত্যা করে। সেই পাপের ধারাবাহিকতা থেকে উদ্ধার করতেই জলপ্লাবণের পর ঈশ্বর প্রবক্তা নোহের কাছে পুনরায় অঙ্গীকার করেন। শেষে তিনি ইস্রায়েলের পিতা আব্রাহামের কাছে প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আগমনের অঙ্গীকার করেন।

পুরাতন নিয়মের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিধৃত করে পালাকার নতুন নিয়মে প্রবেশ করেন। নবসন্ধির কাহিনিগুলির মধ্যে যীশুর জন্ম এবং তার পরবর্তী সময়ের কিছু ঘটনা এখানে বিধৃত। অতপর আমরা দেখি যিশুর প্রকাশ্য জীবন বা কর্মময় জীবনের কয়েকটি ঘটনা। তবে শেষ অংশে যিশুর শেষ ভোজ, শত্রুর হাতে সমর্পণ, যিশুর বিচার, পিলাত কর্তৃক প্রাণদণ্ডের আদেশ, যিশুর ক্রুশ বহন, যিশুকে ক্রুশে বিদ্ধকরণ, ক্রুশের উপর যিশুর যন্ত্রণাভোগ, ক্রুশে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর সপ্তবাণী উচ্চারণ, ক্রুশের উপর মৃত্যু এবং শেষে রয়েছে যিশুকে সমাধি দান। পালাগানের কাহিনি সম্বন্ধে নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক ফাদার আদম এস. পেরেরার অভিমত "সবচেয়ে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে যীশুর কষ্টভোগ ও মৃত্যুযন্ত্রণার দিকগুলো। কষ্টভোগের কাহিনীটি খুবই মর্মস্পর্শীভাবে বিধৃত হয়েছে। মনযোগ দিয়ে পাঠ করলে যে-কোনো ভক্তের চোখে জল না এসে পারবে না।"[৭০]

অন্যান্য পালার মতো যিশুর কষ্টভোগের পালাগানেও বন্দনা আছে। পালা শুরু হয় "পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে" আবাহন দিয়ে। কিন্তু পরের চরণেই ঈশ্বরের বন্দনা আছে। বন্দনায় আমরা দেখি অন্যান্য পালাগান ও গীতিকবিতার মতোই প্রথাগত নম্রতা ও ভক্তি প্রকাশ পায়–

> পবিত্র ত্রিত্ব এক ঈশ্বর বন্দি চরণ,
> পরম পিতার পবিত্র পদে পূজি এ মূঢ় জন।[৭১]

---

৭০. পিটার দোমিঙ্গো রোজারিও, *যীশু খৃষ্টের কষ্টের গান*, ভূমিকা: ফাদার আদম এস. পেরেরা সিএসসি, ঢাকা, পৃ. iii
৭১. *যীশুর দুঃখভোগের পালা*, পাণ্ডুলিপি, পৃ. চ

বন্দনায় ঈশ্বরের পর যিশু-খ্রিষ্টের পূজা করা হয়েছে “আমাদের পাপ তারণ কারণ” বলে। তারপর পালাকার পবিত্র আত্মার পূজা করেন। পবিত্র আত্মা সর্ব জ্ঞান ও গুণের আকর। তিনি সমস্ত সুন্দরের উৎস। তাঁর আরাধনা করতেই হয়, কেননা তিনি আমাদের “পবিত্র পথে যেন রাখে সর্বক্ষণ”।

পালাগানটিকে আমরা তিনটি অংশে ভাগ করতে পারি। প্রথম অংশে পুরাতন নিয়মের কিছু কাহিনি দিয়ে যিশুর আগমন প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে নতুন নিয়মের যিশুর জন্ম ও কর্মজীবনের দ্রুত পরিচয় বিধৃত করা হয়েছে। তৃতীয় অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মূলত গানের আসল উদ্দিষ্টই হল এই অংশ। এখান থেকেই এই পালা তার গতি লাভ করে। এই অংশের শুরুতে দেখি যিশু তাঁর বার জন শিষ্যসহ শেষভোজে বসেছেন। সম্পন্ন করতে চলেছেন। তিনি শিষ্যদের সেই ভোজ প্রস্তুত করার আদেশ দিলে তারা বলেন, “গুরুর আদেশ মতে চল যাই নগরে,/ ওগো ভোজনশালা প্রস্তুত করিবারে।” সেখানে যাবার পর যিশু প্রথমে তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দেন। তারপর তিনি রুটি আর দ্রাক্ষারস নিয়ে আর্শীবাদ করে তাদের খেতে দিলেন। সেই সময় যিশুর বিশ্বাসঘাতক শিষ্য যুদাস বেরিয়ে যায়। গিয়ে প্রধান যাজক ও শাস্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে যে ত্রিশ টাকার বিনিময়ে সে সুযোগ পেলেই যিশুকে ধরিয়ে দেবে। গেৎসেমানি বাগানে দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা দেখি শিষ্যদের সঙ্গে যিশু প্রার্থনা করছেন। তিনি দুঃখশোকে জর্জরিত। কিন্তু শিষ্যগণ ক্লান্ত অবসন্ন। তারা ঘুমিয়ে পড়ে। যিশু তাদের জেগে থাকতে না পারার জন্য তিরস্কার করেন। পালাকার বলেন–

> পেত্রকে ডাকিয়া প্রভু বলেন অতি মধুর স্বরে,
> জাগিতে না পারিলে শিমন তুমি এক ঘন্টা তরে।
> জাগিয়া প্রার্থনা করো গো যেন প্রলোভনে না পড়,
> আত্মাটি সতেজ বটে গো তবু শরীর দুর্বল বড়।[৭২]

তার পরে যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটতে দেখি, সেটা হল প্রধান-যাজক আন্না ও কাইয়াফার সামনে যিশুর বিচার। তাঁকে ধর্মদ্রোহী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কারণ তাঁর দাবি যিশু মানুষকে ভুল শিক্ষা দিচ্ছেন, আর “সেই শিক্ষার বিরুদ্ধে মানব উঠিছে ক্ষেপিয়া”। পরে যিশুকে পুরোহিতবর্গের কাছ থেকে রোমসম্রাট পিলাতের কাছে পাঠানো হয়। পিলাতের কাছে যিশু তাঁর আগমনের তাৎপর্য্য তুলে ধরেন। তিনি ‘রাজা’ এই কথা শুনে পিতর খুশি নন। তবে তিনি যে এই দুনিয়ার রাজা নন, সেই কথা পিলাত বুঝতেও পারেন না। এই অংশে পালাকার যিশু ও তাঁর বিচারক পিলাতের বাদানুবাদ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন–

> পিলাত বলিল তবে কি তুমি রাজা বিরাজমান,
> আমি সত্যের রাজা বটে বলিলেন যীশু সনাতন।
> আমার জন্মের উদ্দেশ্য আজি করি গো প্রকাশ,
> সত্যের প্রমাণ যেন দিতে পারি মানব সকাশ।[৭৩]

---

৭২. পিটার দোমিঙ্গো রোজারিও, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

পিলাতের দরবারে রাজকীয় প্রহসন শেষে যিশুকে ক্রুশে দেবার জন্য সৈন্যরা নিয়ে চলল। পথে তিনি ভীষণ দুর্বল হয়ে মাটিতে পড়ে যান। দীর্ঘ পথ ক্রুশ বহন করে তিনি কালভেরি পাহাড়ে আরোহন করলেন। সেখান তাঁকে আরও অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করার পর ক্রুশের সঙ্গে সৈন্যরা গেঁথে দিল। ক্রুশের বিদ্ধ অবস্থায় যিশু শত্রুদের ক্ষমা করেন। পালাগানে বলা হয়– "ক্ষমো পিতঃ এ অজ্ঞানগণে (তারা) কী করিতেছে জানে না এখানে"। এইভাবে পর পর সাতটি বাণী উচ্চারণ করার পর যিশু মৃত্যু বরণ করেন–

> অতপরে নতশিরে প্রাণ ত্যাজিলেন ঈশ্বর নন্দন,
> হেন কালে এ ভুবনে ঘটিল অলৌকিক ঘটন।[৭৪]

পালাগান শেষ করা হয় যিশুর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে। মৃত্যুবিজয়ী খ্রিষ্ট মৃত্যুর তিন দিন পর আপন গরিমায় সশরীরে পুনরুত্থান সাধন করেন। তাই সেটা আনন্দের এক মহা উপলক্ষ। তাই পালাকার সারা পৃথিবীর মানুষকে খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের অংশীদার করার লক্ষ্যে নতুন দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখার আহ্বান জানান। যিশুর পুনরুত্থানে এই পৃথিবীতে এক নতুর যুগের ও ধারার সূত্রপাত হয়েছে। তার সঙ্গে সামিল হতে পারার মধ্যেই মানব জাতির মুক্তি ও শান্তি নিহিত। তাই সবাইকে পরম আনন্দে গান গাইবার ডাক দিয়ে বলেন–

> দেখ ভাই রে, মৃত্যুরে জয় করিয়া উঠিলেন ঈশ্বর নন্দন,
> পুনরুত্থানকালে ভূমি হইল কম্পন।
> দেখ ভাই রে, আগত ত্রাণনাথ।[৭৫]

যিশুর কষ্টভোগের পালাগান খ্রিষ্টীয় উপাসনা-বৎসরের একটা বিশেষ সময়ে গাওয়া হয়। খ্রিষ্টীয় পঞ্জিকা অনুসারে সারা বৎসরকে পাঁচটি কাল-এ ভাগ করা হয়– সেগুলো পর্যায়ক্রমে আগমন কাল, জন্মোৎসব কাল, সাধারণ কাল, তপস্যা কাল ও পুনরুত্থান কাল। যিশুর কষ্টভোগের পালা গাওয়া হয় তপস্যা কালে। ফাদার আদম এস. পেরেরা সিএসসি বলেছেন, "আমার ছোটবেলা থেকেই দেখতাম, তপস্যা কাল এলেই আমাদের গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিদের একটি দল একেক বাড়িতে একেক সন্ধ্যায় মিলিত হয়ে যীশুর কষ্টের গান গাইতেন। ... বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই গান গাওয়া প্রচলনটি একটি অত্যন্ত প্রাচীন ও জনপ্রিয় লোকভক্তি। এই ধরনের লোকভক্তিগুলোর প্রচলন জীবন্ত মণ্ডলীরই প্রকাশ।"[৭৬] তপস্যাকালকে আবার অনেকে প্রায়শ্চিত্তকাল বলে থাকেন। সেই সময় চল্লিশ দিন ধরে যিশুর যাতনা ভোগের স্মরণে খ্রিষ্টভক্তগণ নানা ভাবে তপস্যা ও উপবাস করে থাকেন। মূলত ভস্ম বুধবার থেকেই তপস্যা কাল শুরু হয় । সেই সময়েই প্রতিটি খ্রিষ্টান এলাকায়, মূলত ভাওয়ালের খ্রিষ্টভক্তদের মধ্যে এই গান গীত হয়। কষ্টের গান গাইবার সময় ও রীতি সম্বন্ধে পংকজ প্লাসিড রড্রিক্স বলেছেন– "এ গানের মূল বিষয় সৃষ্টি থেকে শুরু করে যীশুর

---

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
৭৫. পিটার দোমিঙ্গো রোজারিও, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. iii

যাতনা ভোগ ও মৃত্যু পর্যন্ত। ... এ গান ভস্ম বুধবার থেকে শুরু হয় এবং শেষ হয় পুণ্য শুক্রবার। এ গান টানা সুরে ধীরে ধীরে গাইতে হয়।"[৭৭]

বর্তমান কালেও বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে– যেখানে ঢাকার খ্রিষ্টানদের বসবাস, সেখানেই পালাগানের প্রচলন আছে। বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে নয়, ভগবান যিশুর দুঃখের সঙ্গে ভক্তের দুঃখকে মিলিয়ে নেবার তাগিদ থেকেও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের চিহ্ন হিসাবে কষ্টের গান গাইবার রীতি বাংলাদেশের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যাপকতা লাভ করেছে। কষ্টভোগের পালাগানে খ্রিষ্টভক্তের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-বেদনা তাঁর আরাধ্য দেবতার চরণে নিবেদন করারও এক আকুতি দেখা যায়। ফাদার আদম এস. পেরেরা সিএসসি মনে করেন– "এই গানগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে পণ্ডিতবরের কবিত্ব, বাংলাভাষার উপর অসাধারণ দখল, ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি, ধর্মের উপর গভীর জ্ঞান, ঐশবাণী প্রচারে আগ্রহ ও দায়িত্বজ্ঞান এবং সমাজ ও মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালবাসা।"[৭৮]

রামুর পালা

বরিশাল জেলার ঐতিহ্যবাহী পাদ্রিশিবপুর গ্রামে যিশু-খ্রিষ্টের জীবনচরিত বিষয়ক প্রচলিত পদাবলী কীর্তনই রামুর পালা নামে পরিচিত। এই পালাগানের রচয়িতা হচ্ছেন কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী নামক একজন হিন্দু পুরোহিত। তাঁর ভাবশিষ্য এবং পালাগায়ক র‍্যামুয়েল ফ্রান্সিস গোমেজ ওরফে রামুর নামে এই গানের নামকরণ করা হয়েছে। সেই সময়ে রামুই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের বাড়ি গিয়ে এই গানের রেওয়াজ শুরু করেন। বর্তমানে পাদ্রিশিবপুরের ঐহিত্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত ধারা হচ্ছে রামুর পালা। র‍্যামুয়েল গমেজ ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল জেলার পাদ্রিশিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গানের সংগ্রাহক ফাদার যোসেফ ম. গমেজ (জীবন) বলেছেন, "রামুর পালা মূলতঃ যীশুর পালা ছিল, কারণ যীশু খ্রীষ্টের জীবনী অবলম্বনে এই কীর্তন রয়েছে। যেহেতু স্বর্গীয় রামুয়েল গোমেজ রামু এ কীর্তনখানি গাইতেন, তাই কালক্রমে এটি লোকমুখে 'রামুর পালা' বলেই আখ্যায়িত হয়।"[৭৯] রামুর পালা আজ পাদ্রিশিবপুরের ঐহিত্যগুলির মধ্যে এক অন্যতম উপাদান হিসাবে পরিগণিত।

রামুর পালা রচয়িতা কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী খ্রিষ্টধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না। তাই যিশুর জীবন, কাজ ও আদর্শ জানার জন্য 'স্বর্গদ্বার' নামক একটি পুস্তক সংগ্রহ করেন। সেটি তৎকালে কাথলিক ধর্মশিক্ষার অন্যতম প্রধান পুস্তকরূপে পরিগণিত হত। সেইসঙ্গে তাঁর এক খ্রিষ্টান বন্ধুর সহায়তায় তিনি একটি বাইবেল হাতে পান। 'স্বর্গদ্বার' ও পবিত্র বাইবেলের সহায়তায় তিনি যিশুর জীবনীভিত্তিক পালাগান রচনা করেন। ফাদার যোসেফ গোমেজ অনুমান করেন যে, "সম্ভবত ১৯২৪-১৯২৭ সনের মধ্যবর্তী সময়ে

৭৭. পংকজ প্লাসিড রড্রিক্স, 'নাগরীর ঐতিহ্যময় ইতিহাস', স্মরণিকা, টলেন্টিনুর সাধু নিকোলাস-এর গীর্জা শুভ উদ্বোধন ও আশীর্বাদ, পৃ. ৩৬
৭৮. পিটার দোমিঙ্গো রোজারিও, প্রাগুক্ত, পৃ. iii
৭৯. যোসেফ ম. গমেজ, 'রামুর পালার ইতিবৃত্ত', *রামুর পালা*, ঢাকা: পাদ্রিশিবপুর খ্রিষ্টান ডেভেলপমেন্ট কমিটি, ১৯৯৩, পৃ. ঝ

কীর্তনখানি রচিত হয় এবং গাওয়া শুরু হয়।”[৮০] তিনি রামুর পালাকে ‘কীর্তন’ বলার পক্ষপাতী হলেও শেষ পর্যন্ত তার প্রচলিত নাম ‘রামুর পালা’-ই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্যতায় বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছে বলে মনে করা যায়। অবশ্য সাহিত্য-প্রকরণের বিচারে পালাগানের যেসব বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকে, রামুর পালার মধ্যে আমরা পুরোপুরি না পেলেও অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলোর সন্ধান পাই।

কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী যেহেতু যিশুর জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে তেমন কিছু জানতেন না, তাই তিনি স্বভাবসুলভ নম্রতায় নিজের অজ্ঞানতা প্রকাশ করে গানের শুরুতেই বলেন–

> ওগো আমি সাধন জানি না,
> ওগো কোন সাধনে তোমায় পাব, আমি সাধন জানি না।[৮১]

পালাকারের এই সাধনহীন অজানা সত্তা যেন বিনম্রতায় তাঁর চরণে প্রণত হবার আকুতি থেকেই বলে ওঠে যে সাধন ভজন না জানলেও চরণবাঞ্ছা পোষণ করতে কোনো আপত্তি নেই। তিনি জানেন যে, কোনো মহামূল্য ধন দিয়ে তাঁকে খুশি করতে পারবেন না। একমাত্র ভক্তিমার্গে তাঁকে পাওয়া সম্ভব–

> আমি পূজিব চরণ, এই আকিঞ্চন,
> ভক্তি কুসুম লয়ে তোমার রাঙ্গা চরণ।[৮২]

ঈশ্বর মানুষকে ভালবেসে মানুষের মুক্তির জন্য যিশুকে এই পৃথিবীতে পাঠানোর পরিকল্পনা করেন। তিনি তাঁর দূত পাঠিয়ে সেই সত্য ঘোষণা করেন। তাই পালাগানের শুরুতে ‘যীশুর জন্ম পালা’ শীর্ষক প্রারম্ভিকায় বলা হয়েছে সেই সত্য। পালাকার তাঁর কাব্যগুণে সেই অবতারত্বের সত্যকে নির্দেশ করে বলেছেন–

> জীবের লাগিয়া করুণা করিয়া ধর্মপ্রচার সূত্রে,
> স্বর্গে বসিয়া ভাবিল মনেতে পাঠাইব নিজ পুত্রে।[৮৩]

যিশুর জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর যন্ত্রণাময় মৃত্যু ও গৌরবময় পুনরুত্থান পর্যন্ত ব্যাপ্ত কাহিনিতে অন্যান্য পালার মতোই খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের অংশকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনো দেশের, যে-কোনো ভাষার ও ঐতিহ্যের মধ্যেই আমরা দেখি যে, খ্রিষ্টকেন্দ্রিক শিল্পমাধ্যমগুলোতে যিশুর যাতনাভোগের কাহিনি সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়। সেগুলোর প্রকাশও মানব মনে অনেক আবেদন সৃষ্টি করে। মানুষ যেন তার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে খ্রিষ্টের কষ্টভোগকে মিলিয়ে নিতে পারে। সেই বঞ্চনা-ব্যথা মানুষের অন্তকরণে চিরন্তন অভিঘাত আনে। করুণ রসে মানুষের প্রীতি তাই অবিঃস্মরণীয় দৃশ্য-শ্রব্য-পাঠ্য উপাদান উপহার দিয়েছে। তাইতো রামুর পালায় শুরুতেই আমরা দেখি যে, মারিয়ার জীবনের প্রেক্ষাপটেও সেই দুঃখ আর কোনোমতেই গোপন

---

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ঝ
৮১. স্বপন গমেজ, সংগ্রাহক, *রামুর পালা*, পৃ. ১
৮২. প্রাগুক্ত
৮৩. প্রাগুক্ত

থাকে না। পদঝুলন গাইতে গাইতে পালাকার রামুর নামে ভণিতায় বলেন "অবলা দুর্বলা কত সহিব জ্বালা,/ হল দুঃখে অন্তর ঝালাপালা"।[৮৪]

বৈষ্ণব পদকর্তাগণ যেমন শ্রীমতি রাধার রূপ-যৌবনের বর্ণনা দিয়েছেন, একই ভাবে রামুর পালায়ও আমরা কুমারী মারিয়ার রূপের বর্ণনা পাই। এখানে মারিয়ার "বদন কমল, শশী নির্মল"। তাঁর "তরুণ অরুণ গাত্র চঞ্চল নেত্র গজেন্দ্র গমনে গতি"। এখানে রাধার মতোই "রাম রম্ভা তরু যিনি, গুরু উরু ভূরু যুগ কাম ধেনু" মারিয়ার রূপের তুলনা নেই। সেই সঙ্গে আমরা প্রথম অংশে দেখি যোসেফের বিবাহের বাগ্‌দানের পর নাজারেথ নগরের রমণীদের সঙ্গে মারিয়ার সাক্ষাৎ হয়। এই সময় তাঁকে নিয়ে নারীদের হাসি-ঠাট্টা আদিরসের প্রথম পর্বে আটকে গেছে। সেটা কোনোভাবেই সীমা অতিক্রম করে না। অবশ্য এই কথা স্বীকার করতেই হবে যে, খ্রিষ্টধর্মীয় অন্যান্য পালাগানে এমন প্রগল্‌ভ নারীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না; এমনকি এই রসিকতা সচরাচর দেখাও যায় না। নারীরা মারিয়াকে বলছে,

ওলো ছি ছি ছি লাজে মরে যাই, ওলো তোর মত নিলাজ মেয়ে ত্রিজগতে নাই।
রূপ যৌবনে গরবিনী ছিলি, ওলো বুড়া বরে প্রাণ সঁপিলি, করলি কি লো ছাই।
নব্য সভ্য যুবক যারা, তোর লাগিয়ে আত্মহারা, বুঝি না এ প্রেমের ধারা– বলিহারি যাই।[৮৫]

আবার বাগ্‌দানের পর স্বর্গদূতের মুখে যখন মারিয়া জানতে পারেন যে তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভবতী হবেন এবং যিশুর জন্ম দেবেন তখন একটি গানে যোসেফের অন্তরের কথা বলা হয়েছে হুবহু বৈষ্ণব কবির কথা ধার করে এই ভাবে,

বড় যতন করিয়ে সাগর সেচিনু
মানিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মানিক লুকাল
অভাগার কর্মদোষে ॥
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
আমি বিশুদ্ধচারিণী ভাবিতাম যারে
সেই কলঙ্কিনী হল ॥[৮৬]

দ্বিতীয় ভাগে আছে যিশুর কর্মজীবন। জন্মের প্রায় ত্রিশ বছর পর যিশু তাঁর প্রকাশ্যজীবন বা কর্মজীবন শুরু করেন। বাইবেলের কাহিনি মোতাবেক আমরা পাই যে, কানা নগরের এক বিবাহ ভোজে সুরা ফুরিয়ে গেলে যিশু অলৌকিক উপায়ে জল থেকে সুরা তৈরি করেন। সেই কাহিনি দিয়ে দ্বিতীয় অংশ শুরু। এখানে আরেকটি আশ্চর্য কাজের কাহিনি গানে সুরে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার মধ্যে যিশুর বন্ধু লাজার মৃত্যুবরণ করলে তাকে তিনি নতুন জীবন দান করেন। এই অংশকে যিশুর কর্মজীবনের শেষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য বলতেই হয়, এই ঘটনা যিশুকে জনপ্রিয় করে তোলে বলেই শত্রুপক্ষ যিশুকে হত্যার জন্য তোড়জোড় শুরু করে।

---

৮৪. যোসেফ ম. গোমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৮৫. স্বপন গমেজ, প্রাগুক্ত, ৪
৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

তৃতীয় ভাগে দেখি যিশুর যাতনাভোগের আরম্ভ। সেখানে প্রথমত ইহুদিদের বিচার-সভায় তাঁর বিচার হল। ভাল মানুষের দলে যারা যিশুকে ভালবাসে তাদের কেউ কেউ বলছে– "নিশ্চয়ই হবে যীশু ঈশ্বরের নন্দন,/ নইলে কেমন করে দিল অন্ধের নয়ন?"[৮৭] আবার আমরা খেয়াল করি যে, যিশুর মুক্তিদায়ী কাজে ধর্মব্যবসায়ী ফরিসিরা তাঁর উপর প্রচণ্ড রাগান্বিত। শুধু তা-ই নয় যিশুকে হত্যা করার পরিকল্পনাও তারা অনায়াসে করতে পারে। যিশুর কাজ দেখে তাদের মনে হচ্ছে–

এ বেটা লক্ষীছাড়া ওকে না করলে দেশছাড়া
আমাদের নাহি থাকে মান।
পাপ হবে ক্ষতি নাই অথবা নরকে যাই
নিশ্চয়ই বধিব উহার প্রাণ"[৮৮]

তারপর আছে 'যুদাসের বিলাপ'। যুদাস তাঁর প্রভু যিশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেবার পর যে অনুশোচনা, সেই বোধ থেকে সে বার বার আত্মধিক্কার জানিয়ে বলছে "হায় হায় আমি কি করিলেম হে"। সে তখন মহাযাজকের কাছে গিয়ে তার লব্ধ অর্থ ফেরৎ দিয়ে যিশুকে ছেড়ে দেবার আকুতি জানাচ্ছে–

আমি বুঝিনি তখন করেছি গ্রহণ
তোমাদের সামান্য অর্থ।
এখন নির্দোষীর প্রাণ দিয়ে বলিদান
হারায়েছি পারমার্থ ॥[৮৯]

আর যিশুর মৃত্যুর পর যে কি হবে সেই বিষয়ে ধারণা দিয়ে সে বলে– "কেহ বা হাসিবে কেহ বা কাঁদিবে জেরুজালেম হইবে শ্মশান"।[৯০] আমাদের এই পদকর্তা যে সনাতন ধর্মের অনুসারী তাঁর শব্দ চয়ন থেকেই সেটা বোঝা যায়। কোনো খ্রিষ্টান পদকর্তা 'শ্মশান' কথাটা ব্যবহার করেন না। একজন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যার ফলে সমগ্র শহরেই থমথমে পরিবেশ বিরাজ করে। সেই আবহ তুলে ধরার জন্য জনমানবহীন পবিত্র জেরুসালেম নগীরর কথা বোঝাতে তিনি অনায়াসে 'শ্মশান' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। লোকরীতির এই গ্রহণীয় মনোভাব তার সারল্য ও সব ধারায় তার অনায়াস উত্তরাধিকার গভীরভাবে প্রকাশ করে। তার ফলে রামুর পালা আমাদের সকলের অভিব্যক্তিকে অকপটে প্রকাশ করতে পারে। সেখানে খ্রিষ্টান ও অখ্রিষ্টান সবাই তাদের জীবনের সুকোমল অনুভূতি ও আবেগসমূহ মিলিয়ে নিতে পারে।

'বিচার পালা'য় আমরা দেখি পিলাতের দরবারে বিচারের নামে যিশুকে নিয়ে এক মহাপ্রহসন। বিচারে তাঁকে দণ্ডিত করা হয়। তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে নিষ্ঠুর মৃত্যুর বিধান দেন পিলাত। এই সময় পদকর্তার গান শুনি বিবেকের মতো– "আর করিও না মিছে ধার্মিকের রক্তপাত,/ হবে শিরে অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত।"[৯১] তারপর যিশুকে জেরুসালেম নগরীর বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৮৮. প্রাগুক্ত
৮৯. স্বপন গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

তাঁর কাঁধে ক্রুশ, মাথায় কাঁটার মুকুট; রক্তে ভেজা সারা শরীরে কশাঘাতের চিহ্ন। ক্লান্ত দেহে এগিয়ে চলছেন যিশু। তাঁর সামনে-পেছনে নিষ্ঠুর সৈন্যরা আর উৎসাহী মানুষের দল। 'মারীয়ার বিলাপ' অংশে আমরা দেখি যিশুকে যখন ক্রুশের উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হল তখন তাঁর মা মারিয়ার অন্তরের বেদনা প্রকাশ করে পালাকার বলেন–

যাদু রে পশুপাখি যত আছে　　　সবারে রাখিও কাছে
　　অন্য কেহ না পারে মারিতে।
আমা হেন অভাগিনী　　　আছে কি না নাহি জানি
　　নিজ পুত্র না পারি রাখিতে ॥
আমার যে যাতনা প্রাণে　　　অন্য কেহ নাহি জানে
　　কে বুঝে প্রাণের ব্যথা।
আমি অনলে পুড়িব　　　জলে ঝাঁপ দিব
　　পাষাণে লুটিব মাথা।[৯২]

'যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু' নামক অংশে যিশুর মৃত্যুর ফলে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে এক করুণ আবহ সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনায় পদকর্তা অনায়াস–

নিচল পবন　　　নিথর গগন
　　বিষাদে মগ্ন বিশ্ব।
পশুপাখি সব　　　নাহি করে রব
　　দেখে এ দুঃখের দৃশ্য ॥[৯৩]

'যীশুর পুনরুত্থান' দৃশ্যে কতিপয় নারী তাঁর মৃতদেহে তেল লেপনের জন্য সকাল বেলা কবরের কাছে যান। তখন কবরে যিশুকে না দেখে তারা বিচলিত হন। স্বর্গদূতের কথায় তারা বলেন, "প্রভু আমরা তো তোমাগত প্রাণ, তুমি জীবিত হয়েছ; এ হত অভাগিনীকে দয়া করে একবার দেখা দাও।"[৯৪] তার পর আমরা পালাগানের কথায় শুনি "এই কথা রমণীগণ যখন বলিল,/ দয়াময় প্রভু অমনি সম্মুখে আসিল"।[৯৫] তারপরই যিশু তাঁর শিষ্যদের এক নতুন দেশের সন্ধান দেন। সেই দেশের স্বরূপ উল্লেখ করতে গিয়ে পালাকার বলেন–

আমার যে দেশ সেই দেশী,
যে দেশে হিংসা নিন্দা ও অবিশ্বাস নাই।[৯৬]

তিনি আমাদের সবাইকে সেই দেশের অধিবাসী করার ইচ্ছা পোষণ করেন। যিশু বলেন যে, তাঁর পিতার আবাস সেই দেশেই রয়েছে। সেই দেশই এক নতুন স্বর্গ; আবার এক নতুন পৃথিবী। সেখানেই তিনি অধিরাজ হিসাবে চিরকাল সমাসীন থাকবেন। আর আমরা সবাই তাঁর সেবকরূপে ঈশ্বরের বন্দনাগান গাইব।

---

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৯৩. স্বপন গমেজ, সংগ্রাহক, *রামুর পালা*, পৃ. ৩৪
৯৪. যোসেফ ম. গোমেজ (সম্পা.) রামুর পালা, পৃ. ৬০
৯৫. প্রাগুক্ত
৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

র‍্যামুয়েল ফ্রান্সিস গমেজ রামু ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা পালাগান পরিবেশন করেছেন, তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ভাবে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে আমি পাদ্রিশিবপুর মিডিন ডি' রোজারিও ও ডমিনিক গমেজ– রামুর এই দুই সাগরেদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে জেনেছি, তাঁরা বর্তমানে সরাসরি গানের সঙ্গে যুক্ত নন; কিন্তু গানের কথা ও সুরের মধ্যে যে পরিবর্তন আসছে– সেই সম্বন্ধে তাঁরা ওয়াকিবহাল। নতুন মানুষের অংশগ্রহণের ফলে এই পরিবর্তন তারা খুব সহজেই মেনে নিতে পেরেছেন। তাঁদের অভিমত: লোকগানের পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন অস্বীকার করার উপায় নেই। সেই সত্যকে মেনে নিতে পারলেই রামুর পালার মতো একটি গান নতুন প্রজন্মের মানুষের কাছে আরও গ্রহণীয় হয়ে উঠবে। তারাও নতুন করে মানুষের সামনে সেই পালা উপস্থাপনে আগ্রহী হবে। ঠিক তখনই তার মাধুর্যে নতুন পুরাতন সবাই মোহিত হবে।

রামুর পালা প্রচলিত হবার পরবর্তীকালে পালাগানের গায়েন থেকে শুরু করে পরিবেশনকারীর মধ্যে শুধু খ্রিষ্টানই নন, হিন্দুদেরও সমানভাবে অংশীদার হতে দেখা যায়। রামুয়েল গোমেজের সহকারীদের মধ্যে ছিলেন পাদ্রিশিবপুরের গায়েন কালু ঠাকুর, করতাল বাদক উমেশচন্দ্র হাওলাদার, মৃদঙ্গ বাদক যোগেশ হাওলাদার, বেহালা বাদক যামিনী হাওলাদার; গানের দলে পিটার শিকদার, পল শিকদার, পিও শিকদার, মারকুশ গোমেজ, মিলাট গোমেজ, পিটার গোমেজ, অশ্বিনী কুমার দাস, শশিভূষণ দাস, গেছপার্ট ডি'রোজারিও– প্রমুখ। বর্তমানে রামুর পালার চারটি দল আছে বলে জানতে পেরেছি। তবে এখন শুধু পাদ্রিশিবপুরের সদস্যরাই নন, সেই এলাকার বিভিন্ন গ্রামের মানুষ মিলেমিশে একত্রে গান পরিবেশন করেন। লোকগীতি যেহেতু এককের কোনো বিষয় নয়, বরং সেটা সমষ্টির এক সম্পদ, সেহেতু তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সবার মধ্যে রামুর পালা ঘিরে আশার আলো জ্বালাতে পারবে বলে মনে করি। আর সেই সুবাদে বহুল প্রচলিত এই পালাগান ভক্ত মানুষের আধ্যাত্মিকতার খোরাক জোগাবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

রামুর পালা এখনও পাদ্রিশিবপুরসহ বাংলাদেশের যেখানেই পাদ্রিশিবপুরের মানুষজন আছেন, সেখানেই পরিবেশিত হয়। পাদ্রিশিবপুর ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা– প্রভৃতি স্থানে প্রতি বছরই রামুর পালা গীত হয়। বর্তমানে এই পালার বিভিন্ন দল রয়েছে। দলে নতুন নতুন গায়েন বায়েন রয়েছে। পাদ্রিশিবপুরের অধীন আরও তিনটি খ্রিষ্টান অধ্যুষিত গ্রাম রয়েছে। প্রতিটি গ্রামেও রামুর পালার দল রয়েছে। সেই গ্রামগুলোর মধ্যে এককালে মাটিভাঙার অনেক নামডাক ছিল। বর্তমানে সেই গ্রামে গানের মানুষ আস্তে আস্তে কমে আসছে। অন্যদিকে দেশান্তরকাঠি গ্রামে আবার রামুর পালা গাইবার দলে নারী সদস্যও রয়েছে। আবার কলাবাড়িয়া গ্রামে পাদ্রিশিবপুর থেকে লোক এনে গান পরিবেশন করানো হয়। রামুর পালা ঐতিহ্য অনুসারে পরিবেশিত হতে হলে পাদ্রিশিবপুরের মানুষের অনায়াস দক্ষতার প্রশংসা করতেই হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতি বছর নানা সময়ে এই পালাগান পরিবেশিত হয় মূলত পাদ্রিশিবপুরের খ্রিষ্টভক্তদের মাধ্যমে। রামুর পালা নিয়ে এই এলাকার মানুষের

গর্ববোধ করার বিষয়টি কারও চোখ এড়ায় না। এই পালাকে তাঁরা তাঁদের অস্তিত্বের এক অপরিহার্য উপাদান বলে মনে করেন। সংস্কৃতির প্রতি এই অকুণ্ঠ ভালবাসা ও দায়িত্ববোধ আমাদের সবার জন্যই অনুকরণীয়।

রামুর পালার ভাব,উপমা, শব্দ প্রয়োগ, বিষয়বস্তুর অবতারণা, সুর ও তাল যথাযথ পালাগানের ধর্ম রক্ষা করেছে। বাংলা সাহিত্যের, বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্ত পদাবলি প্রভৃতি ধারার অনুবর্তন এখানে সহজেই চোখে পড়ে। এখানে কিছু ভিন্নধর্মী সুর গানের আবেদনকে আরও গ্রহণীয় করে তুলেছে। আমরা জানি রামুর পালার মূল সুর কীর্তনের; আরও স্পষ্ট করে বললে সেটা হচ্ছে পদাবলী কীর্তনের সুর। ধ্রুপদের কিছু অংশ আছে যেখানে ঝুমুর তালের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও এই গানে দাদরা, কার্হাবা, দশ মাত্রার ঝাঁপতাল, ঝুম্পক এবং বার মাত্রার একতাল ব্যবহৃত হয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় বাংলাদেশে পদাবলীর আদলে যতগুলো পালাগান আছে– রামুর পালা তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খ্রিষ্টীয় অন্যান্য পালাগান

খ্রিষ্টীয় ভাব ও বিষয় অবলম্বনে রচিত তিনটি পালাগান নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ঢাকা জেলার ভাওয়াল এবং আঠারগ্রাম খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকা ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় খ্রিষ্টধর্মের কাহিনি নিয়ে পালাগান রচিত হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আমরা সেগুলোর বিষয়ে উল্লেখ করতে পারি। খ্রিষ্টীয় অন্যান্য পালাগানের মধ্যে রয়েছে–

১. **যিশুর জন্মের পালা:** তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর অধীন ভেটুর গ্রামের মন্টু বার্ণাড পালমা ছোটবেলা থেকেই গানের সঙ্গে যুক্ত। তিনি ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে যিশুর জন্মের কাহিনি নিয়ে গীতিনাটক রচনা করেন।

২. **কুমারী মারিয়ার পালা:** যিশুর জননী কুমারী মারিয়ার পুণ্য জীবন নিয়ে মন্টু বার্ণাড পালমা কর্তৃক রচিত আরেকটি পালানাটক কুমারী মারিয়ার পালা।

৩. **সাধু যোসেফের পালা:** যিশুর পালকপিতা ও কুমারী মারিয়ার স্বামী সাধু যোসেফের জীবনাদর্শ নিয়ে পালাগান রচনা করেছেন মংলা সাধু পল গির্জার অধীনস্ত খ্রিষ্টীয় লোককবি সুরঞ্জন হালদার।

৪. **সাধু যোহনের পালা:** তুমিলিয়া গির্জার প্রতিপালক সাধু যোহনের জীবনী অবলম্বনে রচিত সাধু যোহনের পালায় মানুষের লোভ লালসা ও প্রতিহিংসাপরায়নতার এক নিপুণ চিত্র এঁকেছেন মন্টু বার্ণাড পালমা। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এই পালা ভাওয়াল ছাড়াও আরও কয়েকটি জায়গায় অভিনীত হয়েছে।

৫. **সাধু পিতরের পালা:** যিশুর অন্যতম প্রধানশিষ্য পিতরের অন্তরঙ্গ জীবনের কাহিনি নিয়ে খুলনা মংলা ধর্মপল্লীর একনিষ্ঠ লোকসঙ্গীত গায়ক সুরঞ্জন হালদার অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে সাধু পিতরের পালা রচনা করেন।

৬. **মারিয়া মাগ্দালেনার পালা:** প্রথম জীবন ব্যাভিচারিণী এবং যিশুর সান্নিধ্য পাবার পর তাঁর জীবনাদর্শ প্রচারিণী মারিয়া মাগ্দালেনার দ্বৈত-জীবন কবিত্বময় করে তুলেছেন সুরঞ্জন হালদার তাঁর এই পালাগানে।

৭. **সাধু পলের পালা:** ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টমণ্ডলীতে সাধু পলের বর্ষ পালন করা হয়। তারও আট-দশ বছর আগে মন্টু বার্নার্ড পালমা সাধু পলের পালা রচনা করেন। এই পালায় তিনি পলের প্রথম জীবনে খ্রিষ্টানদের অত্যাচার করার এবং পরবর্তী জীবনে খ্রিষ্টকে প্রচার করার কাহিনি কবিতা ও গানে শিল্প-সুষমাময় করে তুলেছেন।

৮. **সাধু আগাপিতের পালা:** খ্রিষ্টানুসারী সাধক আগাপিত মাত্র ষোল বছর বয়সে ২৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ আগষ্ট রোমসম্রাট অউরেলিয়ানের রাজত্বকালে খ্রিষ্টবিশ্বাসের জন্য প্রশাসক আন্তিওকুস কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হন। তাঁকে প্রথমে হিংস্র প্রাণীর গর্তে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু ক্ষুধার্ত সিংহ তাঁকে আক্রমণ না করলে পরে তাঁর শিরোশ্ছেদ করা হয়। এই কাহিনি অবলম্বন করে রচিত পালাগান সাধু আগাপিতের পালা। বোর্ণী থেকে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে তার রচনাকার ও রচনাকাল উল্লেখ নেই। তবে প্রথম দিকে কোন কোন কুশীলব এই পালায় অভিনয় ও অংশগ্রহণ করতেন এবং করেছেন তাঁদের নামের তালিকা পাওয়া যায়।

৯. **সাধ্বী ফিলোমিনার পালা:** ১৯৪৫-৪৬ সাল নাগাদ খ্রিষ্টসেবিকা সাধ্বী ফিলোমিনার জীবনাদর্শ নিয়ে রচিত পালাগান ডমিনিক রোজারিও ওরফে দুঙ্গু পণ্ডিত রচনা করেছেন। গ্রিক রাজপরিবারের আত্মনিবেদিত এক কুমারী কন্যা ফিলোমিনা মাত্র তের বছর বয়সে খ্রিষ্টের নামে চিরকুমারী থাকার ব্রত গ্রহণ করেন। রোমসম্রাট ডায়োক্লেসিয়ান কিশোরী ফিলোমিনাকে দেখে তাকে বিয়ে করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু ফিলোমিনা তাঁর প্রেম অস্বীকার করেন। তার ফলে রোমসম্রাট ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে পাশবিক অত্যাচার করার পর হত্যা করেন। দুঙ্গু পণ্ডিত বিরচিত সাধ্বী আগ্নেশের পালার মতো সাধ্বী ফিলোমিনার পালাও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

সাধক আন্তোনিয়ো পালাগান ছাড়া অন্যান্য পালাগান সবই মূলত আধুনিক যুগের সৃষ্টি। আন্তোনিয়ো গান বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্মের গোড়াপত্তনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। অন্যান্য পালাগুলো বিংশ শতকের মধ্যভাগে এমনকি, একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হয়েছে। তারপরও বর্তমান কালের পালাগুলোর মধ্যে আমরা প্রাচীন যুগের ধারা অনুসরণ করতে দেখি। সেগুলোর ভাষার মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও ভাওয়াল অঞ্চলের মুখের ভাষাও পরিদৃষ্ট হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের বিষয়বস্তু

সাধু আন্তোনিয়ো খ্রিষ্টীয় জগতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী। তিনি সিদ্ধপুরুষ। তাঁর মধ্যে হয়ত ঐশানুভূতি অন্যান্য মানুষের চেয়ে বেশি ছিল, তাই ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ তাঁকে অতিমানব করে তুলেছেন। তাঁদের বিশ্বাস আন্তোনিয়ো জীবনে অনেক অলৌকিক কাজ সম্পাদন করেছেন। মৃত্যুর পরও তাঁর নামে সাধিত হয়েছে নানা আশ্চর্য ক্রিয়াকর্ম। এখনও অনেক ভক্ত তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন এবং প্রতিনিয়ত স্রষ্টার বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করেন। এমন এক সাধু ব্যক্তিকে ঘিরে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। তাই তাঁকে উদ্দেশ্য করে নানা গান ও প্রার্থনা রচিত হয়েছে। এই সুবাদে বলি যে, সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান আসলে মহান সাধক আন্তোনিয়োর অলৌকিক জীবনেরই এক সাঙ্গীতিক প্রকাশ। পরম্পরাগতভাবে গুরুর কাছ থেকে শিখে এই গান পরিবেশন করা হয়। আন্তোনিয়ো পালাগান গাইবার জন্য আলাদা লোক আছেন। তাঁরা দল গঠন করে মানুষের বাড়ি বাড়ি গান করে থাকেন।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান সংগ্রহ

লোকসাহিত্য মূলত লোকায়ত সমাজ ও জীবনের কথা বলে। মানব জীবন ও মানব সমাজের প্রত্যক্ষ এবং ব্যবহারিক বিষয়গুলির সঙ্গে লোকসাহিত্যের একটা অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে। তাই লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহের জন্য চাই সংবেদনশীল মন এবং একাগ্রতা। শুধু মস্তিস্কের উপর নির্ভর করে লোক-জীবনের নানা বস্তু-বিশ্লেষণ এবং সারণী নির্ধারণ করলেই লোকসাহিত্যে সংকলন এবং সংগ্রহ সম্পন্ন হয় না। তাতে এই সাহিত্যের প্রতি অবিচার করা হয়। তার ফলে যথাযথ আস্বাদও সম্ভব হয় না। তবে বুদ্ধি প্রয়োগের তো দারকার আছেই। সেই সঙ্গে প্রয়োজন হৃদয়ের রসোপলব্ধি। লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির সংরক্ষণও অতীব জরুরি। সেই সঙ্গে সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করে নাগরিক সমাজে সেগুলি যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হয়। মোট কথা, লোকসাহিত্যের সত্যিকারের স্বরূপ তুলে ধরতে হয়।

বাঙালি এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের সাহিত্য ও শিল্পকলায় খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যের অনুবর্তনের প্রতি আমার আকর্ষণ সেই ছোটবেলা থেকেই। শৈশবে দেখেছি আমাদের এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে নানা অনুষ্ঠানে সাধক আন্তোনিয়োর পালাগান করা হত। তখন আমরা তাকে 'ঠাকুরের গীত' বলেই জানতাম। এই গান ছাড়াও আমাদের নাটোর জেলার বনপাড়া ধর্মপল্লীতে সাধ্বী আগ্নেশের পালা, সাধ্বী ফিলোমিনার পালা, বাইবেলের নানা কাহিনি নিয়ে রচিত বৈঠকি গান, এবং উপবাসকালে চল্লিশ দিন যাবত গাওয়া যিশুর কষ্টভোগের পালাগান– প্রভৃতির প্রচলন ছিল। এইসব গানের দলে যাঁরা গান করতেন, তাঁদের মধ্যে আমাদের

কালিকাপুরের মানুষই ছিলেন বেশি। যিনি প্রধান গায়ক বা গায়েন– সেই যোসেফ ডেঙ্গু কস্তা আমাদের কালিকাপুর গ্রামেরই বাসিন্দা। তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী যোসেফ রোজারিও, ওরফে জুসি মাস্টার– আমার খুব কাছের প্রতিবেশী। তাঁদের মুখেই শুনেছি যে, এই দুই জন গায়েন এবং গান রচয়িতাদের গানের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহিত করতেন আমার পিতা স্বর্গীয় পিটার পেরেজ। নানা জায়গায় বিভিন্ন সময়ে যেসব গানের আসর হত তাদের প্রায় সবগুলোতেই আমি উপস্থিত থাকতাম। অবশ্য তখনও অংশগ্রহণ করার মতো বয়স হয়নি, তবে আমি এইসব লোকগীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। পরে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ডেঙ্গু কস্তার কাছাকছি আসি। এই ধরনের গান নিয়ে ভবিষ্যতে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করি। তিনি আমার উৎসাহ দেখে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তী কালে গানের সঙ্গে, বিশেষ করে খ্রিষ্টীয় ভক্তিমূলক সঙ্গীতের সঙ্গে আমার যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কয়েকটি উপলক্ষে গানের বাণী রচনার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। অবশ্য তাতে তিনি সুর সংযোজন করে পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন। আমাদের এলাকায় গ্রামভিত্তিক জারিগান প্রতিযোগিতায় আমাদের এই যৌথ প্রয়াস অনেকবার সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

এই ভাবেই ১৯৮২ সাল থেকে আমি যোসেফ ডেঙ্গু কস্তার কাছ থেকে সাধক আন্তোনিয়ো পালাগানের নানারকম তত্ত্ব ও তথ্য জোগাড় করতে থাকি। তিনি অনেক ধৈর্য নিয়ে আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এই গানের মর্মসত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করেছেন। শ্রদ্ধেয় ডেঙ্গু কস্তার সাহায্য নিয়ে লোকসাহিত্যের এই ধারায় স্নাত হতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি। লোকসাহিত্য সংগ্রহের ব্যাপারে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন,

> লোকসাহিত্য লিখিয়া লইতে কোন বাধা নাই, কিন্তু তাহার লেখক স্বতন্ত্র সমাজের লোক হইলে এই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ শিক্ষা থাকার প্রয়োজন, আর যদি তিনি সেই সমাজেরই লোক হন, তবে তাঁহার বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন নাও হইতে পারে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাঁহাকে নিজের রস-বিচার ও সৃজনী প্রতিভা সংযত রাখিতে হইবে– যাহা যাহা শুনিলাম, তাহাই যথাযথ লিখিতে হইবে; যাহা বুঝিলাম তাহা নহে।[৯৭]

সাধক আন্তোনিয়ো পালাগানের কোনো বিকৃতরূপ থেকে রেহাই পেতে আমি আসর থেকে সম্পূর্ণ গানটি শব্দযন্ত্রে ধারণ করে নিয়েছি। এই কাজে আমাকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছেন শ্রদ্ধেয় গায়েন যোসেফ ডেঙ্গু কস্তা এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য সুব্রত গমেজ। এই দুই গায়েনের সঙ্গে দলের পাইল দোহার, দোহার, বায়েন সবাই তাঁদের সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। তাঁদের গানের আসর থেকে এই গান তুলে নিলেও পরবর্তী সময়ে অনেকবার তাঁদের কাছে গিয়েছি। গানের নানা জায়গায় নানা কথা, সুর, প্রসঙ্গ এবং প্রেক্ষাপট বুঝে নেবার জন্য তাঁদের দ্বারস্থ হয়েছি। তাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমার সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে গানের দলের অন্যান্য সদস্যদের সাক্ষাৎকার নেবার সময় আমি সবার আন্তরিক আনুকূল্য পেয়েছি।

৯৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৫, পৃ. ২৪-২৫

নাটোর জেলার বনপাড়া এলাকা ছাড়াও ঢাকা জেলার ভাওয়াল অঞ্চলে দীর্ঘদিন ঘুরে সেখানকার আঠার জন গায়েন এবং তাঁদের দলের বেশ কয়েকজন দোহার এবং বায়েনদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার এই প্রয়াসকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য আমি গায়েন-বায়েনদের পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও যাঁদের বাড়িতে গান করা হয়েছে এমন প্রায় দেড়শ পরিবার এবং গানের সঙ্গে পরিচিত আনুমানিক পাঁচশ খ্রিষ্টভক্তের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তাঁদের মূল্যবান মতামত এবং প্রস্তাব আমার ডায়েরিতে লেখা আছে। ডেঙ্গু কস্তা, তাঁর শিষ্য সুব্রত গমেজ, আলেকজেণ্ডার গমেজ, মানিক গমেজ, ডগলাস পালমা, আন্তনি রোজারিও, অরুণ কোড়াইয়ার গাওয়া পালাগানের আসরের গান এবং অনেকের সাক্ষাৎকার আমি ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করে রেখেছি। এই পালাগানের আসর, গায়েন, বায়েন, দোহার, পাইল দোহার, তাঁদের আত্মীয়-পরিজন, ভক্ত-পরিবার এবং পালাগানের উপকরণ সামগ্রীর ছবিও তুলেছি প্রচুর। সবই এই গবেষণায় অমূল্য উপাদান হিসাবে সহায়ক হয়েছে।

পালাগানের সাধু আন্তোনিয়ো

'সাংগীতিক শব্দকোষ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে পালাগান সমন্ধে ড. বিমল রায় বলেছেন, "যে গানের অবলম্বনস্বরূপ কোনো একটি ঘটনা বা কাহিনী থাকে এবং অনেকগুলি গানের সমবায়ে সমগ্র বিষয়টিকে স্তরে স্তরে ফুটাইয়া তোলা হয়।"[৯৮] তেমনিভাবে সাধক আন্তোনিয়োর অলৌকিক ও ঘটনাবহুল জীবন নিয়েই রচিত হয়েছে আন্তোনিয়ো পালাগান। এখানেও সমগ্র বিষয়টি স্তরে স্তরে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ পর্যন্ত আমরা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের দুইটি রূপের কথা জানি। একটি লিখিত রূপ, অন্যটি অলিখিত বা মৌখিক রূপ। বাংলাদেশে এই দুই রূপের গানই প্রচলিত। তবে জনপ্রিয়তার নিরিখে মৌখিক রূপের পালাটিই এগিয়ে রয়েছে। আমি সারা বাংলাদেশে মাত্র একটি দলের সন্ধান পেয়েছি যার সদস্যগণ লিখিতরূপের পালাগান পরিবেশন করে থাকেন। আকারে বেশ দীর্ঘ এই পালাগান গাইবার নানা অসুবিধা আছে। অন্যদিকে আমার জানা মতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় অলিখিত পালাগান পরিবেশনের দল আছে সতেরটি।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের লিখিত রূপ

বাংলাদেশে খ্রিষ্টীয় সমাজের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন পিটার ডমিনিক রোজারিও। তিনি সমগ্র বাংলাদেশে দমিঙ্গো পণ্ডিত বা 'দুঙ্গু পণ্ডিত' নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন ঢাকা, অধুনা গাজিপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার তুমিলিয়া এলাকার চড়াখোলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিছু রোজারিও ছিলেন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। তাঁর মা সোহাগী রোজারিও ধর্মপ্রাণ নারী বলে পরিচিত ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই ডমিনিক ছিলেন প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা সনদ

৯৮. বিমল রায়, *সাংগীতিক শব্দকোষ*, প্রদীপ কুমার ঘোষ (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ১২০

তাঁর কমই ছিল। তবুও তিনি নিজের অদম্য আগ্রহ এবং সৃজনশীলতার গুণে সারস্বত সাধনায় নিজেকে এক উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। দমিঙ্গো রোজারিও একাধারে ছিলেন খ্রিষ্টীয় মর্মস্পর্শী অনেক গানের রচয়িতা, সুকণ্ঠের অধিকারী গায়ক, নামজাদা নাট্যকার, অপূর্ব অভিনেতা; আবার অন্যদিকে ধার্মিক কাটেকিষ্ট বা ধর্মশিক্ষক, সচ্চরিত্রবান শিক্ষক, আদর্শ সমাজনেতা, নিরপক্ষ বিচারক এবং কর্মনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল সংসারী মানুষ। দুঙ্গু পণ্ডিত শুধু নামেই নন, তাঁর পাণ্ডিত্য সব ধরনের মানুষকেই আকর্ষণ করত।

ধর্মশিক্ষাদানের ব্যাপারে এলাকায় তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এলাকার নানা বয়সের লোকদের ধর্মশিক্ষা দিতেন। তার সঙ্গে সঙ্গে নিজে নতুন নতুন গান রচনা করে গ্রামের লোকদের শেখাতেন। আর এসব গানের মধ্যে খ্রিষ্টের জীবনলীলা এবং সাধু-সাধ্বীদের জীবনভিত্তিক পালাগানও থাকত। তিনি বেশ কিছু পালাগান রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে 'সাধ্বী আগ্নেশের পালা' ও 'সাধ্বী ফিলোমিনার পালা' যথেষ্ট প্রচার ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তিনি ছিলেন সৃজনশীল মানুষ। সেই সময়ে ঢাকার ভাওয়াল এলাকায় প্রচলিত জনপ্রিয় সুরে এবং হিন্দুদের পদাবলী গানের সুরে 'যিশুর লীলা', 'যিশুর জীবনী' ও 'যিশুর কষ্টভোগের পালা' গান করে ভাওয়াল ও তার বাইরেও সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

নাটক রচনা ও মঞ্চায়নেও তাঁর অবদান আছে। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে আছে 'জোয়ান অব আর্ক', 'গোলাপ ফুল', 'আত্মসমর্পণ' এবং 'রঙ্গস্বামী'। এছাড়া তিনি ইংরেজ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের 'হ্যামলেট', রোমিও জুলিয়েট' ছাড়াও কয়েকটি নাটক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। দুঙ্গু পণ্ডিতের এইসব সাহিত্যকীর্তি তেমন কিছুই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৬৭ সালের ৫ জুন এই খ্রিষ্টীয় সাহিত্যসেবী মৃত্যুবরণ করেন।

পিটার ডমিনিক রোজারিও ওরফে দুঙ্গু পণ্ডিত সাধু আন্তোনিয়োর জীবনী অবলম্বনে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান বা ঠাকুরের গান রচনাকারী হিসেবেই সারা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। বাংলাদেশে এই পালাগানের একটি মৌখিক গীতি অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এই গানের মধ্যে কিছু অসঙ্গতি ছিল বলে অনেকে মনে করতেন এবং এখনও করেন। দুঙ্গু পণ্ডিতের সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান রচনা করার ব্যাপারে যেরোম ডি' কস্তা লিখেছেন, "ভাওয়াল অঞ্চলের বহু প্রচলিত 'ঠাকুরের গান' (পাদুয়ার সাধু আন্তনীর পালাগান)-এ বেশকিছু তথ্যগত ভুল ও কাল্পনিক বিষয়াদি সংযোজিত ছিল। কলিকাতার জেসুইট ফাদার দোঁতেন অন্যের মুখে এ গান শুনে সাধু আন্তনীর দুইটি জীবনী-পুস্তক দিয়ে অনুরোধ করলে দুঙ্গু পণ্ডিত সংশোধিত আকারে 'ঠাকুরের গান' রচনা করেন।"[৯৯] নতুন এই পালাগান রচনায় অন্যের অনুরোধের চেয়ে দুঙ্গু পণ্ডিতের নিজের ঐকান্তিক আগ্রহই বেশি ছিল। তারই

৯৯. যেরোম ডি' কস্তা, *বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী*, ঢাকা: প্রতিবেশী প্রকাশনী, ১৯৮৬, পৃ. ২৭৪

ফলে তিনি এই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর কাজে তিনি সাফল্য লাভ করেছেন বৈকি। সমসাময়িক যুগের কথা বিবেচনা করলে তাঁর রচনা সার্থকই বলতে হয়।

দুঙ্গু পণ্ডিতের রচিত পালাগান বেশ দীর্ঘ। পরম পুরুষ আন্তোনিয়োর সারা জীবনের কাহিনি নিয়ে নিজের ভক্তি-ভালবাসার অর্ঘ্য সাজিয়ে তিনি এই পালা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত সম্পূর্ণ পালাটি মোট বাইশটি (২২) খণ্ডে বা অধ্যায়ে বিভক্ত। পর্তুগালের সাধক আন্তোনিয়োর জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই তিনি পালার আকারে তুলে ধরেছেন। পণ্ডিতের নিজের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে তাঁর রচনার দুইটি প্রতিলিপি আমি দেখেছি। দুঙ্গু পণ্ডিতের সাক্ষাৎ-শিষ্য ছিলেন তুমিলিয়া গির্জার অধীন পিপ্রাশের গ্রামের জর্জ গমেজ। আর জর্জ গমেজের শিষ্য অরুণ কোড়াইয়ার কাছে যে পুরনো খাতাটি আছে, সেখানে প্রথম পাতায় লেখা আছে 'পাদুয়ার সাধু আন্তনীর পালাগান'। আবার খাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখা 'শ্রীগুরু সাধু আন্তনীর চরিতামৃত'। এখানেই শেষ নয়, একই খাতার তৃতীয় পাতায়, অর্থাৎ, যেখান থেকে গান শুরু হয়েছে; সেখানে লেখা রয়েছে 'গীতাঙ্কে সাধু এন্থনির পুণ্যজীবনী'। এই শিরোনামগুলি ঠিক কার লেখা, সেই বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। আমরা জানি সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান 'ঠাকুরের গান'; আরও স্পষ্ট করে ভাওয়াল এলাকার ভাষায় 'ঠাহুরের গান' বলে পরিচিত। কিন্তু দুঙ্গু পণ্ডিতের খাতার কোথাও সেই নামটি লেখা নেই।

এই কথা অনস্বীকার্য যে পণ্ডিত সমসাময়িক হিন্দুধারার প্রচলিত কবিতা ও গানে প্রভাবিত হয়েছেন। আমর মনে হয় তিনি তাঁর উদার মানসিকতার বলে 'শ্রীগুরু সাধু আন্তনীর চরিতামৃত' নামটি দিয়েছেন।[১০০] উদার বলছি এই কারণেই যে, 'শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' নামের প্রভাবে এই নাম নির্বাচন সেই সময়ে বাংলাদেশে ঘোর কাথলিক আবহের প্রেক্ষাপটে দুঙ্গু পণ্ডিতের বেশ সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। তাই রচনাকার নিজে এই নামটি চয়ন করেছেন বলে মনে করি। তিনি এই পালাগান রচনার সময় অহরহ বাংলা ঐতিহ্যের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। তাইত বন্দনায় সাধু আন্তোনিয়োর করুণা ও প্রসাদভিক্ষা করে কাশীরাম দাসের সুরে তিনিও বলেন,

> তোমার জীবনি গান অমৃত সমান,
> কীর্ত্তন করিতে সহায় হও দয়াবান।[১০১]

লিখিত পালাগানে বন্দনা অংশটি বেশ ছোট। আগে বন্দনা বোধ করি লাতিন ভাষায় করা হত। গানের খাতার বন্দনার পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "বন্দনা : আদিকালের বন্দনা– লাটিন ভাষা ... নূতন বন্দনা– বাংলা ভাষা"।[১০২] পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে গান আরম্ভ করে পরম প্রভুকে আহ্বান জানানো হয়েছে, "এস প্রভু মোর হৃদয়াসনে" বলে। তবে বন্দনার শুরুতে যখন তিনি

---

১০০. পিটার ডমিনিক রোজারিও (দুঙ্গু পণ্ডিত), *শ্রীগুরু সাধু আন্তনীর চরিতামৃত*, (অরুণ কোড়াইয়া সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, ঢাকা), পৃ. ৩
১০১. পিটার ডমিনিক রোজারিও (দুঙ্গু পণ্ডিত), *শ্রীগুরু সাধু আন্তনীর চরিতামৃত*, (যোসেফ রোজারিও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, নাটোর), পৃ. ৫
১০২. প্রাগুক্ত

লিখেছেন, "ভক্তি রসে কীর্তন করি শ্রী যীশুর চরণে, আমর ত্রাতার মহিমা গীত গাইব প্রেম সুতানে"[১০৩] তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে– তাঁর এই গানের মধ্য দিয়ে সাধু আন্তোনিয়োর অলৌকিক জীবনকথা গাইলেও তাঁর সত্যিকার আরাধ্যদেবতা কিন্তু পরিত্রাতা যিশুখ্রিষ্ট। তবে খ্রিষ্টের জননী কুমারী মারিয়ার বন্দনায় তিনি অকৃপণ। মারিয়ার প্রশংসাগান করার এক পর্যায়ে তিনি সাধু আন্তোনিয়োকে তাঁর পুত্র বলে তাঁর গুণকীর্তন করার শক্তি প্রার্থনা করেন– "(মাগো) তোমার ভকত পুত্র এন্থনি মহামতি,/ তার গুনকীর্তন তরে দেও গো শকতি।"[১০৪] মৌখিক রীতির পালাগানের গায়কদের বন্দনায় যে বিনয় প্রকাশ পায়, তেমন নম্রচিত্তের আর্তি হয়ত এই পালাগান রচয়িতার মধ্যে নেই; তবুও আলোচ্য পালায় আমরা সর্বগুণের আধার এবং সর্ব প্রসাদ-দায়িনী কুমারী মারিয়ার শক্তি ও করুণা ছাড়া গায়ক বা কবি গান করতে পারেন না– সেই বিনয় লক্ষ করি। তাই তিনি কাতর প্রার্থনা জানান,

> তোমার গুন গাহিতে মোর শক্তি নাই,
> প্রভুর পদে যাচ্না কর যেন শক্তি পাই।[১০৫]

গানের আসরে উপস্থিত শ্রোতাদের আন্তোনিয়োর প্রেমে আকর্ষণ করার অনুনয় জানিয়ে বন্দনা শেষ করা হয়েছে। ভক্ত খ্রিষ্টানের কাছে সাধক আন্তোনিয়ো হচ্ছেন প্রেমের অবতার। তিনি আবার মানুষকে আনন্দরূপ ভগবানের আনন্দের সহভাগী করতে পারেন। তাই তাঁকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেছেন, "এ সভায় সমাগত যত শ্রোতাগণ,/ তব প্রেমের আকর্ষণে কর মনোরঞ্জন।[১০৬] 'ভূমিকা' নামক অংশে পালাগানে প্রবেশক হিসেবে আমরা সাধু আন্তোনিয়োর জীবনের মহত্ত্ব এবং তাঁর কাছে মানত করলে যে সাধুর জাগ্রত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই কথা জানতে পারি। পরম গুণের আধার সাধু আন্তোনিয়োর শরণ নিলে তিনি সবাইকে নানা রকম বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করেন। তাই এখানে অধিকারী লিখেছেন,

> সঙ্কটে পড়িয়া যেইজন ঐ সাধু সদনে,
> মানত করিতেছি ভক্তি যুক্ত মনে।
> তার বিপদ উদ্ধারিছেন এখনও আন্তনি,
> এই আসরে গাহিব তাহার জীবনি।
> মন প্রাণ দিয়া শুন অমৃত বচন,
> যে নামের গুণে মুক্তি পেল পাপীতাপী জন।[১০৭]

দুঙ্গু পণ্ডিত যে ঠিক কোন বইটির সাহায্য নিয়ে তাঁর পালা রচনা করেছেন সেটা সঠিক বলা যায় না। আমি তাঁর বড়িতে গিয়ে কিছু পাণ্ডুলিপির সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু তাঁর ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে সেই বইয়ের খোঁজ পাইনি। যাহোক, তিনি কিন্তু আন্তোনিয়োর পরিবার সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। আন্তোনিয়োর পিতার নাম মার্টিন এবং মাতার নাম তেরেজা বলে উল্লেখ

---

১০৩. প্রাগুক্ত
১০৪. পিটার ডমিনিক রোজারিও (দুঙ্গু পণ্ডিত), *শ্রীগুরু সাধু আন্তনীর চরিতামৃত*, পৃ. ৫
১০৫. প্রাগুক্ত
১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

করেছেন। আমরা তাঁর জীবনী থেকে তা-ই জানতে পারি। তাঁর পিতা মার্টিন একজন যোদ্ধা ছিলেন সেই তথ্যও সঠিক। আর সেই সময় পর্তুগাল যে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত ছিল ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়। পণ্ডিত সেই বিষয়ে বলতে গিয়ে লিখেছেন,

> ধর্ম্ম হিংসুক শত্রুরা সেই দেশে আসি,
> ঐ দেশ দখল করে সত্য ধর্ম্ম নাশি।
> চারিশত বর্ষ ব্যাপী দেশবাসী গণ,
> বিজাতীয় হস্তে পেল মহিমা নির্য্যাতন।
> দুর্দান্ত অসভ্যগণ আসি যুগে যুগে,
> রাজ্য আক্রমণ করে অতিশয় বেগে।
> বিধর্ম্মি নানা জাতীয় প্রবল আক্রমণে,
> রাজ্য খণ্ড জর্জ্জরিত শত্রুর দলনে।[১০৮]

উপরোক্ত বর্ণনার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের নানা আখ্যানকাব্যে বর্ণিত সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাংলার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দুর্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ করে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে ও গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণে বর্ণিত বর্গি আক্রমণের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে রচিত দুঙ্গু পণ্ডিতের এই পালাগানে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের মধ্যে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা, চরিত্র-চিত্রণ এবং জীবন ও জগত সম্বন্ধে এক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর আগে বা পরেও কেউ এমন বিষয়বস্তু ও ভাবধারা অবলম্বন করে সাহিত্য রচনার, বিশেষত কাব্যসাহিত্য রচনার কথা সেইভাবে জোর দিয়ে ভেবেছেন বলে মনে হয় না। তাই সার্বিক দিক বিচার বিবেচনা করে বলা যায়, দুঙ্গু পণ্ডিত বাংলাদেশে আখ্যানধর্মী খ্রিষ্টীয় সাহিত্য রচনার পথিকৃত।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের মৌখিক রূপ

দুঙ্গু পণ্ডিত বিরচিত সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানকে আমরা লোকসাহিত্য বলব কি না সেই ব্যাপারে একটা দ্বিধা থেকে যায়। আবার শুধু লিখিত রূপের জন্য তাকে পুরোপুরি শিষ্টসাহিত্যের অভিধা দেওয়া যায় না। তবে লিখিত এই পালাগান গায়েনের মাধ্যমে গাওয়া হয়। বাংলাদেশে বেশ কিছু গানের দলের মধ্যে মাত্র একটি দলই এই পালাগান করেন। আগেই বলেছি, এই পালাগান আকারে বেশ দীর্ঘ। গানের সময় গায়েনকে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। বাইশ পালার পুরো গান মুখস্ত করা আদৌ সহজ নয়। তাই গায়েন এই গানের প্রধান কিছু অংশ গানের আসরে পরিবেশন করেন। এই লিখিত পালার গায়েন অরুণ কোড়াইয়া ছাড়া আর কোনো গায়েনকে আমি গানের সময় হাতে অনুলিপি নিতে দেখিনি। এই গানে যে ধুয়া এবং সুর ব্যবহৃত হয়, তার সঙ্গে মৌখিক রীতির পালাগানের ধুয়া আর সুরের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

---

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

দুঙ্গু পণ্ডিতের লেখা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের দুইটি পাণ্ডুলিপি দেখেছি। সেই দুই খাতার মধ্যেই পালাগানের আগে গানের সুর নির্দেশিকা রয়েছে। দুঙ্গু পণ্ডিতের শিষ্যের শিষ্য অরুণ কোড়াইয়ার কাছে রক্ষিত খাতায় গানে উনত্রিশ প্রকার সুরের কথা লেখা আছে। অন্যদিকে দুঙ্গু পণ্ডিতের জামাতা স্বর্গীয় যোসেফ রোজারিওর বাড়িতে প্রাপ্ত খাতায় একুশ রকম সুরের তালিকা আমি দেখেছি। সুর ছাড়াও ভাব এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে লিখিত এবং মৌখিক রীতির পালাগানের মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। দুইটি গানের কাহিনি বলার পদ্ধতিও আলাদা। মোটকথা– এই দুই রীতির গানের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈশাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয় বেশি।

পালাগান লিখিত নয়, মৌখিক রূপের জন্যই পরিচিত। লোকসাহিত্যের অঙ্গ হিসেবে পালাগান তার মৌখিক প্রচারের জন্য মানুষের কাছে গৃহীত। একটি সাহিত্য প্রকরণ যখন লিখিতরূপে প্রচলিত হয়, তখন তাকে লিখিত সাহিত্য বলাই সঙ্গত। লেখার পর তার লোকায়ত ভাব আর রূপটি বদলে যায়। তাকে সত্যিকার অর্থে আর লোকসাহিত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। পালাগানে লোকায়ত উপাদান ও লক্ষণ সম্বন্ধে প্রখ্যাত সমালোচক এবং অভিধানকার এইচ. এইচ. এ্যাব্রামস বলেছেন,

> A short difinition of the popular ballad (known also as the folk-ballad or 'traditional ballad'), is that it is a song, transmitted orally, which tells a short. Ballads are thus the narrative spices of folk songs which originate, and are communicated orally, among literate and only partly literate people. In all probability the initial version of a ballad was composed by a single author, but he or she is unknown; and since each singer who learns and repeats an oral ballad is apt to introduce changes in both the text and the tune, it exits in many variant forms. Typically the popular ballad is dramatic, condensed and impersonal: the narrator begins with the climatic episode, tells the story looely by means of action and dialogue (sometimes by means of dialogue alone), and tells it with out self-reference or the expression of personal attitudes of feelings...[১০৯]

এখানে অভিধানকার বলতে চেয়েছেন– যে-কোনো জনপ্রিয় পালাগান বা গীতিকা কিংবা ব্যালাডই মৌখিক পালাগান বা ব্যালাড বলে পরিচিত। তাকে আবার ঐতিহ্যবাহী ব্যালাডও বলা হয়ে থাকে। কাহিনিধর্মী এই পালাগান লোকমুখে প্রচার লাভ করে বলেই তার একটা আলাদা আবেদন আছে। লোকের মুখে তার সৃষ্টি আবার মানুষের মুখে মুখেই তার প্রচার এবং প্রসার। পালাগানের ধারক-বাহক এবং শ্রোতা বা গ্রাহক শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত– দুই ধরনেরই হতে পারে।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের মৌখিক রূপটিও গায়েনরা মুখে মুখে স্মৃতি থেকেই পরিবেশন করেন। এই গানের লেখ্যরূপ আমি কোথাও দেখিনি। কোনো গায়েন তাঁর গুরুর কাছ থেকে লিখে নিয়ে এই গান রপ্ত করেছেন বলেও কারও কাছে শুনিনি। গায়েনদের মতে, এই গান লেখার কোনো রীতি নেই। তাঁরা মনে করেন লিখে নিয়ে গান করলে গানের সত্যিকারের উদ্দেশ্য সফল হয় না। এতে গানের যে আরাধ্যপুরুষ সেই সাধু আন্তোনিয়োর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। লিখে নিলে গানের মধ্যে

১০৯. H. H. Abrams, *A Glossary of Lliterary Terms*, Texas: Harcourt College Publishers, 1993, pp. 11-12

যে ঐশবাণীর আবহ রয়েছে, তারও অবমাননা করা হয় বলে তাঁরা ধারণা পোষণ করেন। তাঁদের একান্ত বিশ্বাস, আন্তোনিয়ো ঠাকুরের এই পালাগান তাঁরা নিজেরা করেন না, সাধক আন্তোনিয়োই তাঁদের দিয়ে গান গাইয়ে নেন। গানের পরিবেশক হিসাবে তাঁরা ঠাকুরের 'উপলক্ষ' মাত্র। ঠাকুরই তাঁদের গান গাইবার শক্তি দেন। গানের কথা আর সুরের জোগানও দেন তিনি। পালার বন্দনায় তাই আমরা শুনি কুমারী মারিয়ার আর্শীবাদ কামনা করে গায়েন গাইছেন, "আমি যদি লজ্জা পাই মা লজ্জা পাইবা তুমি,/ তোমারই গান তুমি গাইবা মাগো উপলক্ষ আমি।"[১১০] এখানেই শেষ নয়, গায়েন নিজেকে গানের অযোগ্য মনে করেন। তিনি একান্ত বিশ্বাসে তাই গেয়ে ওঠেন,

> জানিবা না জানি গীত লইলাম বান্দিয়া,
> এই গীতি গাইব আমার ঠাকুরে আসিয়া।[১১১]

মৌখিক পালাগানের ক্ষেত্রে একটি কথা জানা দরকার, আর সেটা হল ইতিপূর্বে আমরা সাধু আন্তোনিয়োর যে জীবনী নিয়ে কথা বলেছি, তার সঙ্গে এই স্মৃতিনির্ভর পালাগানে সাধু আন্তোনিয়োর যে জীবনের বিবরণ পাওয়া যায়; তার খুব একটা সামঞ্জস্য নেই। সাধু আন্তোনিয়োর জীবনীতে অনেক আশ্চর্য কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার সবগুলোই আমরা একতরফা ভাবে মেনে নিতে পারি না। সেখানে অনেকাংশেই ভক্ত জীবনীকারের আবেগমথিত কথাবার্তা রয়েছে। নানা বিষয়কে অহেতুক অতিরঞ্জিত করার প্রবণতা তাতে লক্ষ্য করা যায়। তাই বলা যায়, এই সমস্ত নানা অলৌকিক কাজের কিস্সা-কাহিনি বাদ দিয়ে যে আন্তোনিয়োর জীবন; অর্থাৎ তাঁর পরিবার, জন্ম, শৈশব, যাজকপদে অভিষেক এবং ইতালি জুড়ে তাঁর কর্মময় জীবন– এসবের মধ্যে সত্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার আন্তোনিয়োর জীবনীগ্রন্থের কাহিনির সঙ্গে পালাগানে উপস্থাপিত কাহিনির কয়েক জায়গায় মিল আছে। জীবনীতে ইতিহাসের উপাদান মিশ্রিত থাকে বলে তার মধ্যে সত্যতা অন্বেষণ করা যেতেই পারে। কিন্তু পালাগান, বিশেষ করে মৌখিক রীতির পালাগান এক ধরনের সাহিত্য এবং লোকসাহিত্য। এই লোকসাহিত্যের বর্ণনায় কাহিনি ও ঘটনার সত্যতা খুঁজতে যাওয়া সমীচীন নয়। তাতে সাহিত্যের রসাস্বাদন থেকে আমরা বঞ্চিত হই। মূল কাহিনির সঙ্গে পালাগানের কাহিনির মিল থাকুক বা না থাকুক, পালাগানের সাধু আন্তোনিয়ো লোকসাহিত্যের চরিত্র হিসেবেই আমাদের কাছে ধরা দেন।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে পালাসমূহ

অলিখিত বা মৌখিক রীতির আন্তোনিয়ো পালাগানে মোট বারটি খণ্ড আছে। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ পালাগান বারটি অধ্যায়ে বা অংশে বিভক্ত। এই অংশগুলি অনেকটা মহাকাব্যের সর্গের মতো। অনেকে এই একেকটি অধ্যায়কে 'পালা' বলেন। আবার কেউ কেউ

---

১১০. পিটার ডমিনিক রোজারিও, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
১১১. প্রাগুক্ত

একে ‘পালি’ বলে অভিহিত করেন। তবে পালাগানের অধিকাংশ গায়েন বা গায়ক পালাকে ‘পালি’ বলার পক্ষপাতী। পরিবেশনের সময় সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান একটানা গাওয়া হয়। অবশ্য গায়েন-বায়েনদের সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়া হয়। একটানা বলতে, গানের মধ্যে কোনো খণ্ড বা পালা ভাগ করে গাওয়া হয় না। একটা পালা শেষ করার পরই যে বিরতি দিতে হবে, এমন কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। আসরে বসে পুরো গান শুনলে কোনটা কোন পালা, অনেক সময় বোঝা যায় না। তবে একটি পালার সঙ্গে আরেকটি পালার ভাব-সম্পর্ক বা যোগসূত্র রয়েছে। মৌখিক রীতির আন্তোনিয়ো পালাগানের বারটি অংশ বা পালা হচ্ছে–

(১) তপস্যার পালা

(২) দুস্কের পালা বা দুঃখের পালা

(৩) জন্মের পালা

(৪) ইস্কুলের পালা

(৫) পাটনীর পালা

(৬) শাস্ত্রের পালা

(৭) জাউলার পালা বা জেলের পালা

(৮) সাত বালকের পালা বা রাখালের পালা

(৯) কেশবের পালা

(১০) উপরান রাজার পালা

(১১) মুর্দার পালা বা মৃতলোকের পালা

(১২) সওদাগরের পালা

ঢাকা এবং নাটোর জেলার বেশ কয়েকটি পালাগানের দলের গায়ক ও বাদকদের সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি যে, তাঁদের অধিকাংশই মনে করেন সম্পূর্ণ পালাগানটি বারটি খণ্ডে সংবদ্ধ। আবার কারও মতে সাধক আন্তোনিয়ো পালাগান বারটি নয়, দশটি অংশে বিভক্ত। ঢাকা জেলার ভাওয়াল এলাকার চড়াখোলা গ্রামের গায়েন সুনীল পেরেরা এবং সাভার এলাকার ধরেণ্ডা গ্রামের গায়েন মানিক গমেজ বার নয়, দশ পালার গান পরিবেশন করেন। তবে বার পালার গানের দলেরই পাল্লা ভারী। তাঁদের দাবি, পানজোরা গির্জা থেকে প্রকাশিত সাধু আন্তোনিয়োর পর্বোপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকার প্রচ্ছদে যে ছবি রয়েছে, সেখানে সাধক আন্তোনিয়োর জীবনের বারটি ঘটনা সম্বলিত বারটি ছবির কোলাজ আছে, অতএব পালার সংখ্যা বার হওয়াই সঙ্গত। বার

পালাকে একত্রে বলা হয় 'অরাত'। অরাত কথার অর্থ গায়েনদের মধ্যে কেউ বলতে না পারলেও তাঁরা জানেন সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের বারটি পালা একত্রে অরাত বলে পরিচিত।

পালাগানের অংশভিত্তিক কাহিনি সংক্ষেপ

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের বারটি পালা বাদ দিয়েও শুরুতে রয়েছে 'আবাহন'। এই আবাহনের মাধ্যমে গানের শুরুতে 'যিজুস' বা যিশুখ্রিষ্ট, দয়াল ঠাকুর বা সাধু আন্তোনিয়ো এবং স্বর্গের রাণী বা কুমারী মারিয়াকে গানের আসরে অধিষ্ঠানের আহ্বান জানানো হয়। আবাহন বলতে আমরা বুঝি আরাধ্য দেবতাকে আহ্বান। পালাগানে আবাহনের পরেই রয়েছে বন্দনা। বন্দনায় পরমেশ্বর, যিশুখ্রিষ্ট, কুমারী মারিয়া, আন্তোনিয়ো ঠাকুর, স্বর্গের দূত ও সাধুসাধ্বীবৃন্দ, পিতামাতা, গুরু, সভায় উপস্থিত শ্রোতা– সকলকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানানো হয়। বন্দনার পরে আছে 'আলাপন'। আলাপনে খুব অল্পকথায় এই পৃথিবীতে আন্তোনিয়োর পিতা-মাতার আগমনের প্রেক্ষাপট জানানো হয়েছে। আর গানের একেবারে শেষে আছে 'দোয়া গীত'। এই দোয়া গীত যে পরিবারে গান করানো হয়, সেই পরিবারের মঙ্গল এবং সেই সঙ্গে সমাজ, দেশ ও সারা বিশ্বের শান্তির জন্য দোয়া প্রার্থনা করা হয়। দোয়া গীতের মধ্য দিয়ে মানুষকে স্বার্থহীন জীবন-যাপন এবং গরিবদের দান-ধ্যানের ব্যাপারে আগ্রহী হতে বলা হয়। সাধক আন্তোনিয়োর সম্পূর্ণ পালাগানটিতে যে বিষয়বস্তু নিহিত রয়েছে এবার তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। বারটি পালার মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। আলাপনে বলা হয়েছে যে ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্যই দুনিয়ায় ফ্রান্সিস ভক্তের আগমন। ঈশ্বর তাঁকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

তপস্যার পালা

ফ্রান্সিস ছিলেন একজন ঈশ্বরভক্ত মানুষ। স্ত্রী ভেরনিকা তাঁর যোগ্য সহধর্মিনী। তিনিও এক ধর্মপ্রাণ নারী। লোকালয়ে মানুষের কোলাহলে তাঁরা ঈশ্বরের আরাধনা ও সাধন-ভজন করতে পারেন না। তাই একদিন ফ্রান্সিস তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বলেছেন, "আমার মনে সাধ ছিল প্রভু দেখিবারে,/ আমি চইলা যামু এখন ঐরান জঙ্গলে।"[১১২] কেননা মানুষের উপস্থিতিতে নয়, ঐরান জঙ্গলে গিয়ে একান্ত নিভৃতে প্রভুর নাম স্মরণ করার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের দুই জনের মনেই ছিল। ফ্রান্সিসের এই প্রস্তাবে ভেরনিকা সম্মতি প্রদান করেন। অতএব যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে ঈশ্বরের ধ্যান-তপস্যা করার উদ্দেশ্যে ঐরান জঙ্গলে চলে যান। তাঁদের কঠোর তপস্যার ফলে ঐরান জঙ্গল আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যায়। একদিন এক কাঠুরিয়া দেখতে পায় যে জঙ্গল সম্পর্ণ পরিষ্কার, কোনো গাছপালা নেই। সেখানে রয়েছে শুধু উন্মুক্ত ময়দান। বিক্রি করার মতো কোনো কাঠও আর নেই সেখানে। তাই ঘোর সমস্যার সম্মুখীন হয় কাঠুরিয়া। তখন ফ্রান্সিস ভক্ত কাঠুরিয়াকে বলছেন, "আমরা দুইয় ভক্তে তপস্যা করি এই ঐরান

---

১১২. সুব্রত গমেজ, গায়ক, *সাধু আন্তনীর পালাগান*, নাটোর, ২০১৩, পৃ. ৬

জঙ্গলে,/ তপস্যার কারণে জংলা মাঠ-ময়দান হইল তারে।”[১১৩] এমনকি তিনি বলেছেন, “যত ছিল বাঘ ভাল্লুক সেই জংলার মাঝে,/ তপস্যার কারণে গেল আর কোনো জঙ্গলে।”[১১৪] এই অবস্থায় কাঠুরিয়া রাজার কাছে ফ্রান্সিস ভক্তের নামে নালিশ জানায়। রাজা কিন্তু তাঁর রাজ্যে ফ্রান্সিসের মতো এমন তাপসের আগমনের কথা শুনে খুশিই হন। আগ্রহ নিয়ে তিনি সেই ভক্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান। তাই পালকিতে করে তিনি ঐরান জঙ্গলে গিয়ে হাজির হন। সেখানে গিয়ে রাজা দেখছেন, কাঠুরিয়ার কথাই ঠিক। ঐরান জঙ্গল একেবারে পরিষ্কার। ভক্তকে দেখার পর রাজা তাঁর সঙ্গে ‘ধর্মের দোস্তি’ করেন। ভক্তের তপস্যায় খুশি হয়ে তিনি তাঁকে ‘নিদাবি’ করে বা খাজনা মওকুব করে ঐরানরাজ্য দান করেন। ভক্তকে ঐরান রাজ্য শাসনের ভার দিয়ে এবং প্রয়োজনে সব রকম সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজা ‘রায়তজন’ বা প্রজাদের ডেকে বললেন যে, তাঁর রাজ্যের মধ্যেই নতুন একটা রাজ্য হয়েছে আর একজন নতুন রাজা হয়েছেন। যদি কেউ সেখানে বসবাস করতে চায়, তবে মহানন্দেই সেটা করতে পারে। তারপর রাজা ঈশ্বরের কাছে নতুন রাজা, অর্থাৎ তাঁর বন্ধু ফ্রান্সিস ভক্তের প্রভাব ও প্রতিপত্তির জন্য দোয়া প্রার্থনা করে বিদায় নেন।

এদিকে স্বর্গের অধিরাজ পরমেশ্বর, ফ্রান্সিস ভক্তের এই রাজা হয়ে রাজ্য পরিচালনা করায় কিন্তু খুশি হন না। তিনি স্বর্গের দূতকে ডেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, ভক্তকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের জন্য; রাজত্ব করবার জন্য নয়। ভক্তকে এই ব্যাপারে সচেতন এবং সাবধান করে দিতে তিনি স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে যেতে চান। ঠিক সেই সময় দুই শয়তান এসে ঈশ্বরকে অনুরোধ করে যাতে ঈশ্বর তাদের দুই জনকে ফ্রান্সিস ভক্তের কাছে পাঠান। ঈশ্বর দুই শয়তানকে বলেন, তারা যদি নানা ছলনা করে ভক্তের ঈশ্বরপ্রীতি এবং ঈশ্বরভীতি ছাড়াতে পারে, তবে তারা তাঁকে ‘দোজক অনলে’ বা নরকে নিয়ে যেতে পারবে। আর ভক্ত যদি পরীক্ষা প্রলোভন সত্বেও ভগবত বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং ‘নিরাবধি’ ভগবানের নাম স্মরণ করেন, তবেই তিনি হাত ধরে তাঁকে উদ্ধার করবেন। সুযোগ সন্ধানী শয়তান ভক্তের জীবন বিপর্যস্ত করার লক্ষ্যে নানা সমস্যা সৃষ্টির পরিকল্পনা করে।

দুস্কের পালা বা দুঃখের পালা

‘দুস্কের পালা’ বা দুঃখের পালায় ঈশ্বরের পরিকল্পনা মতো না চলার অপরাধে ভক্তের জীবনে নানা বিপর্যয় নেমে আসে। এইসব সমস্যার হোতা কিন্তু দুই শয়তান। তারা একটার পর একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভক্তকে নাজেহাল করে। প্রথমেই তারা সূর্যের তেজ বার গুণ বাড়িয়ে দেয়। প্রচণ্ড গরমে ভক্তের রাজ্যের মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তার উপর শয়তান “বারো বচ্ছর মেঘ না দিল সেই শহরের মাঝে”। তাই “যেই শস্য বোনে লোকে জমিনের মাঝে,/ রইদ্দের তাপে সেই শস্য জ্বইল্যা যায়

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

তারে।"[115] এই অবস্থায় প্রজারা রাজার কাছে গিয়ে তাদের জানায়– "খুইট্যা খাইবার লোক তো নাই আপনার ঘরে,/ বিদায় পাইলে যাইতাম আমরা আর কোনো শহরে।"[116] প্রজাদের অভিযোগ শুনে ফ্রান্সিস তাদের যাবার অনুমতি দেন। উল্লেখ্য, রাজ্য থেকে সব প্রজা চলে যাবার কষ্টে ফ্রান্সিস ভক্ত কিন্তু ভেঙে পড়েননি। তাঁর মনে হল ঈশ্বর একদিন তাঁদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন এবং দুঃখকষ্ট লাঘব করবেন।

পরবর্তী ছলচাতুরী হিসেবে শয়তান ভূতের বেশ ছেড়ে ইঁদুরের বেশ ধারণ করে। ইঁদুর হয়ে ভক্তের ধন-সম্পত্তি ও খাদ্যদব্য নষ্ট করে দেয়। তার সঙ্গে ভেরনিকা বিবির ক্ষুধা সহসা বাড়িয়ে দেয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিবি কাঁদতে শুরু করেন। ভক্ত তাঁর স্ত্রীর ক্রন্দন সহ্য করতে না পেরে খাবার আনতে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে ভক্ত–

বাবুর্চিখানার ঘরে গিয়া নজর কইরা চায়,
খানা পানি কিছু তো নাই তাহা দেখতে পায়।[117]

ভক্ত আবার 'ধনের মাণ্ডব ঘরে' যান; সেখানেও "ধনকড়ি কিছু তো নাই ধনের মাণ্ডব ঘরে।" শেষে ফ্রান্সিস তাঁর বন্ধু রাজার কাছে যান। রাজা তাঁকে বলেন, "দুইয় দোস্তে খামু খানা এক বাসনের মাঝে"। কিন্তু তিনি উত্তর দেন, "বিবি লইয়া খামু খানা এক বাসনের মাঝে।" এই কথায় খুশি হয়ে রাজা তাঁর সাত-মায়ের ধন ভক্তের হাতে তুলে দেন। খাবার নিয়ে ফেরার পথে দুই শয়তান চিলের রূপ ধরে ছোঁ মেরে তাঁর হাতের খাবার নদীতে ফেলে দেয়। এত কিছুর পরেও ভক্ত ঈশ্বর-বিশ্বাস জলাঞ্জলি দেন না দেখে শয়তান তাদের রাজ্যে এক মারণ-ঝড় বইয়ে দেয়। এবার ফ্রান্সিস আর ভেরনিকা ভেঙ্গে পড়েন। তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েন। এই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে গায়েন গায়েন গান ধরেন–

কি করিব কোথায় যাব না দেখি উপায়,
আমাগো নছিবের লেখা খণ্ডানো না যায়।
এই বলিয়া দুইয় ভক্তে জুইড়াছে রোদন,
ঝংকার দিয়া উঠল পিতার রত্ন-সিংহাসন।[118]

তাঁদের কান্নায় ঈশ্বর সিংহাসনে থাকতে পারেন না। কেননা, "নিদানে পইরা যেইবা লয় পিতার ধর্মের নাম,/ হস্তে ধইরা করেন উদ্ধার এই তো পিতার কাম।"[119] তাই তিনি স্বর্গদূতকে বলে পাঠান "ভক্ত যদি পারে তোমারে সেবা করিবারে" তবেই তাঁর দুঃখ শেষ হবে। স্বর্গের দেব যাজকের বেশ ধরে ভক্তের কাছে খাদ্য ভিক্ষা চান। তাঁরা নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র সওদাগরের কাছে বিক্রি করে খাবার আনেন। তাঁদের দুই জনের কেউই বুঝতে পারেননি যে সওদাগর আর কেউ নন, তিনি স্বর্গদূত। সেই খাবার দিয়ে তাঁরা স্বর্গদূতের ক্ষুধা নিবারণ করেন। স্বর্গদূত তৃপ্ত হয়ে বললেন, "তেরো দিনকার খানা খাইলাম তোমার দরবারে,/ পিত্তি ঠাণ্ডা

---

১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১১৯. প্রাগুক্ত

হইলাম আমি এই জগতের মাঝে।"[১২০] ভক্ত আর বিবির সেবা এবং আপ্যায়নে খুশি হয়ে স্বর্গদূত তাঁদের প্রচুর ধন-সম্পত্তি দিয়ে আশীর্বাদ করেন। ঈশ্বরের প্রসাদ ও করুণা পেয়ে ফ্রান্সিস আর ভেরনিকা "মহানন্দে করল বসতি ঐ নিজগুয়া শহরে।"

জন্মের পালা

ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাবার পর তাঁদের আর জাগতিক কোনো কষ্ট রইল না। তবে তাঁদের একটি মানসিক যন্ত্রণা ছিল– "যেমন তেমন একটা পুত্র যদি হইতো আমাগো ঘরে।" এখানেই শেষ নয়, বরং "পুত্রের উছিলায় তারা জুইড়াছে রোদন।" পিতা পরমেশ্বর স্বর্গে থেকে তাঁদের ক্রন্দন শুনতে পেলেন। তিনি স্বর্গদূতকে আবার তাঁদের কাছে পাঠালেন। স্বর্গদূত এসে তাঁদের বললেন যে, পিতা পরমেশ্বর তাঁদের ঘরে একটি পুত্র-সন্তান দেবেন। তবে তাঁরা সেই পুত্রের কোনো উপার্জনের ভাগী হতে পারবেন না, তাঁর সেবা-যত্ন গ্রহণ করবেন না; তাঁকে শুধু চোখে দেখেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ফ্রান্সিস ভক্ত ও ভেরনিকা বিবির ঘরে পুত্র সন্তান দেবার অঙ্গীকার করে ঈশ্বর তাঁর দূতের মাধ্যমে 'বেহেস্তখানার ঘর' থেকে আইন্তনকে ডেকে পাঠান। তাঁকে ডেকে প্রভু পিতা বলেন, "পুত্রের জন্য করে কান্দন আমার দরবারে,/ তুমি যাইয়া লও জনম ঐ ফ্রান্সিস ভক্তের ঘরে।"[১২১] আইন্তন ভগবানের এই প্রস্তাবে রাজি হন না। তিনি সোজা বলেন, "যাব না যাব না প্রভু মিছা দুইনার মাঝে"। তিনি পরম পিতাকে বুঝিয়ে দেন যে সত্যিকার অর্থেই তাঁর "কলির ভবের সাধ নাই"। তিনি জানেন, পৃথিবীতে গেলে তাঁকে "দুইনার মায়াজালে" জড়িয়ে পড়তে হবে। আইন্তন ভক্ত প্রভু ঈশ্বরকে তাঁর ভয়ের কথা জানিয়ে বলেন, "দুইনায় গেলে তোমার নামটি যাব যে ভুলিয়া"। যাহোক, ঈশ্বরের সঙ্গে "বিস্তর হটাহটি" করার পর সাধক আইন্তন ফ্রান্সিস ভক্তের ঘরে জন্ম নেওয়ার সম্মতি দিলেন। তবে শর্ত হিসেবে তিনি পিতার হাতের শাস্ত্র দাবি করেন। পিতা তাঁর শাস্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আইন্তনকে ফ্রান্সিসের ঘরে পুত্র করে পাঠালেন। এতে ফ্রান্সিস এবং ভেরনিকা দুই জনেই মহাখুশি। জন্মের আটদিন পরে তাঁরা তাঁকে 'রোমার ধর্মঘরে' নিয়ে গেলেন এবং, "পিতা পুত্র পবিত্রআত্মার নামে বাপ্তাইস্ম করাইল,/ আইন্তন বইলা নাম তার ভুবনে রাখিল।[১২২]

ইস্কুলের পালা

ইস্কুলের পালায় আমরা দেখি, দীক্ষা ও নামকরণের পরই আইন্তন তাঁর পিতামাতার কাছে স্কুলে পড়াশুনা করতে যবেন বলে আশীর্বাদ ভিক্ষা করছেন। তাঁর আব্দার শুনে বাবা-মা তো অবাক। কত সাধন ভজন করে তাঁরা পুত্রকে পেলেন, আর সে-ই কি না ঘর ছেড়ে চলে যেতে চায়। তাঁরা যতই বলেন, "তুমি যাদু ইস্কুল পড় আপনার ঘরে" কিন্তু আইন্তন তাতে কান দেন না।

১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
১২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

নিরূপায় হয়ে পিতামাতা তাঁর সঙ্গে ধনকড়ি এবং পালকি দিতে চাইলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি পায়ে হেঁটেই বিদ্যার্জনের জন্য রওনা হন। তখনই দুই শয়তান তাঁকে বিপদে ফেলার উপায় খুঁজতে থাকে। তারা পথ আগলে আইন্তনকে বলে, "তোমার ধর্মঘর খানি ফালাইয়া আইছ পাছে,/ আমার ধর্মঘর খানি তোমার সামনে আছে।"[১২৩] আইন্তন শয়তানের চালাকি বুঝতে পেরে হাঁটু মুড়ে ক্রুশের চিহ্ন করতেই দুই শয়তান মাটি ছেড়ে শূন্যে ভাসতে থাকে। তখন শয়তান তাঁকে নদীতে ডুবিয়ে মারার সঙ্কল্প করে। চলার পথে বিশাল নদী দেখে আইন্তন ভাবনায় পড়ে যান। তাঁর ব্যথাভরা ক্রন্দন পরমেশ্বর শুনতে পান। শেষে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়ে আইন্তন হেঁটেই নদী পেরিয়ে যান। শয়তান তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারল না। আইন্তন সোজা গিয়ে স্কুলের শিক্ষক বা 'মেস্তুরি ঠাকুর'কে বলেন, "ইস্কুল পড়তে আসলাম আমি রোমার ধর্মঘরে,/ মাস্টার হইয়া পড়ন তুমি শিখাও গো আমারে।"[১২৪] কথা শুনে শিক্ষক মহাশয় তাঁর স্কুলের আরও দশ জন ছেলের সঙ্গে আইন্তনকে পড়াতে শুরু করেন। আট দিন পর তাঁর পরীক্ষা নিতে শিক্ষকের কাছে অনুরোধ করেন। তখন শিক্ষক মহাশয় আইন্তনের পরীক্ষা নিতে অপরাগ বলে জানিয়ে দেন। উপরন্তু তাঁকে ঘরে ফিরে যাবার আদেশ দিয়ে বলেন, "তোমারে লইব পরীক্ষা ঐ প্রভু নিরাঞ্জনে"।

আইন্তন ঠাকুর ঘরে ফিরে এসেও সেখানে আর বেশিদিন থাকেন না। পিতামাতার কাছ থেকে আবার বিদায় নিয়ে তিনি শাস্ত্র শিক্ষার জন্য চলে যান। যাবার পথে এক কৃষকের জমি থেকে এক ছড়া 'কাওন' অর্থাৎ কাউন বা কাউনি শস্য ছিঁড়ে খেলার ছলে গুনতে শুরু করেন। তাতে পরমেশ্বর নারাজ হন। তিনি মনে করেন, "আইন্তন ভক্তে করছে গুনাহ ভরা ক্ষেতের মাঝে"। তাঁর পাপের শাস্তিস্বরূপ তাঁকে বার বছর লাহর দরিয়ায় খেয়া বাইতে হবে। একদিন বাকি থাকতে প্রভু ঈশ্বর সেখানে যাবেন এবং যেখানে সবাই আইন্তনের হাতে চড়ে নদী পার হয়, সেখানে তিনি তাঁর মাথায় চড়ে পার হবেন। পিতা ঈশ্বরের পরিষ্কার কথা, "এমন কার্য যদি আইন্তন পারে গো করিতে,/ তবে গুনাহর মাফ হইব আমার দরবারে।"[১২৫]

পাটনীর পালা

লাহর দরিয়ায় খেয়া দেবার জন্য আইন্তনকে 'সদরের হুকুম' আনতে হয়েছে। কেননা সেখানে অন্যান্য জেলেরাও ছিল। তাদেও পাঠিয়ে দিয়ে তিনি জেলে হয়ে নদীর তীরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পারাপারের লোকজন নদীতে নৌকা না দেখে অবাক হয়। তখন আইন্তন তাদের বলেন, "সোয়ার আইসা হও আমার হস্তের উপরে,/ হস্তে কইরা নিমু তোমাদের দরিয়ার সেই পারে।"[১২৬] নৌকা দিয়ে নয়, হাতে করে পার করার কথা শুনে লোকেরা তো অবাক। তাঁকে তারা 'ডাকাইত' বলে গালিগালাজও করে। যাহোক বাদানুবাদের পর লোকজন আইন্তনের হাতে উঠে নদী পার হতে রাজি হয় এবং পারও হয়। এইভাবে খেয়া বাইতে

১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

বাইতে "একে দুইয়ে বারো বচ্ছর পূর্ণিত হইল"। অবশেষে স্বয়ং পরমেশ্বর যাজকের বেশ ধরে নদী পার হতে এলেন। যাজকরূপী ঈশ্বরকে আইন্তন চিনতে পারলেন না। পরম পিতা আইন্তনের কাছে দাবি করেন যে, তাঁকে হাতে করে নয়, মাথায় তুলে নিয়ে নদী পার করতে হবে। আইন্তন তাঁকে মাথায় তুলে পার করতে নারাজ। তিনি আবার যাজকবেশী ভগবানকে ফিরিয়েও দিতে চান না। অবশেষে আইন্তন পিতার কথামত তাঁকে পার করে দিতে রাজি হন। কিন্তু আইন্তনের শিরে চড়ে পার হবার সময় ঈশ্বর কৌশলে তাঁকে লাহর দরিয়ার গভীর জলে ডুবিয়ে রাখলেন। তাঁর ভয় ছিল, যদি আইন্তন তাঁকে পরম পিতা বলে চিনতে পারেন তবে তাঁকে হয়ত আর এই দুনিয়ায় রাখা যাবে না। পালাগানের ভাষায়–

> পিতায় বলছে আইন্তন ভক্ত বলি গো তোমারে–
> তোমার গুনাহর মাফ হইল আমার দরবারে,
> ভাসন দিয়া উঠ তুমি এই দরিয়ার কিনারে।
> এই দোয়া করল পিতায় এই জগতের মাঝে,
> পাত্তালে ছিল আইন্তন ভাসিয়া উঠিল।[১২৭]

শাস্ত্রের পালা

আইন্তন ঠাকুর ঈশ্বরকে চিনতে পারেননি তাঁর 'নছিব মন্দ' বলে। যখন তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর মাথায় চড়ে পরমপিতা পার হয়ে গেলেন, তখন তাঁর আর আক্ষেপের সীমা রইল না। তিনি তখন পিতার কাছে শাস্ত্র ভিক্ষা করলেন। পিতা স্বর্গের দূতকে দিয়ে শাস্ত্র পাঠালেন ঠিকই সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলে দিলেন যে "এই শাস্ত্র হারাইব সে ঐরান জঙ্গলে,/ গুনাহগার হইব সে আমার দরবারে।"[১২৮] ঠিকই স্বর্গদূত আইন্তনের হাতে শাস্ত্র দেবার পর সেটা পড়তে পড়তে মাথার কাছে রেখে তিনি গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েন।

তাঁকে ঘুমাতে দেখে পরমপিতা স্বর্গের দূতকে পাঠিয়ে আইন্তনের কাছ থেকে শাস্ত্র ফিরিয়ে আনার আদেশ দেন। স্বর্গদূত তা-ই করলেন। ঘুম থেকে জেগে তাঁর কাছে শাস্ত্র না দেখে আইন্তন কান্না শুরু করেন। তাতে ঈশ্বর দয়াপরবশত হয়ে আবার তাঁকে শাস্ত্র দিয়ে পাঠান আর বলে দেন, "যত্ন কইরা এই শাস্ত্র লইবা বারে বারে,/ কইলজা ফাইরা শাস্ত্র তুমি রাখবা পরানে,/ তুমি চাইর বেদ চইদ্দো শাস্ত্র পারবা পড়িবারে।"[১২৯] তার সঙ্গে ঈশ্বর আশীর্বাদ করেন যে, আইন্তন ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারবেন এবং মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারবেন। উপরন্তু তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এমন মানুষ এই পৃথিবীতে একজনও পাওয়া যাবে না। এমন আশ্বাস পেয়ে আইন্তন "দুই হাত মেইলা শাস্ত্র তুইলা লইল তারে"। তারপর–

> পিতার হাতের শাস্ত্র খুইলা লাগছে পড়িবারে–
> শাস্ত্র না পইড়া শাস্ত্র ওয়াকিব হইল,
> পিতার হাতের শাস্ত্র অমনে পরানে ভরিল।[১৩০]

---

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
১২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

জাউলার পালা

শাস্ত্র পেয়ে আইন্তন সামনে এগিয়ে যান এবং "খাড়া গিয়া হইল আইন্তন দরিয়ার কিনারে"। নদীর অশান্ত ঢেউ দেখে তিনি ভাবছেন এই নদী পার হওয়ার কোনো উপায় আছে কিনা। ঠিক তখনই দেখেন যে দুই জেলে সাতদিন চেষ্টা করেও কোনো মাছ ধরতে না পেরে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। । আইন্তন তাদের নদী পার করে দেবার অনুরোধ করলে তারা তাঁকে ভিক্ষুক বা 'মাগনাইত্যা' বলে গালি দেয়। আইন্তন তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, তারা যদি আবার নদীতে জাল ফেলে তবে "সাতটি নৌকা বোঝাই করবা একটি খেওয়ার মাঝে।" আইন্তনের কথামতো পরম পিতার নামে জাল ফেলতেই প্রচুর মাছ ধরা পড়ল। তারা আর জাল টেনে তুলতে পারে না। আইন্তনের পরামর্শে তারা জেলে নগর থেকে আরও দশজনকে ডেকে আনে। তাদের সাহায্যেও দুই জেলে জালের কিনারা করতে পারে না। আবার আইন্তন তাদের পরামর্শ দিলেন যে পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার নামে জালের রশি হাতে নিয়ে টানলেই জাল উঠাতে পারবে। তাঁর কথামতো নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে তারা দেখল জালে প্রচুর সোনার মাছ ধরা পড়েছে। এখন তারা অঢেল সম্পত্তির মালিক। সারা জীবন বসে খেলেও এই সম্পদ শেষ হবে না। শেষে তারা বাড়ি গিয়ে পিতামাতা এবং স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আইন্তনের কাছে গিয়ে বলে–

তুমি আমার নায়ের গুরু আমরা তোমার দাস,
তোমার পাছে হমু সেবক ছাইড়া দিমু বাস।
তোমার পাছে হমু সেবক যা থাকে কপালে,
আর যদি কিছু বল ধর্মের দোহাই লাগে।[১৩১]

সাত বালকের পালা

আইন্তন তাদের রেখে সামনে এগিয়ে গেলেন। একসময় খোলামাঠে এক বটগাছের নিচে গিয়ে সাতজন রাখাল বালকের সঙ্গে গানের আসর শুরু করলেন। সাত বালক যখন তাদের গরু-বাছুর ফেলে রেখে গানে মশগুল, তখন "যত আছে ধেনু বাছুর ময়দান পাথারে,/ সকলে বইসা রইল ঐ গাহানের ধারে।"[১৩২] এই অবস্থা দেখে এক ব্যক্তি সাত বালকের পিতামাতার কাছে নালিশ জানিয়ে বলে, "তোমাগো সাতটি পুত্র নষ্ট হইল ময়দান পাথারে"। তখন সাত কৃষক মিলে একটা বড় ঘর তৈরি করল। সেই ঘরের মধ্যে তাদের সাত ছেলেকে আটক করে তাদের পাহারা দেবার জন্য একজন দারোয়ান বা 'দেউরিদার' নিয়োগ করল। আন্তোনিয়ো সাত বালকের জন্য অপেক্ষা করে তাদের খোঁজে সেই ঘরের কাছে এসে দারোয়ানের কাছে জানতে চান ঘরের মধ্যে কি আছে। দারোয়ান তাঁকে মিথ্যা কথা বলে যে ঘরের ভেতর শূয়োর আর ভেড়া আছে। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে আইন্তন বলেন, "বাক্যি মতো হউক বালক ঐ ঘরের মাঝে"। আর সঙ্গে সঙ্গে "শূয়োর মেরা হইল বালক সেই ঘরের মাঝে"। এই ঘটনায় সাত বালকের পিতামাতার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তারা আইন্তনের কাছে গিয়ে তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইল। তাই

১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

আইন্তন তাদের জীবন ফিরিয়ে দিল। শেষে প্রীত হয়ে সাত বালকের পিতামাতা তাদের সাত ছেলেকে আইন্তনের হাতে সঁপে দেন। আইন্তন তাদের দীক্ষিত করে সাধুদের নাম দিয়ে তাদের নিয়ে গানের আসর করতে লাগলেন। আর শেষে–

আইন্তন বলছে প্রভু পিতা বলি গো তোমারে,
সাতটি পুত্র গিরস্তে সঁইপা দিল মোরে।
সাতটি কইরা পুত্র দিও একেক জনের ঘরে,
এই দোয়া পড়ল আইন্তন পিতার দরবারে।[১৩৩]

কেশবের পালা

সাত রাখাল বালককে সেবক করে নিয়ে আইন্তনের কাজ হল বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গান করা আর মানুষকে তাঁর সেবক করা। অতএব আইন্তন ঠাকুর তাঁর "সাতটি সেবক লইয়া গেল কেশবের বাজারে"। সেখানে গিয়ে "গাহেনা যে করে ঠাকুর কেশবের বাজারে"। তাঁর গান শুনে বাজারের মানুষ উত্তাল। বেচাকেনা বাদ দিয়ে "সকলে মইজ্জা রইল গাহেনার মাঝারে"। পরদিন সাত বালককে বাজারে রেখে আইন্তন কেশবের বাড়িতে যান। সেই সময় কেশব বাড়িতে ছিল না। কেশবের মা যাজকের সাড়া পেয়ে ভিক্ষাসমেত কেশবের স্ত্রীকে পাঠায়। ভিক্ষা দেখে আইন্তন বলেন–

ভিক্ষার তো না যাজক আমি ভিক্ষা লইয়া যাই,
নামের ভিখারী আমি নাম পাইলে সে চাই।[১৩৪]

নামের কথা শুনে কেশবের মা বলেছেন, "কোন নাম নাই দেখ আমার দরবারে"। তবে কেশবের মা এও বললেন, যদি তোমার কাছে কোনো নাম থাকে, তবে সেই নাম আমায় দিয়ে যাও। আইন্তন তাকে পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নাম শিখিয়ে দিলেন। সেই নাম নিতেই কেশবের মা "মৃত্তিকা ছাড়িয়া উঠল শইন্যের উপরে"। কেশব বাড়ি ফিরে মাকে শূন্যে ভাসতে দেখে অবাক হয়ে জানতে চায়– সে নিজে এত বড় সাধক হওয়া সত্ত্বেও একজন মানুষকেও শূন্যে উঠাতে পারেনি, অথচ তার মা কি করে শূন্যে উঠল। তখন কেশবের মা তাকে সবিস্তারে আইন্তন ঠাকুরের কথা বললেন। আইন্তনের কথা শুনে কেশব চরম রাগের বশে তাঁকে হত্যা করার জন্য ছয় কুড়ি ছয়টি বাণ নিক্ষেপ করল। আইন্তন তাঁর পায়ের খড়ম দিয়ে সেই বাণ প্রতিহত করেন। তারপর কেশব নিজে তার বাজারে গিয়ে দেখে আইন্তন দল নিয়ে গান গাইতে ব্যস্ত। তখন কেশব তাঁকে সরাসরি এক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে আহ্বান জানায় যে, তাদের দুই জনেরই সাধনার সমস্ত উপকরণ আগুনের মধ্যে দিলেই বোঝা যাবে কার সাধনা কত বড়। সেই মতোই 'অগ্নিপরীক্ষা' হল। তাতে কেশবের সব পাঁজি পুথি জ্বলে পুড়ে গেল। এই পরীক্ষায় পরাজিত হয়ে কেশবের সব অহঙ্কার চূর্ণ হল। পরম অনুতাপে সে বলল,

না জানিয়া করছি গুনাহ তোমার দরবারে,
আমার গুনাহর করো মাফ তুমি দয়ার ঠাকুরে।

---

১৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

আগে যদি জানতাম গুরু তুমি এমন পীর,
আগে দিতাম দুগ্ধ কলা পাছে দিতাম শির।[১৩৫]

উপরান রাজার পালা

সাতজন রাখাল বালক এবং কেশবেকে নিয়ে আইন্তনের আটজন সেবক হল। তাদের নিয়ে তিনি উপরান রাজার কাছে চললেন। উপরান একজন বড় সাধক। মানুষ মেরে সেই মৃতমানুষ দিয়ে সে বার ভূতের পূজা দেয়। তার কাছে যেতেই আইন্তন দেখতে পান উপরান মাথায় করে একটা মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে। তিনি উপরানের কাছে জানতে চান তার মাথায় মরা মানুষ কেন। প্রশ্ন শুনে উপরান উত্তর দেয়, " আগে যদি দেখতাম তোমায় সেই রাজপন্থের মাঝে,/ তোমারে দিয়া দিতাম পূজা ঐ মন্দিরের উপরে।"[১৩৬] এই কথা শুনে আইন্তন উপরানের গালে ক্রুশের চিহ্ন এঁকে দিলেন। উপরান মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভূতেরা সেই পূজা নিতে আসে ঠিকই, কিন্তু নিতে পারে না। তারা দূর থেকে মৃতদেহ দেখতে পায় অথচ কাছে এসে দেখতে পায় না। হঠাৎ ভুতেরা দেখতে পেল উপরানের গালে ক্রুশের চিহ্ন। তখন তারা রাগে ক্ষোভে বলে,

কিসের চিহ্ন দেখি তোমার গালের মাঝারে ?
জলদি কইরা কইছি চিন উঠাইয়া আন তারে,
নতুবা চইলা যামু আমরা ঐ আপনার ঘরে।[১৩৭]

এই কথা শুনে উপরান আইন্তনের কাছে গিয়ে তার কপাল থেকে ক্রুশের চিহ্ন উঠিয়ে দিতে বলে। আইন্তন উপরানের কৃতকর্মের জন্য তার বাবা-মা ও স্ত্রী-পুত্র কোনো দায় নেবে কিনা জানতে পাঠান। তারা কেউ-ই তার পাপের ভাগী হতে রাজি নয়। উপরান তখন বলে, "যার জন্য করলাম চুরি সেই তো বলে চোরা,/ জান দিয়া না পাইলাম নাম আবার নছিব হইল বুরা।"[১৩৮] শেষে সংসার অনিত্য ভেবে আইন্তনের কাছে গিয়ে বলে, "তুমি আমার নায়েয় গুরু আমি তোমার দাস,/ তোমার পাছে হমু সেবক ছাইড়া গৃহবাস।"[১৩৯]

মুর্দার পালা

উপরানকে নিয়ে আইন্তনের এখন সেবক সংখ্যা নয় জন। তাদের নিয়ে তিনি নদীর ধারে গানের আসর শুরু করলেন। এমন সময় কয়েকজন লোক সৎকারের জন্য একজন মৃত মানুষ নিয়ে এল। মৃতদেহটি কাঠখড়ির উপর সাজিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দিতেই আইন্তন তাড়াতাড়ি আগুন নিভিয়ে দিল। দেহটি মাটিতে নামিয়ে "আশীর্বাদের পানি মুর্দার গায়েতে ছিটাইল।" আর আশীর্বাদের জল গায়ে ছিঁটানোর সঙ্গে সঙ্গে "মইরা গেছিল একটা বেটা চক্ষু মেইল্যা চাইল"। পুনরায় জীবন লাভ করে তিনি

১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

আইন্তন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কালনিদ্রা যাই আমি এই দরিয়ার কিনারে,/ নিদ্রা থেইক্যা জাগাইছ তুমি কিসেরই কারণে ?"[১৪০] তখন আইন্তন তাঁকে বলছেন, "নিদ্রা থেইক্যা জাগাইছে তোমারে আমার প্রভু নিরাঞ্জনে"। এই কথা শুনে সদ্যজীবিত লোকটি আর নিজের ঘরে ফিরে যেতে চায় না। সংসারের প্রতি তাঁর বিরাগ বিদ্বেষ থেকে সে বলে, "তোমার পাছে হমু সেবক যা আছে কপালে"। আইন্তন তাঁকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করে তাঁর নাম দেন 'দো আন্তন'। নতুন জীবন লাভের পর তিনি আইন্তনের কাছ থেকে নতুন একটা দায়িত্ব পেলেন, "... গাহেনা যে করবা তুমি দ্যাশে আর মুল্লুকে,/ দোয়া ফরমাইবা তুমি দো আন্তনের নামে।"[১৪১] যাঁরা পালাগান করেন তাঁদের একান্ত বিশ্বাস, "সেই থেইক্যা ঠাকুরের গান দুইনায় পয়দা হইল"।

সওদাগরের পালা

সওদাগরের পালা থেকে জানতে পারি এক সওদাগরের দুই জন ছেলে ছিল। একদিন সওদাগর তাদের ডেকে বাণিজ্যে যেতে বলল। তারা তাদের ডিঙা কামান-বন্দুক দিয়ে ভর্তি করে উরগই শহরে বাণিজ্য করতে গেল। সেখানে গিয়ে "বারো বছর চলে বাণিজ্য উরগই শহরে,/ ধনকড়ি দিয়া ডিঙা বোঝাই করল তারে।"[১৪২] তারপর তারা দেশে ফিরে চলল। সেই সময় দুই শয়তান তাদের ক্ষতি করার ফন্দি আঁটে। তারা সওদাগরের দুই ছেলেকে হত্যা করে আইন্তনের পিতার ঘরে লুকিয়ে রাখে এবং রাজার কাছে নালিশ করে, "এমন ডাকাইত আছে দেখ তোমার রাইজ্যের মাঝে,/ আপনা হস্তে কইরা খুন রাখছে আপন ঘরে।"[১৪৩] রাজা তাদের অভিযোগ শুনে খুব রেগে যান। তিনি লোক পাঠিয়ে ফ্রান্সিকে বেঁধে নিয়ে আসেন। অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদে ফ্রান্সিস ভক্ত কাঁদতে শুরু করেন। ভক্তের ক্রন্দন ঈশ্বর শুনতে পেলেন। তিনি ভক্তকে বিপত্তি থেকে রক্ষার জন্য তাঁর সন্তান আইন্তনকে অনুরোধ জানান। আইন্তন পিতার কাছে ছুটে আসেন এবং বধ্যভূমিতে গিয়ে জল্লাদেকে বলেন, "এই বেটারে লইয়া যাও রাজার দরবারে,/ মরা মাইনসে দিব স্বাক্ষী ঐ রাজসভার মাঝারে।"[১৪৪] সেখানে সওদাগরের ছেলেদের আইন্তন অলৌকিকভাবে জীবিত করে তোলেন। তারাই রাজসভায় সবার সামনে শয়তানের কারসাজি জানিয়ে দিল। ধরা পড়ে দুই শয়তান আইন্তনের কাছে আকুতি মিনতি করতে লাগল–

> ছাইড়া দিয়া যাও গো গুরু এই জগতের মাঝে,
> তোমার নামটি শুনি আমরা যেই শহরের মাঝে;
> সেই শহর ছাইড়া যামু আর কোন শহরে।[১৪৫]

শয়তান "এই শহর ছাইড়া গেল আর কোন শহরে"। শয়তানের উৎপাতের আর কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে,

> আইন্তন ভক্তে চইলা গেল ঐ বিলাত ভুবনে,

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
১৪১. প্রাগুক্ত
১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

আসর করল আইন্তন ভক্তে রোমার ধর্মঘরে।[১৪৬]

পালাগানের রচয়িতা

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের রচয়িতা কে তা খুঁজে বের করার আগে আমাদের জানা দরকার লোকসাহিত্য ব্যক্তি বা সমষ্টির সৃষ্টি কি না। অনেকে মনে করেন লোকসাহিত্য শুরু হয় ব্যক্তি বিশেষের মাধ্যমে। মারিয়া লিচ বলেছেন, “All aspects of folklore, probably originally the products of individuals, are taken by the folk and put through a process of recreation, which through constant variation and repetition become a group product.”[১৪৭] লিচ এখানে বলতে চেয়েছেন যে, লোকশ্রুতির সব বিষয়ই মূলত ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি। পরবর্তীকালে সেই ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য মানুষ সেটা গ্রহণ করে এবং পরম্পরাগত ভাবে নতুন করে পুনর্গঠন করতে থাকে। এইভাবে ক্রমাগত পরিবর্তন, পুনরাবৃত্তি ও পরিবর্ধনের ফলে শেষ পর্যন্ত সেটা আর কোনো একজন ব্যক্তি মানুষের থাকে না বরং সামগ্রিক সৃষ্টির রূপ পরিগ্রহ করে। লোকসাহিত্য এক জনের সৃষ্টি হলেও সেটা আর ব্যক্তির থাকে না, হয়ে যায় সমষ্টির। এভাবেই সেই রচয়িতা আস্তে আস্তে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান। অতএব ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত, “লোকসাহিত্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমবেত সৃষ্টি, ব্যষ্টির মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার অসম্পূর্ণ রূপায়ণকেই সমষ্টি নিজের আদর্শে সম্পূর্ণ করিয়া লয়।”[১৪৮] অন্যদিকে প্রায় একই অভিমত প্রকাশ করে ভারতীয় লোকসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ড. ভেরিয়েল এলউইন বলেছেন,

> It is often said that there is no such thing as a village poet or a village folk-lorist, that the tales and songs of the poeple are very old and owe little or nothing to modern individual effort. My own experience leads me to doubt this. It is true that a great many of the songs are the possessions of the people as a whole; nobody knows when they are composed, they are repeated again and again and the only change is often a change for the worse. But at the same time gifted individuals do arise in the peasant communities. Even these do not regard their poems and songs as copyright. They compose them in the excitment and rapture of the dance and before they know what has happend, they have become public treasure.[১৪৯]

এখানে ড. ভেরিয়েল এলউইনের একটি কথার সঙ্গে সহমত পোষণ করা যায় না। তিনি যে বলেছেন ব্যক্তির রচনা সমাজের আর দশ জনের হাতে পড়ে পরিবর্তিত হতে হতে নিকৃষ্ট হয়ে যায়; তার কিন্তু কোনো জোরালো যুক্তি নেই। কেননা ক্রমাগত অবনতির ফলে লোকসাহিত্য তো অবলুপ্তির পথে চলে যাবার কথা। সেটা কিন্তু হচ্ছে না, বরং অবনতির পথে না গিয়ে উন্নতির দিকে তার যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। এই নবায়নের জন্যই শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও লোকসাহিত্য ছাত্র-শিক্ষক-পণ্ডিত সকলের পঠন-পাঠনের বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সহিত্যপ্রেমী মানুষের অন্তরে সাহিত্যরস আস্বাদনের

---

১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
১৪৭. Maria Leach, Ibid., p. 401
১৪৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬
১৪৯. Verrier Elwin, *Folk Songs of Chattisgarh*, Bombay: Oxford University Press, 1946, p. 1

অবলম্বন হয়ে রয়েছে। অতএব আমরা বলতে পারি, লোক সাহিত্য কোনো একজনের প্রচেষ্টায় রচিত হয়ে থাকলেও তার মধ্যে একটা গোটা সমাজ এমনকি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবন-যাত্রার কথা বিস্তারিতভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারে। সেখানে ব্যক্তি লুপ্ত হয়ে সমাজকে, বিশেষত সংহত সমাজকে তুলে ধরে। ছোট পরিসীমার মধ্যে লোকায়ত সাধনার একটা ব্যপ্ত পরিচয় লোকসাহিত্যের মধ্যে পাওয়া সম্ভব। কোনো রচনাকালের মৌলিক রচনার দেখা পাওয়া না গেলেও সেই রচনায় রচয়িতা সবার সঙ্গে মিলে যান। এই প্রসঙ্গে লোকসাহিত্য বিশারদ ড. আশুতোষ ভট্টচার্য যথার্থই বলেছেন, "লোকসাহিত্য কোন বিষয় ব্যক্তিবিশেষ (individual) দ্বারা রচিত (created) হইবার পর ইহা সমষ্টিগত ভাবে (communally) পুনরায় রচিত (recreated) হয়। ইংরেজিতে ইহাকেই communal recreation বলা হইয়াছে।"[১৫০]

আমরা দেখেছি কোনো কোনো সমালোচক লোকসাহিত্যকে ব্যষ্টির সৃষ্টি বলেছেন, আবার কেউ কেউ বলেছেন লোকসাহিত্য সমষ্টির সৃষ্টি। তবে লোকসাহিত্য কোনো ব্যক্তি বিশেষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং শ্রমের ফলে রচিত হলেও পরবর্তীকালে তা দল বা সমষ্টির প্রভাবে পুনরায় রচিত হয় এবং সাধারণের মধ্যে গৃহীত ও প্রচলিত হয়। পালাগানের ক্ষেত্রেও পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য দেখা যায়। সমালোচক রবার্ট গ্রোভ্স স্পষ্টতই বলেছেন, "The ballad proper has no known author."[১৫১] সমালোচকের এই মন্তব্য মধ্যপন্থার দাবি রাখে। তার কারণ হিসেবে বলা যায় ধাঁধাঁ, প্রবাদ, কিংবা লোকগীতি ব্যাক্তি বিশেষের রচনা বলে স্বীকার করে নিতে আপত্তি না থাকলেও পালাগানের ক্ষেত্রে অনেকেই কিন্তু ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টির রচনা বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। মারিয়া লিচ বলেছেন,"... the folk is too indifinite, too unorganized for such conceted efforts, they suggested that ballads were composed by the folk under the direction of a leader who brought the necessary discipline into the composition and who functioned as organizer and selector."[১৫২] অর্থাৎ যে রচনা অনেক মানুষের অংশগ্রহণের ফলে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে সেই রচনার সঙ্গে রচয়িতা হিসেবে একজনের নাম প্রযুক্ত হতে পারে না। তবে একথা সত্য যে, গীতিকা এবং আখ্যায়িকা বা আখ্যানধর্মী রচনার ক্ষেত্রে সবার মিলিত প্রচেষ্টা অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেই রচনার মধ্যে ঘটনায় পারম্পর্য রক্ষা করা, তার মধ্যে সঙ্গতি বিধান করা এবং একটা সুস্পষ্ট পরিণতি নির্দেশ করা সমষ্টির পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। অবশ্য কোনো একজনের তত্ত্বাবধানে পালাগান রচিত হয়ে থাকলেও তাঁকে অবিমিশ্র রচয়িতা বলে মেনে নেওয়া যায় না। শুধু পালাগান নয়, যে-কোনো লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য।

এই কথা স্বীকার করে নিতেই হয় যে, গীতিকা রচনায় প্রথম পর্যায়ে একজনই ভূমিকা নিয়ে থাকেন, পরবর্তীকালে ক্রমেই তা নানা জনের দ্বারা পরিমার্জিত, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, সংযোজিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে কিয়দংশ বিয়োজিত হয়। এই প্রথম ব্যক্তি

---

১৫০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১
১৫১. Robert Groves, Ibid., p. 9
১৫২. Maria Leach, Ibid., pp. 106-111

যে কে, তা কখনও জানা যায়; আবার অনেক সময় জানা যায় না। পালাগানের গায়ক তাঁর গুরুর কাছে গানটি শিখে নেন। পরবর্তী সময়ে তিনি যখন গান পরিবেশন করেন তখন হয়ত জায়গা বিশেষে গুরুর কথা এবং সুরের হুবহু অনুসরণ বা অনুকরণ করতে পারেন না। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি অনেক সময় নিজের কথা এবং সুর বসিয়ে দেন। এই প্রয়োজন আবার সৃষ্টির জন্যই হতে পারে। ফলে একই পালাগানে নানা জায়গায় নানা সময় কথা এবং মাঝে মাঝে সুরেরও হেরফের হতে দেখা যায়। তাই পালাগানের সম্ভাব্য রচয়িতা সম্পর্কে অভিধানকার সংক্ষেপে জানিয়েছেন, "In all probability the initial version of a ballad was composed by a single author, but he or she is unknown; and since each singer who learns and repeats an oral ballad is apt to introduce changes in both the text and the tune, it exits in many variant forms."[১৫৩]

পালাগানের প্রথম স্তরে একজনের মাধ্যমে সৃষ্টি হলেও হতে পারে। আমরা অনেক সময় সেই রচনাকারের নাম জানতে পারি। এবার মাঝে মাঝে রচনাকারের নাম অজানা থেকে যায়। তবে নাম জানা গায়েন বা রচনাকারের প্রথম সৃষ্টির সঙ্গে কয়েক প্রজন্মের পরের রূপটি যে পুরোপুরি মিলে যাবে, সেটা প্রত্যাশা করা সমীচীন নয়। এই ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটা স্বাভাবিক। আর সেটা প্রায়ই হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে রবিন ম্যাহিড যথার্থই বলেছেন,

> A true ballad is anonymous. We cannot tell who originally wrote it ... The singers of one generation handed the ballads down to the singers of the next generation, and so on over the years and the centuries. And in the process of being handed down in this manner, the ballads have undergone changes and modifications, so that many of them exist in a variety of different versions."[১৫৪]

এখানে রবিন ম্যাহিডের মন্তব্য অনেকাংশেই সঠিক বলে গ্রহণ করতে পারি। পালাগান যেহেতু কাহিনিধর্মী রচনা, সেহেতু কোনো ব্যক্তি একটি কাহিনি শুরু করে দিলে পরে জনতাই সেটা এগিয়ে নিয়ে যায়। এর ফলে কাহিনি যেভাবে শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে তার আর সেইরূপ থাকে না। আস্তে আস্তে তখন সেই কাহিনি থেকে শাখা কাহিনির সৃষ্টি হয়। আবার অনেক সময় শাখা কাহিনিই স্বতন্ত্র কাহিনির জন্ম দেয়। কাহিনির এই পরিবর্তন বা বিবর্তন সম্পর্কে রবার্ট গ্রোভ্স বলেছেন, "Original author is merely acting as spokesman for the group and when the ballad is complete will not claim it as his own. The ballad is important, the group is important, but the individual counts for little."[১৫৫] স্রষ্টা বা রচয়িতার এই জনতায় মিশে যাওয়া বা সমষ্টির সঙ্গে একাত্ম্য হয়ে যাওয়ার মধ্যে পালাগানের নবজন্ম ঘটে। অধিকাংশ সমালোচকই স্বীকার করেন, যারা পালাগানের রচয়িতা তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই উচ্চপর্যায়ের শিল্প ও সাহিত্যগুণসম্পন্ন মানুষ।

---

১৫৩. H. H. Abrams, Ibid., pp. 11-12
১৫৪. Robin Mayhead, *Understanding Literature*, Cambridge: Cambridge University Press, 1965, p. 48
১৫৫. Robert Groves, Ibid., p. 9

মারিয়া লিচ এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর অভিধানে– “the ballad is certainly the product of the late Middle Ages, that it is certainly not a product of primitie society, that it is a highly artful and rather difficult form, that the music is intimately and fundamentally a part of it. All of this would argue for conscious trained authorship.”[১৫৬] তবে এই মৌখিক রীতির পালাগানের রচনা ও রচয়িতা প্রসঙ্গে ড. মফিজুল ইসলাম যে মন্তব্য করেছেন, এখানে তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, “... পালাগানের রচয়িতা হিসেবে মাঝে মাঝে কোনো কোনো কবির নাম যুক্ত থাকতে দেখা যায় বটে, হয়ত তারা এর আদি রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু এগুলি মৌখিক রীতির সাহিত্য, জনগণের সম্পত্তি। কথকের মুখ থেকে এগুলি সংগৃহীত হয়েছে, কোনো মুদ্রিত পুথি পাওয়া যায়নি।”[১৫৭] এই পর্যায়ে আন্তোনিয়ো পালাগানের রচয়িতা অন্বেষণে ব্রতী হতে পারি।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের রচয়িতা

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান অনেকদিন থেকেই বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। বলা যায় বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ও প্রসারের কাল থেকেই সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান বাংলাদেশের মাটিতে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে মিশে ছিল। খ্রিষ্টসাধকদের মধ্যে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ে সাধু আন্তোনিয়োর জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। তাঁর জীবনের সঙ্গে যেসব অলৌকিক কাহিনি জড়িয়ে আছে তা খুব সহজেই ধর্মপ্রাণ বাঙালির হৃদয়-মনে ভক্তি-বিশ্বাস উদ্রেক করতে সমর্থ হয়েছিল। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের জনপ্রিয়তা আজও সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান দুই ধরনের আছে– একটি লিখিত, অন্যটি অলিখিত বা মৌখিক। লিখিত পালাগানের একজন রচয়িতা রয়েছেন। এই সম্বন্ধে আগেই আলোকপাত করা হয়েছে। অলিখিত পালাগানটি, যা গুরু পরম্পরায় মৌখিকভাবে গাওয়া হয়– তার রচনাকার সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে এই অলিখিত মৌখিক রচনাটি যে একজন উচ্চ এবং সমৃদ্ধ শিল্পমনসম্পন্ন লোকের সৃষ্টি, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। পালাগানের গভীরে প্রবেশ করলে আমরা সহজেই এই সত্য উপলব্ধি করতে পারি।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের ‘মুর্দার পালা’য় আমরা দেখি যে আইন্তন নদীর ধারে সেবক নিয়ে গান করার সময় লোকেরা সৎকারের জন্য একজন মৃতলোককে শ্মশান নিয়ে এল। মৃতদেহে অগ্নি সংযোগ করার পর আইন্তন সেখানে গিয়ে আগুন নিভিয়ে দেন এবং লোকটিকে পুনর্জীবিত করেন। জীবন পেয়ে লোকটি আর স্ত্রী-পুত্রের কাছে ঘরে ফিরে যেতে চায় না। সে সেবক হয়ে আইন্তনের সঙ্গে যেতে চায়, “তুমি আমার নায়ের গুরু আমি তোমার দাস,/ তোমার পাছে হমু সেবক ছাইড়া গৃহবাস।”[১৫৮]

১৫৬. Maria Leach, Ibid., p. 106-111
১৫৭. মফিজুল ইসলাম (সম্পা.) *লোকসাহিত্য সংকলন-৪৬*, *রংপুরের পালাগান*, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ক-খ
১৫৮. সুব্রত গমেজ, গায়ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

পালাগানে বলা হয়েছে যে নতুন জীবনপ্রাপ্ত লোকটির এই ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় আইন্তন খুশী হয়ে তাঁকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর নাম দেন 'দো আন্তন'। পালাগানে তাঁর বাপ্তিস্ম এবং গায়েন হিসেবে দীক্ষা তথা দায়িত্ব প্রাপ্তির বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

আছিল যে হিন্দু কূলে খ্রিষ্টান কূলে আনিল,
পিতা পুত্র পবিত্রাত্মার নামে তারে বাপ্তাইস্ম করাইল;
আর দো আন্তন বলিয়া নাম তার ভুবনে রাখিল।
আইন্তন বলছে দো আন্তন আমি বলি গো তোমারে,
সাত সেবক সঁইপ্যা দিলাম তোমার হাতে হাতে।
আর গাহেনা যে করবা তুমি দ্যাশে আর মুল্লুকে,
দোয়া ফরমাইবা তুমি দো আন্তনের নামে।[১৫৯]

আইন্তন তাঁকে নিজের সঙ্গে নিয়ে না গেলেও তাঁর উপর একটা গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। সেই কর্মভার হল যে, তাঁকে দেশে দেশে ঠাকুরের গান গাইতে হবে; ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করতে হবে। নতুন জীবন পাওয়ার প্রতিদানস্বরূপ তিনি আইন্তন ঠাকুরের কথার বরখেলাপ করেন না। তাইত পালাগানে শুনি,

গাহেনা যে করে ঠাকুর দ্যাশে আর মুল্লুকে,
আর দোয়া ফরমায় যে আবার দো আন্তনের নামে।[১৬০]

শুধু গান গাওয়াই যথেষ্ট নয়, মানুষের হয়ে মানুষের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ প্রার্থনা করাও হবে তাঁর পবিত্র কর্তব্য। এই দো আন্তনের গান গাওয়ার প্রয়াস থেকেই নাকি আন্তোনিয়ো পালাগান বা ঠাকুরের গান গাওয়া শুরু হয়। পালাগানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, "সেই থেইকা ঠাকুরের গান দুইনায় পয়দা হইল।"[১৬১]

পালাগানের এই কাহিনির সত্যতা নিয়ে আমাদের মনে প্রশ্ন থেকে যায় বৈকি। তবে এই কাহিনিতে মৃতলোক জীবন পাবার পর তার যে নামকরণ হয়েছে দো আন্তন, তার সঙ্গে দোম আন্তোনিয়ো নামের যথেষ্ট মিল আছে। তাই আমাদের আলোচ্য সাধক আন্তোনিয়ো পালাগানের রচয়িতা দোম আন্তোনিয়ো বলে গ্রহণ করতে পারি। দোম আন্তোনিয়োর জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে এই ধারণা স্পষ্টতা পাবে। বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্মের গোড়াপত্তনকালীন পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত বিচার-বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতেরা এই মৌখিক রীতির পালাগানের রচনাকার হিসাবে বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কলম্বাস বলে অভিহিত ভূষণা রাজ্যের রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিওর কথা উল্লেখ করেছেন। এই সমন্ধে আমরা একটা পরিষ্কার ধারণা পাই যেরোম ডি'কস্তার মন্তব্যে। তিনি *বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী* নামক ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন,

> [...] কথিত আছে সাধু আন্তনী স্বপ্নযোগে রাজপুত্রকে দেখা দিয়ে তাঁকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। ফলে ভূষণার রাজপুত্র খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে 'আন্তইন দা রোজারিও' নাম গ্রহণ করেন। তিনি ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভূষণায়

১৫৯. প্রাগুক্ত
১৬০. প্রাগুক্ত
১৬১. প্রাগুক্ত

> প্রত্যাবর্তন করেন এবং এক অত্যুৎসাহী ধর্মপ্রচারকে পরিণত হন। নিজ অঞ্চল ছাড়াও তিনি ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল এবং আসামে বাণীপ্রচার করেন। কথিত আছে তিনি দু'বছরে ২০,০০০ লোককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি গান, তর্কবিতর্ক ও কথোপকথোনের মাধ্যমে হিন্দুরে মধ্যে ধর্মপ্রচার করতেন। তাঁর রচিত 'সাধু আন্তনীর পালা' সহ অন্যান্য 'পালা' ও গান ভাওয়াল অঞ্চলে এখনও পরিদৃষ্ট হয়।[১৬২]

সঙ্গীতের প্রতি বাঙালি জাতির দুর্বলতার কথা জেনে দোম আন্তোনিয়ো গানের মাধ্যমে খ্রিষ্টের বাণী, তাঁর আদর্শ এবং আন্তোনিয়োর মতো খ্রিষ্টসাধকের কথা সেই সময়কার সহজ সরল মানুষের কাছে তুলে ধরবেন সেই কথা সহজেই অনুমেয়। যেরোম ডি'কস্তার অভিমতের সমর্থন মিলে খ্রিষ্টোফার পিউরিফিকেশনের লেখা একটি প্রবন্ধ। তিনি লিখেছেন, "খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে আন্তইন দা রোজারিও বিভিন্ন স্থানে বাণী প্রচারকার্য চালিয়ে গেছেন। ... ভাওয়াল অঞ্চলের কাথলিকদের মধ্যে প্রচলিত 'সাধু আন্তোনিয়ো পালা' ও অন্যান্য 'পালাগান' আন্তইন দা রোজারিওর রচনা বলে বিবেচিত হয়।"[১৬৩] আমি এই পালাগানের বেশ কয়েকজন গায়েনের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি তাঁরা প্রত্যেকেই এই পালাগান প্রবর্তকের নাম প্রসঙ্গে দোম আন্তোনিয়ো রোজারিওর কথা বলেন।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন বাংলা-পর্তুগিজ শব্দকোষের দুইজন লিপিকর ছিলেন– একজন বাংলা ভাষা জানা বিদেশি, অন্যজন পর্তুগিজ জানা বাঙালি। তারাপদ মুখোপাধ্যায় অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন– "দ্বিতীয় লিপিকর দোম আন্তোনিয়ো।"[১৬৪] এই শব্দকোষের পরিশিষ্টে বিবিধ প্রসঙ্গ নামক অংশে হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনায় কতগুলি শ্লোক আছে। এই শ্লোকগুলি দোম আন্তোনিয়ো রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থেও পাওয়া যায়। শব্দকোষ শুরু করা হয়েছে 'সত্যনিরঞ্জন' শব্দটি লিখে। তরাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, "দোম আন্তোনিয়ো ছাড়া আর কোন বাঙালি 'সত্যনিরঞ্জন' লিখে পর্তুগীস-বাংলা শব্দকোষের পুথি শুরু করতে পারেন?"[১৬৫]

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে পালাকার অহরহ 'নিরাঞ্জন' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এক জায়গায় ধুয়া হিসেবে গাওয়া হয়েছে "নিরাঞ্জন ভাব রে ভাই নিরাঞ্জন ভাব, নিরাঞ্জন ভাবিলে রে ভাই পরকাল পাব হায় হায় নিরাঞ্জন ভাব।"[১৬৬] এছাড়াও আইন্তন বেশ কয়েকবার নানা মহৎ কাজ সম্পাদনকারী হিসেবে 'প্রভু নিরাঞ্জনের' নাম উল্লেখ করেছেন। এই 'নিরাঞ্জন' কথাটি আসলে হওয়া দরকার নিরঞ্জন। নিরঞ্জন বলতে আমরা নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বরকে বুঝি। এই শব্দ খ্রিষ্টীয় প্রেক্ষাপটে সেই সময় ব্যবহার করা হত না। বলা দরকার করতে দেওয়া হত না। দোম আন্তোনিয়ো ছাড়া সেই সময় এমন কোনো সাহসী বাঙালি ছিলেন না যিনি ধর্ম বিষয়ে গোঁড়া মানসিকতাসম্পন্ন পর্তুগিজ পাদ্রিদের তোয়াক্কা না করে 'নিরাঞ্জন' কথাটি ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও পালাগানে বাঙালি

---

১৬২. যেরোম ডি' কস্তা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
১৬৩. খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন, 'দর্পণে মঠবাড়ী ধর্মপল্লী', স্মরণিকা, যাজকীয় অভিষেক, ২০০২, সাধু আগষ্টিন'র গীর্জা, মঠবাড়ী, পৃ. ১৩
১৬৪. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, *ইতিহাসে উপেক্ষিত*, কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪, পৃ. ৫৫
১৬৫. প্রাগুক্ত
১৬৬. সুব্রত গমেজ, গায়ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

হিন্দুধর্মীয় কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। কেশব ভক্ত যখন অহঙ্কার করে আইন্তনকে বাণ মেরে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন গায়েন অবলীলায় গেয়ে ওঠেন, "অহঙ্কার না কইরো গো বান্দা পাইবা অপমান"। আর এই অহঙ্কারের জন্য কোথায় কার জীবনে কি বিপদ নেমে এসেছে তার তালিকা দিতে গিয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ, চাঁদ সওদাগর, হরিশ্চন্দ্র রাজা– প্রমুখের উল্লেখ করেছেন। যাদের কাছ তিনি গানের মাধ্যমে খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়োর জীবনী প্রচার করছেন, তাঁরা সবাই এইসব পুরাণকাহিনি ও ইতিহাসের চরিত্র সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। দোম আন্তোনিয়ো গানের মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন। তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাই মুসা পেকাম্বরের নাম শোনামাত্রই তাঁরা তার মর্মসত্য উপলব্ধি করতে পারতেন।

এইসব বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের রচয়িতা দোম আন্তোনিয়ো রোজারিও বলে গ্রহণ করতে আমাদের আর কোনো বাধা নেই। জেমস্ ফার্গুসন বলেছেন,

> The author of a literacy work is usually known, or if unknown may be postulated a single artist. A ballad has no known author and may have had several authors, even many, since every singer who repeated a ballad not quite as he heard it, changing words or lines and adding or dropping verses, tended to contribute something to its growth.[১৬৭]

যে-কোনো সাহিত্যকর্মেরই একজন রচয়িতা থাকেন এবং সেই রচনা থেকে আমরা তাঁর পরিচয় জানতে পারি। যদি তাঁর নাম সঠিকভাবে জানা না যায়, তবে সম্ভাব্য রচনাকার বলে আমরা অনেক সময় কারও নাম ধরে নিই। তবে পালাগান বা গীতিকার ক্ষেত্রে এই কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। অন্যকথায় বলতে গেলে– পালাগানের কোনো নির্দিষ্ট রচয়িতা নেই বলেই মনে হয়েছে জেমস্ ফার্গুসনের। প্রত্যেক গায়কই তাঁর প্রতিভাবলে নতুন করে গানে গ্রহণ বা বর্জন করেন। মোট কথা, তিনি পালাগানের রূপগত পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটান। এইভাবেই তিনি পালার উৎকর্ষ সাধন করেন। অন্যান্য পালাগানের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য স্বীকার করে নিলেও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের রচয়িতা সমন্ধে এমন দাবি গ্রহণীয় নয়। এই পালাগানের একজন নির্দিষ্ট রচয়িতা ছিলেন যিনি তাঁর কাব্যকুশলতায় অমৃতপুরুষ আন্তোনিয়োর জীবনী অবলম্বনে ধর্মীয় ভাবধারায় এমন শিল্প-সার্থক পালাগান রচনা করেছেন। তিনি বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারে সর্বাপেক্ষা আলোচিত এবং কিংবদন্তি বাঙালি দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও।

---

১৬৭. James Kinsley (ed.), *Scottish Poetry: A Critical Survey*, James Ferguson, 'The Ballads', London: Folcroft, 1973, p. 99

চতুর্থ অধ্যায়

সাধক আন্তোনিয়ো পালা এবং

বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টীয় সাধনার রূপ

বাংলা সাহিত্যের দুইটি ধারা– লিখিত সাহিত্য আর মৌখিক সাহিত্য বা লোকসাহিত্য। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক সাহিত্যের লিখিতরূপ মহাকাব্য, গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, জীবনীকাব্য, অনুবাদ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গীতিনাট্য– নানাভাবে বিকশিত হতে দেখা যায়। আবার বাংলাদেশের লোকসাহিত্যও পিছিয়ে নেই। লিখিত সাহিত্যের পাশাপাশি মৌখিক সাহিত্যের ধারাটিও বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় চিরপ্রবহমান রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এই সমৃদ্ধির একদিকে আছে লিখিত সাহিত্যের ঐশ্বর্য, অন্যদিকে রয়েছে লোকসাহিত্যের বিচিত্র সম্ভার। বাংলা সাহিত্যের অনেক ঐতিহ্য ও সৃষ্টিশীল নিদর্শন আজও বিবর্তিত হয়ে চলেছে লোক-ঐতিহ্যের প্রবহমান ধারায়। এই লোকসাহিত্যেরই একটি বিশিষ্ট প্রকরণ হচ্ছে পালাগান। বাংলাদেশে পালাগান বা গীতিকাধর্মী রচনার ধারায় নতুন সংযোজন সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান। আমাদের দেশীয় ঐহিত্য ও আদর্শকে একান্তভাবে ধারণ ও বহন করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে বলেই এই পালাগান আমাদের জাতীয় জীবনেরও এক অমোঘ দলিল হিসাবে পরিগণিত।

আমরা জানি, সাধক আন্তোনিয়ো পালাগান অষ্টাদশ শতকের রচনা। তবে বাংলা লোকসাহিত্যের এই নমুনা এতদিন আমাদের অগোচরে ছিল। সেটা নিয়ে কারও গবেষণার দায়ভার ছিল না বলেই অধিকংশ মানুষের কাছে আজও অজানা রয়ে গেছে। এই পালাগানের যথাযথ চর্চা অব্যাহত রয়েছে বলেই তার আবেদন অনেক বেশি। তবে সেটা বিদগ্ধজনের গোচরীভূত করা হয়নি। অথচ আন্তোনিয়ো পালাগানে সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে সুবিশাল ধারা ও ঐতিহ্য রয়েছে, সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বাংলা ও বাঙালির একেবারে ঘরের সম্পদ এই পালাগানে খ্রিষ্টীয় সাধনার স্বরূপ অন্বেষণে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারি যে, সাহিত্যের শাখায় পালাগানের সমস্ত আদর্শকে ধারণ করে তার সঙ্গীতময়তাকে একটা সুনির্দিষ্ট রূপরেখায় প্রকাশ করেছে আন্তোনিয়ো পালাগান। সেই সঙ্গে খ্রিষ্টীয় জীবনাচরণের এক অনুপুঙ্ক্ষ বর্ণনায় এই পালাগান বাঙালি খ্রিষ্টানের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জীবন্ত স্বাক্ষর হয়ে উঠেছে। প্রায় সাড়ে চারশ বছরের পুরানা ধারা যখন এই দেশের মাটি-মানুষের সঙ্গে মিশে গেছে, তখন তাকে আর পরদেশি বলে দূরে সরিয়ে রাখার কোনো অর্থ হয় না। আমাদের সবারই উচিত এই সাহিত্য-সঙ্গীত মাধ্যমকে বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে খ্রিষ্টীয় সাধনার স্বরূপ

বাঙালি ধর্মপ্রাণ জাতি। যে-কোনো ধর্মাবলম্বী অধিকাংশ বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে তাঁর ধর্মবোধ এবং ধর্মীয় বিশ্বাস। ধর্মকে ঘিরে তাঁর ভক্তি প্রদর্শনের নানা মাধ্যমও সে অনায়াসে আয়ত্ব করে নেয়। বাঙালির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক– মোট কথা সার্বিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে তার ধর্মীয় ভক্তি প্রকাশের নানা অনুষঙ্গ। পূজা-অর্চনা, ভজন-আরাধনা ছাড়াও বাঙালি পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নানা ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ধর্মচেতনার এই সূত্র ধরেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে নানা রকমের গান মানুষের মধ্য থেকে সাধারণ মানুষ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। কালক্রমে এইসব গান জনসমাজে পরিচিতি লাভ করে এবং ধর্মীয় আচার-আচরণের অংশ হিসেবে মানুষের কাছে গৃহীত হয়। প্রাচীনকালে বাংলাদেশে শক্তির আরাধনার অস্তিত্ব ছিল। শক্তিদেবীর আরাধনার হাত ধরে বিস্তার লাভ করে শৈব সাধনা। এইসব আরাধনার জন্য সাধন-ভজনের কিছু পদ্ধতি প্রয়োজন ছিল। এই উপাসনার তাগিদেই মানুষ সুরের আশ্রয় নিয়ে কিছু কিছু গান রচনা করে। এই গানগুলি বাংলাদেশের আদি পর্যায়ের লোকসঙ্গীত। গান রচনা করে আরাধনার রীতি অনেকদিন প্রচলিত ছিল। সেই সূত্রে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে মনসার গান, শীতলার গান, শ্যামা সঙ্গীত, শাক্ত সঙ্গীত রচিত হয়েছে। অন্যদিকে তারও কিছুটা পরবর্তী সময়ে ইসলাম ধর্মের প্রভাবে ও প্রচারের ফলে ইসলামিক চিন্তাধারাকে আশ্রয় করেও কিছু গান রচিত হয়। তাদের মধ্যে পীরের গান, ময়নামতীর গান, দরবেশী গান– উল্লেখযোগ্য। একইভাবে বঙ্গদেশে যখন খ্রিষ্টধর্মের গোড়াপত্তন হয় তখন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাইবেলের বাহিনী, যিশু-খ্রিষ্টের জীবন এবং অনুকরণীয় খ্রিষ্টীয় সাধক-সাধিকাদের জীবন নিয়ে রচিত হয় পালাধর্মী বেশকিছু গান। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রচিত এই সব গানই একসময় লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গিয়েছে।

পালাগান গাওয়ানো

বাংলাদেশে নানা ধর্মীয় আরাধনার এমনই এক সঙ্গীতের নাম পালাগান। এই পালাগান সচরাচর কোনো উপাসনালয়ে করা হয় না। মানুষের বাড়িতে বা বারোয়ারি কোনো জায়গায়; যেখানে অনেক মানুষ সমবেতভাবে তার রসাস্বাদন করতে পারে এবং আধ্যাত্মিক সন্তোষ লাভ করতে পারে। উভয় বঙ্গেই এই ধরনের পালাগানের প্রচলন আছে। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র যেহেতু সীমাবদ্ধ এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের পালাগান, সেহেতু তার লক্ষ্য বাংলাদেশে হওয়াই সঙ্গত। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের একটি মন্তব্য স্মরণ করতে পারি। তিনি তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* নামক সংকলনের ভূমিকায় বলেছেন, “পূর্ববঙ্গে বিবাহাদি উৎসব, পূজাপার্বণ ও বারোয়ারি উপলক্ষে গায়েন

ডাকিয়া পালাগান দেওয়া হয়।"[১] ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক এখানে হিন্দুধর্মালম্বী মানুষের কথা বলেছেন। শুধু হিন্দুদের ক্ষেত্রেই নয়, বাংলাদেশে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এমনই উৎসব-কেন্দ্রিক পালাগানের প্রবর্তন হয়। এই বিশ্বাসের অভিব্যক্তি এখনও মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে।

পালাগান গাওয়ানোর রীতি

বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্ম বাইরে থেকে এলেও এখন আর কোনো আগন্তক ধর্ম নয়, বরং আস্তে আস্তে বাংলার মাটি ও মানুষের মধ্যে শক্ত ভিত গড়ে নিয়েছে। এই ধর্ম দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে যাবার প্রয়াসে যেমন আন্তরিক ছিল, এখনও তেমনই নিরলস। বাংলাদেশে ধর্মীয় ভক্তি-বিশ্বাস প্রকাশের রীতি-নীতি তথা উপাসনার পদ্ধতিতে বাংলা ও বাঙালি ঐতিহ্যের অনুবর্তন দেখা যায়। তাই খ্রিষ্টীয় উপাসনা ও নানা উৎসবের মধ্যে এদেশের মানুষ নানা অনুষঙ্গ একাত্মভাবে মিশে গেছে। খ্রিষ্টীয় লৌকিক ধর্মাচারের মধ্যেও দেখা যায় মানত করা, উপবাস করা, তীর্থে যাওয়ার মতো একান্তভাবে বাঙালির ধর্মীয় ও ধর্মবিশ্বাসকেন্দ্রিক নানা কর্মকাণ্ড। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানও তাই ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে একান্তভাবে মিশে আছে। অতএব এই গান গাওয়ানোর জন্য কয়েকটি ধাপে করণীয় কিছু লৌকিক কাজকর্ম এবং বিষয় রয়েছে। এবার সেই সম্বন্ধে আলোকপাত করা যাক।

মানত করা

জীবনে পারমার্থিক, এমন কি ইহলৌকিক অনুগ্রহ লাভের জন্য মানুষ ভগবান, ধর্মাবতার বা সিদ্ধ নারী-পুরুষদের কাছে নানা আবেদন করে তাঁর প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যে-কাজ সমাধা করে থাকে– তাকে মানত বলা যায়। 'ব্যবহারিক শব্দকোষ'-এ মানত-এর অর্থ করা হয়েছে, "অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য দেবতা পীর প্রভৃতির কাছে যাহা দান করিবার বা সাধন করিবার সঙ্কল্প করা যায়"।[২] পৃথিবীর অন্যান্য দেশেই নয়, বাংলাদেশেও ঠিক একইভাবে খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভক্তদের মধ্যে সাধু আন্তোনিয়োর কাছে মানত করার রীতি অনেক দিন থেকেই প্রচলিত। আমরা যেহেতু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি, সেহেতু সেই দেশের বিশেষত ঢাকা জেলার ভাওয়াল এলাকার খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভক্তদের মধ্যে সাধু আন্তোনিয়োর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের পদ্ধতিসমূহ আলোকপাত করব। আমরা আগেই জেনেছি, সাধু আন্তোনিয়োর সবচেয়ে বড় উৎসব-অনুষ্ঠান হয় ভাওয়াল এলাকার পানজোরা নামক জায়গায়। এই পানজোরায় সাধু আন্তোনিয়োর তীর্থ ও তার আনুষ্ঠানিকতা সম্বন্ধে অপূর্ব নিকোলাস ক্রুজ বলেছেন, "একটি বিষয় না বললেই নয় যে, তা হচ্ছে সারা বৎসর ব্যাপী অত্র ভাওয়াল অঞ্চলে ও দেশের অন্যান্য স্থানেও সাধু আন্তনীর নিকট মানত হিসাবে তাঁর নিকট ধন্যবাদার্থে তাঁর জীবনীভিত্তিক

১. শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, ভূমিকা. পৃ. ॥
২. কাজী আব্দুর ওদুদ (সঙ্কলিত) *ব্যবহারিক শব্দকোষ*, পৃ. ৮৪০

পালাগান চলে। এই উপলক্ষ্যে এলাকায় বেশ কয়েকটি পালাগানের দল রয়েছে, যারা পেশাভিত্তিক 'সাধু আন্তনীর পালাগান' করে থাকে।"[৩]

বাংলাদেশে ভাওয়াল এলাকার খ্রিষ্টভক্তগণ মানতকে 'মান্‌তি' বলে থাকেন। মানুষ নানা কারণে সাধু আন্তোনিয়োর কাছে মান্‌তি করে থাকেন। আমি প্রায় পাঁচশরও বেশি মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে জেনেছি যে, তাঁদের মানত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈষয়িক অনুগ্রহ লাভের জন্য। মানুষের ভক্তি-বিশ্বাস এবং চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ভরা এসব মানতের তালিকা দেখলে বেশ অবাক হতে হয়। সন্তানহীন দম্পতিরা সন্তান কামনায় মানত করেন। তবে অনেকেই পুত্র-সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন বেশি। গর্ভবতী মায়েরা তাঁদের গর্ভাবস্থায় সুস্থ সন্তান জন্মদানের জন্য আন্তোনিয়োর কৃপাভিক্ষা করেন। আবার যদি গর্ভকালীন কোনো সমস্যা থাকে, সেই সমস্যা নিরসণের জন্যও মানত করা বয়। খ্রিষ্টান পরিবারের ছেলেমেয়েরা যাতে ভালভাবে লেখাপড়া করতে পারে সেইজন্য মানত করার রেওয়াজ আছে। অন্যদিকে ছেলে যাতে ভাল চাকরি বা কাজ পায় কিংবা মেয়ের যাতে ভাল পাত্র জোটে সেই মানতও অনেকে করেন। বিত্তশালী পরিবারে দেখেছি সন্তান যেন বিদেশে পড়াশুনা করতে পারে বা স্বামী-সন্তান যেন বিদেশে কাজের সুযোগ পায়; তার জন্যও সাধু আন্তোনিয়োকে অনুনয় করা হয়। কোনো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেও মানুষ ধন্যবাদের জন্য সাধু আন্তোনিয়োর গান গাওয়ায়। কোনো অসুস্থতা থেকে নিরাময়ের জন্য, পরিবারে শন্তির জন্য, ব্যবসায় উন্নতির জন্য, কোনো শুভকাজে সাফল্য লাভের আশায় এবং নতুন বাড়ি করার সময়, জায়গা-জমি ও গাড়ি কেনার পরও সাধু আন্তোনিয়োর আশীষ চাওয়ার রীতি আছে। আবার যদি কোনো পরিবারের কোনো ছেলে পুরোহিত হতে যায়, কিংবা কোনো মেয়ে যদি ব্রতীয় জীবনে থাকে; তবে তাঁদের সুন্দর ও বিশ্বস্ত জীবন যাপনের জন্যও ঠাকুরের গান গাওয়ানো হয়ে থাকে।

আমি জীবনের প্রথম ঠাকুরের গীত শুনি আমাদেরই পাড়ার সাহেব বাড়ির আইন্তন রোজারিওর বড় সন্তান জুলিয়ান রোজারিও যখন রোম নগরীতে যাজকপদে অভিষিক্ত হন সেই সময়। সেটা ছিল ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ। সেই দিনের কথা আমার আবছা মনে আছে। সেটা ছিল বিকাল বেলা। গান পরিবেশন করছিলেন যোসেফ ডেঙ্গু কস্তা। সঙ্গে ছিলেন আমার বাবা পিটার পেরেজ (মাস্টার), যোসেফ রোজারিও (মাস্টার), পিতর কস্তা, জার্মান কস্তা (আমার পিসা মশাই)। এছাড়াও আরও কয়েকজন ছিলেন, তাঁদের কথা আমার মনে নেই। যাহোক দেখা যায় কোনো বাড়িতে স্বামী বা সন্তান যদি নেশাগ্রস্ত থাকে তবে নেশা থেকে মুক্তির জন্য বাড়ির কেউ আন্তোনিয়োর আরাধনা করেন। খ্রিষ্টভক্তদের এইসব আকাঙ্ক্ষা, বাসনা বা প্রার্থনা পূরণ হলে তাঁরা গায়েন ডেকে ঠাকুরের গান বা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য সেই উপলক্ষে বাড়ির আত্মীয়-স্বজনও নিমন্ত্রিত হন।

---

৩. অপূর্ব নিকোলাস ক্রুজ, 'ফিরে দেখা: নাগরী ধর্মপল্লী (১৬৯৫-২০০০)', নাগরী, নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, ২০০০, পৃ. ২১

মানত করার নিয়ম-কানুন

শুধু মানত করলেই নয়, ভক্তদের মানত করার কিছু নিয়ম-কানুনের কথা বলেছেন এই পালার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা। প্রথমতঃ সাধু আন্তোনিয়োর প্রতি ভক্তের আগাধ ভক্তি-বিশ্বাস থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত মনপ্রাণ এবং অন্তর পবিত্র না রাখলে মানতের যাথার্থ্য রক্ষিত হয় না বলে গায়েনদের দাবি। দুঙ্গু পণ্ডিত রচিত পালাগানের খাতায় ফাদার যাকেব ভূরা পালাগানের মানত সম্বন্ধে লিখেছেন, "যে ব্যক্তি গান মানত করিবে, সে তাহার উপবাস ও গীর্জ্জার কার্য্য নিজেই করিবে। ঈশ্বর ও আন্তোনিয়োর নিকট প্রগাঢ় বিশ্বাস সহকারে সকল বিষয় সম্পাদন করিবে। রবিবার উপবাস করিবে না। রবিবার গান করাইলে যে কোন দিন উপবাস করিবে।"[৪] যাঁরা মানত করেন তাঁদের বিশ্বাস সাধু আন্তোনিয়ো একজন জাগ্রত সাধু। তাঁর কাছে বর চাইলে তিনি কখনও মানুষকে নিরাশ করেন না। মার্ক ডি'কস্তা মানুষের এই বিশ্বাসের বিষয়টি সম্পর্কে যথার্যই বলেছেন, "আজো অবধি সাধু আন্তোনিয়ো আশ্চর্য কাজ করে যাচ্ছেন। তা না হলে লোকেরা কেন তাঁর কাছে মানত করে এবং ঠাকুরের গান গাওয়ায়। কেন তাঁর নামে কৃতজ্ঞতার খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করে।"[৫]

বায়না করা

মানত পূরণ হলে লোকেরা গান গাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমেই বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে তাদের সুবিধামতো গানের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। তবে তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই তারিখে গান না-ও হতে পারে। সেটা চূড়ান্ত করার জন্য গান গাওয়ানোর জন্য আগে গায়েনের কাছে গিয়ে বায়না করতে হয়। গায়েন বায়েনদের সুবিধে অনুসারেই সচরাচর গান করা হয়। তাঁরা সবাই সংসারী মানুষ। কৃষিকাজে এবং কেউ কেউ চাকরিসূত্রে নানা কাচে ব্যস্ত থাকেন। যদিও অপূর্ব নিকোলাস ক্রুজ বলেছেন, "এই উপলক্ষে এলাকায় বেশ কয়েকটি পালাগানের দল রয়েছে, যারা পেশাভিত্তিক 'সাধু আন্তনীর পালাগান' করে থাকে।"[৬] তবে সর্বক্ষণিক পালাগায়ক বা পেশাজীবী পালাগায়ক বলে কারও পরিচয় আমি পাইনি।

যাহোক, বিভিন্ন পেশায় যুক্ত গায়েন বায়েনদের গানের জন্য নিশ্চিতভাবে পাবার লক্ষ্যে আগে বায়না করার প্রয়োজন আছে। বায়নার সময় সামান্য টাকা দিতে হয়। তবে এই টাকা পালাগানের জন্য ধার্য মূল্যের মধ্যে পড়ে না। নির্দিষ্ট দিনে গান গাওয়ানোর জন্য গায়েনের সম্মতিসূচক যিনি গান করাবেন তাঁর সাধ্য অনুসারে ১, ২, ৫, ১০, ১৫ বা ৫০ টাকা দিয়ে বায়না করতে হয়। এই বায়না করার পর গায়েনকে তাঁর দলবল নিয়ে গানের জন্য যেতেই হবে। শত বাধা-বিঘ্ন, এমনকি মৃত্যুও নাকি এই সিদ্ধান্ত বদল করতে পারে না বলে জানিয়েছেন পালাগানের গায়ক। সাধারণত বায়নার পর গানের তারিখ পরিবর্তন

---

৪. পিটার ডমিনিক রোজারিও (দুঙ্গু পণ্ডিত), *শ্রীগুরু সাধু আন্তনীর চরিতামৃত*, (যোসেফ রোজারিও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি), পৃ. ১
৫. মার্ক ডি'কস্তা, *অলৌকিক কর্মসাধক পাদুয়ার সাধু আন্তনী*, পৃ. ২০-২২
৬. অপূর্ব নিকোলাস ক্রুজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

করা হয় না। তবে খুব বড় ধরনের সমস্যা থাকলে অন্যথা হতে পারে। পালাগানের দলের পক্ষে সচরাচর গায়েন বা দলের প্রধান গায়ক এই বায়না গ্রহণ করে থাকেন।

গানের খরচ

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে মোট বারটি পালা আছে। অধিকাংশ গায়েনই এই পালাকে 'পালি' বলার পক্ষপাতী। বর্তমানে প্রতি পালির জন্য দক্ষিণা হিসেবে একশ (১০০/-) টাকা করে নেওয়া হয়। প্রত্যেক পালির জন্য কেউ-ই ধার্যকৃত একশ টাকার বেশি কেউ নিতে পারবেন না। টাকার পরিমাণের এই সিদ্ধান্ত সাধু আন্তোনিয়োর তীর্থস্থান পানজোরায় খ্রিষ্টধর্মের কর্তৃপক্ষ তথা বিশপ, পুরোহিত, স্থানীয় পালক-পুরোহিত, নানা প্রতিনিধি এবং বেশ কয়েকটি গানের দলের গায়েন-বায়েন– সবাই একত্রে বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিয়েছেন। লোকেরা নিজেদের সামর্থ্য এবং মানত অনুসারে কম বেশি গান গাইয়ে থাকেন। আমি দেখেছি একজন মাত্র তিন পালা গান গাইয়েছেন।

অনেকে আবার নানা সময় ও পর্যায়ে মানত করেছেন অথচ সুবিধামতো গান গাওয়াতে পারেননি; তাই একসঙ্গে সবগুলি মানতের গান পরিবেশন করিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা হয়ত প্রতিটি মানতের সময় বার পালা করে গান করানোর অঙ্গীকার করলে দেখা যাবে তিনটি মানতের জন্য ছত্রিশ পালা গান করাচ্ছেন। একজন গায়ক আমাকে বলেছেন, একবার এক গৃহকর্তা নাকি একশ কুড়ি পালা গান গাইয়েছেন। এক্ষেত্রে হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে সাধু আন্তোনিয়োর মোট বার পালা গান আছে, সেখানে একশ কুড়ি পালা গান কিভাবে আসে? এই ধরনের বেশি পালার গান গাইবার সময় নির্ধারিত বার পালা গানই ঘুরে ফিরে গাওয়া হয়ে থাকে। তখন একবারই শুরুতে বন্দনা আর শেষে দোয়া গীত গাওয়া হয়।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের বন্দনা গাইবার জন্য আলাদা করে একশ (১০০/-) টাকা নেওয়া হয়। এই টাকাও প্রতি পালা গানের জন্য ধার্য টাকার হিসেবের সঙ্গে ধরা হয় না। শেষে 'দোয়া গীত' গাইবার সময় যে বাড়িতে পালাগান করা হয়, সেই বাড়ির সব সদস্য-সদস্যা গায়েনকে প্রণাম করেন। এই প্রণাম করাকে বাংলাদেশে 'সেলাম করা' বলা হয়ে থাকে। গায়েন সেলাম করার সময় বাড়ির বয়স্ক কর্তা থেকে শুরু করে শিশু পর্যন্ত সবাই গায়েনের হাতে টাকা-পয়সা দিয়ে থাকেন। এই প্রথা 'গায়েন সেলাম' বা 'ঠাকুর সেলাম' নামে অভিহিত। একবার এক পালাগানের আসরে গায়েনের হাতে সেই পরিবারের সদস্যকে আমি খেয়াল করেছি পাঁচশ টাকা দিতে দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের একজন বাচ্চা ছেলে মাত্র এক টাকাও দিয়েছে। গায়েন সেলামের এই টাকাও পালির টাকার হিসেবে পড়ে না।

আবার দোয়া গীতের সময় সামান্য চাল, পান, সুপারি এবং আলু– গানের বেদির সামনে রাখতে হয়। বেদির সামনে রাখা চালকে বলা হয় 'সিদ্ধা'। মানত বা মনষ্কাম পূর্ণ হওয়া বা সিদ্ধ হওয়ার অর্থে এই নাম প্রযুক্ত হতে পারে। অন্যদিকে গান

গাইবার পর এই চাল পবিত্র হয়েছে বলেও এহেন অভিধা অসঙ্গত নয়। এই চালের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য করা আছে। সিদ্ধার পরিমাণ সোয়া সের। চালের এই পরিমাণে সচরাচর হেরফের হবার উপায় নেই। এই চাল বেদির সামনে দিতেই হয়। তবে চাল ছাড়া পান, সুপারি, হলুদের গুড়া এবং আলু দেবার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সারা বছর গান করে যে চাল পাওয়া যায়, তা গায়েনের বাড়িতে গচ্ছিত রাখা হয়। বৎসরান্তে গায়েনের বাড়িতে এক বা দুই পালি গান করা হয়। গানের সময় গানের দলের সব গায়েন-বায়েন উপস্থিত থাকেন। এই গানের উদ্দেশ্য পরমপিতা ঈশ্বর, পুণ্যবতী কুমারী মারিয়া, প্রভু যিশু-খ্রিষ্ট এবং গানের উপাস্য সাধু আন্তোনিয়োকে বিগত বছরের জন্য জ্ঞাপন এবং নেতিবাচক কৃতকর্মের জন্য তাঁদের ক্ষমা প্রার্থনা। তার সঙ্গে অনাগত দিনের জন্য তাঁদের আশীর্বাদ চাওয়া হয়। এই গান গাইবার সময় সারা পৃথিবীতে এবং সব মানুষের মনে যাতে সত্যিকারের শান্তি, ক্ষমা ও প্রেম বিরাজ করে– সেই জন্যও বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হয়। গানের শেষে 'সিদ্ধা' চাল দিয়ে ভোজের আয়োজন করা হয়। অবশ্য সিদ্ধা চালের পরিমাণ কম হলে সাধারণ চাল দিয়েও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই ভোজে দলের গায়েন বায়েন ছাড়াও তাঁদের নিকট আত্মীয়েরা অংশগ্রহণ করেন।

গায়েন-বায়েনদের ব্যয়ভার

গানের সময় গায়েন-বায়েনদের খাবার দেবার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যারা গানের জন্য তাঁদের নিয়ে যান, তাঁদের মধ্যে কেউ যদি খাবারের ব্যবস্থা করতে চান, তবে করতে পারেন। এই ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সচরাচর যদি পালির সংখ্যা কম হয়, সেক্ষেত্রে খাবার দেবার দরকার পড়ে না। আর যদি গানের পালি বেশি থাকে, তবে গৃহকর্তা খাবারের বন্দোবস্ত করেন। কথাপ্রসঙ্গে গায়ক সুব্রত গমেজ বলেছেন, "সচরাচর যাঁরা গান গাইয়ে থাকেন তারা প্রত্যেকেই খাবারের আয়োজন করেন। আমার এত দিনকার গায়কী জীবনে মাত্র এক বাড়িতে খাবার দেওয়া হয়নি। তবে সেই বাড়িতে চা দেওয়া হয়েছিল।" সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান করা কষ্টকর। উঁচু বা চড়া সুরে গান গাইতে গায়ক এবং দোহাদের কষ্ট হয়। তাই মাঝে মাঝে চায়ের আয়োজন করা হয়। মাঝে মাঝে অনেক দূরে গানের জন্য যেতে হয়। সেক্ষেত্রে যাতায়াতের খরচ বহন করেন গৃহকর্তা। আর যদি রাতে থাকার প্রয়োজন পড়ে, তবে তার ব্যবস্থাও করেন বাড়ির মালিক। গানের দল কোনো জায়গায় গান গাইবার উদ্দেশ্যে যাত্রা কররে তাঁদের প্রায় সব দায়-দায়িত্ব যাঁর বাড়িতে গান করতে যাবেন তাঁর।

গানের পদ্ধতি

যেদিন গান গাওয়ানো হয়, সেদিন বা তার আগে থেকেই কিছু আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি হিসেবে গানের আসরের জন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করতে হয়। সচরাচর বাড়ির উঠানে গান গাইবার জন্য মনোনীত করা হয়। আবার অনেক সময় ঘরের বারান্দায়ও গান গাওয়ানো হয়। বর্ষাকালে বা নতুন ঘর আশীর্বাদের সময় গান করানো হলে সেটা হয়ে থাকে ঘরের মধ্যেই। তবে যিনি গান করান তাঁর বাড়ির বাইরে কখনও গানের আসর বসে না।

গানের আসরে একটি বেদি সাজানো থাকে। গান যদি বাড়ির উঠানে গাওয়ানো হয় তবে এই বেদিটি সাধারণত বাড়ির প্রধান ঘরের সামনে সাজানো হয়। এই বেদির দিকে মুখ করে গায়েন গান শুরু করেন। বেদিটি সচরাচর ছোট হয়ে থাকে। তবে পরিষ্কার সাদা রুমাল দিয়ে সেটা ঢেকে দেওয়া হয়। বেদির উপরে রাখা হয় সাধু আন্তোনিয়োর মূর্তি। দুঙ্গু পণ্ডিতের লেখা পালাগানের খাতায় ফাদার যাকোব ভূরা পালাগানের কয়েকটি নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতির কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, "গান আরম্ভ করিবার প্রার্থনা, গায়েন ও দোহার সকলে এক সাথে করিবে। সাধু আন্তোনিয়োর মূর্ত্তি আসরে রাখিয়া ভক্তি যুক্ত চিত্তে সাধুর গুণকীর্তন করিবে। যতক্ষণ গান করিবে ততক্ষণ সাধুর মূর্ত্তির নিকট আসরে প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবে।"[৭]

আন্তোনিয়োর মূর্তি ছাড়াও যিশু ও কুমারী মারিয়ার মূর্তি থাকতে পারে। তবে গানের সময় সাধু আন্তোনিয়োর মূর্তিই বেদিতে সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। মূর্তির পাশে রাখা হয় ফুল দিয়ে সাজানো দুটো ফুলদানি। ফুলের সঙ্গে মূর্তির পাশে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে। অনেক সময় বেদীতে ধূপ জ্বালানো হয়, ফলে এটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি হয়। তবে আরেকটি জিনিসের কথা উল্লেখ না করলেই নয়; সেটা হল যতক্ষণ গান গাওয়া হয় ততক্ষণ এই ছোট টেবিলের উপর এক জোড়া মন্দিরা বা ছোট কাঁসার করতাল থাকে। এই মন্দিরা গায়েনকে তাঁর ওস্তাদ দীক্ষার সময়ে দেওয়া। সেই জন্যই সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে শিষ্যকে দীক্ষা দেবার রীতিকে বলা হয় "মন্দিরা দেওয়া"।

যখন গান করা হয় তখন গায়েন প্রায় সারাক্ষণই দাঁড়িয়ে গান করেন। মাঝে মাঝে তিনি হাঁটু মুড়ে বসে গান করেন। অনেক সময় দুই হাত তুলেও গান করেন। তবে সভায় আর যেসব গায়েন-বায়েন থাকেন তাঁরা সব সময় বসে থাকেন। গান গাইবার সময় গায়েন বা মুখ্য গায়কের হাতে একজোড়া মন্দিরা থাকে। কেউ কেউ আবার হাতে রোজারি মালাও রাখেন। আমি সাভারের কমলাপুর গ্রামে এক বাড়িতে গানের সময় গায়েনের হাতে একটা বড়– আনুমানিক ছয় ইঞ্চি মাপের একটি ক্রুশমূর্তি দেখেছি। আর যে জায়গায় গান গাওয়া হয়, সেখানে মাথার উপর একটা ছোট চাঁদোয়া টাঙানো হয়। এই শামিয়ানা সচরাচর আসনের কাছাকাছি থাকে। এটি সাধারণত লাল ও সাদা রঙের হয়ে মিশ্রণে বানানো হয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো জায়গায় বেগুনি রঙের শামিয়ানাও পরিলক্ষিত হয়।

কোনো বাড়িতে বা আসরে যখন গান শুরু করা হয় তার একটু আগে থেকে দলের সবাই নীরবতা পালন করেন। প্রায় তিন মিনিট নীরবে প্রার্থনা করার পর আবার দলগত ভাবেও প্রার্থনা করা হয়। এই মিলিত প্রার্থনায় গানের আসরে যাঁরা উপস্থিত থাকেন তাঁরা সবাই অংশগ্রহণ করেন। এই প্রার্থনা নিতান্তই কিছু প্রথাগত মৌখিক প্রার্থনা। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। দুঙ্গু পণ্ডিতের লেখা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের খাতার দ্বিতীয় পাতায় লেখা আছে, "রচনাকারের যুক্তি মতে, গানের পূর্বে বা পরে প্রার্থনার নিয়ম এই– আসরে গায়েন ও দোহাত সকলে হাঁটু পাতিয়া ১২ বার প্রভুর প্রার্থনা, ১৩ বার

৭. পিটার ডমিনিক রোজারিও (দঙ্গু পণ্ডিত), *শ্রীগুরু সাধু আন্তনীর চরিতামৃত*, (যোসেফ রোজারিও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি), পৃ. ১

দূতের বন্দনা, ১৩ বার ত্রিত্বের জয় প্রার্থনা করিবে। গানের পরে আসরে জানুপাত করিয়া ১ বার প্রভুর প্রার্থনা, ১ বার দূতের বন্দনা, ১ বার ত্রিত্বের জয় বলিবে। যদি কেহ মানত করিতে চায় তবে ১ বার প্রভুর প্রার্থনা, ১ বার দূতের বন্দনা, ১৩ বার ত্রিত্বের জয় প্রার্থনা করিবে।"[৮] তবে আজকাল আর এতাবার প্রর্থনা করা হয় না। বেশির ভাগ জায়গায় গানের আগে এবং পরে একবার করে প্রভুর প্রার্থনা, দূতের বন্দনা, ত্রিত্বের জয়– প্রভৃতি প্রার্থনা করা হয়। এই প্রার্থনার পর গায়েন গান শুরু করেন। তবে মূল গানে প্রবেশের আগে আছে আবাহন। আন্তোনিয়ো পালাগানে 'আবাহন' শব্দের অর্থ হচ্ছে দেবতাকে আহ্বান জানানো। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে তার পদ্ধতি হচ্ছে– পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে গান শুরু করেই যথাক্রমে গায়েন এবং দোহারেরা দয়াল যিজুস, দয়াল ঠাকুর বা সাধু আন্তোনিয়ো এবং স্বর্গের রাণী কুমারী মারিয়াকে গানের আসরে আহ্বান জানান। তারপর গায়ক বন্দনা ছেড়ে মূল গানে প্রবেশ করেন।

গায়েন ও তার দল

পালাগান মৌখিক রীতির লোকসাহিত্য। গায়ক আসরে দঁড়িয়ে পরিবেশন করেন। গান গাইবার জন্য তাঁর নিজের একটা দল থাকে। এই বিষয়ে 'বাংলাপিডিয়া'র বলা হয়েছে, "পালাগানে একজন মূল গায়েন বা বয়াতি থাকেন। তিনি দোহারদের সহযোগে গান পরিবেশন করেন। এ গান কাহিনিমূলক হওয়ার কথোপকথন আকারে পরিবেশিত হয়।"[৯] এক্ষেত্রে স্মর্তব্য– যিনি পালাগান করেন তাঁকে গায়েন বলাই সঙ্গত। বয়াতি ও পালাগান করেন, তবে তার স্বরূপ আলাদা। শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক বয়াতির বিষয়ে বলেছেন, "বয়তীরা বিভিন্ন পালা হইতে নিজের পছন্দ মত গান সংগ্রহ করিয়া সেই গান ইচ্ছামত সুর দিয়া গান করেন, কোনো পালাই সমগ্র গান করেন না। অনেকে সমগ্র পালাটিও জানেন না।"[১০]

পালাগানের যিনি গায়েন তাঁর নিজের গানের দল থাকে। তিনি সেই দলের সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গান করেন। অন্যদিকে বয়াতির নিজস্ব কোনো গানের দল থাকে না। গানের আসর থেকেই কোনো মানুষ বয়াতির গানের সুর বা লহর টানেন। তিনি বেহালা, সারিন্দা বা দোতারা বাজিয়ে গান করেন। অথচ পালাগানের গায়কের হাতে এমন কোনো বাদ্যযন্ত্র থাকে না। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের গায়কের হাতে মন্দিরা বা কাঁসার ছোট করতাল দেখেছি। তিনি সেটা হাতে রাখেন মাত্র, বাজান না। কাজের সময় ক্লান্তি দূর করার জন্য যেসব গান করা হয়, অনেক বয়াতি সেসব গানের সঙ্গেও গান করেন। পালাগানের গয়েন সচরাচর এমন অবসর যাপনের লক্ষ্যে নিবেদিত গানের আসরে গান করেন না।

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ* (খণ্ড ৫), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ৩৯১
১০. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, ভূমিকা, পৃ. ॥

আন্তোনিয়ো পালাগানের গায়েন

আন্তোনিয়ো পালাগান করা একটা সম্মানের বিষয়। যাঁরা এই গান পরিবেশন করেন তাঁরা সমাজে বেশ শ্রদ্ধার পাত্র। বিশেষ করে প্রধান গায়ক বা গায়েনের একটা আলাদা প্রভাব থাকে। লোকেরা তাঁকে 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করেন। গায়েন এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন সবাই মনে করেন যে পালাগান করা হচ্ছে ঈশ্বরের কাজ করা। ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা। তাই তাঁর মধ্যে কিছু সুকোমল বৃত্তি বা গুণাবলী থাকা দরকার। তাঁর কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার এবং চিন্তা-ভাবনার মধ্যে একটা মার্জিত ভাব এবং বোধ থাকা প্রয়োজন। গায়ককে হতে হবে স্নেহপরায়ণ পিতার মতো। যে-কোনো মানুষ যাতে তাঁর কাছে সহজেই যেতে পারে। সামাজিক জীবনে তাঁকে সহজ সরল এবং কালিমাহীন হওয়া দরকার। জাগতিক ভোগবিলাস বর্জিত মানুষ হিসেবে তাঁর একটা পরিচয় থাকা জরুরি। তিনি হবেন গুরুনিষ্ঠ এবং দেবনিষ্ঠ। ঈশ্বরের প্রতি এবং বয়োজেষ্ঠ্যদের প্রতি তাঁর ভক্তিভাব থাকা বাঞ্ছনীয়। আমি সাধু আন্তোনিয়োর গানের লিখিত রূপের একটি পুরনো খাতায় দেখেছি 'ফাদার যাকেব ভূরার যুক্তি মতে সাধু আন্তনির গানের নিয়ম পদ্ধতি' নামক শিরোনামে লেখা আছে, "যাহারা সাধু আন্তনির পালাগান করিবে তাহাদের প্রত্যেককে ভাল কাথলিক হওয়া উচিৎ। ... আদর্শ খ্রীষ্টানের মতো গান করিবে। যাহাতে ধর্ম্মের কোনো অবহেলা না হয়। গান করা আনন্দ ও সাধু আন্তনির গুণ, যশ কীর্তন করা ও ঘোষণা করা, ঈশ্বরের মহিমার গৌরব করা।"[১১] এই পাণ্ডুলিপিতে গায়েনদের আচার-আচরণ সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। গান করার সময়, বিশেষ করে বিশ্রামের সময় কোনোরকম ধুমপান বা উত্তেজক কিছু সেবন বা পান করা যাবে না। ভক্তচিত্তে সাধু আন্তোনিয়োর একান্ত সেবকের মতোই গান করা দরকার বলে মনে করেন প্রথমযুগের সেই সমস্ত গায়েন আর বায়েনেরা।

তবে এইকথা অনস্বীকার্য যে, কোনো গায়ক গানে কতটা সফল সেটা নির্ভর করে শুধু তাঁর গান গাইবার দক্ষতায়ই নয়, চারিত্রিক গুণাবলীর উপরও। তবে গায়কের কাজ যেহেতু গান আর সুর নিয়ে, তাই তাঁর সাফল্যের সাধারণীকৃত বিচার হয় তাঁর কণ্ঠমাধুর্য, ছন্দবোধ, উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি, শাস্ত্রজ্ঞান, সঙ্গীতজ্ঞান, আকর্ষণীয় পরিবেশন, পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনা, আনন্দ দানের ক্ষমতা, ভাবগাম্ভীর্য– প্রভৃতির উপর। আবার সঙ্গীতরসজ্ঞ মানুষ গায়কের মধ্যে রসজ্ঞান, আখর সংযোজনায় পটুতা, বাদ্যযন্ত্র বা খোলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে গান করার ক্ষমতা, দোহার-বায়েনদের সঙ্গে তাল-মানের সামঞ্জস্য রেখে গান গাইবার দক্ষতা– প্রভৃতি গায়কী গুণাগুণ প্রত্যাশা করেন। আর যথার্থ গায়ক তাঁর শিষ্যের মধ্যেও এইসব গুণাবলী সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে বা বিকশিত হতে জোরালো ভূমিকা নিয়ে থাকেন। গায়েন তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্বন্ধে কতটুকু সচেতন, সেটাও তাঁর গানের আসরে ধরা পড়ে। সবাইকে নিয়ে সব বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ও সঙ্গতি বিধান করে গান গাইতে পারলেই গায়েন সফল।

---

১১. পিটার ডমিনিক রোজারিও (দুঙ্গু পণ্ডিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১

দোহার

পালাগান মৌখিক রীতির লোকসঙ্গীত। এই গান একা করা যায় না। তার জন্য একটা দল থাকে। দলে একজন প্রধান গায়ক বা গায়েন থাকেন। তিনি আরও কয়েক জনের সহায়তায় পালাগান করেন। এই বিষয়ে 'বাংলাপিডিয়া'য় বলা হয়েছে, "পালাগানে একজন মূল গায়েন বা বয়াতি থাকেন। তিনি দোহারদের সহযোগে গান পরিবেশন করেন।"[১২] অর্থাৎ পালাগান গাইতে গায়েনকে যাঁরা সহযোগিতা করেন তাঁদের দোহার বলা হয়। ভাওয়ালের খ্রিষ্টানদের মধ্যে অনেকেই দোহারকে 'দোয়ার' বলে থাকেন। দোহার আর দোয়ার মূলত একই অর্থ প্রকাশক। আমরা দেখি যে, 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' নামক অভিধানে দোহার বা দোয়ার শব্দের অর্থ করা হয়েছে, "যে সুর ধরাইয়া দেওয়া হইল তাহা দ্বিতীয়বার গাওয়া, সহকারী গায়ক (দোহার গাওয়া)।"[১৩]

দোহারগণ মূল গায়কের পরে গান করেন। বলা যায় কথা ও সুরে তাঁরা গায়েনকে অনুসরণ করেন। আন্তোনিয়ো পালাগানের প্রথমেই যে আবাহন বা পরম পিতা পরমেশ্বর, প্রভু যিশুখ্রিষ্ট এবং কুমারী মারিয়াকে গানের আসরে আহ্বান করা হয়েছে তখন গায়েন আগে গান, "আমার দয়াল যীজুস আয়", তারপর দোহারেরা একই সুরে একই কথায় গেয়ে ওঠেন, "আমার দয়াল যীজুস আয়"। দ্বিতীয়বার গায়েনের কণ্ঠে শুনি, "আমার দয়াল ঠাকুর আয়", দোহারেরা আবারও তাঁকে অনুসরণ করেন এবং গান "আমার দয়াল ঠাকুর আয়"। শেষবার যখন গায়েন সুর তোলেন "আমার স্বর্গের রাণী আয়", দোহারেরা তাঁর সুরের অনুবৃত্তি করেন "আমার স্বর্গের রাণী আয়" বলে। আবার ধুয়া গাইবার সময় যে-কোনো ধুয়া প্রথমে শুরু করেন গায়েন নিজে। ধুয়ার প্রথম বা প্রধান অংশটুকু গায়েন গাইবার পর দোহারেরা সেটা পুনর্বার গেয়ে থাকেন। আস্তে আস্তে গায়েন যখন গানে এগিয়ে যান তখন দোহারেরা মাত্র ধুয়াটি গান করেন। এক পর্যায়ে দোহারেরা ধুয়ার কিয়দংশ গান করেন। একটি উদাহরণ সহযোগে বর্ণনা করা যাক। 'আলাপন' নামক পালাগানে প্রবেশক অংশে আমরা দেখি গায়েন প্রথমে ধুয়া শুরু করেন এই অংশটুকু গেয়ে,

(গায়েন)	নিরাঞ্জন ভাব রে ভাই,	(দোহার)	নিরাঞ্জন ভাব।
(গায়েন)	নিরাঞ্জন ভাবিলে রে ভাই গো,	(দোহার)	পরকাল পাব, হায় হায় নিরাঞ্জন।[১৪]

দোহারগণ তাঁর পরে পরে এই পুরো ধুয়াটি গান করেন। অতঃপর গায়েন গানের কাহিনির মধ্যে দিয়ে সামনে এগিয়ে যান। তিনি পরবর্তী অংশ হিসেবে গান করেন।,

(গায়েন)	ওরে পরমপিতা পরমেশ্বর আমার	(দোহার)	পরম ঐ স্বর্গেতে।
(গায়েন)	আর কত রঙ্গে করছে খেলা আমার	(দোহার)	প্রভু নিরাঞ্জনে।[১৫]

১২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ* (খণ্ড ৫), পৃ. ৩৯১
১৩. কাজী আব্দুল ওদুদ (সঙ্কলিত) *ব্যবহারিক শব্দকোষ*, পৃ. ৪৮৩
১৪ সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
১৫. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

গায়েন এই দুই চরণ গাইবার পর দোহারেরা কিন্তু এই চরণদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি করেন না; তাঁরা তখন আবার পুরো ধুয়টি গেয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–

> নিরাঞ্জন ভাব রে ভাই, নিরাঞ্জন ভাব।
> নিরাঞ্জন ভাবিলে রে ভাই, পরকাল পাব, হায় হায় নিরাঞ্জন।[১৬]

এইভাবে কিছু অংশ গাইবার পর গায়েন কাহিনির দিকে আরও অগ্রসর হন এবং গেয়ে যান এবং দোহারেরা পুরো ধুয়ার শুধু অংশমাত্র গান করেন। গানের অংশ থেকে উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন–

(গায়েন)	ভাগ্যিমান ফ্রান্সিস ভক্তে পয়দা হয় ভুবনে,
(দোহার)	হায় হায় নিরাঞ্জন।
(গায়েন)	আরে নিরাঞ্জনের পুণ্যের কিরপা হইয়াছে তাহারে,
(দোহার)	হায় হায় নিরাঞ্জন।
(গায়েন)	তাহার রমণী ছিল আবার ভেরনিকা বিবি,
(দোহার)	হায় হায় নিরাঞ্জন।[১৭]

এই অংশে গায়েন প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম চরণ গাইবেন আর দোহারগণ শুধু "হায় হায় নিরাঞ্জন" অংশটুকু গাইবেন। পুরো গানে দোহারদের একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাঁদের পক্ষ থেকে পালাগানের গায়েনকে সহায়তার মধ্যেই গান সত্যিকারভাবে শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। উপস্থিত ভক্তমানুষও তার যথাযথ রস আস্বাদনে সমর্থ হন।

পাইল দোহার

পালাগানে গায়েনের পরই যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তিনি পাইল দোহার বা পাইল দোয়ার। গানের দোহারেরা যদি পুরো পালাগানটি স্মৃতিতে ধরে রাখতে না পারেন, তবে কোনো অসুবিধে নেই; কিন্তু পাইল দোহারকে পুরো গান জানাতেই হয়। অর্থাৎ গানের কথা তাঁর মুখস্ত রাখতেই হয়। গায়েনের সঙ্গে সঙ্গে বা পরে পরে গানের কথা বলে যাওয়াই তাঁর প্রধান কাজ। আমি সুব্রত গমেজের দলে যিনি দোহারের কাজ করেন সেই গাব্রিয়েল রোজারিওকে মাঝে মাঝে গায়েন গানের কথা ভুলে গেলে কথা এবং সুর ধরিয়ে দিতে দেখেছি।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের পুরো অংশই কিন্তু সুরে গাওয়া হয় না। মাঝে মাঝেই গানকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সুরেলা আবৃত্তির মাধ্যমে করা হয়। এই আবৃত্তির সময় বা কথায় গানের কাহিনি বলার সময় গায়েনের পরে পরে পাইল দোহার গানের কথা বলে যান। তাঁদের এই আবৃত্তির সময় অন্যান্য দোহার এবং বায়েনগণ নীরব থাকেন। গানের অংশ থেকে উদাহরণ টেনে বুঝিয়ে দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। গানের কাহিনিতে সুরে নয়, শুধু বলা হয়–

---

১৬. প্রাগুক্ত
১৭. প্রাগুক্ত

(গায়েন)	এমন কথা আইন্তন ভক্তে,	(পাইল দোহার)	যখনই কইল,
(গায়েন)	ছলনা কইরা শয়তান,	(পাইল দোহার)	লাগছে কহিবারে।
(গায়েন)	তোমার ধর্মঘর খানি,	(পাইল দোহার)	ফালাইয়া আইছ পাছে,
(গায়েন)	আমার ধর্মঘর খানি,	(পাইল দোহার)	আছে তোমার কাছে।
(গায়েন)	তুমি যাদু পড় ইস্কুল,	(পাইল দোহার)	আমার ধর্মঘরে।
(গায়েন)	এমন কথা দুই শয়তান,	(পাইল দোহার)	যখনই কইল,
(গায়েন)	অন্তরধ্যান দ্বারা আইন্তন,	(পাইল দোহার)	অন্তরে জানিল।[১৮]

বোঝার সুবিধের জন্য আমি এখানে কমা (,) চিহ্ন ব্যবহার করেছি। কমার আগের অংশটুকু বলেন গায়েন আর কমার পরের অংশটুকু বলেন পাইল দোহার। পাইল দোহারের হাতে কোনো কোনো সময় বাদ্যযন্ত্র থাকে। আমি কয়েকজন পাইল দোহারের হাতে মন্দিরা দেখেছি। পালাগানে তাঁর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

পালাগানের বায়েন

আমরা জানি পালাগান গাইবার জন্যই রচিত। পালার পুরো অংশ না গাইলেও অধিকাংশই গীত হয়। আন্তোনিয়ো পালাগানের কিয়দংশ আবৃত্তি করা হয়। অতএব যে-কোনো গানেই যদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা, হয় তবে গান এরও হৃদয়গ্রাহী এবং শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। বাংলা পালাগানে গায়েন, বায়েন, দোহার এবং শ্রোতা সবাই গানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। ড. দেবব্রত নস্কর বলেছেন, "মূল গায়ক, বাদকগণ, দোহার প্রমুখ সকলের সক্রিয় প্রচেষ্টায় হারমোনিয়াম, করতাল, কাড়া-নাকাড়া, খোল, ঝাঁঝর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সমষ্টিগতভাবে পালা আসরে গীত হয়।"[১৯] অন্যান্য বাংলা পালাগানের মতো সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় খোল, মন্দিরা বা কাঁসার ছোট করতাল, বাঁশি, দোতারা, হারমোনিয়াম ও তবলা। পালাগানের বন্দনায় গায়েন যখন গান করেন–

> গায়েন বায়েন ঠাকুর তুমি খুঁইজা লও চাই বর,
> হাতে লইও তারযন্ত্র গালায় মধুর স্বর।[২০]

তখন আমরা বুঝতে পারি যে গানের সঙ্গে বায়েনকেও গানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু গুরুএকা নন, তিনি পাইল দোহার, দোহার, বায়েন– সবাই সম্মিলিতভাবে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানকে সুন্দর ও শ্রুতিনন্দন করে তোলেন। তাঁরা সবাই মিলে একটি উদ্দেশ্য সাধন করেন, আর সেটা হল ঠাকুরের মহিমা কীর্তন।

মন্দিরা দেওয়া

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান গুরুমুখী গান। গুরুর কাছ থেকেই এই গান শিখতে হয় বা রপ্ত করতে হয়। তবে দলের প্রধান গায়ক বা গায়েন হতে হলে কোনো গুরুর অধীনে দলের সদস্য হিসেবে কয়েক বছর গান গাইতে বা কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজাতে

---

১৮. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
১৯. দেবব্রত নস্কর, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, নিবেদন, পৃ. চ
২০. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

হয়। এইভাবে গুরুর কাছে গানের তালিম নিতে নিতে যেদিন গুরু মনে করবেন যে তাঁর শিষ্য নিজেই গান করে আসার পরিচালনা করার উপযুক্ত, সেদিন তিনি তাঁকে দীক্ষা দেন বা মন্দিরা দেন।

এই মন্দিরা দেওয়ার জন্য একটা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করা হয়। তার জন্য বিশেষ প্রস্তুতির দরকার আছে। দিনক্ষণ ঠিক হলে যেদিন মন্দিরা দেওয়া হবে, সেদিন শিষ্যের বাড়িতে গ্রামের বা এলাকার বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ডাকা হয়। সবার সামনে শিষ্যকে গুরু জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি বিশ্বস্তভাবে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান করবেন কি না। তাঁর ইতিবাচক সম্মতি পেলে তিনি উপস্থিত সুধীজনকে প্রশ্ন করেন তাঁর গান গাইবার ব্যাপারে তাঁরা আগ্রহী কি না। যদি নতুন গায়েনের গানের মান নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট হন তবেই গায়েন তিনি তাঁকে দীক্ষা দিতে সম্মত হন। আনুষ্ঠানিক এসব প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলে একটি বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গুরু তাঁর শিষ্যের হাতে কাঁসার ছোট করতাল বা মন্দিরা তুলে দেন। এই মন্দিরা সমর্পণকে কেন্দ্র করে গানে দীক্ষা দেওয়ার অনুষ্ঠানের নাম হয়েছে 'মন্দিরা দেওয়া'। অনেক সময় গুরুশিষ্যকে তাঁর নিজের ব্যবহৃত রোজারি মালাও দান করে থাকেন। এই দানপর্ব শেষ হলে নতুন গায়েন উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সামনে দুয়েক পালি গান পরিবেশন করতে পারেন। শেষে সবাই মিলে এক আনন্দভোজে অংশগ্রহণ করেন। সেই দিন থেকে শিষ্য গায়েন হিসেবে গান গাইতে পারেন। মানুষের মানত পূরণের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন। শুরু হয় তাঁর ঠাকুরের জীবন।

আন্তোনিয়ো পালাগানের কয়েকজন গায়েন

আন্তোনিয়ো পালাগান পরিবেশনে গায়েনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা দেখেছি, তিনি ঠাকুর ভক্ত একজন মানুষ। এবার সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের কয়েকজন গায়েনের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। আমি বেশ কয়েকজন পালাগায়কের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের গায়কী জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জানতে পেরেছি। কয়েকজন দশ-বার বছর ধরে পালাগান করছেন। আবার এমন কয়েকজনও আছেন, যাঁরা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে গায়কের ভূমিকায় জড়িত। তাঁদের অনেকেই আগে গানের দলে দোহার বা বায়েন হিসেবে যোগদান করেছেন। পরবর্তীকালে ওস্তাদের অনুপ্রেরণায় এবং নিজের সাধ্য-সাধনার বলে গায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। গায়েনদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে জানতে পেরেছি, সব গায়েনই তাঁদের শিষ্যদের গান নিয়ে আশাবাদী। তাঁরা মনে করেন এই গান গাইবার দায়িত্ব পিতা-পরমেশ্বর এবং তাঁর ভক্ত-সাধক আন্তোনিয়োই তাঁদের দিয়েছেন। সারা বাংলাদেশে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের প্রায় কুড়ি জন গায়েন আছেন। তাঁদের সবার সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ হয়েছে। আমি তাঁদের বাড়িতে গিয়েছি। তাঁদের এবং পরিবার-পরিজনদের সাক্ষাৎকারও নিয়েছি। সত্যিই তাঁদের সহজ সরল জীবন-যাত্রা আমাদের সবার জন্যই অনুপ্রেরণাদায়ক। এই আলোচনায় আমি কয়েকজনের জীবনের কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

যোসেফ ডেঙ্গু কস্তা

যোসেফ কস্তা, ওরফে ডেঙ্গু কস্তা আমার জীবনে দেখা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের সবচেয়ে সফল ও সার্থক গায়েন। তাঁর বর্তমান বাড়ি নাটোর জেলার কালিকাপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম গুরুস্তনু ওরফে বাসি কস্তা। বাসি কস্তা তাঁর ডাক নাম। তবে আসল নাম বাসিল কস্তা। যোসেফ ডেঙ্গু কস্তার মা ছিলেন ভির্জিনিয়া গমেজ। ডেঙ্গু কস্তার জন্ম ঢাকা জেলার ভাওয়াল এলাকার বিখ্যাত চড়াখোলা গ্রামে। গান-বাজনার জন্য এই গ্রামের বেশ সুনাম রয়েছে। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। কুড়ি বছর বয়সে নাগরী ধর্মপল্লীর দোয়ানী গ্রামের লিলি ক্রুশের সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের কিছুদিন পর অন্যান্য লোকদের সঙ্গে ঢাকা ছেড়ে সেই সময়কার রাজশাহী জেলার বনপাড়া এলাকায় চলে আসেন।

ডেঙ্গু কস্তা প্রায় ষাট বছর ধরে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান করেছেন। গত বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শেষদিকে তিনি গান না গাইলেও গানের আসরে যেতেন। তাঁর শিষ্যের অনুরোধে মাত্র দুয়েক পালা গান করে আসর থেকে নেমে যেতেন। ডেঙ্গু কস্তা প্রথমে বায়েন হিসেবে গানের দলে যোগদান করেন। দলের বায়েন মৃত্যুবরণ করার ফলে তাঁর ওস্তাদ তাঁকে বায়েন হিসেবে দলে নেন। তাঁর গান শেখার উদ্দেশ্য ছিল না। দলের সদস্য হিসেবে তৃতীয় গানের আসরে তাঁর ওস্তাদ গানের কথা ভুলে গেলে তিনি নাকি ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে গানের কথাটা মনে করিয়ে দেন। তাঁর এই স্মৃতিশক্তির প্রমাণ পাবার পর ওস্তাদ খুবই প্রশংসা করেন। এই ঘটনার পরই তিনি নাকি প্রতিজ্ঞা করেন যে ডেঙ্গু কস্তাকে গায়েন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তারপরই ডেঙ্গু কস্তা চলে আসেন রাজশাহী জেলার বনপাড়া এলাকায়। বেশে কয়েক বছর পর তাঁর ওস্তাদ ঢাকা থেকে বনপাড়া ঘুরতে আসেন। তিনি এসে যোসেফ ডেঙ্গুকে তাঁর প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে সচেতন করে দেন। সেই সময় তিনি সম্মতি তাঁকে দিতে পারেননি। অতএব ওস্তাদ তখন তাঁর বাবা এবং গ্রামের প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রবীণদের পীড়াপীড়িতে ডেঙ্গু শেষে গান গাইতে সম্মত হন। ওস্তাদ একটা করে পালাগান শোনাতেন। সহজ সরল কৃষক ডেঙ্গু কস্তা সেটা নিয়ে সারাদিন চিন্তা করতেন। গুন গুন করে গাইতেন। এভাবে মোট বারটি পালা শোনানো শেষ হলে তিনিও গেয়ে শোনান ওস্তাদকে। পরে বনপাড়ার কয়েকজন লোক নিয়ে ওস্তাদই নাকি দল গঠন করে পরবর্তী কোনো এক সময়ে এসে দীক্ষা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঢাকা ফিরে যান। বছর দুই পরে তিনি পুনরায় বনপাড়া গিয়ে তাঁকে মন্দিরা দেন। এভাবেই কিছুদিন গাইবার পর পুরো গানের বিষয়টার প্রতি একটা ভাললাগা বোধ আসে। ভক্তিভাব জাগ্রত হয়। ডেঙ্গু কস্তা জীবনে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ পেয়েছেন তাঁর ওস্তাদের কাছ থেকে। এছাড়াও তাঁর বাবা-মা, এলাকার মাতব্বর, পাড়া-প্রতিবেশী লোকজন এবং স্ত্রীও অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা জুগিয়েছিলেন। তাঁদের উৎসাহ দেবার কারণ ছিল যে তাঁরা মনে করতেন সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান করা একটা ধর্মীয় দায়িত্ব। সেই গান গাইলে ধর্মপ্রচার করা হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা হয়। গায়েনকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করেন এবং তাঁর গান প্রচারের ফলে পরিবারের সার্বিক মঙ্গল সাধিত হয়।

ডেঙ্গু কস্তা কাঁর গায়কী জীবনে যে সব সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন তার মধ্যে তাঁর প্রাথমিক সঙ্কোচটাই ছিল প্রধান। সবসময়ই নাকি তাঁর মনে হত যে, তিনি কি গান ঠিকমতো গাইছেন তো? কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে না? মানুষ তাঁর গান কি পছন্দ করে? মানুষ তাঁকে কি ভাবে? এমনই হাজারো প্রশ্ন তাঁর মনে উদয় হত। গান করতে গেলে তো সেই দিন আর বাড়ির কোনো কাজ করা যায় না। মাঝে মাঝে বেশ একটানা কয়েক দিনের জন্য বাইরে গিয়ে থাকতে হয়। তাতে বাড়ির কাজে ব্যাঘাত ঘটলেও তেমন ক্ষতি নাকি কোনোদিনই হয়নি। তবে বাইরে গেলে তাঁর খুব বাড়ির চিন্তা হত। অথচ তাঁর কাছে আশ্চর্যের মনে হয় যে তাঁর অনুপস্থিতিতে বাড়িতে কোনোদিন কোনো সমস্যা হয়নি। তাঁর বিশ্বাস ঠাকুরই তাঁর সমস্ত অমঙ্গল দূর করে দিতেন। তিনি বলেছেন, তাঁর বাড়িতে মোট সাতবার চুরি হয়েছে। কিন্তু অবাক হবার বিষয় যে, সেই সাতবারই তিনি বাড়ি থাকতেই চুরি হয়েছে; গানের জন্য বাইরে থাকার সময় নয়।

ডেঙ্গু কস্তা তাঁর দীর্ঘ গায়কী জীবনে নিজের এলাকার সাতটি গ্রাম ছাড়াও বোর্ণী, মথুরাপুর এবং রাজশাহী, দিনাজপুর, ঢাকার শহরের বিভিন্ন এলাকাসহ মঠবাড়ি, চড়াখোলা, সাভার, আঠারগ্রামের নানা জায়গায় গান করছেন। বাংলাদেশের বাইরে, অর্থাৎ ভারতেও তিনি তিন বার গান করতে গিয়েছেন।

সুব্রত গমেজ

নাটোর জেলার বনপাড়া গ্রামের সুব্রত গমেজ গায়েন হিসেবে দল পরিচালনা করছেন আজ প্রায় কুড়ি বছর। তিনি প্রথমে তাঁর ওস্তাদ ডেঙ্গু কস্তার দলে খোল বাদক হিসেবে যোগ দেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুব্রত গায়েন হিসাবে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছেন। এলকার সবাই তাঁর নম্র ও ভদ্র কথাবর্তা এবং ব্যবহারের তারিফ করেন। আমি যত জন গায়েন দেখেছি, তাঁদের মধ্যে সুব্রত গমেজ বয়সে সবার চেয়ে ছোট।

যোসেফ ডেঙ্গু কস্তা সুব্রতর গানের গলা গুনে তাঁকে অনুরোধ করেন তিনি যাতে গানটা শিখে নেন। প্রথম দিকে তাঁর শেখার ব্যাপারে আপত্তি ছিল। তিনি বেশ কয়েক মাস সময় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, বয়স্ক ব্যক্তিদের পরামর্শ, পিতামাতার অনুমতি এবং স্ত্রীর সম্মতির পর গান গাওয়ার জন্য ওস্তাদের কাছে অঙ্গীকার করেন। সুব্রতর গলার কাজ খুব সুন্দর। তিনি গানের সুরে ও কথায় আনায়াসে ভক্তদের মোহিত করতে পারেন। তাঁর ভাষা পরিষ্কার, সুললিত এবং শ্রুতিমধুর। অথচ তাঁর কিন্তু তথাকথিত শিক্ষা নেই বললেই চলে। আমার জানা মতে সুব্রত গমেজ পালাগায়কদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সবচেয়ে কম শিক্ষিত। তিনি তৃতীয় শ্রেণি অবধি পড়াশুনা করেছেন। কিন্তু গানের পরিবেশনে সুব্রতর সমকক্ষ কোনো গায়ক কী নাটোর, কী ঢাকা কোথাও আমার চোখে পড়েনি।

সুব্রতর ওস্তাদ ডেঙ্গু কস্তা আলাপকালে আমাকে তাঁর অনুগত শিষ্য সম্পর্কে বলেছেন যে, সুব্রত খুব শান্তমনের মানুষ। গানের ব্যাপারে তাঁর ঐকান্তিকতা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। একাগ্রচিত্তে গান করাই যেন তাঁর জীবনব্রত। শিষ্য হিসাবে তাঁর জীবনের আদর্শ যদি কেউ বহন করে থাকেন– তিনি সুব্রত। সুব্রত গমেজ নিজের বনপাড়া এলাকা ছাড়াও বোর্ণী, মথুরাপুর, দিনাজপুর, ঢাকা, সাভার বান্দুরা, গোল্লা, যশোহর– প্রভৃতি এলাকায় গান করেছেন। উত্তরাঞ্চলে সাধু আন্তোনিয়োর পালাগানের দলের মধ্যে সুব্রত গমেজের দলই সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে বলে জানা গেছে।

সুনীল পেরেরা

গাজিপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার অধীন চড়াখোলা গ্রামের সুনীল পেরেরা গায়েন হিসেবে আঠার বছর যাবত একটি গানের দল পরিচালনা করছেন। তাঁর পিতা সিরিল পেরেরা তাঁকে গানবাজনায় উৎসাহ দিতেন। এছাড়াও তাঁর নিজেরই গ্রামের জন গমেজ তাঁকে সব সময় অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন। নিজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্তোতিরাও তাঁর এই গান পরিবেশন করার বিষয়টিকে অন্তর থেকে সমর্থন করেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

সুনীল পেরেরার ওস্তাদ হচ্ছেন রাঙামাটিয়া গ্রামের সিলভেষ্টার ছিলু পালমা। তাঁর দলে মোট আটজন সদস্য আছেন। চারজন খ্রিষ্টান এবং দুই জন হিন্দু। হিন্দু সদস্যরা বায়েনের ভূমিকায় পালাগানের দলে আছেন– একজন হারমোনিয়াম এবং অন্যজন খোল বাজান। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের দলে সচরাচর খ্রিষ্টান ছাড়া অন্য ধর্মালম্বী মানুষ থাকে না। তবে সুনীলের দলে এই দিক থেকে একটা স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। তিনি প্রিপ্রাশৈর, উলুখোলা, ছাইতান, করান, দোয়ানী, ভাদার্তী– এলাকায় পালাগান করেছেন। তিনি এবং তাঁর দল সাধু আন্তোনিয়োর নামে প্রচলিত দশ পালার গান পরিবেশন করে থাকেন। তাঁর মতে, দশ পালা গানই অন্যান্য জায়গায় বার পালা বলে প্রচলিত এবং গীত।

আন্তনি রোজারিও (বাদু আন্তনি)

নাগরী ধর্মপল্লীর তিরিয়া গ্রামের বাদু আন্তনি রোজারিও একই সঙ্গে নিজেকে সাধু আন্তোনিয়োর প্রকৃত শিষ্য এবং তাঁর শিষ্য হবার অযোগ্য বলে মনে করেন। তাই তিনি 'বাদু আন্তনি' বলে নিজের পরিচয় দেন। তাঁর নাম এখন বাদু আন্তনি বলেই গৃহীত এবং পরিচিত। তাঁর দুই ছেলে এবং চার মেয়ে। তিনি বিগত ষাট বছর যাবত পালাগানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তবে মূল গায়েন হিসেবে আছেন পঁয়তাল্লিশ বছর। তাঁর দলে গায়েন বায়েন মিলে মোট সাতজন সদস্য। তাঁর মতে যেহেতু পালাগানে সাত বালকের গান গাইবার প্রসঙ্গ আছে– তাই তিনি দলে সাতজন সদস্য রাখার পক্ষপাতী। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান গুরু-শিষ্য পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে। এই বিচারে আমরা দেখি যে, বাদু আন্তোনিয়োর গুরু হচ্ছেন নাগরীর তিরিয়া গ্রামের নিকোলাস রোজারিও ওরফে নিক্‌লা। নিকোলাসের গুরু মানুয়েল পিউরীফিকেশন। তাঁর বাড়ি নাগরীর অধীন ছাইতান গ্রামে। মানুয়েলের

গুরু আবার তিরিয়া গ্রামেরই যোয়াকিম যোয়া ভক্ত। যোয়াকিম ভক্তের গুরু করান গ্রামের গাব্রিয়েল গায়েন ওরফে গাবু। এই গাব্রিয়েল গায়েন আনুমানিক ১৮৭০ সালের দিকে গান করতেন বলে বাদু আন্তনির অভিমত। তাঁর নিজেরও দুই জন শিষ্য রয়েছেন।

বাদু আন্তনি নিজের এলাকা ছাড়াও তুমিলিয়া, রাঙামাটিয়া, মাউসাইদ, মঠবাড়ি, নাগরী, শুলপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল— প্রভৃতি জায়গায় গান করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁর গানের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের বাড়ির মঙ্গল এবং দেশ ও দশের কল্যাণ সাধিত হয়। আন্তোনিয়োর গানের ফলে পরিবারে ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং মানুষ বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পায়। অন্যান্য গায়েনের মতো তাঁরও অভিমত যে সাধক আন্তোনিয়ো পালাগান পরিবেশন করার মাধ্যমে যিশুর বাণী প্রচার করা হয়।

বার্ণাড রোজারিও (পোর্‌হা)

বার্ণাড রোজারিও মানুষের কাছে 'পোরহা' বলেই বেশি পরিচিত। 'পোরহা' কথার অর্থ হচ্ছে 'পোকায় খাওয়া'। তাঁকে কেন এই নামে ডাকা হয় তা তিনি জানেন না। অনেক সময় কেউ যদি ছোটবেলা প্রায়ই অসুস্থ থাকে, তবে তাকে গ্রামদেশে এমন অভিধা দেওয়া হয়। তিনি তাঁর ওস্তাদ বাদু আন্তোনিয়োর সঙ্গে গান করেছেন চার-পাঁচ বছরেও বেশি সময়। তবে ওস্তাদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে বিগত আঠার বছর ধরে তিনি নিজেই দল গঠন করে গায়েন হিসেবে গান পরিচালনা করছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন,

> পানজোরার সাধু আন্তোনিয়োর গান আমার চলার পথে শক্তি যোগায়। তাঁর গান নিয়েই আমি বেঁচে আছি। এই গান শেখার জন্য আমি অনেক বছর ওস্তাদের পেছনে ঘুরেছি। তখন সবকিছুর মধ্যেই যেন আন্তোনিয়োর অস্তিত্ব অনুভব করতাম। গান শিখে পানজোরায় এক পর্বদিনে প্রথম গান করতে দাঁড়াই। বাজনা শুরু হতেই আমি গানের কথা মনে করতে পারছিলাম না। কিছুই গাইতে পারিনি সেদিন। আমার জ্বর এসে যায়। এই খবর পেয়ে ওস্তাদ চলে আসেন। পরের দিন স্বপ্নে দেখি সাধু আন্তোনিয়ো যেন আমার বাঁ দিক দিয়ে চলে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, আমি যাতে ভয় না পাই; বরং গান চালিয়ে যাই। স্বপ্নেই আমি তাঁকে বলি, 'তুমি আমার কণ্ঠে এসে ভর কর ঠাকুর, আমি গান করব।' সেই থেকে আজ পর্যন্ত ঠাকুরের গান করেই যাচ্ছি। তিনিই আমাকে দিয়ে গান করিয়ে নিচ্ছেন। আমি তাঁর উপলক্ষ মাত্র।[২১]

বার্ণাড রোজারিওর জীবনে মন্দিরা দেওয়া নিয়ে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাঁর ওস্তাদ বাদু আন্তোনিয়ো তাঁকে প্রথমে মন্দিরা দিতে চাননি। তাঁর কথানুসারে পরবর্তীকালে ওস্তাদ তাঁকে মন্দিরা দেবার আগেই একটা ছোট ছেলে এক জোড়া মন্দিরা নিয়ে এসে তাঁর বাড়িতে সাধু আন্তোনিয়োর আলতারে রেখে চলে যায়। সেই ছেলের কোনো পরিচয় তিনি নিজে এবং তাঁর পরিবারেরও কেউই জানতেন না। সেই থেকে তাঁর বিশ্বাস সাধু আন্তোনিয়োই তাঁকে মন্দিরা দিয়েছেন। তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে গান পরিবেশনের আপ্রাণ চেষ্টা করেন বলে জানিয়েছেন।

---

২১. বার্নাড রোজারিও, সাক্ষাৎকার, নাগরী, গাজিপুর, ৩ মার্চ ২০১৫

অরুণ কোড়াইয়া

এই পর্যন্ত মৌখিক রীতির পালাগানের গায়েনদের নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এবার লিখিত রূপের পালাগানের গায়েন সম্বন্ধে আলোকপাত করা যেতে পারে। লিখিত গানের এবং দল বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। এইদিক থেকে একমাত্র ব্যতিক্রম অরুণ কোড়াইয়া। তিনিই আন্তোনিয়ো পালাগানের লেখ্যরূপ পরিবেশন করেন।

ঢাকা তুমিলিয়া এলাকার বোয়ালি গ্রামের কোড়াইয়া পরিবারের সন্তান অরুণ কোড়াইয়া ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হিলারি কোড়াইয়া ছিলেন বোয়ালি ডাকঘরের কর্মকর্তা। ছোটবেলা থেকেই তিনি খ্রিষ্টীয় গানের সঙ্গে জড়িত। মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করতে যাবার সব ব্যবস্থা হবার পরও তিনি যেতে পারেননি। পরবর্তীকালে তিনি পালাগানের গানের দলে ভিড়ে যান। গত পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি কষ্টের গান এবং বৈঠকি গানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তুমিলিয়া গির্জার এলাকায়, বিশেষ করে বোয়ালি গ্রামে তাঁর গানের যথেষ্ট কদর আছে।

অরুণ কোড়াইয়া দুঙ্গু পণ্ডিতের লেখা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান পরিবেশন করেন। তিনি এবং একমাত্র তাঁর দলই সারা বংলাদেশে দুঙ্গু পণ্ডিত রচিত লিখিত রূপের গান গেয়ে থাকেন। অরুণের ওস্তাদ ছিলেন প্রয়াত জর্জ গমেজ। তিনিই তাঁকে গানের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছেন। ওস্তাদ ছিলেন তাঁর বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই জর্জ গমেজ দুঙ্গু পণ্ডিতের সাক্ষাৎশিষ্য। তিনি স্বয়ং পণ্ডিতের কাছ থেকে এই গান লিখে নেন। আর জর্জের কাছ থেকে লিখে নেন তার শিষ্য অরুণ কোড়াইয়া। তিনি পালাগানের গায়েন হয়েছেন প্রায় পঁচিশ বছর আগে। অবশ্য তার আগে থেকেই তিনি সাধু আন্তোনিয়োর এই পালাগানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অরুণ কোড়াইয়া নিজের ভাওয়াল এলাকা ছাড়াও ঢাকা শহর, বান্দুরা, নাটোর– প্রভৃতি জায়গায় গান গাইতে গিয়েছেন। দুঙ্গু পণ্ডিতের রচিত গানের মোট বাইশটি পালা। পুরো গান গাইতে তিনদিন সময় লাগে বলে জানিয়েছেন অরুণ কোড়াইয়া। তাই তিনি সম্পূর্ণ গানটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে নিয়েছেন। সেই লেখা কম্পিউটারে ছেপে নিয়ে তিনি গান পরিবেশেন করেন। তাঁর এই কাজে সহায়তা করেছেন চড়াখোলা গ্রামেরই খ্রিষ্টসাহিত্য অনুরাগী সুনীল পেরেরা।

লিখিত রীতির পালাগান গাইবার ব্যাপারে অরুণ কোড়াইয়ার মনে একটা আত্মসম্মানবোধ আছে। তিনি মনে করেন যে, তিনিই পালাগানের আসল রূপটি টিকিয়ে রেখেছেন। তাঁর মতে যেহেতু গানটি লেখা আছে, তাই তার মধ্যে কোনো অবাস্তব কাহিনি অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। বই থেকে সঠিক তথ্য নিয়ে গান রচিত হয়েছে বলে তাঁর অভিমত। তিনি নিজের পরিবেশিত পালাগানের ভবিষ্যত নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের সাঙ্গীতিক ও সাহিত্যিক মূল্য

সাহিত্যিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ের সাহিত্যকে আমরা বলতে পারি মার্গসাহিত্য বা লিখিত সহিত্য। আর দ্বিতীয় ভাগটিকে বলা যায় লোকসাহিত্য বা মৌখিক সাহিত্য। এখানে মার্গসাহিত্য বলতে আমি লিখিত সাহিত্য বা শিষ্টসাহিত্যকে বুঝিয়েছি। তবে একথা ঠিক যে, লোকসাহিত্যের মধ্যেও ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের উচ্চতর আদর্শের দিকগুলি প্রতিফলিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় লিখিত সাহিত্য ও মৌখিক সাহিত্য তথা লোকসাহিত্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। লিখিত সাহিত্য ব্যক্তি প্রতিভা দ্বারা সৃষ্ট। ব্যক্তিমানুষ তার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এই সাহিত্য রচনা করেন। সাহিত্যে কোনো স্রষ্টা বা লেখক যতই নৈর্বক্তিক থাকার চেষ্টা করুন না কেন– সেই সাহিত্যে তাঁর একান্ত নিজস্ব শিল্প-কুশলতার পরিচয় থাকবে। অন্যদিকে লোকসাহিত্যের বেলায় আমরা দেখি– কোনো লোককবি বা গায়েন বা রচয়িতা নিজে সেই সাহিত্যের গোড়াপত্তন করলেও সেখানে তাঁর ব্যক্তিজীবনের চেয়ে গোষ্ঠীজীবনের ছবিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিজীবন স্বতন্ত্ররূপে আমাদের সামনে ধরা দেয় না। সেখানে তাঁর সাধনা একার নয়, সেটা সবাইকে নিয়ে সমষ্টির সাধনা। সমাজের সামগ্রিক জীবনই সেই সাহিত্যে বাণীরূপ লাভ করে।

পালাগানের সঙ্গীতময়তা

পালাগান একই সঙ্গে পালা এবং গান। যদিও পালাগান অনেকাংশে আখ্যানধর্মী রচনা, তবুও তার মধ্যে সাঙ্গীতিক গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সবচেয়ে বেশি। আমরা জানি, পালাগান মূলত লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীতের মতোই তার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে গীত হওয়া। লোকগীতি আকারে সংক্ষিপ্ত বা ছোট বলে আমাদের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব হয়। তবে গীতিকা বা পালাগানের মতো দীর্ঘ রচনার ক্ষেত্রে সেই কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কেননা সেক্ষেত্রে তার মধ্যে সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য না থাকলে স্মৃতিতে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় পাশ্চাত্য এবং বাংলা পালাগানের যে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্য দেখা যায়, তা হচ্ছে তার গীতিময়তা বা সঙ্গীতধর্মিতা। পাশ্চাত্য সমালোচক ম্যাথিউ জন কাল্ডওয়েল হডগার্ট বলেছেন,

> The ballads are incomplete without music. They cannot be achieved their full effects unless they are sung to their own particular tunes, and they cannot be understood historically unless their relationship to music is understood. Despite the wonderful narrative technique of the ballads and their occasional richness of symbolism, they are relatively thin in poetic texture, but their musical setting adds considerably to their richness and profundity.[২২]

---

২২. M. J. C. Hodgart, *The Ballads*, London: Hutchinson University Library, 1950, p. 46

হডগার্ড এখানে বলতে চেয়েছেন যে, কথার সঙ্গে সুরের মেলবন্ধন ছাড়া পালাগান যথার্থ্য লাভ করতে পারে না। আবার সমালোচক রবার্ট গ্রোভস ব্যালাডের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাতে তার সঙ্গীতধর্মিতাই প্রাধান্য পায়। তিনি বলেছেন, “It is incomplete without music, music of a repetitive kind that exists and sustains, The ballad proper is best understood not primarily as a narrative poem or song, but as a song and chorus evolved by the group mind of a community.”[২৩]

রবার্ট গ্রোভস এখানে হডগার্টের অনুরূপ উক্তি করে বলেছেন, সুরহীন কোনো পালাগানের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এই ক্ষেত্রে তিনি পালাগানের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তার গীতিময়তাকে। সুরে নিবন্ধ এই দীর্ঘ পালাগান তার সঙ্গীতধর্মিতার জন্যই স্থায়িত্ব লাভ করে এবং মানুষের মনে আবেদন সৃষ্টি করে। তিনি এ-ও মনে করেন যে, পালাগানের সুরের সঙ্গে দলগত গানের প্রাসঙ্গিকতাও মিশে থাকতে পারে। অতএব পালাগান কারও একা গাইবার জন্য নয়, দলগতভাবে গাইবার জন্যই রচিত। প্রায় একই অভিমত প্রকাশ করে গর্ডন হল জেরাল্ড বলেছেন, “... a ballad is always a narrative, is always sung to a rounded melody.”[২৪] জেরাল্ড ঠিকই বলেছেন যে, পালাগান আখ্যানধর্মী রচনা। তবে পালা আবৃত্তি করা বা পাঠ করার চেয়ে গানের মাধ্যমে উপস্থাপন করাই বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে মারিয়া লিচের মন্তব্য– “Almost without exception ballads were sung, often they were accompanied by instrumental music.”[২৫] মারিয়া লিচ এখানে পালাগানের সঙ্গীতধর্মিতার কথা বলতে গিয়ে তার সঙ্গে প্রায়ই যে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবে পাশ্চাত্য ব্যালাডের সঙ্গে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র আধুনিক প্রতীচ্য বাদ্যযন্ত্রের মতো এত জটিল নয়, বরং সেগুলো ধাতব তার ও পশুর চামড়ার তৈরি এক ধরনের সরল যন্ত্র। মোট কথা, মারিয়া লিচ মনে করেন, কোনো অবস্থায়ই পালাগান গীত হওয়া ব্যতিরেকে পরিবেশিত হতে পারে না বা হওয়া উচিত নয়। তাতে তার গীতিধর্মিতা ক্ষুন্ন হয়।

পাশ্চাত্য ব্যালাডের মতো বাংলা পালাগানও গাইবার জন্য রচিত। গান হলেই তাতে বাদ্যযন্ত্র থাকবে। তাই পালাগানও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গাওয়া হয়ে থাকে। তবে পালাগানের যন্ত্রানুষঙ্গ দেশীয়। প্রধানত খোল, করতাল, দোতারা এবং হারমোনিয়ামই তাতে প্রাধান্য পায়। তাই পাশ্চাত্য সমালোচকের কথার প্রতিধ্বনি করে বাংলার বিশিষ্ট লোকসাহিত্য বিশারদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, “গীতিকা সর্বত্রই গীত হয়, কোথাও কেবল মাত্র আবৃত্তি করা হয় না: গীতের সঙ্গে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রও প্রায়ই ব্যবহার করা হইয়া থাকে।”[২৬] সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে সুরের ভূমিকা অনেক। এখানে সুরে গান গাইবার ফাঁকে ফাঁকে

---

২৩. Robert Groves, *The English Ballad*, London: Oxford University Press, 1927, p. 9
২৪. Gordon Hall Gerould, *The Ballad of Tradition*, Oxford: The Clarendon Press, 1932, p. 3
২৫. Maria Leach, *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*, New York: The Macmillan Company, 1949, p.107
২৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪০২

পাইল দোহারের সাহায্যে আবৃত্তির মাধ্যমে অনেকখানি অংশ উপস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় খোল, মন্দিরা বা কাঁসার ছোট করতাল, বাঁশি, দোতারা, হারমোনিয়াম। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের বন্দনায় আমরা শুনি,

জানি বা না জানি গীত লইলাম বান্দিয়া,
এই গীত গাইব আমার ঠাকুর আসিয়া।
গায়েন বায়েন তুমি খুঁইজ্যা লও চাই বর,
হাতে লইও তারযন্ত্র গালায় মধুর স্বর।[২৭]

অতএব গায়েন-বায়েন সম্মিলিতভাবে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান পরিবেশন করেন।

পালাগানের সুর

পালাগান সঙ্গীত, এবং লোকসঙ্গীত। সুরের মাধ্যমে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। আমাদের লোকসঙ্গীতের সুরের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য সত্যিই বিঃস্ময়কর। সুরের জন্যই এই গানগুলি মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। অথচ আমরা দেখি যে, আমাদের লোকসঙ্গীতের সুরের আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে। এই দেশের সমালোচক এবং পণ্ডিতেরা লোকসঙ্গীতের উপলক্ষ, বাণীরূপ, সাহিত্যগুণ, সঙ্গীতে প্রতিফলিত সমাজ-জীবন– প্রভৃতি কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই তার আলোচনা দেখা যায়। বাংলা লোকসঙ্গীতের সুর নিয়ে যথাযথ আলোচনা আজও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। দেহ আর প্রাণের সমন্বয়ে যেমন মানব দেহের সম্পূর্ণতা, তেমনি বাণী এবং সুরের যথার্থ ও সুন্দর মেলবন্ধনে শিল্পসার্থক সঙ্গীতের সৃষ্টি। বাংলাদেশের পালাগানের সুর নিয়ে অধিকাংশ সমালোচকই তেমন কোনো সমালোচনা করেননি। এখানে সমালোচকগণ সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ নন। তাই তাঁদের পক্ষে সঙ্গীতের সুর নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। অতএব তাঁরা পালাগানের সুর, তাল, লয়, মাত্রা– ইত্যাদি সাঙ্গীতিক বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেননি।

এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক। তিনি পূর্ববঙ্গের নানা জায়গায় ঘুরে পালাগান সংগ্রহ করার সময় পালাগানের গায়েন, বায়েন ও বয়াতীদের সঙ্গে আলাপ করে সেগুলোর সুর, তাল, লয় ও ছন্দ– সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ও আলোচনা করেছেন। বাংলা লোকসঙ্গীতের যত সুর আমরা শুনতে পাই, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সর্বাপেক্ষা প্রচলিত সুর হচ্ছে ভাটিয়ালি। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক ভাটিয়ালি সুরের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, "পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পল্লীকবিগণ যে সুরে গান রচনা করিয়া গিয়াছেন সেই সুরটিকে 'ভাটিয়ালী' বলা হয়।"[২৮] ভাটিয়ালি একান্তভাবেই পূর্ববঙ্গের প্রচলিত লোকসঙ্গীত। আর পূর্ববঙ্গ, অর্থাৎ অধুনা বাংলাদেশের কথ্যভাষার উচ্চারণভঙ্গির উপরই নির্ভর করে ভাটিয়ালি সুরের প্রাণময়তা। তবে এই দেশের সব জায়গায় কিন্তু এই ভাটিয়ালি গানের সুরের মধ্যে সামঞ্জস্য বা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

২৭. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
২৮. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, ভূমিকা, পৃ. ॥

ভাটিয়ালি সুর একটিই; তবে তার ধাঁচ কিন্তু আলাদা। তাই একেক অঞ্চলে একই ভাটিয়ালির একেকটি ধাঁচ প্রচলিত। আঞ্চলিকতার উপর ভিত্তি করে এই সুরের পাঁচটি ধাঁচের কথা জানা যায়। এগুলি হচেছ– সুষঙ্গী, ভাওয়াইল্যা, বিক্রমপুইর‌্যা, বাখরগইঞ্জ্যা ও গোপালগইঞ্জ্যা। সমালোচক জানিয়েছেন, "এই ধাঁচের পার্থক্য কিন্তু গানের ছন্দ রচনার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে গায়কের কণ্ঠস্বর, উচ্চারণভঙ্গী ও শিক্ষার উপরে।"[২৯] তারই ফলশ্রুতিতে সব গায়ক সব ধাঁচের গান গাইতে পারেন না। অন্য কথায় বলতে গেলে, এক এলাকার গায়ক অন্য এলকার গানের সুর সবসময় সঠিকভাবে রপ্ত করতে পারেন না। তার কারণ হিসেবে বলা যায় যে, কোনো বিশেষ এলাকার গায়ক যে বিশেষ উচ্চারণ ভঙ্গিতে অভ্যস্ত, তাঁর কণ্ঠস্বর হয় সেই এলাকার ধাঁচের বাহক। অতএব তিনি বিশেষ একটি অঞ্চলে প্রচলিত ধাঁচের সুরে গান গাইবার অনায়াস দক্ষতা অর্জন করেন। অন্য অঞ্চলের ধাঁচের সুর আয়ত্ব করতে হলে তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়।

ভাটিয়ালি গানের প্রত্যেকটি ধাঁচে আবার চারটি করে 'লহর' আছে। এই লহরগুলি হল– বিচ্ছেদ, সারি, ঝাঁপ ও ফেরুসাই। এই লহরকে অনেকেই 'টান' বলে থাকেন। এই কথা স্মরণ রাখা দরকার, লহর কিন্তু গানের ছন্দ রচনার উপর নির্ভর করে। তার ফলে দেখা যায়, পালাগানের অভিজ্ঞ গায়েন বা গায়ক গানের ছত্রের শব্দগুলি একটু এদিক ওদিক করে সেগুলির সঙ্গে হারে, হারে রে, হায়, হায় রে, ও হায়, মরি হায়, ঐ, ঐ না, ঐ যে, না, হেই না, হেয় না, ও না, আর, আরে, সে, গো– প্রভৃতি নিরর্থক শব্দ যোগ করে লহরের ছন্দ মিলিয়ে নেন। তার ফলে অভিজ্ঞ গায়েন ভাটিয়ালি সুরে রচিত পালাগান যে-কোনো লহরে গাইতে পারেন। ভাটিয়ালি সুরে বাংলার সবচেয়ে বেশি লোকগীতি রচিত হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলা দেশে ভাটিয়ালি সুরে তাই পালাগান বা গীতিকাগুলি শিল্পসার্থক হয়ে উঠেছে।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের অধিকাংশ সুরই ভাটিয়ালির ধাঁচে রচিত। এই সুরগুলি কোনো গায়েনের একান্ত নিজের সৃষ্টি বলে মনে হয় না। আমার মনে হয়, প্রচলিত সুর নিয়েই আন্তোনিয়ো পালাগানে সুর সংযোজিত হয়েছে। আন্তোনিয়োর সম্পূর্ণ পালাগানটির মধ্যে পঁচিশ (২৫) রকম সুরের নির্দেশিকা রয়েছে।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "... প্রত্যেক দেশের গীতিকা-সমূহ গীত হইয়া থাকে। ইহার সুর গতানুগতিক বলিয়াই বৈচিত্র্যহীন, বাহির হইতে বিবেচনা করিলে একঘেয়ে বলিয়া বোধ হইতে পারে। ... সুর গীতিকার লক্ষ্য নহে: কাহিনীই ইহার লক্ষ্য, সুর তাহার আশ্রয় মাত্র। সেই জন্য আনুপূর্বিক গতানুগতিক সুরে গীত হওয়া সত্ত্বেও ইহা শ্রোতৃবর্গের অপ্রীতিকর বলিয়া বিবেচিত হয় না।"[৩০] সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের ক্ষেত্রে ড. ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। এই পালায় অনেক সুরের সমাহার লক্ষ্য করা যায়। সুরের এই বৈচিত্র্য আমাদের অবাক করে বৈকি। এই পালায় কাহিনিটি আনুপূর্বিক।

---

২৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০৩
৩০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪০২-৪০৩

তার মধ্যে গল্প আছে ঠিকই, কিন্তু তার বিকাশ ঘটে না। তবে তার সুরের কারুকাজ আমাদের মোহিত করে। ড. ভট্টাচার্যের কথার প্রতিধ্বনি করে ড. চিত্তরঞ্জন দেব বলেছেন, "গীতিকা বা লোক-গীতি-কথায় সুর অপেক্ষা কাহিনীই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এর গায়কী ভঙ্গী বা ধারা যে সর্বত্র প্রায় একইরূপ- একথা লোকগীতির বেলায় খাটে না।"[৩১] লোকসাহিত্যের এই বিশেষজ্ঞদ্বয়ের কাছে যদিও পালাগানের সুর অপেক্ষা কাহিনি প্রাধান্য এবং আনুকূল্য পায়, তবুও আমাদের আলোচ্য সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে দেখি সুরেরই জয়জয়কার। সুর যে পালার কাহিনিকে উপভোগ্য করে তুলেছে, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

পালাগানের ধুয়া

বাংলায় "ধুয়া' শব্দটি এসেছে 'ধ্রুব' শব্দ থেকে। 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' নামক অভিধানে ধুয়া সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "গানের যে পদ বার বার গাওয়া হয়"। একই সঙ্গে 'ধুয়া ধরা' অর্থ করা হয়েছে, "গানের ধুয়া গাওয়া"।[৩২] পালাগানে প্রচলিত ধুয়া সম্বন্ধে ধারণা দিতে গিয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "সুদীর্ঘ কাহিনীমূলক গীতির বৈচিত্র্যহীন সুরের একঘেয়েমি দোষ দূর করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে দোহার কর্তৃক ধুয়া ধরিবার রীতি প্রচলিত আছে, তাহাকে ঘোষাও বলে, শুদ্ধ ভাষায় তাহা ধ্রুবপদ বলিয়া পরিচিত। লোকসাহিত্যের অন্তর্গত কাহিনীমূলক রচনা গীতিকার ক্ষেত্রে ইহা ব্যাপকভাবে প্রচলিত।"[৩৩] বাংলায় যাকে আমরা ধুয়া বলি ইংরেজিতে তাকে বলা হয় refrain। Refrain-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

> A line or part of a line, or a group of lines, which is repeated in the course of a poem, sometimes with slight changes, and usually at the end of the each stanza. The refrain occurs in many ballads and work poems, and is a frequent element in the Elizabethan songs, where it may be merely a non-verbal carrier of the melodic line. ... A refrain may consist of only a single word—or of an entire stanza. The stanza refrain occurs in a song, as a section to be sung by all the auditions, it is called the chorus.[৩৪]

এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কোনো গান বা কবিতার মধ্যে পুনরাবৃত্তিমূলক এক বা একাধিক চরণকেই সাধারণভাবে ধুয়া বলা যায়। এই ধুয়ার চরণ মাঝে মাঝে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। তবে সচরাচর স্তবকের শেষে ধুয়া গাওয়া হয়। পালাগান বা ব্যালাড ছাড়াও এলিজাবেথীয় ইংরেজি সাহিত্যের গানে তার ব্যবহার দেখা যায়। মাঝে মাঝে একটি শব্দেরও ধুয়া হতে পারে। আবার পুরো একটা স্তবকের ধুয়াও দেখা যায়। তবে একথা স্মরণ রাখা দরকার দরকার যে, ইংরেজি refrain আর বাংলা ধুয়ার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও তাদের চরিত্রগত মিল আছে বলে যাবে না। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "ধুয়ার

---

৩১. চিত্তরঞ্জন দেব, *বাংলার লোক-গীত-কথা*, পৃ. ৪
৩২. কাজী আব্দুল ওদুদ (সঙ্কলিত) *ব্যবহারিক শব্দকোষ*, পৃ. ৫০২
৩৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ২৫
৩৪. H. H. Abrams. *A Glossary of Literary Terms*, p. 176

পদ সাধারণতঃ একটি মাত্র হইয়া থাকে, ইহার অধিক হয় না, ইহা অনেক সময় গীত-বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত না হইলে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। কিন্তু refrain-এ অনেক সময় অধিক সংখ্যক পদও থাকে এবং পদগুলি গীত-বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত হয়।”[৩৫]

ধুয়া গাইবার উদ্দেশ্য

পালাগানে ধুয়া গাইবার নানবিধ কারণ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত ধুয়া মূল গায়ককে গানের মাঝে বিশ্রাম দেয়। আমরা জানি পালাগান গাওয়া সময় সাপেক্ষ। গান সম্পন্ন হতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। মাঝে মাঝে একেকটি পালাগান শেষ হতে দুই-তিন দিন সময় লাগে। অতএব গানের মধ্যে ধুয়া গায়ককে বিশ্রামের অবকাশ দান করে। দ্বিতীয়ত যারা পালাগান শুনতে আসেন তাঁদের মনে ভাবাবেগ সৃষ্টি করতেও গানে ধুয়া ব্যবহার হয়। শ্রোতাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা-সঙ্কুল ও ঘাত-প্রতিঘাতময় অবস্থায় তাঁদের হৃদয়ে পালাগান যথাযথ ভাবের অনুভূতি জাগায়। তৃতীয়ত কাহিনিধর্মী দীর্ঘ পালাগানের ক্ষেত্রে ধুয়া সুরের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়নে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। কাহিনিমূলক দীর্ঘ পালাগানে অনেক সময় সুরের একঘেয়েমি এসে পড়ে। ধুয়া সেই পুনরাবৃত্তি নিরসনে সহায়তা করে। পালাগানে ধুয়া ব্যবহারের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে পালাগানের বিশেষজ্ঞ শ্রী বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন,

> গীতিকায় ধুয়া বা refrain ব্যবহৃত হয় নানা উদ্দেশ্যেই। ... প্রথমতঃ গীতিকায় বর্ণিত কাহিনীর পরিবেশকে সমৃদ্ধ করতে ধুয়ার সহায়তা গ্রহণের নিদর্শন মেলে। দ্বিতীয়তঃ গীতিকার গল্পরসকে সমৃদ্ধ করতেও ধুয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালান করে। তৃতীয়তঃ আপত অসংলগ্ন বলে বিবেচিত যে ধুয়া তা রিলিফের কাজ করে, অনেকটা ট্রাজেডিতে ব্যবহৃত ট্রাজিক রিলিফের মত। চতুর্থতঃ একটানা কাহিনী পরিবেশিত হলে যেখানে শ্রোতার আকর্ষণ হ্রাস পাবার সম্ভাবনা ছিল, সেখানে ধুয়ার ব্যবহারে কাহিনীর ধারাবাহিকতা ব্যহত হওয়ায় আকর্ষণ তথা কৌতূহল বৃদ্ধি পায় বা অটুট থাকে। ... পঞ্চমতঃ ক্ষেত্র বিশেষ গীতিকায় পরিবেশিত কাহিনীর যে মেজাজ, ধুয়াকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত মেজাজের করে রচনা ও ব্যবহার করায় গীতিকায় এক প্রকার বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি ধুয়া বিশেষ অনুভূতিকে জাগ্রত করে এবং সুর ও লয় সংযোগে গীত ধুয়া কাহিনীকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করে তোলে।[৩৬]

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে ধুয়া

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে ধুয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এখানে অনেকগুলি ধুয়াগীত আছে যা পালাগানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধুয়াগুলি পালা থেকে আলাদা নয়, বরং পালার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিবেচিত। শ্রী বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, “ধুয়া ব্যবহারের নির্দিষ্ট কোনো রীতি নেই। তবে সচরাচর প্রতিটি স্তবকের শেষে তা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আবার কখনও কখনও স্তবকের মধ্যেও ধুয়ার ব্যবহার লক্ষিত হয়।”[৩৭] তবে আন্তোনিয়ো পালাগানের ক্ষেত্রে সমালোচকের এই উক্তি প্রযোজ্য নয়। আন্তোনিয়ো পালাগানে আমরা দেখি যে, প্রায় প্রতিটি ধুয়াই প্রথমে গাওয়া হয়। অন্যকথায় বলা যায় যে ধুয়া দিয়েই কোনো স্তবক বা অংশের শুরু হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রথমেই আসি বন্দনা অংশে ধুয়ার ব্যবহার

৩৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪০৬
৩৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*, পৃ. ১০৮
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

প্রসঙ্গে। আন্তোনিয়ো পালাগানে বন্দনা বেশ দীর্ঘ। এই বন্দনার শুরুতেই বলা হয়েছে, "আমি পরথমে বন্দিয়া গামু যীজুসের চরণে,/ আমার ঠাকুরের চরণে গো যীজুসের চরণে।"[৩৮] এই চরণ দুইটি প্রতিটি বন্দনার পরই ধ্রুবপদের মতো ফিরে আসে।

আলাপন নামক অংশটির মাধ্যমে আমরা আন্তোনিয়ো পালাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। এই আলাপনের শুরুতেই গায়েন গান করেন, "নিরাঞ্জন ভাব রে ভাই, নিরাঞ্জন ভাব,/ নিরাঞ্জন ভাবিলে রে ভাই, পরকাল পাব, হায় হায় নিরাঞ্জন।[৩৯] এখানে 'পরম পিতা পরমেশ্বর" যিনি "পরম ঐ স্বর্গেতে" থেকে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন– তিনিই নিরঞ্জন। এই পৃথিবীতে তিনি যা করেন, তা সবই তাঁর অপার লীলা। তাই গায়েন বলেন, "কত রঙ্গে করছে খেলা আমার প্রভু নিরাঞ্জনে"। এই নিরঞ্জন সর্বশক্তিমাণ। তিনি সবকিছুই করতে পারেন। তিনি মানুষকে "মারিয়া জিয়াইতে" পারেন; আবার "পাহাড় ভাইঙ্যা দইরা করিবারে" পারেন। তিনি শুধু শক্তিধর প্রভু নন, তিনি আপন মহিমায় মহীয়ান, ফলে "অপার তো মহিমা পিতার বুঝন না যায়।" এইভাবে পিতার ঈশ্বরত্বের পরিচয় জ্ঞাপক প্রতিটি পদের পরই উপরোক্ত দুই চরণ "নিরাঞ্জন ভাব রে ভাই, নিরাঞ্জন ভাব,/ নিরাঞ্জন ভাবিলে রে ভাই, পরকাল পাব, হায় হায় নিরাঞ্জন"– ধুয়া গাওয়া হয়। গায়েন যখন পিতা-পরমেশ্বরের ঐশ্বরিক সত্তার বর্ণনা দিতে দিতে আইন্তন ঠাকুরের পিতামাতা ফ্রান্সিস ভক্ত এবং ভেরনিকা বিবির এই দুনিয়ায় "পয়দা" হওয়ার কথা ঘোষণা করেন, তখন প্রত্যেক পদের পর দোহারেরা গেয়ে ওঠেন, "হায় হায় নিরাঞ্জন"। ভক্ত এবং বিবির ধার্মিকতার পরিচয় দেওয়ার প্রসঙ্গে গায়েন বলেন যে, তাঁরা দুই ভক্ত মিলে সর্বদা নিরঞ্জনের কথা ভাবেন বা ধ্যান করেন। তবে নিরঞ্জন ভাবনায় শুধু ফ্রান্সিস এবং ভেরনিকাই নন, গায়েনও তাঁদের মতো নিরঞ্জনের নাম জপ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে বলেন, "আমার মনে সাধ হইছে আবার প্রভু দেখিবারে"। কেননা তাঁর একান্ত বিশ্বাস, এই নিরঞ্জনই আমাদের ভবসাগর পার করবেন; আর পরজীবনে স্বর্গে স্থান দেবেন। অতএব পরকাল পাবার প্রত্যাশায় আমাদের প্রত্যেকেরই যে নিরঞ্জনের নাম স্মরণ করতে হবে, এইকথা গায়েন তাঁর ধুয়াতেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

'তপস্যার পালা'য় দুই শয়তান যখন ফ্রান্সিস ভক্ত আর ভেরনিকা বিবির প্রভুর নাম শরণ প্রতিহত করতে নানাভাবে চেষ্টা করে; তখনও ভক্তের কথার অনুরণন করে গায়েন ধুয়ায় বলেন, "গুরুর নাম জপিতে না দিল,/ সামনে আছে দুইটি শয়তান সেই তো ভাঙ্গি দিল।"[৪০] তারপর ভক্তকে সমস্যায় ফেলতে দুই শয়তানের নানা পরিকল্পনার কথা শোনা যায়। আর প্রত্যেক পরিকল্পনার পর পর ধুয়া হিসেবে গাওয়া হয় "রে গুরুর নাম জপিতে না দিল" অংশটি। এখানেও মূল ধুয়ার দুইটি চরণ থেকে মাত্র একটি চরণ পরবর্তী অংশের সঙ্গে গাওয়া হয়। আমরা পালাগানে শুনি শয়তানের কথায়, "বারো রবির জ্বালা লমু আকাশে সাজাইয়া", তার পরই গায়েনের ধুয়া, "রে গুরুর নাম জপিতে না দিল"। আবার শয়তান বলে, "সেই জ্বালা ছইড়া দিমু এই

৩৮. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৪০. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

শহরের মাঝে", সঙ্গে সঙ্গে ধুয়া, "রে গুরুর নাম জপিতে না দিল"। এভাবে আমরা দুই শয়তানের পরিকল্পনায় ফ্রান্সিস ভক্ত আর ভেরনিকা বিবির উপর ভবিষ্যতের নানা বিপর্যয়ের একটা সম্ভাব্য ছবি দেখি, যা ধুয়ার সাহায্য নিয়ে গায়েন আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

'দুস্কের পালা' নামক অংশে শয়তান ছলনার আশ্রয় নিয়ে "কালখিদ্যা লাগাই দিল ঐ বিবির উদরে"। ক্ষুধার কষ্টে ভেরনিকা বিবি কাঁদতে শুরু করেন। ফ্রান্সিস ভক্ত বিবির জন্য খাবার আনতে যান "বাবুর্চি খানার ঘরে"। কিন্তু সেখানে গিয়ে "খানা পানি কিছু নাই তাহা দেখতে পায়"। ভক্তকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে দেখে বিবি তাঁকে ভর্ৎসনার সুরে বলেন, "তোমার উদর করছ ঠাণ্ডা ঐ বাবুর্চি খানার ঘরে,/ বিবি বইলা মনে নাই এই জগতের মাঝে।/ এই বইল্যা দয়ার বিবি লাগছে কান্দিবারে।"[৪১] এখানে বিবির কান্না বড় করে দেখানোর জন্য গায়েন ধুয়া হিসেবে গান করেন, "বিবি কান্দে গো" কথাটি। বিবির কান্নার ফলে বিশ্ব-প্রকৃতি ভারাক্রান্ত। গানের ভাষায়–

দুইটি নয়নের জল গো দেয় গো বরিষণ,
বিবি কান্দে গো।
বিবির কান্দনে যেমন বৃক্ষের পত্র ঝরে,
বিবি কান্দে গো।
ভাইটায় ছিল নালা নদী ফিরে উজান তরে,
বিবি কান্দে গো।[৪২]

এই "বিবি কান্দে গো" ধুয়াটি শুনতে শুনতে আমাদের মনেও বিবির জন্য এক ধরনের কষ্টবোধ জাগে। শ্রোতাদের বিবির দুঃখে একাত্ম করার লক্ষ্যেই এই ধুয়া রচিত হয়েছে। একই পালায় আরও দুই বার এই ধুয়া ব্যবহৃত হয়েছে। দুই বারই দেখি বিবির জন্য খাবারের খোঁজে গিয়ে ভক্ত যখন বিফল হয়ে ফিরে আসেন। তবে গানের কথার ক্ষেত্রে খুব একটা হেরফের নেই। বিষয়বস্তু হচ্ছে "অন্নের পিয়াসে পরাণ বিবির ছটফট করে"। 'দুস্কের পালা'য় আমরা জানতে পারি স্বর্গে পরম পিতা তাঁর দূতকে ফ্রান্সিস ভক্ত আর ভেরনিকা বিবির কাছে প্রেরণ করেন এই বলে যে, তাঁরা যদি স্বর্গের দেবকে যথাযথ আতিথেয়তায় খুশি করতে পারেন তবেই তাঁরা তাঁদের এই কষ্ট থেকে নিস্কৃতি পাবেন। পিতার কথামতো স্বর্গের দেব যখন ভক্তের বাড়িতে এসে হাজির হন তখন গায়কের কণ্ঠে আমরা শুনি, "আইল স্বর্গের দেব জয়ধ্বনি দিয়া গো,/ আইল স্বর্গের দেব যীজুস নাম লইয়া।[৪৩] একই পালায় আরও একবার এই ধুয়া প্রয়োগ করা হয়েছে যখন ভক্ত অনেক কষ্ট করে নিজেরা অভুক্ত থেকেও স্বর্গের দূতের জন্য খাবার জোগাড় করে আনেন তখন। দূতের পরিতৃপ্তির আভাস দিতেও এই ধুয়া জোরালো ভূমিকা নেয়। আর এক সময় সেটা যেন সমগ্র পালাগানে স্বর্গদূতের আগমনধ্বনি হিসাবে প্রতিধ্বনিত হয়।

---

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৪২. প্রাগুক্ত
৪৩. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

দুই ভক্তের বিশ্বাস অটল দেখে স্বর্গের প্রভু-ঈশ্বর তাঁদের কষ্ট লাঘব করেন এবং প্রচুর ধনসম্পদে সমৃদ্ধ করেন। তবে তাঁদের ঘরে কোনো সন্তান না থাকায় তাঁদের মনে একটা শূন্যতাবোধ ছিল। তাই তাঁরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যাতে তাঁদের ঘরে এক পুত্র-সন্তানের জন্ম হয়। তই 'জন্মের পালা'য় দুই ভক্ত ভগবানের কাছে সন্তান চেয়ে 'জুইড়্যাছে রোদন'। ভক্তের এই ক্রন্দন যে গায়েনরই ক্রন্দন। গয়েন তখন ধুয়া ধরেন, "আর দয়া করে, আস গো দয়াল যীজুস,/ দয়া করিয়া মোরে দাও গো এই বর দান।"[৪৪] অতপর গায়েন, যখন দুই ভক্তের সাধ্য-সাধনার কথা সুরে সুরে গান করেন তখন দোহারেরা "আর দয়াল" বলে ধুয়া ধরেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, "এই বলিয়া দুইয় ভক্তে কোন কাজই করে, আর দয়াল,/ আর একই মনে প্রভুর নাম তারা লয় বারে বারে, আর দয়াল।"[৪৫] এই গানে গায়েন গান করেন, "এই বলিয়া দুইয় ভক্তে কোন কাজই করে", আর দোহারগণ শুধু "আর দয়াল" অংশটুকু ধুয়া হিসাবে গান করেন। একই ভাবে গায়েনের "আর একই মনে প্রভুর নাম তারা লয় বারে বারে" গাইবার পর দোহারের সুর শোনা যায় "আর দয়াল"।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের কোনো একটি পালায় সচরাচর একটিই ধুয়া থাকে। তবে "জন্মের পালা'য় আমরা একাধিক ধুয়া সন্নিবেশিত হতে দেখি। ভক্তের আবেদনে সাড়া দিয়ে ঈশ্বর তাঁদের ঘরে পুত্র-সন্তান দেবার অঙ্গীকার করেন। ঈশ্বর তখন আইন্তনকে "বেহেস্তখানার ঘর" থেকে ডেকে তাঁকে ফ্রান্সিস আর ভেরনিকার ঘরে জন্ম নিতে বলেন। ঈশ্বরের এই প্রস্তাবে আইন্তন পৃথিবীতে জন্ম নেবার ব্যাপারে তাঁর অনীহা প্রকাশ করেন। তিনি বলে উঠেন, "কলির ভবের সাধ নাই রে,/ পিতা যাব না যাব না কভু আমি, কলির ভর সায়রে রে, এ জনমে রে।"[৪৬] এই কথা বলার পর আইন্তন কলির ভবে না যাওয়ার কিছু কারণ নির্দেশ করেন। তাদের মধ্যে "দুইনায় গেলে ধরব মোরে পিতা, দুইনার মায়াজালে", "মানুষ হবে ছোট ছোট পিতা, বর্ণ হবে কালা", "ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ কইরা পিতা, পন্থে দিব কাঁটা" এমনই নানা কারণে তিনি দুনিয়ায় যেতে চান না। প্রত্যেকটি কারণের পর পরই দোহারেরা গেয়ে ওঠেন, "কলির ভবের সাধ নাই রে"। তাই এখানে প্রধান ধুয়া হিসেবে আমরা "কলির ভবের সাধ নাই রে" অংশটি গ্রহণ করতে পারি। প্রতিটি চরণের পর দোহাররা ফিরে ফিরে এই ধুয়াটুকু গেয়ে থাকেন। আস্তে আস্তে গানের কাহিনি সামনের দিকে অগ্রসর হয়। তবে এই ধুয়া শুনতে শুনতে শ্রোতারাও এক সময় আইন্তনের সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে ওঠেন, "কলির ভবের সাধ নাই রে"।

'জন্মের পালা'য় আইন্তন ঠাকুরের জন্মের আগে থেকেই গাওয়া হয়, "আইন্তন ভক্তের জনম হইল ভুবন মাঝারে,/ জনম হইল ভুবন মাঝারে গো।/ আইন্তন ভক্তের জনম হইল ভুবন মাঝারে।[৪৭] এই ধুয়ার মাধ্যমে আসলে আইন্তনের মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থারও বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। গর্ভসঞ্চারের সময় থেকেই অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় মাসে নারীর মনে কি অবস্থান্তর ঘটে

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

এবং মানবভ্রুণের আস্তে আস্তে বৃদ্ধিলাভের বিষয়টি গায়েন পদে পদে গাইবার পর দোহারেরা গান করেন, "আইন্তন ভক্তের জনম হইল ভুবন মাঝারে"। পালাগানে আমরা তার স্পষ্ট পরিচয় পাই,

একমাস দুই মাস তিনি মাস হইল,
একমাসের কালে মায়ে কিছু না জানিল গো।
আইন্তন ভক্তের জনম হইল ভুবন মাঝারে।
আরে দুই মাসের লোকে কানাকানি করে,
তিনি মাসের কালে পুত্রের রক্তে বান্দে দানা গো।
আইন্তন ভক্তের জনম হইল ভুবন মাঝারে।
আরে চাইর মাস পঞ্চ মাস ছয় মাস হইল,
চাইর মাসের কালে পুত্রের হাড়ে মাংস জুড়ে গো।
আইন্তন ভক্তের জনম হইল ভুবন মাঝারে।[৪৮]

'ইস্কুলের পালা'য় আইন্তন যখন তাঁর পিতামাতার কাছে বিদায় আর্শীবাদ নিয়ে লেখাপড়া করার জন্য গুরুগৃহের উদ্দেশ্য যাত্রা করেন তখন গায়েন ধুয়া ধরেন এইভাবে, "করে যাবা রে ও আমার মন, কনে যাবা যীজুস দরশন,/ ওরে কবে যাবা রে ও আমার মন, কবে যাবা যীজুস দরশন।[৪৯] এখানে ধুয়ার চরণদুটি প্রায় একই, অথচ দুটি চরণ মিলে একটিই ধুয়া। দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে শুধু 'ওরে' কথাটি যোগ করেই ধুয়াটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হয়েছে।

আসলে সব ধুয়াই শুরু করেন গায়েন নিজে। গায়েনের পরে গান দোহারেরা। শিক্ষালাভের আশায় আইন্তনের যাত্রার প্রাক্কালে গায়েন এই পূর্ণ ধুয়াটি গাইতে গাইতে অনায়াসে গানের কাহিনির সামনে অগ্রসর হন তখন দোহারেরা শুধু ধুয়ার অংশমাত্র গান করেন। এক্ষেত্রে "মন কবে" কথাটি দোহারেরা গেয়ে থাকেন। দোহারের কণ্ঠে যখন আমরা এই অংশটি শুনি তখন মনে হয় এটি যেন একটি আলাদা নতুন ধুয়া, কিন্তু তা নয়। "মন কবে" কথাটুকু পূর্ণ ধুয়া থেকেই নেওয়া হয়েছে। গানের পদ থেকে উদাহরণ টেনে দেখা যায়,

দিন থাকিতে লইলা না প্রভু নাম দিবার আলিসে,
সন্মুখে তরঙ্গ নদী পার হইবা কিসে রে।
মন কবে যাবা রে ও আমার মন, কবে যাবা যীজুস দরশন,
আইন্তন ভক্তে চইলা গেল ময়দান ঐ পাথারে রে।
খাড়া গিয়া হইল ভক্তে রাজপন্থের মাঝে,
মন কবে যাবা রে ও আমার মন, কবে যাবা যীজুস দরশন।
তারাতুরি দুই শয়তানে লাগছে কহিবারে, মন কবে,
আর ছোট শয়তান উইঠা বলে বড় শয়তান ভাই, মন কবে,
আরে পন্থে পাইছি দুধের ছেইল্যা মারিয়া ফেলাই, মন কবে।[৫০]

সম্পূর্ণ পালাগানে আমরা এমন অনেকগুলি ধুয়া দেখতে পাই। প্রত্যেকটি পালায় এক বা একাধিক ধুয়ার মধ্যে ভাব ও সুরের বৈচিত্র্য আনয়ন করে। উপরোক্ত ধুয়াগুলি ছাড়াও আছে–

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৫১. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত

১।	(ক) পূর্ণ ধুয়া-	মন লাহর দরিয়ার মাঝে মনার বসতি গো যীজুস,
		কি নাম লওয়াইতে পার তুমি।
	(খ) অপূর্ণ ধুয়া-	মন লাহর।[৫২]
২।	(ক) পূর্ণ ধুয়া-	গুরু চিন না রে, চিন না রে,
		হায় হায় চিন না রে মন, মাঙ্গ রে প্রাণের ধন।
	(খ) অপূর্ণ ধুয়া-	গুরু চিন না।[৫৩]
৩।	(ক) পূর্ণ ধুয়া-	আর পাপীর উপায় কি, ওগো রসের মালিক গো।
		অধমের উপায় বলো কি।
	(খ) অপূর্ণ ধুয়া-	মন পাপীর।[৫৪]
৪।	(ক) পূর্ণ ধুয়া-	পার কর দীননাথ, পার কর মোরে,
		ভয় পাইয়া ঠেকিয়া রইলাম ভবের জঞ্জালে।
	(খ) অপূর্ণ ধুয়া-	পার কর।[৫৫]
৫।	(ক) পূর্ণ ধুয়া-	মন বাইয়া যাও রে, হায় রে সোনার নাও পবনের বৈঠা,
		আর বাইতে পারলাম না মন বাইয়া যাও।
	(খ) অপূর্ণ ধুয়া-	মন বাইয়্যা যাও।[৫৬]
৬।	(ক) পূর্ণ ধুয়া-	রে জানিয়ে লও রে ভাই, চিনিয়া লও রে ভাই।
		দয়াল যীজুসের নাম প্রাণে আর মনেতে রে জানিয়া লও রে।
	(খ) অপূর্ণ ধুয়া-	রে জানিয়া লও রে।[৫৭]
৭।	(ক) পূর্ণ ধুয়া-	ওরে সোনার লহরী তরী বাইজ্জা রইছে জালে হে।
	(খ) অপূর্ণ ধুয়া-	সোনার লহরী তরী।[৫৮]
৮।	(ক) পূর্ণ ধুয়া-	অহঙ্কার না কইর বান্দা পাইবা অপমান।
	(খ) অপূর্ণ ধুয়া-	হায় হায় পাইবা অপমান।[৫৯]

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৫৫. প্রাগুক্ত
৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৫৮. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৯। (ক) পূর্ণ ধুয়া- আর ভয় পাইয়া গুরুজীর নাম লইল না রে,

হায় রে দয়াল যীশুরই নাম না মুখে লইল রে।

(খ) অপূর্ণ ধুয়া- আর ভয় পাইয়া।[৬০]

১০। (ক) পূর্ণ ধুয়া- দয়াল গো, যীজুস কৃপার নয়নে একবার চাও,

দয়া কর গো, যীজুস কৃপার নয়নে একবার চাও।

(খ) অপূর্ণ ধুয়া- যীজুস দয়াল দয়াল গো।[৬০]

১১। (ক) পূর্ণ ধুয়া- আরে ও কলির কাল আইল,

রাজা বেঈমান হইয়া ধর্ম না রাখিল।

(খ) অপূর্ণ ধুয়া- আরে ও কলির কাল।[৬১]

১২। (ক) পূর্ণ ধুয়া- যীজুস নাম পরম মধুর রে,

যীজুস নাম ঠাকুরের পরম মধুর রে।

(খ) অপূর্ণ ধুয়া- যীজুস নাম। [৬২]

শ্রী বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, "ক্ষেত্র বিশেষে গীতিকায় পরিবেশিত কাহিনীর যে মেজাজ ধুয়াকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত মেজাজের করে রচনা ও ব্যবহার করায় গীতিকায় এক প্রকার বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়।"[৬৩] সাধক আন্তোনিয়ো পালাগানের ক্ষেত্রে সমালোচকের এই কথা ঠিক নয়। আন্তোনিয়ো পালার প্রতিটি ধুয়াই পালার মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই রচিত হয়েছে। পালার যেখানে যে ভাব, তার সঙ্গে মিল রেখে ধুয়ার সুর সংযোজিত হয়েছে। ধুয়ার অংশটি গানের কথা ও কাহিনির সঙ্গে ভালভাবে খাপ খেয়ে যায়। তবুও দেখা যায় এই পালাগানের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে ধুয়ার জুড়ি নেই। পালাগানের সঙ্গে ধুয়ার বিষয়গত সম্পর্কে সম্বন্ধে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যও বলেছেন, "গীতিকায় যে ধুয়া ব্যবহৃত হইত, তাহার সঙ্গে কাহিনীর বিষয়-বস্তুর কোনো যোগ থাকিত না। সেই জন্যই একই ধুয়া বিভিন্ন গীতিতে এবং বিভিন্ন গীতিকার বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত হইতে পারিত। ... লোকসাহিত্যের অর্ন্তভূক্ত গীতিকায় এই ধুয়া রচনার সঙ্গে মূল কবির কোন সম্পর্ক থাকিত না, কিংবা তাহার দোহারেরা ইচ্ছামতোই তাহা যোগ করিত।"[৬৪] লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞের এই অভিমত বাংলার অন্যসব পালাগান বা গীতিকার ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে, তবে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের প্রেক্ষাপটে তা সর্বাংশে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের সঙ্গে যেসব ধুয়া গাওয়া হয় তার সবগুলোই গানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। তার ফলে মনে হয়

---

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৬৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
৬৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ২৫

ধুয়াগুলি বুঝি একই গায়েন বা পালাকারের রচনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তপস্যার পালায় শয়তান যখন ফ্রান্সিস ভক্ত আর ভেরনিকা বিবিকে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে না দিয়ে নানা বিপত্তি সৃষ্টি করে, তখন গায়েন ধুয়া গেয়ে ওঠেন– "রে গুরুর নাম জপিতে না দিল"। আবার অন্নের অভাবে ভেরনিকা বিবি যখন কষ্ট পান তখন গায়েন ধুয়া "বিবি কান্দে গো"। একইভাবে আইন্তন ভক্ত স্কুল পড়তে যাবার পথে সামনে নদী দেখে যখন ভাবছেন কিভাবে তিনি পার হবেন, তখনকার ধুয়াটি বেশ অর্থপূর্ণ, "পার কর দীননাথ, পার কর মোরে,/ ভয় পাইয়া ঠেকিয়া রইলাম ভবের জঞ্জালে।"[৬৫]

আইন্তন ঈশ্বরের শাস্তিস্বরূপ লাহর দরিয়ায় বার বছর খেয়া পারাপারের শেষদিন পরমপিতা নিজেই তাঁর কাছে পার হওয়ার জন্য আসেন। তখনকার ধুয়ায় আছে এই পার হওয়ার অনুষঙ্গে বলা হয়েছে– "মন বাইয়া যাও রে, হায় রে সোনার নাও পবনের বৈঠা,/ আর বাইতে পারলাম না মন বাইয়া যাও।"[৬৬] একইভাবে 'সাত বালকের পালা'য় আইন্তন ভক্তের সঙ্গে পাহারাদার যখন মিথ্যে কথা বলে, তখন তাঁর অভিশাপে সাতজন রাখাল-বালক শূয়োর আর ভেড়ায় পরিণত হয়। এই পরিস্থিতিতে পাহারাদার পিতামাতাকে কি বলে জবাবদিহি করবে ভেবে পায় না। তখন সে কেঁদে কেঁদে বলে, "আমি উপায় কি করিব"। ঠিক একইভাবে সাত বালকের মায়ের অন্তরের কষ্ট বোঝাতে গায়েন গেয়ে ওঠেন, "মায়ে কাঁদে পুত্র বলে"। আবার আইন্তন ভক্ত যখন সাতটি সেবক নিয়ে কেশবের বাড়ির দিকে যাত্রা করেন, তখন গায়েনের কণ্ঠে শোনা যায়, "তোমার দোয়া লইয়া চইলা যামু আবার,/ তোমার কিরপা লইয়া চইলা গো যামু আবার।"[৬৭] এদিকে কেশব যখন নিজের দাম্ভিকতা দেখিয়ে আইন্তন ভক্তকে বাণ ছুঁড়ে আঘাত করেন, তখনও গায়েন কেশবের উদ্দেশ্যে যে উপদেশবাণী শোনান, তা যেন আমাদের সবার প্রতিই আইন্তন এবং গায়েনের উপদেশবাণী,

> অহঙ্কার না কইরো বান্দা পাইবা অপমান,
> অহঙ্কার না কইরো গো বান্দা পাইবা অপমান।
> হায় হায় পাইবা অপমান।[৬৮]

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে, ধুয়ার পদ সচরাচর একটি হয়। আমরা কিন্তু বাংলা গীতিকা ছাড়াও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে দেখেছি ধুয়ার পদ একাধিক। অধিকাংশ ধুয়াই সেখানে দুই বা তিন পদবিশিষ্ট। ড. ভট্টাচার্য আরও বলেছেন যে, ধুয়া প্রায়ই গানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলে না। তিনি অবশ্য ইংরেজি ব্যালাডের ধুয়ায় একাধিক পদ এবং সেগুলি যে ব্যালাডের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূক্ত সেই কথা উল্লেখ করেছেন।[৬৯] এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ইংরেজি ব্যালাডের মতো আন্তোনিয়ো পালাগানের একাধিক পদবিশিষ্ট এবং গানের ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধুয়া দেখা যায়। এখানে প্রায় প্রতিটি ধুয়া প্রথমে শুরু হয় দুইপদ বিশিষ্ট অবস্থায়। পরে গান অগ্রসর হলে তা একপদ হিসেবে গাওয়া হয়। আবার অনেক সময় একটি পদের অংশবিশেষ অর্থাৎ

---

৬৫. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৬৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮

শুধুমাত্র দুই বা তিনটি শব্দের সমাহার ঘটিয়েও ধুয়া গাওয়া যায়। পালাগানের অংশবিশেষ তুলে এখানে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা যায়, "আরে ও কলির কাল আইল,/ রাজা বেঈমান হইয়া ধর্ম না রাখিল, আরে ও কলির কাল।"[৭০] এখানে এই পূর্ণ ধুয়ায় দুইটি পদ আছে। এই ধুয়াই গাইতে গাইতে এক পর্যায়ে দোহারগণ অপূর্ণ ধুয়াটি গাইতে থাকেন। এখানে অপূর্ণ ধুয়া হচ্ছে, "আরে ও কলির কাল"। আবার এই অপূর্ণ ধুয়া একসময় আরও সংক্ষিপ্ত আকারে গীত হয়, "আরে ও" এই দুই শব্দে। অতএব আমরা দেখি সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে দুই পদ, এক পদ, মাত্র দুইটি শব্দ; এমনকি মাঝে মাঝে একটি শব্দও ধুয়া হিসেবে গাওয়া হয়। তাতে ধুয়ার ধর্ম ক্ষুন্ন হয় না, এমনকি পালাগানের রসাস্বাদনের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না।

বাংলা পালাগান গায়েন, বায়েন এবং দোহারদের– সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং সাধনায় সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে। এখানে কারও ভূমিকা ছোট বা বড় করে দেখা সমীচীন নয়। পালাগানের ধুয়া গানের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করে। তাকে শ্রুতিমধুর করে তোলে। ধুয়া গাইবার জন্য গায়েনের সহজাত দক্ষতা দরকার। শ্রী বরুণকুমার চক্রবর্তী ধুয়ার সঙ্গে গায়েনের সম্পর্কের বিষয়ে বলেছেন, "বাংলা গীতিকায় যে ধুয়ার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তার সিংহভাগই মূল গায়কের দ্বারা গীত হবার জন্য রচিত, দোহারদের দ্বারা গীত হবার জন্য উপযোগী ধুয়া তুলনামূলকভাবে কমই ব্যবহৃত হয়েছে।"[৭১] আন্তোনিয়ো পালাগানের ধুয়ার দিকে দৃষ্টি দিলে তা সত্যতা লাভ করে না। একথা ঠিক যে, আন্তোনিয়োর গানের অধিকাংশ ধুয়া মূল গায়ক শুরু করেন। তারপর যখন গানের কাহিনি অগ্রসর হয় তখন সেই ধুয়া পুরোপুরি দোহারদের অধীনে চলে যায়। শুরুতে গায়েন গাইবার পর দোহারগণ তাঁর পরে পরে গান করেন। এই বিষয়ে গানে দোহারদের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

পালাগানে বন্দনা

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস বাঙালির আধ্যাত্মিক জীবনের বড় পরিচায়ক। যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার আগে ভগবানের নাম স্মরণ করা আমাদের চিরন্তন রীতি। ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করা আমাদের বাঙালি জীবনাচরণের একান্ত বৈশিষ্ট্য। ঐশকরুণা ছাড়া কোনো শুভ কাজ আরম্ভ করার কথা ভাবা যায় না। দেবদেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনায় সব কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আবার কাজের শেষে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোও যেন আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এই বাঙালি মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আমাদের কবি-সাহিত্যিকগণও কাব্য রচনার প্রারম্ভে ঈশ্বর এবং দেবদেবীর নাম স্মরণ করেছেন। ঠাকুরের বন্দনার মাধ্যমে তাঁদের কাব্য শুরু করেছেন। আবার কাব্যের শেষে ভণিতা দিয়ে শেষ করেছেন। মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত কাব্যই শুরু হয়েছে বন্দনা দিয়ে, আর শেষ হয়েছে ভণিতা দিয়ে। মধ্যযুগের আখ্যানমূলক কাব্যের এই

---

৭০. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৭১. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

রীতি আধুনিক কালেও পরিলক্ষিত হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁদের কাব্য-কবিতায় বন্দনার আশ্রয় নিয়েছেন।

বন্দনা বলতে আমরা বুঝি স্তব করা, স্তুতি করা বা গুণকীর্তন করা। তবে একথা ঠিক যে, বন্দনার রীতি শুধু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়; সংস্কৃত, হিন্দি, ফার্সি এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য ভাষায় রচিত কাব্যের মধ্যেও প্রচলিত। অবশ্য তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের কাব্যে বন্দনার প্রয়োগ যত ব্যাপক, আধুনিক যুগের কাব্য-কবিতায় তত নয়। অর্থাৎ আধুনিক কালে সাহিত্যে বন্দনার রীতি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কিন্তু মৌখিক রীতি, তথা লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিবর্তন চোখে পড়ে না। লোকসাহিত্যের উদ্ভবকাল থেকে বন্দনা রীতির সূচনা হয়েছে; আজও তা অব্যাহত রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ধারায় বদল ঘটেছে। জন্ম লাভ করেছে লিখিত সাহিত্য। সেই সঙ্গে তার নতুন নতুন প্রকরণ তৈরি হয়েছে। অথচ তার প্রভাবে লোকসাহিত্য রচনার ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। তবে একথা ঠিক যে, লিখিত সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের দীর্ঘ সময় ধরে পাশাপাশি চলার ফলে এই দুই ধারার সাহিত্যে শিল্পরীতির যথেষ্ট আদান প্রদান ঘটেছে। সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে গ্রহণ বর্জনও চলেছে। এই দেওয়া-নেওয়ার পর্যায়ে কে কার কাছ থেকে কতটা নিয়েছে তার আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়– যেহেতু লোকরীতির তুলনায় লিখিত রীতি অর্বাচীন কালের সেহেতু লিখিত রীতি লোকরীতির প্রভাবেই প্রভাবিত। এই বিষয়ে বিশদ হতে গিয়ে ড. মহম্মদ আব্দুল খালেক বলেছেন,

> বন্দনা যে আসলে লোকরীতি, তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা তার প্রামাণ পেতে পারি। আজকের দিনেও আমাদের সমাজে যে সমস্ত লোক-কবি লোকসাহিত্য রচনা করছেন বন্দনা ছাড়া তাঁরা এক পা-ও অগ্রসর হতে পারেন না। উদাহরণ স্বরূপ– কবি, জারী, সারি, গম্ভীরা গানের কথা বলা যেতে পারে। আজকের দিনেও যখন কোনো লোক-কবি আসারে গান পরিবেশন করতে দাঁড়ান, প্রথমেই তিনি আসর বন্দনা, বিভিন্ন দেবদেবী বন্দনা, আল্লা-রাসুল, পীর-মুর্শিদ বন্দনা শেষ করে তবে তার গান শুরু করেন। বর্তমান কালের জীবিত লোক-কবিগণ এই বন্দনা রীতি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পালন করে থাকেন।[৭২]

পালাগান যেহেতু লোকসাহিত্যেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ শাখা তাই তার মধ্যে বন্দনা-রীতি থাকবেই। তবে কিছু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। সেই সুবাদে আমরা দেখি যে, বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত সবগুলো পালাগান বা গীতিকায় বন্দনা অংশ নেই। মনে হয় গায়েনের মুখে মুখে রচিত এইসব পালায় গায়েন বন্দনা গাইলেও পরবর্তীকালে গায়েন সেই একই বন্দনা গাইবার প্রয়োজন অনুভব করেননি। তিনি হয়ত নিজে রচনা করে নতুন বন্দনা যুক্ত করেছেন। আবার এমনও হতে পারে তাঁর ওস্তাদের গাওয়া পুরনো বন্দনা গানে তিনি ব্যবহার করেছেন। পালাগান সংগ্রাহকগণ গায়েন বা বয়াতিদের কাছে যে খাতা দেখেছেন সেসবের বেশকিছুতে বন্দনা ছিল আবার কিছু খাতায় বন্দনা ছিল না। তবে পালাগানের আসরে গায়েন সবসময় বন্দনা গাইতেন। শ্রী বরণকুমার চক্রবর্তীর 'দৃঢ় বিশ্বাস', "কখনই একেবারে সরাসরি কোনো পালাগান গীত হত না। পূর্ব প্রস্তুতি

---

৭২. মহম্মদ আব্দুল খালেক, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান*, পৃ. ১২৮

হিসাবেও বন্দনা গান গীত হত, বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের পূর্বে গীত হওয়া গৌরচন্দ্রিকার মত।"[৭৩] বন্দনা ব্যতিরেকে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান গাওয়া হয় না। পালাগানের প্রায় অর্ধ-শতাধিক আসরে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কোথাও কোনো পালাগান বন্দনা ছাড়া পরিবেশিত হতে দেখিনি। বন্দনা গাইবার মাধ্যমে গায়েন-বায়েন পালাগান পরিবেশনের শক্তি সঞ্চয় করেন।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে বন্দনা গাইবার সঠিক নিয়ম কী– সেই ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট নির্দেশিকা কোথাও পাইনি। তবে এটা ঠিক যে গানের শুরুতেই প্রার্থনা করা হয়। প্রার্থনার পর ইষ্টদেবতাদের গানের আসরে উপস্থিত হবার আহ্বান জানানো হয়। এই আহ্বানের পরেই শুরু হয় বন্দনা। বন্দনা গাইবার নিয়ম বলতে বন্দনা দাঁড়িয়ে বা বসে গাইবার কথা বলছি। আমি নানা জায়গায় আন্তোনিয়ো পালাগানের আসরে দেখেছি– কোথাও বন্দনা বসে করা হয়, আবার কোনো কোনো জায়গায় করা হয় দাঁড়িয়ে। ঢাকা জেলার সাভার এলাকার কমলাপুর গ্রামের এক বাড়িতে যাজকীয় অভিষেক উপলক্ষে ২০১৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বেশ রাতের দিকে মানিক গমেজের পরিচালনায় একটি গানের আসর ছিল। সেখানে বন্দনা গানের সময় গায়েন-বায়েন সবাই দাঁড়িয়ে পরিবেশন করেছিলেন। আবার নাটোর জেলার বনপাড়া গ্রামের একটি বাড়িতে ২০১৫ সালের ২ জানুয়ারি তারিখ বিকেলে গাওয়া গানের আসরে বন্দনার সময় শুধু গায়েন সুব্রত গমেজ দাঁড়িয়ে ছিলেন; বাদবাকি দোহার এবং বায়েন সবাই বসে ছিলেন। তাই দেখা যায় বন্দনা গাইবার জন্য ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু দুঙ্গু পণ্ডিতের লেখা পালাগানের পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় পাতায় লেখা আছে, "রচনাকারের যুক্তি মতে, ... সকলে দাঁড়াইয়া বন্দনা করিবে।"[৭৪] এই নিয়ম অনেক আগে প্রচলিত ছিল। এখন হয়ত তার যৌক্তিকতা নিয়ে অনেক গায়েন-বায়েন প্রশ্ন তুলতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁদের সুবিধে অসুবিধের উপর নির্ভর করেই বন্দনা গান গাওয়া সমীচীন।

সব সময় যে পালাগান রচয়িতারাই আসরে পালাগান পরিবেশন করতেন, তা নয়। অনেক সময় লোককবিরা পালাগান রচনা করার পর সুকণ্ঠের অধিকারী কোনো গায়ক হয়ত সেই গান আসরে পরিবেশন করতেন। এই ক্ষেত্রে পরিবেশনকারী পালাগান রচনাকারীর বন্দনা না-ও গাইতে পারেন বরং তাঁর পছন্দ ও রুচি মোতাবেক সভায় দাঁড়িয়ে নিজেই বন্দনা রচনা করে গাইতেন। স্বভাবতই এক্ষেত্রে মূল রচয়িতার বন্দনার সঙ্গে গায়কের গীত বন্দনার কোনো সামঞ্জস্য বা মিল থাকার কথা নয়। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে প্রচলিত বন্দনার ক্ষেত্রেও এমন হেরফের দেখা যায়। এই ব্যাপারে নাটোর জেলার কালিকাপুর গ্রামের নামকরা গায়েন যোসেফ ডেঙ্গু কস্তাও তাঁর ওস্তাদের কাছে শেখা বন্দনা অংশ পুরোপুরি গাইতেন না। তিনি আসরের পরিবেশ এবং তাঁর শ্রোতা-দর্শকদের মনের অবস্থা বুঝে নিজের রচিত বন্দনা পরিবেশন করতেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর

---

৭৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৭৪. পিটার ডমিনিক রোজারিও (দুঙ্গু পণ্ডিত), *শ্রীগুরু সাধু আন্তনীর চরিতামৃত*, (যোসেফ রোজারিও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি), পৃ. ২

শিষ্য, একই এলাকার বনপাড়া গ্রামের সুব্রত গমেজও আন্তোনিয়ো পালাগানের কিছু কিছু অংশ নিজে রচনা করে পরিবেশন করেন। গুরু বন্দনায় তাই তিনি গুরুর পরিচয় উপস্থাপন করে অনায়াসে গাইতে পারেন–

> ওস্তাদ আমার ডেঙ্গু কস্তা দিলাম পরিচয়,
> যাহার শিক্ষার গুণে আমি দাঁড়াইলাম সভায়।[৭৫]

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান মূলত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত। তাই গানের বিষয়বস্তু হিসেবে খ্রিষ্টধর্মালম্বী ও খ্রিষ্টীয় প্রেক্ষাপটই প্রাধান্য লাভ করেছে। ভক্তের বিশ্বাস এই পালাগান গাইবার গাওয়ানোর ফলে তাঁরা জাগতিক এবং পারমার্থিক প্রসাদ লাভ করেন। সাধু আন্তোনিয়োর মধ্যস্থতায় তাঁরা কিন্তু খ্রিষ্টের মাহিমা-কীর্তন করেন। খ্রিষ্টই তাঁদের আরাধ্য দেবতা। খ্রিষ্টই তাঁদের উদ্ধারকর্তা। এই কারণেই পালার শুরুতে আমরা শুনি খ্রিষ্টবন্দনা। এই খ্রিষ্টবন্দনা ধুয়া বা ধ্রুবপদের মতো প্রতিটি বন্দনাংশের পরই গাওয়া হয়। গায়ক যখন গেয়ে ওঠেন–

> আমি পরথমে বন্দিয়া গামু যীজুসের চরণে,
> আমার ঠাকুরের চরণে গো যীজুসের চরণে।[৭৬]

তখন আমাদের আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই বন্দনা গানের মাধ্যমে মানব মুক্তিদাতা যিশু-খ্রিষ্টের মহিমা-ই প্রকট হয়ে ওঠে। ভগবান যিশুর অলৌকিক জীবনের অনুধ্যান করে গায়ক এবং শ্রোতাসকল যে তাঁর প্রসাদ পাবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, সেই আকুতি গোপন থাকে না। গায়কের কণ্ঠে তাই আমরা শুনি–

> পরথমে বন্দিয়া গামু আমরা প্রভু নিরাঞ্জন,
> তাহার ঠিকানা আমার এই যে ভুবন।[৭৭]

অতপর রয়েছে স্বর্গীয় পিতা পরমেশ্বরের বন্দনা। এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে পরমপিতা তাঁর পবিত্র প্রেমের আশিসধারায় আমাদের প্রতিনিয়তই সিক্ত করেন। ঈশ্বর এখানে পিতামাতার মতোই আমাদের ভালবাসেন। পিতার প্রেমের কথা বলার পর গায়েন ঈশ্বরজননী কুমারী মারিয়ার চরণে তাঁর প্রণতি জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও পিতামাতা, ওস্তাদ– প্রমুখের বন্দনায় মুখর গায়ক উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন–

> ওগো পিতামাতার প্রেমেতে নিগূঢ় পবিত্রতা,
> আরে পরম পিতা পরমেশ্বর পৃথিবীর দাতা।
> পিতার পদ বন্দিয়া গামু আমরা করিয়া মিনতি,
> মা কুমারীর চরণে আমরা হইয়া যাব নতি।
> স্বর্গেতে বন্দিয়া গামু আমরা স্বর্গের দেবগণ,
> ভূমিষ্ঠে বন্দিয়া গামু সকল শ্রোতাগণ।[৭৮]

---

৭৫. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৭৬. প্রাগুক্ত
৭৭. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৭৮. প্রাগুক্ত

পালাগানে পিতামাতার বন্দনা একটা আলাদা মর্যাদা পায়। গায়েন ভগবানের পরই পিতামাতার বন্দনায় মুখর। তাঁদের জন্যই তিনি এই আলোহাস্যোজ্জ্বল ধরণীর রূপ দেখতে পেয়েছেন–

ওগো তারপরে বন্দিয়া গামু আমরা পিতামাতার চরণ,
যাহার গর্ভে জন্ম লইয়া দেখিলাম ভুবন।[৭৯]

পিতামাতার পরে গায়কের জীবনে যাঁর ভূমিকা বেশি সেই গুরুর বন্দনা করেন। গুরু-বন্দনা বাংলা পালাগানের একটা চিরন্তন রীতি। পালাগান গুরুমুখী বিদ্যা। কোনো গায়েনই গুরুর সহায়তা ছাড়া এই গান আয়ত্ব করতে পারেন না। তিনি গুরুর নামে আসরে দাঁড়ান। গুরু তাঁকে এই গানে দীক্ষা বা মন্দিরা দিয়েছেন। গায়েন বন্দনার সময় গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন–

ওস্তাদের চরণ গো আমরা বইন্দা গামু মাঠে,
সবার মধ্যে যে গুরু মন্দিরা দিছে হাতে।
দীক্ষাগুরু বইন্দা গামু শিক্ষা গুরুর ভায়,
হস্তে ধইরা যেই গুরু শিখাইছে ডাইন বায়।
একে একে পঞ্চ গুরু আমরা দেখি বিদ্যমান,
কোন গুরু ভজিলে রে ভাই খণ্ডে হইবা পার।[৮০]

পালাগানের গায়েনদের অনেকেরই তথাকথিত বিদ্যা বা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অশিক্ষিত পটুত্ব আছে। এই আত্মজ্ঞানই তাঁদের অহমিকাশূন্য মানুষে পরিণত করে। তাই পালাগান পরিবেশনের সময় তাঁরা নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি জাহির করার কোনো রকম চেষ্টা করেন না। তাঁরা জানেন গানের আসরে তাঁদের চেয়ে জ্ঞানীগুণী মানুষ আছেন। বিদগ্ধ মানুষের মধ্যেও যে ঠাকুর তাঁদের গান পরিবেশনের জন্য বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন; তাই তাঁদের বিনীত আবেদন–

সভাতে বন্দিয়া গামু সভার পঞ্চ ভাই,
অতি মূর্খ জাইন্যা মোরে সভায় দিবেন ঠাঁই।[৮১]

পিতামাতার বন্দনা করার সঙ্গে সঙ্গে গায়ক তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের বন্দনা করেন। তবে তিনি নিশ্চিত যে–

গুরু ভজনার চেয়ে মহত্তর আর কিছুই নাই,
পিতা গুরু মাতা গুরু, গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই।
ইহার চেয়ে অধিক গুরু ভজিলে সে পাই।[৮২]

শিষ্যের প্রতি গুরুর একটা দায়বদ্ধতা থাকে। গুরু ভাল হলে তাঁর শিষ্যও ভাল হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর শিষ্য যদি ভাল হয় তবেই গুরুর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সবাই তাঁর প্রশংসা করে। আবার যদি তার বিপরীত হয়, অর্থাৎ শিষ্য যদি খারাপ হয়, তখন গুরুর ভাগ্যে জোটে নানা অপবাদ। পালাগানের ঠাকুর বা ওস্তাদ কিন্তু সেই ব্যাপারে খুব সচেতন। তিনি বেশ সুন্দর একটা উপমার সাহায্যে গানের বন্দনায় গুরুর প্রতি শিষ্যের যথাযথ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশের মাধ্যম যে সুষ্ঠ-সুন্দরভাবে গান পরিবশেন, সেটা তুলে ধরেন–

---

৭৯. প্রাগুক্ত
৮০. প্রাগুক্ত
৮১. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

হালুয়া যে চষে হাল বান্দিয়া চাইর আইল,
শিষ্য যাহার অভাজন হয় গুরুতে খায় গাইল।[৮৩]

খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস মতে খ্রিষ্টজননী কুমারী মারিয়া ভক্তেরও মা জননী। তিনি পিতা পরমেশ্বর এবং তাঁর পুত্র যিশুর কাছ থেকে ভক্তের জন্য প্রসাদ, করুণা এবং বরাভয় এনে দেন। পালাগানের ক্ষেত্রেও গায়েন তাঁর গান যাতে সুষ্ঠ এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় তার মায়ের কাছে আবেদন জানান। মায়ের কাছে তাঁর সব আব্দার–

আমি যদি লজ্জা পাই মা লজ্জা পাইবা তুমি,
তোমারই গান তুমি গাইবা উপলক্ষ আমি।
আইস মাগো মা কুমারী নাইম্যা দেও চাই বর,
গায়ে দিও জোর বল মা গলায় মধুর স্বর।
যতক্ষণ খাড়া হইয়া তোমার গুণ গাই,
অধমেরে ছার যদি ধর্মের দোহাই।[৮৪]

সাধক আন্তোনিয়ো পালাগান অথচ তাঁর নামে বন্দনা থাকবে না, এমনটা হতে পারে না। মা-মারিয়ার চরণে প্রাণাম জানাবার পর গায়েন পালাগানের আরাধ্য সাধু আন্তোনিয়োর বন্দনা গান করেন। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান 'ঠাকুরের গীত' বলে সমধিক পরিচিত। ঢাকার ভাওয়াল এলাকার খ্রিষ্টভক্তগণ সবাই নিজেদের বুলিতে 'ঠাহুরের গীত' বলতেই বেশি অভ্যস্ত। তেমনিভাবে সাধু আন্তোনিয়োও 'ঠাকুর' হিসেবেই পরিগণিত। এই গান গায়েন করেন না; তাঁর বিশ্বাস এই গান করেন ঠাকুর নিজে। যেহেতু এটা তাঁর নিজের মহিমাগান, অতএব তিনিই গানের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেন। তাঁদের বিশ্বাস পালার গায়েন শুধু একজন উপলক্ষ মাত্র।

২০০৩ সালের দিকে নাগরীর বার্নাড রোজারিওর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তিনি ঠাকুরের গীত করেন কি না। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে– না, গান তিনি করেন না; ঠাকুর করেন। আমি তো তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। যাহোক, পরে তিনি আমাকে তাঁর এই নির্লিপ্ত ভাব-প্রকাশের কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেন, এটা যেহেতু ঠাকুরের গান অতএব গানে সঙ্গ দেবার জন্য সহযোগী গায়েন এবং বায়েন ঠাকুরই তাঁকে খুঁজে দেবেন। অতএব ঠাকুরের প্রতি গায়েনের যে অগাধ বিশ্বাস তার পরিচয় পাই তাঁরই গানে–

জানি বা না জানি গীত লইলাম বন্দিয়া,
এই গীত গাইব আমার ঠাকুর আসিয়া।
গায়েন বায়েন তোমরা শুইনা লও চাই বর,
হাতে লইও তারযন্ত্র গলায় মধুর স্বর।[৮৫]

গায়েন বন্দনার এক পর্যায়ে এই পৃথিবীতে মানুষের সুস্থ-সুন্দর জীবন যাপনের আহ্বান জানান। এখানে বসবাস করতে হলে সবাইকে হিসাব নিকাশ করে চলতে হয়। পরম মালিক যে-কোনো সময় হুকুম করলে আমাদের সবাইকে এই জগতের

৮৩. প্রাগুক্ত
৮৪. প্রাগুক্ত
৮৫. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

রাজ্যপাট গুটিয়ে চলে যেতে হবে। দয়ালের এই আদেশ যে-কোনো তার উপর নেমে মুহূর্তে আসতে পারে। তাই গায়েন মোহমুক্ত অন্তওে আমাদের শোনান–

> এইসব জনিয়া গো ভবে কর বেচাকিনা,
> আসিবে মালিকের হুকুম কিবা রাত্রিদিনা।[৮৬]

বন্দনার শেষে গিয়ে গায়েন তাঁর গানের স্থায়িত্ব বা সময়কাল সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত দেন। গান শেষ করতে বেশ সময় লাগবে বলে তিনি বন্দনা অংশটি আর দীর্ঘায়িত করতে চান না। তিনি গানের পরবর্তী কাহিনির দিকে শ্রোতাদের এগিয়ে নিয়ে যান। তবে আসল কাহিনিতে প্রবেশের আগে তিনি আলাপন বা কাহিনি-প্রবেশক অংশটি গান করে নিতে চান। গানের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়াসে গায়েন তাই বলেন–

> এই সকল কহিতে গো আমার হইবে অনেকক্ষণ,
> বন্দনা ছাড়িয়া এখন গীতে রাখি মন।
> বন্দনা ছাড়িয়া গো এখন গীতে রাখি মন,
> তপস্যার পালা লইয়া করি আলাপন।[৮৭]

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের বন্দনা বাংলাদেশের অন্যান্য পালা বা গীতিকার মতোই একটা রীতি অনুসরণ করে চলে। লোকসাহিত্যের উপাদান হিসেবে পালাগানের এই বন্দনা গায়েনকে যেমন তাঁর পূর্ব ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়, তেমনি পালাগানের আসরে যেসব শ্রোতা বা কুশলী থাকেন, তাঁদেরও পালাগানের সঙ্গে একাত্ম্য করে নেন। বন্দনার এই রীতি একান্তই লোকরীতি। বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোকসাহিত্য গবেষক মহম্মদ আব্দুল খালেক তাঁর আলোচনায় যথার্থই বলেছেন, "... বন্দনা রীতি প্রকৃতপক্ষে লোকরীতি এবং বন্দনা পদ্ধতি সামগ্রিকভাবে মূলত লোকসাহিত্যেরই উপাদান। লোকসাহিত্য থেকেই সম্ভবত মধ্যযুগের কোনো এক সময় লিখিত সাহিত্য বন্দনা রীতিকে গ্রহণ করেছিল, আধুনিক কালে এসে আবার তাকে বর্জন করেছে, কিন্তু লোকসাহিত্য এখনও তাকে অবিকৃত অবস্থায় ধরে রেখেছে। কাজেই বন্দনা রীতিকে মধ্যযুগীয় বলবার কোনো যুক্তি নেই।"[৮৮]

পালাগানের সাহিত্যিক মূল্য

বাংলা লোকসাহিত্যের ধারায় লোকসঙ্গীত বা লোকগীতি রূপগত এবং বিষয়গত উভয়দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এই ধারাটি অন্যান্য ধারার চেয়ে সমৃদ্ধ। লোকজীবনের অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ– এই দুই দিকেই তার সচেতন দৃষ্টিপাত রয়েছে। লোকসঙ্গীতের সাহিত্যগুণও অন্যান্য লোকসাহিত্যের ধারার কাছে ঈর্ষণীয় বলেই মনে হয়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞ ড. আশরাফ সিদ্দিকী লোকসাহিত্যের ধারায় লোকগীতি সম্বন্ধে বলেছেন,

---

৮৬. প্রাগুক্ত
৮৭. প্রাগুক্ত
৮৮. মহম্মদ আব্দুল খালেক, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান*, পৃ. ১৩৬

যা লোকে মুখে মুখে প্রচারিত ও প্রচলিত তা-ই লোকসাহিত্য– লোকগীতি। লোকগীতি কেউ পূর্বে পাঠশালা বা স্কুলে শেখে নাই- তার ভুবন হলো ঐতিহ্যের ভুবন। এ যেন কোন পাহাড় থেকে বয়ে চলা এক নদী– তা যতই আমাদের কাছে আসছে- পরিচিত ভুবনের বার্তাবহ হচ্ছে– আঁধারের অবগুণ্ঠন খুলে যুগের সাথে আপোষ করে অগ্রসর হচ্ছে। প্রাচীন সমাজের বহু বিশ্বাস ও উপচার বহু লোকগীতিতে থাকলেও আজ তা আমাদের সকলের সুখ দুঃখের শরীক। গীত হতে হতেই লোকগীতি অগ্রসর হয়– অনেক সময় অন্য কোন জনপ্রিয় গানের লাইন ঢুকে যায়, তাতে নবীনত্বও আসে।[৮৯]

আশরাফ সিদ্দিকীর এই উক্তির আলোকে আমরা দেখি, লোকগীতি অধিকাংশ সময়েই লোকের মাধ্যমে এবং বেশির ভাগ সময়ই তা মৌখিকভাবে প্রচার লাভ করে। এইভাবে সেই লোকসাহিত্যের ছত্রছায়ায় লোকগীতি কারও ব্যক্তিত্বের ছায়াকে আশ্রয় করে না। লোকায়ত সমাজ ও জীবনের কথা বলতে বলতে তা সমাজের সব ধরনের মানুষের অন্তরের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়। তাই লোকগীতি সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পরিবর্তিত হয়। সময় ও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে সেও পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়। পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে সাহিত্যের– বিশেষ করে লোকসাহিত্যেরও পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু সেই পরিবর্তনকে তার অবনতি বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। পালাগানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে আমরা এক ধরনের পরিবর্তন দেখি। এই পরিবর্তন যদিও আধুনিকতার হাত ধরে এসেছে, তবুও তার সার্বজনীন আবেদন কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। আন্তোনিয়ো পালাগানে ভাষা, ভাব এবং প্রকাশভঙ্গিরও আমূল পরিবর্তন এসেছে। তাতে তার সাহিত্যিক মূল্য সীমিত হয়নি, বরং সাধারণ লোকজনের কাছে সেটা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। তবে পালাগানের সাহিত্যিক মূল্য অন্যান্য, বিশেষ করে লিখিত রূপের কাব্য-কবিতার সঙ্গে তুলনা করে নির্ণয় করা যায় না। আবার সেটা তুলনা করা গেলেও তা করা সমীচীন নয়। এই প্রসঙ্গে ম্যাথিউ হডগার্ট মনে করেন,

The traditional division of poetry into form and content is even more misleading with the ballads than with more learned poetry. Formal devices do not make up the whole of the ballad aesthetic... The technical components are really effective only in their context; and that context is a special cultural and artistic tradition. The ballads are closely associated with a particular way of living and thinking; in one sense, folklore is the poetry.[৯০]

এখানে সমালোচক বলতে চেয়েছেন, লিখিত সাহিত্যের মূল্য বিচারের ক্ষেত্রে যে প্রচলিত মাধ্যম অবলম্বন করা হয়, তার উপর নির্ভর করে পালাগানের সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয় করা যায় না। কোনো একটা কালপর্বের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত সাহিত্যের বিচার করা যেতে পারে, তবে সেটা পালাগানের বেলায় না-ও খাটতে পারে। পালাগান একটা নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে। তার মধ্যেকার জীবন-যাত্রার সঙ্গে আমাদের চারপাশের মানুষের জীবনাচরণের মিল হয়ত খুব একটা পাওয়া যায় না। কেননা পালাগানে অনেক সময় অতীন্দ্রিয় জগতের ঘটনা গানের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। তবুও লোকসাহিত্য, তথা লোকগীতির নিরিখেই পালাগানের সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ করা দরকার।

---

৮৯. আশরাফ সিদ্দিকী, *বাংলার মুখ*, পৃ. ৩৮
৯০. M. J. C Hodgart, *The Ballads*, p. 33-34

পালাগানের ছন্দ

কাব্য-কবিতা বা গানের ক্ষেত্রে ছন্দের একটি বড় ভূমিকা আছে। আর আখ্যানধর্মী রচনায় অধিকাংশ সময়ই ছন্দের বৈচিত্র্য দেখা যায়। বাংলা অন্যান্য পালাগানের মতোই আন্তোনিয়ো পালাগানে ছন্দ রচনার ক্ষেত্রে তেমন কোনো অভিনবত্ব চোখে পড়ে না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি একই ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পালাগান বা গীতিকায় ছন্দ রচনার প্রসঙ্গে লোকসাহিত্য বিশারদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন,

> গীতিকা মাত্রই প্রচলিত রচনা রীতির অনুগামী, ছড়ার বিষয়বস্তুর মধ্যে যেমন আকস্মিকতা ও অভিনবত্ব অনেক সময় চোখে পড়ে, তেমনি ছন্দের দিক দিয়াও অনেক সময় নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গীতিকার রচনা রীতিতে কোন বৈচিত্র্য নাই। এই ছন্দে ইহা আনুপূর্বিক রচিত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র একটি গীতিকাই যে আনুপূর্বিক অভিন্ন ছন্দে রচিত হয়, তাহা নহে– ইহা রচনার আর কোন ছন্দই নাই, একই পরিচিত ছন্দ ইহার সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।”[৯১]

ড. ভট্টাচার্যের কথায় পরিপ্রেক্ষিতে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে ছন্দ রচনার বিষয়টি সত্য বলেই মনে হয়। কেননা সমগ্র পালা জুড়ে আমরা শুধুমাত্র একটি ছন্দের ব্যবহার দেখি।

বাংলা পালাগানের মতো ইংরেজি গীতিকার ছন্দেও এমন সহজ সরল ভাবটি অক্ষুন্ন রয়েছে। সেখানে দুয়েকটি ব্যালাডে হয়ত-বা ছন্দ রচনায় নতুনত্ব আনয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সেসব প্রচেষ্টা সফলকাম হয়নি। ইংরেজি ব্যালাডের ছন্দ সম্পর্কে জেমস কিন্‌সলি বলেছেন, “In the ballads we have a body of stories in verse, framed, with few exceptions, in the simplest of metres...”[৯২] সমালোচক জেমস কিন্‌সলির মনে হয়েছে যে, ব্যালাড বা পদ্যের আকারে বলা গল্পে অধিকাংশ সময়ই এক ধরনের সহজ সরল এবং প্রচলিত ছন্দ ব্যবহারের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই ছন্দ ব্যবহারের ফলে কাব্যগীতির কাহিনিটি উপস্থাপন করা সহজসাধ্য হয়।

অন্যান্য পালাগানের মতো সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানও মূলত আনুপূর্বিক ছড়ার ছন্দে রচিত। এখানে ছন্দ রচনার তেমন কোনো বিভিন্নতা নেই। অবশ্য সংস্কৃত ছন্দের লঘু গুরু উচ্চারণ প্রাকৃত স্তরে এসে বিলুপ্ত হয়েছে। বাংলা কবিতার বেলায় কবিরা অধিকাংশ সময়ই অন্তঃমিলের প্রতি মনযোগী হওয়ার ফলে সেখানে শব্দের উচ্চারণের ক্ষেত্রে দল নির্ভরতা বেড়েছে। আবার লোক-কবিরা যে রীতিনিষ্ঠভাবে ছন্দ রচনার প্রতি যত্নবান ছিলেন এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে এই কথা স্বীকার করতেই হয়, পালাগান যেহেতু লোকসঙ্গীত, সেহেতু প্রথাগতভাবে তার ছন্দ নির্ণয় সেভাবে সম্ভব না-ও হতে পারে। লোকসাহিত্যের নিরিখে ছন্দ নির্ণয় পালাগানের লোকধর্মকে অক্ষুন্ন রাখে।

---

৯১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯-৩৭০
৯২. James Kinsley (ed.), *Scottish Poetry: A critical Survey*, James Ferguson, ‘The Ballads’, London: Cassell & Co. Ltd., 1995, p. 100

পালাগানের অলঙ্কার

পালাগান লোকসাহিত্যের একটি অতি জনপ্রিয় ধারা। আপাতভাবে লোকসাহিত্যের মধ্যে মানুষের অনুভূতির প্রকাশ লিখিত সাহিত্যের মতো ততটা পরিশীলিত নয়। সেখানে মানুষের অভিরুচির প্রকাশেও একটা জাতির লোকায়ত মানসিকতাই প্রধান্য লাভ করে। তাই লোকসাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি তার নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে। লিখিত সাহিত্যের মতো তার কোনো দায়বদ্ধতা নেই বললেই চলে। সেই বিচারে লোকসাহিত্য অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংস্কৃতানুসারী বা শাস্ত্রবদ্ধ নয়। লোক-কবিদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তাঁদের অলঙ্কার প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করে। তাই তাঁরা তাঁদের নিজেদের জীবন, সমসাময়িক সমাজ, পরিপার্শ্ব– প্রভৃতি থেকে অলঙ্কার আহরণ করেছেন। গীতিকা বা গাথাসাহিত্যে ব্যবহৃত অলঙ্কারের মাধ্যমে রচয়িতাদের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং অভিরুচিরই প্রকাশ ঘটেছে। অন্যান্য পালাগানের মতো আন্তোনিয়ো পালাগানও অলঙ্কার সমৃদ্ধ। এবার সেই ব্যাপারে আলোকপাত করা যাক।

অলঙ্কার কোনো ভূঁইফোড় বিষয় নয়। মানুষের মনই তার উৎসভূমি। তাই অলঙ্কারসমূহ বেশ সহজ এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে সাহিত্যে প্রবেশ বা অনুপ্রবেশ করে। লোক-কবিদের রচনায় অলঙ্কারের উপস্থিতি অনেক সময় নিরাভরণ। এই বিচারে আমরা দেখি, সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার– দুই ধরনের অলঙ্কারই প্রয়োগ করা হয়েছে।

শব্দালঙ্কার

কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে এবং গ্রহণযোগ্যতায় শব্দালঙ্কারের ভূমিকা আছে। তাই শব্দালঙ্কারের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। শব্দের ধ্বনির উপর নির্ভর করে সৃষ্ট এই অলঙ্কারের সীমাবদ্ধতা থাকলেও তার ব্যবহার শুধু সাহিত্যিকগণ নন, দৈনন্দিন জীবনের কথা-বার্তায় অনেক মানুষই শব্দালঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তবে এই অলঙ্কার পৃথিবীর সব দেশেই সাহিত্যেই দেখা যায়। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখি আন্তোনিয়ো পালাগানে শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস, যমক– প্রভৃতির সমারোহ।

অনুপ্রাস

একই ধরনের বর্ণ বা শব্দ যদি কোনো বাক্যে বার বার উচ্চারিত বা ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে অনুপ্রাস অলঙ্কার বলে। অনুপ্রাসে স্বরধ্বনি নয়, ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থানই গুরুত্ব পায়। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে শব্দের পাশাপাশি অনুপ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের অন্তেও অনুপ্রাস প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। এবারে আমরা পালাগানে লক্ষ্য করি–

ওগো পিতামাতার প্রেমেতে পাই নিগূঢ় পবিত্রতা,
আরে পরম পিতা পরমেশ্বর এই পৃথিবীর দাতা।[৯৩]

বন্দনার এই অংশে শব্দের পাশাপাশি 'প' ও 'র' ধ্বনির প্রাধান্য ছাড়াও আমরা দেখি বাক্যের শেষে 'ত' ধ্বনির সাম্য। তাই এই চরণ দুইটি শব্দানুপ্রাসের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। এছাড়াও–

জানিবা না জানি গীত লইলাম বান্দিয়া,
এই গীত গাইব আমার ঠাকুরে আসিয়া।[৯৪]

এই অংশে 'গ' ধ্বনির সমাবেশ বেশ ভাল শব্দদ্যোতনা সৃষ্টি করেছে। আবার 'খ', এবং 'ব' ধ্বনির সমাহার দেখি আরেকটি পদে–

খানা পানি কিছু না রাখল বাবুর্চি খানার ঘরে,
কালখিদা লাগাই দিল ঐ বিবির উদরে।[৯৫]

কিংবা আরও দেখি নরকের কথা বলতে গিয়ে পালাকার 'জ' ও 'খ' ধ্বনির আধিক্য ঘটিয়ে বলেন–

তুমি যদি দাবি রাখ এই খানা বদলে
সর্ব্বকাল জ্বালাইয়রা মরাব পিতায় দোজখ অনলে।
দোজখ সাচ্চা দোজখ মিছা না দোজখ নৈরাকার,
ঐ দোজখে জ্বালাইয়া মারব পিতায় সকল গুনাগার।[৯৬]

এমনই নানা অনুপ্রাস সমৃদ্ধ আন্তোনিয়ো পালাগান শুনতে বেশ শ্রুতিমধুর লাগে। শব্দানুপ্রাস সৃষ্টিতে পালাগানের গায়েন সিদ্ধহস্ত।

যমক

একই শব্দ যদি দুইটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় বা প্রযুক্ত হয়, তখন তাকে বলে যমক অলঙ্কার। পালাগানে যমকের উদাহরণ খুব একটা বেশি নেই। তবুও দেখা যায় সার্থক যমক সৃষ্টিতে লোক-কবি পারঙ্গম। আন্তোনিয়ো পালাগানের 'দুস্কের পালা'য় যখন ফ্রান্সিস ভক্ত আর ভেরনিকা বিবির অন্নের কাষ্টে দিনাতিপাত করছেন, তখন বিবি ভক্তকে তাঁর যন্ত্রণার কথা জানিয়ে অনুযোগের সুরে বলছেন–

অন্নের জ্বালা বড় জ্বালা যাহার গায়ে লাগে,
এক চক্ষে আসে নিদ্রা আরেক চক্ষে জাগে।[৯৭]

এখানে 'জ্বালা' শব্দ দুইটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন গায়েন। আবার আইন্তনের জন্মের পর তার পিতা খুশিতে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং পুত্রের গলায় সোনার হার পরিয়ে দিলেন। কবি তাই বলেছেন,

---

৯৩. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৯৬. আন্তনী রোজারিও (বাদু আন্তনী), গায়ক, *আন্তনীর পালাগান*, নাগরী, ২০১৭, পৃ. ২১
৯৭. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

যত ছিল দায় দুলাল ভুলাইয়া সে লইল,
সোনার কাছি দিয়া সোনারে সে পরাইল।[৯৮]

অর্থালঙ্কার

শব্দ বা বাক্যের অর্থের উপর নির্ভর করে যে অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয়, তাকে বলে অর্থালঙ্কার। সাহিত্যের, বিশেষত কাব্যের গঠন ও ভাবসৌন্দর্য সৃষ্টিতে অর্থালঙ্কারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। অর্থালঙ্কারের বৈচিত্র্য যত বেশি, কোনো কাব্য বা রচনা ততই শিল্প-সার্থক হয়ে ওঠে। তবে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে অলঙ্কারের খুব একটা বৈচিত্র্য নেই।

উপমা

উপমা অর্থ তুলনা। উপমা মানে কোনো বস্তুর সঙ্গে আরেকটি বস্তুর তুলনা করা বোঝায়। কোনো কাব্য যদি মধুর, হৃদয়গ্রাহী, সরস, শক্তিশালী ও জীবনানুগ– করতে হয়, তবে তাতে যথাযথ উপমার প্রয়োগ করা দরকার। যথার্থ উপমার ব্যবহারে রচয়িতার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে গভীরতর বাস্তব উপলব্ধি ও শৈল্পিক দক্ষতার যেমন স্বাক্ষর মেলে; তেমনিভাবে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, লোকায়ত বিশ্বাস, মানস-চেতনা ও ব্যক্তি-অভিরুচির পরিচয় পরিস্ফুট হয়। সাহিত্যে উপমা একটি গুরুত্বপূর্ণ অলঙ্কার। পালাগানে উপমা ব্যবহারের প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য ব্যালাডের সফল সমালোচক ম্যাথিউ হডগার্ট বলেছেন, “Folk tradition lies behind not only the general attitute expressed in the ballads but the kind of imagery they use. This imagery is of a peculiar kind: ... they are symbolic rather than decorative.”[৯৯]

উপমার আলঙ্কারিক সংজ্ঞার্থ হিসেবে বলা যায় যে, স্বভাবধর্মে দুইটি ভিন্ন জাতীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে ভিন্নধর্মীয় গুণের বা ধর্মের উল্লেখ না করে যদি সেই বস্তুর সামঞ্জস্য প্রকাশ করা হয় তবে সেটা হয় উপমা। উপমায় চারটি অংশ থাকে- উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ। এই চারটি অঙ্গের মধ্যে উপমেয় ছাড়া অন্য যে-কোনো অঙ্গ লুপ্ত থাকলেও উপমা হতে পারে। এবার আমরা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান থেকে কয়েকটি উপমার উদাহরণ দিতে পারি। পালাগানে রচয়িতার জীবন ও সামাজিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে উপমা রচিত হয়েছে। পালাগানের বন্দনায় বলা হয়েছে–

জালুয়ায় যে বায় জাল ছাইক্যা তোলে পানি,
সেইরূপে জোগাইও আমার হরফের গাঁথুনি।[১০০]

এখানে জেলের জাল বেয়ে জল থেকে মাছ ধরার অনুষঙ্গের সঙ্গে গায়েনের গানের কথা নির্বাচনের উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। আবার সেই বন্দনায় গায়েন যখন বলেন–

---

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৯৯. M. J. C Hodgart, *The Ballads*, p. 37
১০০. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

মালিয়ায় যে গাঁথে মালা ফুল সারি সারি,
সেইরূপে জোগাইও আমার হরফের গাঁথুনি।[১০১]

মালির মালা গাঁথার সঙ্গে গায়েনের গানের হরফ বা কথার মালা গাঁথার উপমা রচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে ভগবান যে ভক্তের বিপদ-আপদের সময় সত্যিকারের উদ্ধারকর্তা তার উপমাস্বরূপ পালাগানে শুনি–

যেমন গাভীর পিছে ফিরে বাছুর দুগ্ধের আশে,
সেই মতে গিয়াছি আমি ভক্ত জনার পাশে।[১০২]

চলার পথে আইন্তন সামনে সমূহ বিপদের সম্ভাবনায় হায় হায় করে ওঠেন। তাঁর হাহাকার শুনে মনে হয় তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। আইন্তনের সমস্যার গুরুত্ব বোঝাতে গায়েন বা রচয়িতা এই উপমার আশ্রয় নিয়েছেন–

হায় হায় বইয়া আইন্তন শিরে দিল হাত,
আসমান ভাইঙা যেন পড়িল মাথাত।[১০৩]

উৎপ্রেক্ষা

সাধু আন্তোনিয়োর পালাগানে ব্যবহৃত উমপার পরেই উল্লেখ করতে হয় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের প্রসঙ্গ। এই অলঙ্কারকে আসলে উপমা আর রূপকের মধ্যবর্তী অলঙ্কার বলা যায়। উপমেয় আর উপমানের মধ্যে যদি অভেদ কল্পনা করা হয় তবে সেটি হয় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। পালাগানে কাঠুরিয়া যখন সকাল বেলা খাওয়া দাওয়া করে কাঠ কাটতে বেরোয় তখন বলা হয়েছে–

খাইয়া দাইয়া কাঠুরিয়া মুখে দিল পান।
আর ঘর থেইক্যা বাইর হইল পুণ্যিমাইয়া চান।[১০৪]

এখানে কাঠুরিয়াকে পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। এই উপমার সম্ভাবনাবাচক শব্দ নেই। তাই একে আমরা উৎপ্রেক্ষা বলব, তবে সেটা হল প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। সম্ভাবনাবাচক শব্দ না থাকলে তাকে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা বলা হয়।

বিরোধমূলক অলঙ্কার

যখন দুইটি বস্তু বা বিষয়কে আপাতভাবে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়, কিন্তু তাৎপর্যের দিক থেকে তাদের মধ্যে বিরোধ থাকে না; তখন তাকে বলে বিরোধমূলক অলঙ্কার। আন্তোনিয়ো পালাগানে এমনই কিছু বিরোধমূলক অলঙ্কার রয়েছে। এই অলঙ্কার পালাগানের বিষয়বস্তুকে আরও হৃদয়গ্রাহী করেছে। এইবার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ঐরান জঙ্গলে শাস্ত্র হারিয়ে আইন্তন ঈশ্বরের কাছে আবেদন করেন, যাতে তাঁকে আবার শাস্ত্র দেওয়া হয়। ঈশ্বর তাঁকে শাস্ত্র দিলে আইন্তন যা করেন, সেটা হল–

১০১. প্রাগুক্ত
১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
১০৪. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

শাস্ত্র না পইড়া শাস্ত্র ওয়াকিব হইল,
পিতার হাতের শাস্ত্র অমনি পরাণে ভরিল।[১০৫]

এখানে শিল্পসুন্দর একটি বিরোধাভাস সৃষ্টিতে পালাকবির কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয়। আবার আইন্তন যখন কেশবের বাড়িতে গিয়ে তার খোঁজ করে তখন কেশব-জননী তাঁকে ভিক্ষা দিতে গেলে আইন্তন বলেন–

ভিক্ষার তো না যাজক আমি ভিক্ষা লইয়া যাই,
নামের ভিখারী আমি নাম পাইলে সে চাই।[১০৬]

এই বিরোধমূলক অলঙ্কার বাক্যের অভ্যন্তরীণ ভাবটি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলে। অতএব পালায় ব্যবহৃত এসব অর্থালঙ্কার পালাগানের সাহিত্যিক মূল্যকেই বিশেষভাবে সূচিত করে।

অতিশয়োক্তি

ভাব প্রকাশের জন্য সাহিত্যের বর্ণনায় যদি বাহুল্যের আশ্রয় নেওয়া হয়, তবেই সেটা হয় অতিশয়োক্তি। আন্তোনিয়ো পালাগানে এমন অনেক অতিশয়োক্তি রয়েছে। জন্মের পালায় আন্তোনিয়োর জন্মের পর তাঁর পিতা ফ্রান্সিস ভক্ত এতই খুশি হন যে, তিনি তাঁর রাজ্যের সমস্ত দুস্থ-ফকিরদের ধন-সম্পদ দিয়ে 'রাজার মত' বিত্তশালী করে দেন।

যত ছিল অন্ধ আতুর সেই শহরের মাঝে,
ধন দিয়া করল তাদের রাজার সমাতল।[১০৭]

আবার কেশবের পাণ্ডিত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে পালাকার তার পাঁজি-পুঁথি বহন করার জন্য বলদে টানা গাড়ির প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেন। সেটাই বড্ড বেশি বাড়িয়ে বলা হয়। এটাই এখানে অতিশয়োক্তি।

কেশব নাকি বড় ভক্ত দুনিয়ার উপরে,
পাঞ্জি পুঁথি বয় তার বলদে বলদে।[১০৮]

শব্দগুচ্ছের একাধিক ব্যবহার

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে কিছু কিছু শব্দ বারবার ব্যবহার করার ফলে গানের কাহিনি দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে। আবার এক বারবার প্রয়োগে কোনো চরিত্রের মানসিক অবস্থা সুন্দরভাবে আভাসিত হয়েছে। নির্দিষ্ট একগুচ্ছ শব্দের এমন আরোপ করার ফলে বক্তব্যের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। আইন্তনকে নিয়ে স্বর্গের অধিশ্বর চিন্তিত। তাই তাঁর মানসিক উদ্বেগ প্রকাশ করতে গায়েন গাইছেন–

রহিতে না পারে পিতায় সিংহাসনের মাঝে।
আর স্বর্গের দ্যাবের সঙ্গে কথা লাগছে কহিবারে,
আর পিতায় বলছে স্বর্গের দেব তুমি দেখছনি নয়নে।

---

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১০৮. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

আর আজকে কেন সিংহাসন লাগছে লড়িবারে,
আর সেই কথা ভাইঙা কইবা আমার দরবারে।[১০৯]

আবার আইন্তন ভক্ত যাজকের বেশে কেশবের বাড়িতে এলে, কেশব ভক্তের মা যখন জানতে পারেন যে, আইন্তন শুধু নিজের নামের ভিখারিই নন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরম নামের অধিকারীও বটে। তখন কেশব জননী আইন্তনকে বলেন–

কোন নাম নাই দেখ আমার দরবারে।
কোন নাম যদি থাকে তোমার দেহের মাঝে,
কোন নাম শিখাইয়া যাও বাইর বাড়ির দখখলে।[১১০]

এখানে কেশবের মায়ের মনের অবস্থা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। তিনি নিজে সাধনার কোনো নাম দিতে না পারার জন্য শঙ্কিত। আবার আইন্তনের কাছে নাম প্রার্থনা করছেন। অন্যদিকে শয়তান আইন্তনের পিতা ফ্রান্সিস ভক্তকে বিপদে ফেলতে সওদাগরের দুই ছেলেকে হত্যা করে ভক্তের ঘরে লুকিয়ে রাখার পরিকল্পনা আমরা শুনি,

দুইটি ছেইল্যা মাইরা লমু ঐ দরিয়ার উপরে।
দুইটি ছেইল্যা লইয়া যামু ঐ নিজগুয়া শহরে,
দুইটি ছেইল্যা ছাপাইয়া রাখুম ফ্রান্সিস ভক্তের ঘরে।[১১১]

শেষে পরাজিত শয়তান আর কোনো উপায় না দেখে আইন্তনকে বলে তিনি যাতে তাদের ছেড়ে দেন, তবে তারা আইন্তনের শাস্তি মেনে নেবে এবং তাঁর শহর ছেড়ে অন্য কোনো শহরে চলে যাবে। আইন্তন তখন তাদের কুকর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

এক ভাঞ্জি দিছ পিতারে ঐরান জঙ্গলে,
আরেক ভঞ্জি দিছ পিতারে বাবুর্চিখানার ঘরে।
আরেক ভাঞ্জি দিছ পিতারে ধনের মাণ্ডব ঘরে,
আরেক ভাঞ্জি দিছ পিতারে রাজার দরবারে।
আরেক ভাঞ্জি দিছ আমারে ইস্কুল পড়িবারে,
আরেক ভাঞ্জি দিছ পিতারে আবার গর্দান লইবারে।[১১২]

আন্তোনিয়ো পালাগানে প্রবাদ-প্রবচন

বাংলা প্রবাদেও সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করতে গিয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "প্রবাদ গোষ্ঠী-জীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি।"[১১৩] ড. ভট্টাচার্যের মতো প্রবাদের এত সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত এবং সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ আর কারও পক্ষে করা সম্ভব কি না জানি না। তবে এখানে প্রবাদের কয়েকটি সত্যিকার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। প্রবাদ মুখে মুখে প্রচার লাভ করে। তাই একে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করে আলোচনা করা হয়। তবে মৌখিক ধারার এই প্রবাদ আস্তে আস্তে সাহিত্যের

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
১১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
১১৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৯৭২, পৃ. ১৬

মধ্যেও প্রবেশ করে। লোকসাহিত্যে তো বটেই, আবার লিখিত সাহিত্যেও প্রবাদ স্থায়ী আসন করে নেয়। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে প্রবাদ কিছুটা পরিবর্তন লাভ করে। বলা যায় সামান্য পরিমাণে তার নিজস্বতা হারায়। কথার পরিবর্তন ঘটলেও প্রবাদের মূল ভাবের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না। বিশেষ করে কথাসাহিত্যে প্রবাদ পরিবর্তন লাভ না করলেও কাব্য-কবিতা বা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ছন্দমিলের প্রয়োজনে তার বহিরঙ্গের কিছু কিছু পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠে। এবার আমরা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে প্রবাদ-প্রবচন প্রয়োগের দিকে আলোকপাত করি।

বাংলা প্রবাদের যে রূপ আমরা সচরাচর দেখি, আন্তোনিয়ো পালাগানে কিন্তু হুবহু সেই একই রূপ দেখা যায় না। তাদের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বৃক্ষের সত্যিকারের পরিচয় যে তার ফলের মধ্যে, সেই প্রসঙ্গ তুলে এখানে বলা হয়েছে যথার্থ গুরুর পরিচয় তাঁর শিষ্যের মধ্যেই নিহিত,

> গাছ যাহার ভালো হয় ফল তাহার মিষ্ট,
> গুরু যাহার ভালো হয় শিষ্য তাহার শিষ্ট।[১১৪]

এখানে এই প্রবাদের মাধ্যমে গায়েন তাঁর নিজের গুরুর মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। কিছু কিছু মানুষ আছে নিজে কোনো বিষয়ে সঠিকভাবে না জানলেও তার জ্ঞান জাহির করতে ওস্তাদ। আর সেই বিদ্যা বা জ্ঞান অজ্ঞানতার নামান্তর। গড্ডালিকা প্রবাহের কথা বলতে গিয়ে রচনাকার বলেছেন,

> আরে নিজে না বুঝিয়া যেইবা অন্যের বুঝায়,
> এক ভেরীর পাছে যেমন আরেক ভেরী যায়।[১১৫]

মানুষের মান-সম্মান বড় বিষয়। কেউ ধন-সম্পত্তি খোয়ালে তা আবার ফিরে পেতে পারে; কিন্তু সম্মান হারালে তা আর ফিরে পাবার কোনো উপায় থাকে না। আবার মানুষের কোনো অভ্যাস, বিশেষ করে বদভ্যাস থাকলে সেটা সহজে সরানো যায় না। সেটা যেন মানুষের দ্বিতীয় সত্তা হিসাবে পরিগণিত হয়। এই প্রসঙ্গে গায়েন বলেন–

> ইজ্জত যায়না ধুইলে.
> আর খাইসলত যায় না মইলে।[১১৬]

আত্মসম্মান নিয়ে থাকা বা বাঁচা ভাল, কিন্তু সেই সম্মানবোধ যাতে অহেতুক না হয়। এই মানসিকতা যাতে মানুষকে অহঙ্কারী না করে। নিজেকে সেরা বা উঁচু ভাবলে তার পতন অনিবার্য। আবার অনেক সময় আরোপিত বা মিথ্যা নম্রতার বশে নিজেকে খুব ছোট বা হীন ভাবলেও বিপদ। তাতে জীবনে সত্যিকারভাবে বড় হওয়া যায় না। আমাদের মধ্যে আত্মবোধের একটা ভারসাম্য থাকা দরকার। গায়েনের পরামর্শ–

---

১১৪. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
১১৫. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

অতি উঁচু না হইও বাতাসে ভাঙিব,
অতি ছোট না থাকিও ছাগলে মোরাইব।[১১৭]

এই পৃথিবীতে এমন কিছু লোক আছে যাদের জন্য ভাল কিছু করলে উল্টো তারাই মঙ্গলকারীকে দোষারোপ করে। তাই কারও উপকার করার আগে সাতপাঁচ ভাবতে হয়। মানুষের এই দ্বিমুখী চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে পালাগানের গায়েন বেশ সুন্দর একটা প্রবাদের আশ্রয় নিয়ে বলেছেন–

যাহার জন্য করলাম চুরি সেই তো বলে চোরা,
জান দিয়া না পাইলাম নাম আবার নছিব হইল বুরা।[১১৮]

আমাদের সমাজে কিছু প্রচলিত মান-মানসিকতা ও ধারণা আছে যে, কোনো খারাপ কিছু হলে বা কোনো কাজের নেতিবাচক প্রভাব পড়লে আমরা সহজেই তার দোষ অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিই। তবে সত্যিকথা হল কোনো কাজের দায়িত্বে থাকা মানুষকে নেতিবাচক প্রভাবের দায় নিতেই হয়। পরকে দোষারোপ করা অনেক উদাহরণ আন্তোনিয়ো পালাগানে রয়েছে। তবে কোনো দেশের যদি অকল্যাণ হয়, তার দায় গিয়ে বর্তায় শাসক বা রাজার উপর– কেননা তিনি প্রজাপালক; তিনিই সবার রক্ষাকর্তা। আবার চিরন্তন বাঙালি সমাজের রীতি অনুসারে আমরা দেখি, সংসারের সমস্ত দায় কিন্তু একা নারীকেই নিতে হয়। সেই কথাটিও গায়েন একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন–

রাজার দোষে রাইজ্য নষ্ট লোকে বলায় করে,
আরে স্ত্রীর দোষে পুরুষ নষ্ট বাচ্চায় কেন মরে।[১১৯]

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে এমনই আরও কিছু প্রবাদ রয়েছে যা লোকায়ত মানব জীবনের নানা অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। তাই এগুলি আমাদের কাছে গ্রহনীয়।

বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের ব্যবহার

প্রবাদের মতো বিশিষ্টর্থক শব্দগুচ্ছ সাহিত্যের ভাব ও প্রকরণগত উৎকর্ষ সাধন করে। আন্তোনিয়ো পালাগানে এমনই বেশকিছু শব্দগুচ্ছ আছে যা প্রবাদ-প্রবচন না হয়েও বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। আসলে গানের প্রয়োজনেই এইসব শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ সহযোগে আমরা যদি আলোচনা করি, তবে দেখব এইসব শব্দসমূহ গায়েন বা রচয়িতার মানসিক অবস্থা আমাদের সামনে অকপটে প্রকাশ করে। বন্দনায় গায়েন শিষ্যের সাফল্য এবং অসাফল্যের কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন,

হালুয়া যে চষে হাল বান্দিয়া চাইর আইল,
শিষ্য যাহার অভাজন হয় গুরুতে খায় গাইল।[১২০]

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
১১৯. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

ভাল চাষি তার জমির চারিদিকে ভালভাবে মাটি তুলে তারপর চাষের কাজ করে। তেমনি ভাল গুরু প্রথম থেকেই যথাযথভাবে তাঁর শিষ্যকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। তাই গায়েনের মুখে আমরা শুনি–

এইসব জানিয়া ভবে কর বেচাকিনা,
আসিবে মালিকের হুকুম কিবা রাত্রি দিনা।[১২১]

এই পৃথিবীতে জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। যে-কোনো সময় আমাদের এই আলোহাস্যোজ্জ্বর ধরণী ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে। এই সবই নির্ভর করে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের উপর। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা ভেবে আমাদের যথাযথভাবে জীবন যাপন করা দরকার। যখন সেই পরমের ডাক আসবে তখন এই দুনিয়ার হাসি-খেলা রেখেই আমাদের ফিরতে হবে। আমরা যেন তার জন্য সবসময় প্রস্তুত হয়ে থাকি। এমনই বিশিষ্ট অর্থ-প্রকাশক শব্দ ব্যবহারে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের গায়েন সিদ্ধহস্ত। সেগুলো আমাদের জীবনসম্পৃক্ত।

পালাগানে প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস

সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ। পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো ভাষার সাহিত্যে মানুষের ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের আচার-ব্যবহার ও জীবন-যাপনের আলেখ্য থাকবেই। পালাগানেও একটি সংঘবদ্ধ সমাজের মিলিত বিশ্বাস ও সংস্কার প্রকাশ পায়। ইংরেজি সাহিত্য সমালোচক ম্যাথিউ হডগার্ট বলেছেন, “The ballads are a record of social history, and many of them reflect a distinctive type of community and a dinstinctive set of social values.”[১২২] অর্থাৎ, হডগার্ট বলতে চেয়েছেন যে, পালাগান হচ্ছে সমাজ এবং ইতিহাসের আলেখ্য। তাদের মধ্যে বিশেষ একটা সমাজের লৌকিক আচার-আচরণ এবং মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের এমন সামাজিক মূল্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে।

আন্তোনিয়ো পালাগান বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্যই শুরু হয়েছিল। তাই তার মধ্যে খ্রিষ্টীয় চিন্তাধারা এবং বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। তবুও বাঙালি জাতির কিছু সংস্কার ও বিশ্বাস তারমধ্যে বাণীরূপ লাভ করেছে। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস মতে কোনো কাজ শুরু করার আগে ক্রুশের চিহ্ন করা বা পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার নাম নেওয়া একটা চিরাচরিত প্রথা। তাই আমরা দেখি পালাগানে যে সব খ্রিষ্টবিশ্বাসী চরিত্র আছে, তারা সবাই কোনো কাজ বা যাত্রা শুরু করার আগে ক্রুশের চিহ্ন করে। ফ্রান্সিস ভক্ত, ভেরনিকা বিবি এবং স্বয়ং আইন্তনও পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার নাম স্মরণ করে সব কাজের সূচনা করেন। পালাগানে আইন্তন ভক্তের সম্বন্ধে বলা হয়েছে এই ভাবে,

---

১২১. প্রাগুক্ত
১২২. M. J. C. Hodgart, Ibid., p. 131

আজানু পাতিয়া ভক্তে সিদ্ধি কুরুশ করে,
মহাপ্রভুর নামটি ভক্তে মনে স্মরণ করে।[১২৩]

কোনো কাজ ভগবানের নাম নিয়ে শুরু করলে তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। আইন্তন ভক্ত জেলেদের একইভাবে বলেন তারা যেন পবিত্র ত্রিত্ব-ঈশ্বরের নামে নদীতে জাল ফেলে, তবেই প্রচুর মাছ পাবে। তাঁর কথামতো তাঁরা–

পিতা পুত্র পবিত্রাত্মার নামে জালের রশি লইল হাতে,
পরম পিতার নামে জাল উঠায় ডিঙার মাঝে,
সাতটি নৌকা বোঝাই করল একটি খেওয়ার মাঝে।[১২৪]

আবার এই নামের গুনেই কেশবের মা শূন্যে উঠে যায়। আইন্তনের কাছে পরম নাম চাইলে আইন্তন তাকে পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার নাম নিতে বলেন। আইন্তনের কথা শুনে–

পিতা পুত্র পবিত্রাত্মার নামটি লইল বারে বারে,
আরে মৃত্তিকা ছাইড়া উঠল কেশবের মা শইন্যের উপরে।[১২৫]

এই বিশ্বাস থেকে পালাগানের চরিত্রের মধ্যে এমন ধর্মানুগত্য দেখা যায়। ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সামজিক জীবনেও মানুষের মধ্যে প্রচলিত কতগুলি বিশ্বাস কাজ করে। পুত্র-সন্তানের প্রতি সবারই একটা আলাদা পক্ষপাত থাকে। মানুষের বিশ্বাস– পুত্র বংশের মুখ রক্ষা করে। পালাগানে আমরা শুনি ফ্রান্সিস ভক্ত এবং ভেরনিকা বিবি পরম পিতা ঈশ্বরের কাছে পুত্র-সন্তান কামনা করছেন। আবার 'উপরান রাজার পালা'য় আইন্তনের কথা শুনে উপরান যখন তার পিতামাতার কাছে জানতে চায় যে, তারা তার নরবলি দিয়ে পূজা করার অংশীদার কি না, তখন তারা সেই দায় নিতে চায় না। তারা বরং উপরানের জীবনের পরিবর্তন চায়। তাদের প্রিয়জন খারাপ কাজে প্রণোদনা দেবে, সেটা মেনে নিতে পারে না। তাই তারা আপনপুত্র উপরানকে ভর্ৎসনা করে বলে–

সুপুত্র হইলে ভবে করে যে সুকাম,
জাতি বাঁচে কূল বাঁচে, বাঁচে বংশের নাম।[১২৬]

এখানে পুত্রকে ঘিরে পিতামাতার প্রত্যাশা গোপন থাকে না। তারা এ-ও জানে যে পুত্র যদি ভাল হয় তবে সেটা তাদের গৌরব। আবার পুত্র যদি খারাপ হয় তবে সেটা তাদের পক্ষে অবমাননাকর। এই কথা-ই পালাগানে উপরানের বাবা-মা এক বুক ব্যথা নিয়ে বলে–

আবার কুপুত্র হইলে ভবে করে কুকাম,
জাতি ডুবায় কূল ডুবায়, ডুবায় বংশের নাম।[১২৭]

---

১২৩. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
১২৪. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
১২৭. প্রাগুক্ত

পিতামাতার মনে এই প্রত্যয় থাকা সত্ত্বেও তার পুত্র-সন্তানের উপর থেকে প্রত্যাশা ফিরিয়ে নিতে পারে না। পুত্র-সন্তান যে তাদের ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ ভরসা, সেই কথা তারা ভুলতে পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত তারা বলে–

> পুত্রজন থাকলে ভবে বাইচ্যা খাইতে পারে,
> মরণ কালে হয় ছেমা শিয়রের উপরে।[১২৮]

আমাদের দেশে এখনও পুত্রের মুখ চেয়েই অনেক পিতামাতা বেঁচে থাকেন। তাকে ঘিরে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন। অন্তত এটুকু ভাবতে পারেন যে, মৃত্যুর সময় পুত্রধন তাদের মাথার উপর ছায়ার মতো দাঁড়াবে। পুত্রকে ঘিরে এই একান্ত বাঙালি মানসিকতা পালাগানের প্রেক্ষাপটে সত্যতা লাভ করে। পালাগানে তাই পুত্র-সন্তানের গুরুত্ব বেশি। সবচেয়ে বড় কথা পুত্র বংশ রক্ষা করে। এই কথাটি বলতে গায়েন যে কাব্যভাষার আশ্রয় নিয়েছেন তা সত্যিই চমৎকার: "আবার পুত্রজন থাকলে ভবে হয় কি না কাম,/মরণকালে রক্ষা করে পিতা ধর্মের নাম।[১২৯]

পালাগানে আইন্তনের সংস্পর্শে এসে প্রায় সবাই নিজের জাতি, ধর্ম, কূল, আত্মীয়-স্বজন, ঘরবাড়ি, ধন-সম্পত্তি সব ছেড়ে দিয়ে তাঁর শিষ্য হয়ে যায়। নতুন জীবন লাভের পর প্রত্যেকের জীবনে একটা দায়িত্ব থাকে। সেই মতো তাকে কিছু করতে হয়। অনেকে দরিদ্রকে সাহায্য করে, কেউ-বা আবার সহায়-সম্পদ বিলিয়ে দেয়। তবে সবচেয়ে বড় ত্যাগ হল সবকিছু ছেড়ে প্রভুর শিষ্য হওয়া। আর পালাগানে তাই দুই জেলে, সাত বালক, উপরান, কেশব– এরা সবাই একই সুরে বলে–

> এই অবদি রাইজ্যপাট ছাইড়া দিলাম তারে,
> ঘরে আছে পিতামাতা বিদায় দিলাম তারে।
> ঘরে আছে স্ত্রীপুত্র আবার বিদায় দিমু তারে;
> সেবক হইয়া যামু পাছে যা থাকে কপালে।[১৩০]

ভগবানের উদ্দেশ্যে মানুষকে কিছু না কিছু দান করতে হয়। বিশেষ করে খ্রিষ্টীয় শিক্ষায় এই দিকটি গুরুত্ব দেওয় হয়। আন্তোনিয়ো পালাগানের শেষে যে 'দোয়া গীত' গাওয়া হয়, সেখানে ভক্ত কিভাবে জীবন যাপন করবেন তার একটি নির্দেশনা দেওয়া আছে। শুধু ভক্ত কেন, যে কোনো মানুষের জন্যই এই নীতিবাক্য পালনীয় হতে পারে। এই সমস্ত আজ্ঞা ঠিকমতো পালন করলে স্বর্গসুখ পাবে বলে গায়েনের পরামর্শ–

> অনাহারীকে দিও খানা আর পিপাসীকে পানি,
> আর বস্ত্রহীনে দিও বস্ত্র এই নীতি জানি।
> ঠাকুরের নামে দিবা পয়সাকড়ি দান,
> আরে ধনে বলে ভইরা রাখব সকল সন্তান।
> পরের স্ত্রী পরের পুরুষ যেইবা লোভ করে,
> লোহার মুঙ্গর হাতে লইয়া যমে ধাওয়া করে।
> অজ্ঞানেতে পাপ করলে জ্ঞান হইলে সারে,
> আরে জাইন্যা শুইন্যা করলে পাপ এই দুইনায় মরে।

---

১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
১২৯. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

সাধুজন তরিয়া গেল তার ভজনার বলে,
পাপীরে তরাইতে পারে সাধুগণের দলে।[১৩১]

পালাগানে সমাজচিত্র

মানুষের জীবনধারণ সমাজকে অবলম্বন করে, সমাজ নিয়ে আবর্তিত হয়। সমাজে মানুষ ছাড়া আর কোনো সচেতন সত্তা নেই। সেইজন্য মানুষের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি– সমাজ নিরপেক্ষভাবে সৃষ্ট হতে পারে না। সৃজনশীল কোনো কিছুই সমাজ থেকে বাদ দিয়ে গণ্য হতে পারে না। তাই সমাজ ও সাহিত্যের যোগ হরিহর-আত্মার মতোই। এই কারণেই লোকসাহিত্য বা শিষ্টসাহিত্য সব সাহিত্যেই মানুষের সমাজ-জীবনের প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য। বাংলাদেশের গীতিকাগুলি রচনার পেছনে রচয়িতাদের মধ্যে একটা সামাজিক প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল। কোনো রচনার পেছনে এই ধরনের সামাজিক চেতনা কাজ করলে স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে সামাজিক জীবন এবং তার চিত্র প্রতিফলিত হবে। এই প্রসঙ্গে ড. আশরাফ সিদ্দিকী বলেছেন, "এমন একটা যুগ ছিল যখন গীতিকা তৈরির পেছনে একটা সামজিক প্রেরণা ছিল। ... কোন একজন গায়ক একটা গীতিকা তৈরি করতেন সামাজিক প্রয়োজনে। ... এ সমাজ ছিল গ্রামীণ, এর সংস্কৃতিও ছিল গ্রামীণ।"[১৩২] অন্যদিকে ময়মনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে প্রায় একই কথা বলেছেন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, "ইহার বৈশিষ্ট্য সামাজিক ভিত্তির উপরও ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে। প্রকৃতি ও সমাজ ইহাদের লক্ষ্য।"[১৩৩] লোকসাহিত্যের এই দুই দিকপাল বিশেষজ্ঞের কথা আন্তোনিয়ো পালাগান সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে আমরা সামাজিক প্রয়োজনে এই পালাগানের সৃষ্টি হতে দেখি। সেই সময় মানুষের মধ্যে চিত্ত-বিনোদনের একটা উপায় হিসেবে পালাগান খ্রিষ্টসমাজে প্রচলিত ও প্রচারিত হতে শুরু করে। প্রচারিত বলছি, কেন না বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের একটা জনপ্রিয় মাধ্যমরূপেরও পালাগান গৃহীত ছিল। এমন প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্ট পালাগানে সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপট নিয়ে এবার আলোচনা করি।

আন্তোনিয়ো পালাগানে মানুষের যে জীবিকার কথা বলা হয়েছে, তা যেন গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মানুষের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। তপস্যার পালায় আমরা এক কাঠুরিয়ার কথা শুনি। গানে বলা হয়েছে, "এক বেটা কাঠুরিয়া ছিল সেই জঙ্গলের মাঝে"। তার জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন হল জঙ্গল থেকে কাঠ জোগাড় করে বাজারে বিক্রি করা এবং সেই উপার্জনে পরিবার চালানো। ভক্তের তপস্যায় জঙ্গল ময়দানে পরিণত হয় তখন কাঠুরিয়া নিজেই রাজার কাছে নিয়ে নালিশ করে বলে, "লাকরি বেইচ্যা খাই তোমার ঐরান জঙ্গলে"। জঙ্গল পরিষ্কার হলে তার সমস্যা। তাই তার অনুযোগ, "আমার ঘর গুষ্টি শুকাইয়া মরে ঐ আপনার ঘরে"। এই বিপদ থেকে রাজা যেন তাকে উদ্ধার করেন।

১৩১. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
১৩২. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোক সাহিত্য*, পৃ. ৪৯-৫০
১৩৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯২

কাঠুরিয়া কাঠ সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করে 'দাও' বা দা। বাংলাদেশে কাঠ-জাতীয় শক্ত কোনো কিছু কাটতে হলে সবাই কাটারি বা দা ব্যবহার করে। গানে বলা হয়েছে সকাল বেলা কাঠুরিয়া "তার দাও খান লইল সে আপনার হাতে"। কাঠুরিয়ার পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। বাঙালি পরিবারে পানের প্রচলন পালাগানেও প্রতিফলিত হয়েছে। তাই গানে যখন শুনি "খাইয়্যা দাইয়্যা কাঠুরিয়্যা মুখে দিল পান", তখন বুঝতে বাকি থাকে না পালাগানের এই কাঠুরিয়া বাংলারই কোনো বনাঞ্চলের বাসিন্দা, যে গাছ কেটে বাজারে বিক্রি করে তার জীবন ধারণ করে।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অবিকল চিত্রও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে পাওয়া যায়। ভক্তের সমস্যায় ঐরান জঙ্গল ময়দানে পরিণত হলে রাজা তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন এবং তাঁকে ঐরান রাজ্যের রাজা করেন। এমনকি তিনি নিজের এলাকার লোকজনদের ডেকে ঐরান রাজ্যে বসবাস করার নির্দেশ দেন। তারা মনের সুখে সেখানে বসবাস করতে লাগল। একসময় শয়তানের কোপে আর কোনো বৃষ্টি হয় না। লোকেরা বহু কষ্টে জমিতে চাষ করে কিন্তু কোনো ফসল হয় না। বীজ বুনলেও তা থেকে কোনো শস্য উৎপন্ন হয় না বরং সবই রোদে জ্বলে-পুড়ে যায়। তারই ফলে আমরা দেখি "খুইট্যা খাইবার লোক নাই রায়ত জনের ঘরে"। আর কোনো উপায় না দেখে "রায়তজন চইল্যা গেল আর কোন শহরে"।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে মৎসজীবী মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। খালে বিলে নদীতে মাছ ধরা এবং সেই মাছ বাজারে বিক্রি করে জীবন ধারণ করার মতো মানুষ খুব সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। জেলেদের জীবন যাত্রার সঙ্গে কমবেশি আমরা সবাই পরিচিত। আন্তোনিয়ো পালাগানের আমরা জেলেদের সাক্ষাৎ পাই। 'জাউলার পালা'র প্রথমেই আমরা শুনি "দুইটি জাউলা বায় জাল লাহর দইরার মাঝে"। তারা সাতদিন যাবত চেষ্টা করেও কোনো মাছ পায় না। সেই নদীতে যে মাছের কথা শুনি সে-ও আমাদের গ্রাম বাংলার খালে বিলের "চান্দা গুরা মচ্ছি"। জেলেরা জাল এবং নৌকা নিয়ে মাছ ধরার আশায় "ডিঙা বাইয়্যা দিল তারা দরিয়ার সেই কূলে"। জেলেরা অন্য মানুষের সঙ্গে এক জায়গায় বসবাস করে না। তারা মিলে মিশে একত্রে থাকে। কোনো প্রয়োজন পড়লে একজন আরেকজনকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। বাংলাদেশে যেমন জেলেপাড়া আছে তেমনি গানের মধ্যেও 'জালুয়া নগর' বা জেলে পাড়ার কথা বলা হয়েছে। দুই জেলে যখন জাল উঠাতে পারে না তখন আইন্তন ভক্ত তাদের বলেন,

তোমাগো না ইষ্টিকুটুম আছে জালুয়া নগরে,
দশ ভাই ডাইক্যা আন জাল উঠাইবারে।[১৩৪]

সেই সময় সমাজে নানা পেশার লোক ছিল। উপরের আলোচনা ছাড়াও আমরা পালাগানে আরও কিছু জীবিকা নির্বাহের পরিচয় পাই। কেউ কেউ পালকি চালাত। রাজার দরবারে থাকত পালকি বেহারা। তারা রাজা এবং গন্যমান্য লোকদের নানা জায়গায়

---

১৩৪. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

নিতে যেত এবং ফিরিয়ে আনত। রাজা যখন ভক্ত আর বিবির তপস্যার কথা জানতে পারেন, তখন তিনি নিজেই গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁর যাবার প্রসঙ্গে গানে বলা হয়েছে–

সোয়ার গিয়া হইল রাজায় পালকির উপরে,
পালকি বেয়ারা চইল্যা গেল ঐরান জঙ্গলে।[১৩৫]

এছাড়াও আমরা ঘাট-মাঝির সাক্ষাৎ পাই। তাদের কাজ নদীতে লোক পারাপার করা। যে-কোনো মানুষ এই কাঝ করতে পারত না। খেয়া পারাপারের জন্য সদরের অনুমতি লাগত। সেখানে আবার তাদের খাজনাও দিতে হত। এইভাবেই মাঝিরা তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। পরম পিতার অভিশাপে আইন্তনও লাহর দরিয়ায় বার বছর খেয়া পারাপার করেন। তাঁকেও সরকারের অনুমতি নিতে হয়েছে। আইন্তন আগেকার ঘাটমাঝিকে বলছেন–

সদরের হুকুম আমি লইয়া আইছি তারে,
বারো বচ্ছর দিমু খেওয়া এই লাহর দইরার মাঝারে;
নাও নৌকা লইয়া যাও তুমি আপনারই ঘরে।[১৩৬]

অনেকে আবার পশু পালন করত। এই কাজে বিশেষভাবে ছোট ছোট ছেলেদের নিয়োগ করা হত। সাত বালকের পালায় সাতটি বালক গরু, বাছুর, শূয়োর এবং ভেড়া চাড়য়। তারা সারাদিন মাঠে মাঠে থাকে আর পশু পাহারা দেয়। সন্ধ্যা হলে তার ঘরে ফেরে। সেই যুগে মানুষ দারোয়ানের কাজও করত। পালাগানে দেখা যায়– আইন্তনের সংস্পর্শে এসে সাত রাখাল বালক যখন গানে মত্ত তখন তাদের ধরে একটি ঘরে আটক করে রাখা হয়। সেই ঘরে পাহারা দেবার জন্য পাহারাদার বা 'দেউরিদার' নিয়োগ করা হয়। পালাগানের ভাষায়–

গিরস্তে বলছে দেউরিদার, বলি গো তোমারে,
আমরা সাতটি পুত্র করলাম কয়েদ এই ঘরের মাঝারে।[১৩৭]

নৌ-বাণিজ্য ছাড়াও অনেকের আবার ছোটখাট দোকান ছিল। নিত্য ব্যবহার্য জিনিস মানুষ সেসব দোকান থেকে কিনত। কেশবের বাজারে এই দোকানদার বা দোকানসেবীরা বেচাকেনা করে। এখানে বোঝা যায়, সেই কালে বাজারে গানের আসর বসত। মানুষ আগ্রহের সঙ্গে সেসব পালাগান শুনত। আন্তোনিয়ো পালাগানে কেশবের পালায় আমরা দেখি যে আইন্তন ভক্ত যখন–

সেবক লইয়া করে গাহেন বাজারের মাঝারে,
বিক্রিগিরি কিছু নাই যে বাজারের মাঝারে।
যত আছে দোকানসেবি বাজারের মাঝারে,
সকলে মইজ্জা রইল গাহেনার মাঝে।[১৩৮]

---

১৩৫. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। সেই দণ্ড কার্যকর করার জন্য ছিল জল্লাদ। দুই শয়তান যখন প্রতিশোধ স্পৃহায় আইন্তনের বাবার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনে, তখন রাজা জল্লাদ ডেকে তাঁকে প্রকাশ্যে হত্যা করতে বলেন। গানের ভাষায়–

আপনা হস্তে কইরা যে খুন রাখছে আপন ঘরে,
এই বেটার গর্দান লও তুমি ময়দান পাথারে।[১৩৯]

সমাজে যাজক, পীর, দরবেশ, আউলিয়া– এমনই ধর্মগুরুদের উপস্থিতি ছিল। তাঁদের নিজস্ব কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। তাঁরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। মানুষের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে নিজেদের অন্ন জোগাড় করতেন। লোকেরা তাঁদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখত। এখানে যাজক, পীর এবং আউলিয়া– শব্দগুলি একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। পীর বলতে আমরা বুঝি মুসলিম সমাজের সাধুপুরুষ, যাঁরা খোদা ও পৃথিবী সম্বন্ধে জানেন। তাঁরা পুণ্যাত্মা, মহাপুরুষ। তাঁরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। সবাই তাঁদের বিশেষ মান্য করেন। খ্রিষ্টান সমাজের যাজকগণ তেমনি সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। যাজকের পরিচয় দিতে গিয়ে পালাগানের কবি বলেছেন–

যাজক বেশে পরম পিতায় চইলা ম্যালা করে।
যাজক যাজক বলো সবে যাজক কোন জন,
প্রথমকার ভাগি করছে ঐ প্রভু নিরাঞ্জন।
যাজক যাজক বল সবে যাজক আউলিয়া,
ঘাটে ঘাটে দিয়া নাও দেখছে নীরব হইয়া।[১৪০]

আইন্তনের শিরে চড়ে নদী পার হওয়ার জন্য স্বর্গের প্রভু যাজক বেশে আইন্তনের কাছে যান। তখনই আমরা যাজকের পরিচয় পাই। এখানে যাজক আর আউলিয়া শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার আইন্তন ভক্তের পিতামাতার কষ্টের সময় এই পরম পিতাই স্বর্গের দূতকে আবার ফ্রান্সিস ভক্তের কাছে পাঠান এই নির্দেশ দিয়ে–

সদাগর বেশে যাইবা শানের বান্দাইল ঘাটে,
যাজক বেশে যাইবা তুমি বাইর বাড়ির দখ্‌খলে।[১৪১]

পালাগানে আমরা দেখি যে, স্বর্গদূতের আগমনে যেন আইন্তন ভক্তের বাড়িতে উৎসাহের সাড়া পড়ে যায়। সবাই তাঁর সেবাযত্ন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এমনকি দীর্ঘ বার দিন অনাহারে থাকা ভেরনিকা বিবিও দূতের আগমনে তাঁর কর্তাকে ডেকে বলেন–

যাজকের যেন জিকির শোনালাম বাইর বাড়ির দখ্‌খলে,
কি ভিক্ষা চায় যাজক শুইন্যা আস তারে।[১৪২]

---

১৩৯. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
১৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

যাজকগণ কোনো বাড়িতে এসে প্রথমেই জোর গলায় “পিতার নামে জিকির” দিতেন। জিকিরকে সহজ কথায় আমরা নমস্কার বলতে পারি। এই জিকির বর্তমানে “জয় যিশু’ বা “যিশু প্রণাম” জাতীয় সম্ভাষণে পরিণত হয়েছে। আজও বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায় যাজক এবং খ্রিষ্টভক্তদের মধ্যে এই সম্ভাষণ প্রচলিত আছে।

আন্তোনিয়ো পালাগানে নারী চরিত্র খুব বেশি নেই। তাঁদের মধ্যে আইন্তনের জননী ভেরনিকা, কেশবের মা, কেশবের স্ত্রী প্রধান। তবুও এখানে সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। পালাগানের প্রেক্ষাপটে মনে হয় সেই সময় নারীরা পুরুষের সঙ্গে সহজে মেলামেশা করতেন না। অন্য পুরুষ, বিশেষ করে অপরিচিত পুরুষ মানুষের সামনে তাঁরা সহজে আসতেন না। ভেরনিকা বিবি যখন চরম ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত তখনও তিনি খাবারের খোঁজে ঘর থেকে বের হন না। তিনি তাঁর স্বামীকেই বার বার খাবার আনতে পাঠান। একইভাবে পরম পিতা যখন ফ্রান্সিস ভক্তের “মন বুঝিবারে” যাজকের বেশ ধরে তাঁর বাড়িতে আসেন, তখন ভেরনিকা বিবি ঘর থেকে ভক্তকে যাজকের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। অতিথি আপ্যায়নের সময়ও নারীরা সাধারণত ঘরের ভেতরেই থাকতেন। ভেরনিকা যাজকের জন্য খাবার প্রস্তুত করে ভক্তকে দিয়ে যাজকের কাছে পাঠান। তিনি নিজে যাজকের সামনে যান না–

> বিবি বলছে দয়ার ভক্ত, ভক্ত গো,
> এই খানা লইয়া যাও বাইর বাড়ির দখ্‌খলে;
> এই খানা দিয়া যাজক বিদায় কর তারে।[১৪৩]

আইন্তন ভক্তের জন্মের পর তাঁর পিতামাতা খুব খুশি হন। প্রথম সন্তান জন্মের পর হয়ত লোকজন, বিশেষ করে গরিব লোকদের ডেকে খাওয়ানোর নিয়ম ছিল। পালাগানে তাই গায়েনের মুখে আমরা শুনি,

> যত ছিল অন্ধ আতুর সেই শহরের মাঝে,
> ধন দিয়া করল তাদের রাজার সমাতল।[১৪৪]

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে আমরা যে সমাজ এবং সমাজ-ব্যবস্থা দেখি, তা কিন্তু শুধু খ্রিষ্টান সমাজ নয়; বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি সমাজ এবং তার সমাজচিত্র।

আন্তোনিয়ো পালাগানে চরিত্র চিত্রণ

আখ্যানধর্মী রচনা, যেখানে একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনি থাকে সেখানে যথাযথ চরিত্র নির্মাণে রচয়িতার শিল্প-কুশলতা ফুটে ওঠে। মধ্যযুগের সাহিত্যের তুলনায় বাংলা গীতিকার চরিত্র-চিত্রণে রচয়িতাদের স্বাতন্ত্র্য তেমন চোখে পড়ে না। গীতিকার জীবন-ভাবনা ও বিষয়-বৈচিত্র্যই এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। আমরা জানি বাংলা গীতিকা ধর্মাচ্ছন্নতামুক্ত। কোনো ধর্মনীতি

১৪৩. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

প্রচারের প্রচেষ্টা সেখানে একেবারেই নেই। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে লালিত রক্ত-মাংসের মানুষের কাহিনিই সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। অথচ সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে আমরা দেখি একটি বিশেষ ধর্মভাবনাকে তুলে ধরার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। সত্যিকথা বলতে গেলে, বাংলাদেশের গীতিকাই হোক বা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানই হোক– তাদের উভয়ের মধ্যে কোনো চরিত্রই সম্পূর্ণতা লাভ করেছে বলে মনে হয় না। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সামগ্রিকভাবে পালাগান বা গীতিকার চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে বলেছেন,

> ইহার চরিত্র সাধারণতঃ নাটকের মত এত সুস্পষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ (individualistic) নহে বরং এক একটি আদর্শ বা ছাঁদ (tpye) স্বরূপ। তবে কোন কোন সময় ইহার ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ'কথা সত্য যে, কোন চরিত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্রের ভাব ফুটিয়া উঠিলেও, তাহা আনুপূর্বিক নাটকীয় চরিত্রের মত পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করিতে পারে না অধিকাংশ চরিত্রই অপরিণত ও সম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।[১৪৫]

ড. ভট্টাচার্যের মন্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি পালাগানের চরিত্রগুলি সাদামাটা। সেখানে চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য সহজে চোখে পড়ে না। তবে আন্তোনয়োর পালাগানের চরিত্রের প্রেক্ষাপটে এই কথা সত্য বলে সহজেই গ্রহণ করা যায়।

অন্যদিকে ইংরেজি ব্যালাডে চরিত্র সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে মারিয়া লিচ ব্যালাডের চারটি উপাদানের মধ্যে চরিত্র চিত্রণের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ব্যালাডের চরিত্র রচনার বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, "Characters are usually types and even more individual are underdeveloped".[১৪৬] এখানে অভিধানকার বলতে চেয়েছেন যে, পালাগানের চরিত্রগুলো হবে সাদামাটা। সেখানে চরিত্রসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে বিকাশের কথা কোনো সমালোচকই জোর দিয়ে বলেননি। আর পালাগানের বর্ণনার সারল্যের জন্য চরিত্র পরিস্ফুট হবার সম্ভাবনাও কম থাকে। পালাকার গল্প বলার তাগিদটাই বেশি অনুভব করেন বলে অন্য বিষয়গুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। সেই সঙ্গে পালাগানে সুর সৃষ্টির দিকে গায়কের নজর দিতে হয় বলে কোনো চরিত্রের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত সম্ভবপর হয় না।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে চরিত্রের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। এখানে ভগবানকেও মাঝে মাঝে মানুষ বলে মনে হয়। তিনি মানুষের মতোই রাগে ক্ষোভে অভিমানে তাড়িত হন। এমনকি মাঝে মাঝে মানুষের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে আবার রক্তমাংসের মানুষের মধ্যেও প্রয়োজনে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। তখন সেই চরিত্রগুলো অলৌকিক শক্তির অধিকার লাভ করে এবং অন্যান্য চরিত্রগুলোকে প্রভাবিত করে। এই পালাগানে আমরা দেখি নারী চরিত্রের উপস্থিতি খুব কম। কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে মাত্র একজন নারী, অর্থাৎ, আইন্তনের জননী ভেরনিকা বিবি প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। কেশবের মা তার স্বাতন্ত্র্য সূচনা করলেও ব্যাপ্তি লাভ করতে পারেনি। বাদবাকি নারী চরিত্রগুলির ভূমিকা নেই বললেই চলে। এবার আমরা কয়েকটি চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ করে তাদের জীবনবোধ সম্বন্ধে আলোকপাত করে দেখি।

---

১৪৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০২
১৪৬. Maria Leach, *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*, p.107

ফ্রান্সিস ভক্ত

আন্তোনিয়োর পিতা ফ্রান্সিস ভক্ত একজন ধার্মিক মানুষ। তিনি তপস্বী। তবে পালাগানে তাঁকে 'ভাগ্যিমান' বা ভাগ্যবান বলে অভিহিত করা হয়েছে; কেন না "নিরাঞ্জনের পুণ্যের কিরপা হইয়াছে তাহারে"। ঈশ্বরে কৃপা আশীর্বাদ লাভ করার কারণ হিসেবে বলা যায় ফ্রান্সিস ভক্ত, "মালিক ধর্মের নামটি সদা মনে স্মরণ করে"। তিনি সাধক। তিনি মানুষের কোলাহলে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের সাধন ভজন করতে পারেন না। তাই তাঁর স্ত্রী ভেরনিকার কাছে তিনি অনুযোগ করে বলেন,

আমার মনে সাধ হইছে আবার প্রভু দেখিবারে,
আমি চইল্যা যামু এখন ময়দান পাথারে।[১৪৭]

অর্থাৎ, তিনি ঐরান জঙ্গলে যেতে চান তপস্যা করতে। শেষে স্বামী-স্ত্রী দুই জন মিলে ঐরান জঙ্গলে চলে যান। তাঁদের ঐকান্তিক তপস্যার ফলে ঐরান জঙ্গল ময়দানে পরিণত হয়। এমনকি সাধনার একাগ্রতায়,

যেই জংলায় বাঘ ভাল্লুক চইর্যা খায় বারমাস,
সেই জংলায় দুইয় ভক্তে করতেছে উপবাস।[১৪৮]

জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেরিয়ে তাঁকে সামনে যেতে হয়। ফ্রান্সিসের সাধনার ফলে যখন ঐরান জঙ্গল ময়দানে পরিণত হয়, তখন কাঠুরিয়া রাজার কাছে তাঁর নামে নালিশ জানায়। রাজা এই তাপসের কথা শুনে তাঁর সঙ্গে 'ধর্মের দোস্তি' করতে আগ্রহী হন। এক পর্যায়ে রাজা তাঁকে নিদাবি বা নিষ্কর করে ঐরান রাজ্যে রাজত্ব করার অধিকার প্রদান করেন। রাজা সেই নতুন রাজ্যে রায়তজন বা প্রজাদের পাঠিয়ে দেন। সেই রাজ্যে বসবাসকারী সবার খাজনাও তিনি মওকুফ করে দেন। রাজা ঈশ্বরের কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা করেন যাতে নতুন রাজা ধন-সম্পত্তি ও অর্থ-প্রতিপত্তিতে আরও বেশি বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন। সেই সময় ঈশ্বর তাঁর দূতকে বলছেন তিনি তো ভক্তকে এই পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পাঠাননি, তবে কেন ফ্রান্সিস ভক্ত রাজা সেজে বসে আছেন? এই অবস্থায় ঈশ্বর তাঁর মন পরীক্ষা করার জন্য ঈশ্বর নিজেই স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ভক্তের কাছে আসতে চান। যাহোক, এই দায়িত্ব নেয় দুই শয়তান। তবে ঈশ্বরের বিশ্বাস শয়তান ভক্তের মন টলাতে পারবে না। শয়তানকে ঈশ্বর এও বলে দেন যেন ভক্তের কোনো ক্ষতি না হয়। তিনি তাঁর সেবক ফ্রান্সিসের অনিষ্ট করতে চান না। তাই শয়তানকে তিনি বলেন,

নিরাবধি ভক্তে যদি লয় আমার নাম,
হস্তে ধইরা করুম উদ্ধার এই তো আমার কাম।[১৪৯]

শয়তান ভক্তের কাছে এসে তাঁর জীবন বিপর্যস্ত তোলে। প্রথমেই তারা সূর্যের তেজ বারো গুণ বাড়িয়ে দেয়। গরমে মানুষের প্রাণ যায় যায়। তার উপরে "বারো বচ্ছর মেঘ না দিল সেই শহরের মাঝে"। তাতে সবচেয়ে বিপাকে পড়ে চাষিরা। তাদের জমির সব শস্য নষ্ট হয়ে যায়। তারা আর ভক্তের রাজ্যে থাকতে চায় না, অন্য কোনো জায়গায় চলে যেতে চায়। রাজার কাছে

---

১৪৭. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
১৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

কোনো প্রজা যদি রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি চায় তবে রাজার পক্ষে সেই অপমান ও গ্লানি সহ্য করা কঠিন। এই বঞ্চনার মধ্যেও ভক্ত ভাবছেন, "পিতার বুঝি লাগছে আমাগো মন বুঝিবারে।" কিন্তু পরিত্রাণের পথ তো তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। শেষে অন্য কোনো উপায় না দেখে অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা বুকে চেপে ভক্ত রায়তজন বা প্রজাদের বলেন–

> এখন চইলা যাও তোমরা আর কোন শহরে,
> পিতায় যদি করে দয়া ঐ কিঞ্চিত নয়নে;
> তখন ফিরা আইস তোমরা এই শহরের মাঝে।[১৫০]

ভক্ত সব বিষয়েই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। নিজের জীবনের দুঃখ-কষ্টগুলো নিজের পত্নীর সঙ্গে সহভাগিতা করেন। তিনি প্রজাদের হারিয়ে চরম বেদনার মধ্যে স্ত্রী ভেরনিকার উদ্দেশ্যে বলেন, "একই মনে প্রভুর নাম লও বারে বারে"। তাঁর একান্ত বিশ্বাস একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করলে "বাইধ্য হইয়া করব দয়া প্রভু নিরাঞ্জনে"।[১৫১] তাই অনিবার্য ভাবে–

> এই বইলা দুই ভক্তে কোন কাজ করে,
> একই মনে প্রভুর নাম লয় বারে বারে।[১৫২]

ফ্রান্সিস ভক্তের এই ঈশ্বর সাধনা দেখে দুই শয়তান হতাশ হয়। তবে এই যাত্রায় হেরে গেলেও শয়তান কুবুদ্ধি প্রয়োগের নতুন উপায় খোঁজে। শেষে তারা ইঁদুরের বেশ ধরে ভক্তের ধন-ভাণ্ডারের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে দিল। তাঁর ঘরের সব খাদ্য-পানীয় খেয়ে ফেলল। তার সঙ্গে "কালখিদ্যা লাগাই দিল ঐ বিবির উদরে"। তার ফলে "অন্নের পিয়াসে পরান বিবির ছটফট করে"। এমন অবস্থায় বিবি কেঁদে কেঁদে স্বামীকে বলছেন "কিছু খানা দিয়া পরান রক্ষা কর মোরে"। সংবেদনশীল স্বামী হিসেবে "বিবির কান্দন ভক্তে না পারে সহিতে"। অসহায় পতির অন্তরের যন্ত্রণা আর যেন গোপন থাকে না। বিবিকে প্রবোধ দিয়ে তিনি বলেন–

> ঘরে বইসা প্রভুর নাম লও বারে বারে;
> এখন চইলা যামু আমি বাবুর্চি খানার ঘরে।
> যদি কোন খানা মিলে বাবুর্চি খানার ঘরে।,
> সেই খানা দিয়া পরান রক্ষা করুম তারে।[১৫৩]

রান্নাঘরে কোনো খাবার না পেয়ে ভক্ত ভাবছেন, "পিতায় বুঝি লাগছে আমাগো মন বুঝিবারে"। খাবারের কোনো সুরাহা করতে না পেরে ভক্ত "মনোদুঃখে চইলা গেল আপনার ঘরে"। একইভাবে তিনি খাবারের সন্ধানে গিয়েছিলেন "ধনের মাণ্ডব ঘরে"। সেখানেও সব শূন্য। কোথাও কোনো খাবার নেই। শত কষ্টের মধ্যেও ফ্রান্সিস কিছুতেই পিতা ঈশ্বরের নাম নিতে ভোলেন না। শয়তান ঈশ্বরের কাছে বলেছিল যে, ছলেবলে কৌশলে যে প্রকারেই হোক, ভক্তের ধর্মের নাম ছাড়াবে এবং তাঁকে

---

১৫০. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১৫১. প্রাগুক্ত
১৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
১৫৩. প্রাগুক্ত

টেনে নরকে নিয়ে যাবে। এত বিপর্যয়ের মধ্যেও আমরা দেখি প্রায়ই– "আজানু পাতিয়া ভক্তে সিদ্ধি কুরুশ করে,/মহাপ্রভুর নামটি ভক্তে মনে স্মরণ করে।[১৫৪]

ভগবানের নাম নিয়ে ভক্ত আবার বেরিয়ে পড়েন খাবারের খোঁজে। তাঁর মনে হল বন্ধুর কথা। দোস্ত তাঁকে বিপদে-আপদে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নিজের বন্ধুর কাছে যেতেও ভক্তের ভারি লজ্জা আর সঙ্কোচ। তিনি রাজার কাছে গিয়েও অন্দরে প্রবেশ করতে চান না। তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য রাজা পালকিসহ লোক পাঠিয়েছেন; অথচ ভক্ত দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি পালকিতে চড়ে যেতে চান না। তিনি একান্ত বন্ধু হলেও রাজার কাছ থেকে সুযোগ সুবিধে আদায় করতে আগ্রহী নন। তাই তাঁর মুখে আমরা শুনি– "দুই পায়ে হাঁটিয়া যামু দোস্তের দরবারে,/ তোমার পালকিখান ফিরাইয়া নেও দোস্তের দরবারে।[১৫৫] পালকি ফেরত পাঠিয়ে ভক্ত "দুই পায়ে হাঁটিয়া" রাজার দরবারে গেলেন। রাজা তাঁকে দেখে রাজসভা থেকে বেরিয়ে এসে অর্ভ্যথনা করে যথাযোগ্য মর্যাদার খাবার আসনে বসালেন। রাজা যখন প্রস্তাব দেন, "দুইয় দোস্তে খামু খানা এক বাসনের মাঝে", তখন ভক্ত ভাবছেন নিজের পত্নীর কথা। রাজার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েও রাজাকে হতাশ করে বলেন,

আমার বিবি আছে উপাস আপনার ঘরে,
যদি কোন খানা মিলে তোমার দরবারে।
বিবি লইয়া খামু খানা এক বাসনের মাঝে।[১৫৬]

পালাগানে ঈশ্বর ভক্ত ফ্রান্সিসকেও আমরা মাঝে মাঝে হতাশ হতে দেখি। তিনি দুই-একবার ঈশ্বর আর নিজের উপর যেন আর ভরসা রাখতে পারেন না। তখন মনে হয় তাঁর কপালটাই হয়ত খারাপ। এক ধরনের হীনমন্যতা এবং হতাশায় তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়বার বন্ধুর বাড়ি খাবার আনতে গিয়ে শয়তানের প্ররোচনায় যখন ফিরে আসেন তখন তিনি নিরাশ হয়ে বলেন, "আর নিদানে পইড়্যা আইলাম আমি দোস্তের দরবারে,/ আরে নছিব মন্দ দেইখ্যা দোস্তে সয়াল না দিল মোরে।"[১৫৭] এখানে তিনি বন্ধুর চেয়ে নিজের ভাগ্যকেই দায়ী করছেন। অনেক চেষ্টার পরও শয়তান যখন ভক্তের ধর্মের নাম ছাড়াতে পারছে না তখন তারা এক প্রচণ্ড ধূলার তুফান সৃষ্টি করল। সেই ঝড়ের দাপটে ভক্তের বাড়িঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে। এই কালঝড় দেখে–

হায় হায় বইলা ভক্তে শিরে দিল হাত,
আসমান ভইঙা যেন পড়িল মাথাত।
কি করিব কোথায় যাব না দেখি উপায়,
আমাগো নছিবের লেখা খণ্ডানো না যায়।[১৫৮]

---

১৫৪. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১৫৮. প্রাগুক্ত

এখানে তিনি হতাশার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছেন। ঝড় দেখে একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ এত সহজে বিচলিত হতে পারেন, তা ভাবতে অবাক লাগে। তাঁর মনে হয় 'নছিবের লেখা' খণ্ডন করা যাবে না। ঈশ্বরভক্ত একজন মানুষের এই নিয়তিবাদ কোনো মতেই গ্রহণ করা যায় না। তাঁর মতো সাধকের কাছে সেটা কাঙ্ক্ষিতও নয়।

ফ্রান্সিস ভক্ত একজন অতিথি-বৎসল মানুষ। তিনি নিজে যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন তাঁর বাড়ি থেকে কেউই না খেয়ে যেতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে রাজা হয়ে রাজ্য শাসন করার জন্য ঈশ্বর তাঁকে শাস্তিস্বরূপ এই দুঃখের তিমিরে রেখেছেন। তাঁর শাস্তি মওকুফ হবে যদি তিনি স্বর্গের দূতকে যথাযথ আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট করতে পারেন। স্বর্গদূত যখন তাঁর বাড়িতে এলেন তখন তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। অথচ তাঁর ঘরে কোনো খাবার নেই। কোনো রাখঢাক না করে তিনি বলেন– "কোন খানা নাই দেখ আপনার ঘরে,/ কি ভিক্ষা চাও তুমি আমার দরবারে।[১৫৯]

শেষে নিজেদের পরিধেয় পোষাক বিক্রি করে তিনি খাবারের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হন। তিনি সওদাগরের কাছে নিজেদের কাপড়ের বদলে খাবার চান। সওদাগর কাপড়ের বিনিময়ে নয়, এমনিতেই খাবার দিতে চাইলে তিনি সেই খাবার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। আসলে তিনি বুঝতেই পানেননি যাজকের বেশ ধরে যে স্বর্গদূত তাঁর বাড়িতে ভিক্ষার জন্য এসেছেন, তিনিই আবার সওদাগর হয়ে নদীর কূলে নৌকা ভিড়িয়েছেন তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য। স্বভাবতই ন্যায়পরায়ন ভক্ত বিনামূল্যে দেওয়া খাবার নিতে কুণ্ঠিত। তাই তাঁর সোজা কথা–

> খানা দিয়া চাও গো তুমি দেনা রাখিবারে,
> এই খানার কার্য নাই এই আমার দরবারে।
> তুমি বস্ত্রর বদলে কিছু খানা দেও গো আমারে,
> সেই খানা দিয়া যাজক বিদায় করুম তারে।[১৬০]

এখানে ফ্রান্সিস ভক্তের চরম আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাই। তিনি কোনো মতেই কারও কাছে ঋণী থাকতে চান না। শেষে সওদাগররূপী দূত যখন তাঁকে বললেন, "নিদাবী বইল্যা খানা দিলাম গো তামারে,/ ইহার কোন দাবী দাওয়া না রাখি ভুবনে"– তখনই তিনি সওদাগরের কাছ থেকে খাবার গ্রহণ করতে সম্মত হন।

ফ্রান্সিস ভক্ত ঈশ্বরের আশিসধন্য ব্যক্তি। তিনি ভগবানের প্রধান সেবক। তাই স্বর্গাধিরাজ তাঁকে সহজে ত্যাগ করতে পারেন না বা করতে চান না। পরমপিতা তাঁকে শাস্তি দিলেও শেষে তাঁর মঙ্গল বিধান করেন। তাই ফ্রান্সিস যখন স্বর্গদূতের যথার্থ সেবা

১৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
১৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

করতে সমর্থ হয়েছেন, তখন ঈশ্বর খুশি হয়ে তাঁকে আবার ধন-সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, যার দৌলতে ফ্রান্সিস– "হস্তি ঘোড়া বাইন্দা রাখল ভক্তে বাইর বাড়ির দখ্‌খলে,/ মহানন্দে করল বসতি ঐ নিজগুয়া শহরে।[১৬১]

এত কিছুর পরেও ফ্রান্সিস ভক্তের মনে একটা গভীর কষ্ট লুকিয়ে আছে। তঁর মনে হয়ত সুখ আছে, কিন্তু শান্তি নেই, নেই স্বস্তি। তার কারণ তিনি সন্তানহীন। ঈশ্বর অনেক কিছু দিয়েও তাঁকে যেন এই একটি দিকে জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। দয়ালু ভগবান নিজেই বলছেন,

আমার প্রধান সেবক ফ্রান্সিস তো আপনে,
তাহার সমান ভক্ত নাই এই জগতের মাঝে।
পুত্র তো দেই নাই ওই ফ্রান্সিস ভক্তের ঘরে,
পুত্রের জন্য করে কান্দন আমার দরবারে।[১৬২]

পুত্র-সন্তানের জন্য ফ্রান্সিসের এই কান্না যে-কোনো পুত্রহীন পিতার কষ্টেরই বহিঃপ্রকাশ। শেষে তাঁর ক্রন্দন পরমপিতার মনে আঘাত করে। তিনি করুণা তাঁর ঘরে এক পুত্র-সন্তান পাঠালেন। যথাসময়ে তাঁর পত্নী এক পুত্রের জন্ম দিলেন। চারিদিকে সেই খবর রাষ্ট্র হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে "ভক্তে তো চইল্যা গেল আপনার ঘরে"। ঘরে গিয়ে যখন স্ত্রীর কোলে শিশুকে দেখতে পান তখন–

যত ছিল দায় দুলাল ভুলাইয়া সে লইল,
সোনার কাছি দিয়া সোনারে সে পরাইল।
নোয়াইয়া ধোয়াইয়া পুত্র কোলে তুইলা লইল,
লক্ষ লক্ষ চুম্বন ভক্তে বদনে মারিল।[১৬৩]

পুত্রের মুখ দেখে তিনি সত্যিই অভূতপূর্ব আনন্দ পেয়েছেন। তবে পুত্রস্নেহে পাগল পিতা শুধু নবজাত সন্তানকে নিয়েই মত্ত নন; তিনি সন্তানের মঙ্গল কামনায় মানুষ ডেকে তাদের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলেন। গরিব মানুষকে অর্থ-সামগ্রী দিয়ে পুত্রের কল্যাণ প্রর্থনা করলেন। পালাগানে বলা হয়েছে, "যত ছিল অন্ধ আতুর সেই শহরের মাঝে,/ধন দিয়া করল তাদের রাজার সমাতল।[১৬৪]

ভেরনিকা বিবি

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে নারী চরিত্র খুব কম। তবে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় নারী হিসাবে আমরা দেখি ভেরনিকা বিবিকে। আলাপন নামক অংশে তাঁর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ফ্রান্সিস ভক্তের পত্নী। সেখানে বলা হয়েছে, "তাহার ঘরনী ছিল আবার ভেরনিকা বিবি"। তাঁর স্বামী যখন নিরিবিলিতে ঈশ্বর ভজনা করতে চান তখন তিনিও পতির সত্যিকারের সহধর্মিনীরূপে সঙ্গে নির্জনে যাবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে বলেন– "আমার মনে সাধ ছিল প্রভু দেখিবারে,/ আমি চইল্যা যামু এখন ঐরান

১৬১. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
১৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১৬৪. প্রাগুক্ত

জঙ্গলে।[165] ভেরনিকা তাঁর পতিকে একা ছাড়তে চান না। তিনি স্বামীর সুখ-দুঃখের সহভাগিনী এবং বিপদ-আপদে তাঁর অনুগামিনী। পালাগানে তাই বলা হয়েছে, "স্বামী স্ত্রী দুইয় জনে একই মন হইল"।

ভেরনিকা বিবি একজন ধার্মিকা নারী। তিনি আবার সহজ সরল সংসারী মানুষ। সংসারের বাইরে ঈশ্বর-ভাবনা ছাড়া তাঁর আর কোনো কিছুতে তেমন আকর্ষণ নেই। তাঁদের তপস্যায় ঐরান জঙ্গল ময়দান হলেও ভেরনিকা বিবি ফ্রান্সিস ভক্তের অনুগামিনী পত্নী ছাড়া আর কেউ নন। শয়তান যখন "কালখিদ্যা লাগাই দিল ঐ বিবির উদরে", তখন তাঁর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য হয় না। তিনি স্বামীর কাছে অনুযোগ করে বলেন, "অন্নের পিয়াসে পরান আমার ছটফট করে,/কিছু খানা দিয়া পরান রক্ষা কর মোরে।[166]

তিনি পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে অপারগ। স্বামীর কাছে খাবার চাইবার পর তিনি আর অপেক্ষা করতে পারেন না। খাদ্যের জন্য তিনি অবুঝ শিশুর মতো কান্না জুড়ে দেন। ভক্তকে খাবার না নিয়ে শূন্য হাতে ফিরতে দেখে ধর্মপত্নী হয়েও তাঁকে স্বার্থপর ভাবতে শুরু করেন। তিনি মনে করেছেন ক্ষুধার জ্বালায় ভক্ত হয়ত একাই সব খাবার খেয়ে নিয়েছেন। তাই তিনি ভক্তকে বলছেন– "তোমার উদর করছ ঠাণ্ডা ঐ বাবুর্চিখানার ঘরে,/ বিবি বইলা মনে নাই এই জগতের মাঝে।[167]

আমরা মনে করি ভক্তের সঙ্গে এতদিনের দাম্পত্য জীবন কাটানোর পর স্বামীর প্রতি এটুকু বিশ্বাস তাঁর থাকা দরকার ছিল। তিনি তো একাই অনাহারী নন, ভক্তও বার দিন ধরে না খেয়ে আছেন। অভুক্ত অবস্থায় তিনি নিজেকে অসহায় ভাবছেন। মনে করছেন এই দুনিয়ায় তিনি একেবারে একা। তাঁর কষ্টের কথা "এমন বান্ধব নাইক্যা ভবে ডাইক্যা জিগ্যাস করে"। তিনি মনে করেন যার ক্ষত তারই ব্যথা, অন্য কেউ সেটা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই তাঁর মুখে আমরা শুনি একতরফা কিছু কথা–

> অন্নের জ্বালা বড় জ্বালা যাহার গায়ে লাগে,
> একই চক্ষে আসে নিদ্রা আরেক চক্ষে জাগে;
> জানিয়া ধর্মের নামটি না গো আসে মনে।[168]

এখানে আবেগের বশে ভেরনিকা বিবি বলছেন খাবারের কষ্টটাই মানুষের সবচেয়ে বড় কষ্ট। ভেরনিকার মতো এত বড় একজন ধর্মপ্রাণ নারীও বলছেন, অন্নের কষ্ট থাকলেও ধর্মের নামও মনে আসে না। স্বর্গের দূত যখন যাজকের বেশ ধরে ফ্রান্সিস ভক্তের সেবার ঐকান্তিকতা এবং আতিথেয়তা প্রমাণ করতে আসেন, তখন কিন্তু সবার আগে যাজকের অভিবাদন শুনতে পান ভেরনিকা বিবিই। তিনি অনেকদিন না খেয়ে থাকলেও তাঁর চোখ-কান কিন্তু সব সময় খোলা। গানে বলা হয়েছে–

> বারো দিনের অনাহারী করছে আমগো প্রভু নিরাঞ্জনে।
> যাজকের যেন জিকির শোনালাম বাইর বাড়ির দখ্খলে,
> কি ভিক্ষা চায় যাজক শুইন্যা আইস তারে।[169]

---

১৬৫. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
১৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
১৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

ভেরনিকা বিবি বিশ্বাস করেন যাজক ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাই তাঁর সেবা করা তিনি একান্তন কর্তব্য বলে মনে করেন। এই কারণেই বারদিন অভুক্ত থেকেও তিনি পুরোহিতের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেন। তাঁরা গরিব, তাঁদের হাতে ধন-কড়ি কিংবা টাকা-পয়সাও নেই; তবুও তিনি ভক্তকে বলছেন–

এক জনের বস্ত্র দিয়া দুই জনে পরাই,
আমার বস্ত্র লইয়া যাও শানের বান্দাইল ঘাটে।
বস্ত্রের বদলে কিছু খানা লইয়া আইস তারে,
সেই খানা দিয়া যাজক বিদায় করুম তারে।[১৭০]

ভেরনিকা উদার মনের এক নারী। তিনি স্বামীকে তাঁর নিজের কাপড় তিনি বিক্রি করে যাজকের জন্য খাবার আনতে বলছেন। ভক্ত কোনো উপায়ান্তর না দেখে বিবির কথামতো তাঁর কপড় নিয়ে যান সওদাগরের কাছে, বিনিময়ে যদি কিছু পাওয়া যায়। বিবির পরিধেয় বস্ত্র দেখে সওদাগর কোনো মতেই সেই বস্ত্র নিতে চান না। সওদাগর আসলে এক স্বর্গদূত যিনি ভক্তের বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে এসেছেন। অতএব তাঁদের সেবার মানসিকতা দেখে সওদাগর বস্ত্র না নিয়ে 'নিদাবি' বলে খাবার দেন। ভক্ত যখন খাবার আর বিবির দেওয়া কাপড় ফিরিয়ে আনেন, তখন বিবি ভাবছেন ভক্ত হয়ত চুরি করে খাবার নিয়ে এসেছেন। তিনি কড়া ভাষায় বলছেন–

চুরি কইরা আনছ খানা আপনার ঘরে,
এই খানার কার্য নাই এই জগতের মাঝে।
তুমি বস্ত্রর বদলে কিছু খানা লইয়া আইস তারে,
সেই খানা দিয়া যাজক বিদায় করুম তারে।[১৭১]

কথায় আছে অভাবে স্বভাব নষ্ট। তবে এই কথা কিন্তু ভেরনিকা বিবির বেলায় প্রযোজ্য নয়। তিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনো মতেই অসদুপায় অবলম্বন করতে রাজি নন। নিজেদের সামর্থ অনুসারে তিনি দিনাতিপাত করতে চান। এখানেই ভেরনিকা বিবির আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাই। সৎ জীবন-যাপন করে তিনি সংসারধর্ম অতিবাহিত করতে চান। আপাত সুখ-শান্তির চেয়ে আন্তরিক প্রশান্তি তাঁর কাছে আরও বেশি কাঙ্ক্ষিত।

ভেরনিকা বিবির জীবনে যখন দুঃখের সূর্য অস্ত গেল তখন তিনি বলছেন, "থোরা কিছু ধন বল সম্পদ হইয়াছে আমাগো"। এত কিছুর পরও তাঁর মনে সত্যিকারের শান্তি ছিল না, তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। সন্তানহীনা কোনো রমণীর আর যা-ই থাকুক না কেন, অন্তরে আনন্দ থাকে না। ধর্মমতি ভেরনিকাও তার ব্যতিক্রমী নন। তাই তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একটা গভীর শূন্যতাবোধ তাঁকে যেন প্রতিনিয়ত গ্রাস করে। তাই আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন–

যেমন তেমন একটা পুত্র যদি হইত আমগো ঘরে,
না খাইতাম পুত্রের কামাই দেখিলাম নয়নে।
পুত্রের উছিলায় ধন বাচিতাম ভুবনে।[১৭২]

---

১৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১৭১. প্রাগুক্ত
১৭২. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

শয়তানের প্রলোভন জয় করার পর ভেরনিকা বিবি ঈশ্বরের কাছে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি পুত্রের ভরণ-পোষণ প্রত্যাশী নন, তাঁকে শুধু নয়ন ভরে দেখতে চান। শুধু পুত্রের সঙ্গ-সান্নিধ্যই তাঁর কাছে কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত। এভাবে অনেক সাধ্য-সাধনার পর তিনি পুত্রের জননী হন। যথাসময়ে আমরা জানি– "মঙ্গল মত হইয়া ঠাকুর ভূমিষ্ঠে গড়াইল,/ দেখিয়া পুত্রের মুখ পরান জুড়াইল।"[১৭৩]

ফ্রান্সিস ভক্তের ঘরণী এবং আইন্তন ভক্তের জননী ভেরনিকা জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, ক্ষোভ-বঞ্চনা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, স্বামীর প্রতি রাগ-অনুরাগ– এসব নিয়ে যেন এক আদর্শ বাঙালি রমণী।

আন্তোনিয়ো বা আইন্তন ঠাকুর

পালাগানে আইন্তন ভক্ত বা আইন্তন ঠাকুর চরিত্রটি আদর্শায়িত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আইন্তন ভক্ত স্বর্গের পুরুষ। তাঁকে আমরা প্রথমে দেখি "বেহেস্তখানার ঘরে"। ফ্রান্সিস ভক্ত এবং ভেরনিকা বিবি ঈশ্বরের শাপমুক্ত হবার পর সুখে-শান্তিতেই ছিলেন। তবে তাঁদের কোনো সন্তান না থাকায় "পুত্রের উছিলায় তারা জুইড়াছে রোদন"। তারফলে "ঝংকার দিয়া উঠল পিতার রত্ন সিংহাসন। তাই ঈশ্বর দয়াপরবশত হয়ে তাঁদের ঘরে পুত্র-সন্তান দেবার অঙ্গীকার করেন। তিনি স্বর্গের দূতকে দিয়ে আইন্তনকে ডেকে ফ্রান্সিস ভক্তের ঘরে পুত্র হয়ে জন্ম নিতে বলেন। আইন্তন কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না। পৃথিবীতে যাবার কথা শুনে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। পালাগানে আমরা শুনি–

> জন্মের কথা পরম পিতায় যখনই কহিল,
> হায় হায় বইলা আইন্তন আছাড় খাইয়া পড়িল।
> হায় হায় বইলা আইন্তন শিরে দিল হাত,
> আসমান ভাইঙা যেন পড়িল মাথাত।
> যাব না যাব না প্রভু মিছা দুইনার মাঝে,[১৭৪]

পৃথিবীকে তাঁর মনে হয় "মিছা দুইনা"। মিথ্যা ভরা দুনিয়ায় না যাওয়ার সঙ্কল্প তাঁর মধ্যে এত প্রবল যে, তিনি খুব সহজেই পরম পিতার মুখের উপর বলতে পারেন, "কলির ভবের সাধ নাই রে"। কেননা, "দুইনায় গেলে ধরব মোরে পিতা দুইনার মায়াজালে"। দুনিয়ার মায়ায় তিনি বাঁধা পড়তে চান না। তিনি জানেন এই কলিকালে দুনিয়ায় নানা ধরনের সমস্যা আছে। সেখানে মানুষের আচার ব্যবহার অসংযত। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই আছে। নিকট আত্মীয়রাও অনেক সময় মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এইসব নিচুতার জন্যই আইন্তন পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্ম নিতে চান না। তবে সবচেয়ে বড় যে কারণ সেটা তাঁর নিজের ভাষায়–

---

১৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

আর যাব না যাব না প্রভু মিছা দুইনার মাঝে,
দুইনায় গেলে তোমার নামটি যাব যে ভুলিয়া।[১৭৫]

একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে পরমপিতা তাঁকে এই জগতে পাঠাতে চান। তবে ফ্রান্সিস ও ভেরনিকার ঘর আলো করে পুত্র-সন্তান হিসাবে জন্ম গ্রহণ একটা উপলক্ষ বলা যায়। কিন্তু পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে তিনি যে ঈশ্বরের ক্ষমা-ভালবাসার স্বরূপ মানুষের সামনে প্রকাশ করবেন– সেই উদ্দেশ্যই প্রধান বলে মনে হয়। আইন্তন হয়ত ঈশ্বরের অভিসন্ধি বুঝতে পারেননি। তাই তিনি এই দুনিয়ায় আসার ব্যাপারে এত আপত্তি করেছেন। তবে তাঁর এই ব্যবহারে ঈশ্বর প্রীত হন না। সেই কারণেই তাঁর জীবনে নানা প্রতিকূলতা আসে। পালাগানে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে– "হটাহটি সাধু আইন্তন বিস্তর করিল,/কিঞ্চিৎ দুঃখ পরম পিতায় তার নছিবে লেখিল।[১৭৬]

অবশেষে আইন্তন রাজি হন যে তিনি ফ্রান্সিস ভক্তের ঘরে তাঁর সন্তানরূপে জন্ম নেবেন। তবে পিতার কাছে তাঁর একটা দাবি আছে। পালাগানের ভাষায়,

কাতর হইয়া আইন্তন ভক্তে লাগছে কহিবারে,
তোমার হাতের শাস্ত্র যদি পিতা দেও গো আমারে;
তবে শ্যেন লমু জনম ফ্রান্সিস ভক্তের ঘরে।[১৭৭]

ঈশ্বরের শাস্ত্র আইন্তন তাঁর নিজের জীবনের পাথেয় করে নিতে চান। কেননা দুনিয়ার নানা সমস্যা-সঙ্কুল অবস্থায় এই শাস্ত্রই তাঁকে চলার পথে শক্তি-সাহস ও উদ্যম এনে দেবে। অসাধ্য সাধন করার জন্য তিনি প্রসাদ ও করুণারূপী শাস্ত্রের আবদার করেন। ঈশ্বর কিন্তু তাঁকে নিরাশ করেন না। তিনি আইন্তনকে নিজের হাতের শাস্ত্র দেবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বের অধীত জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা প্রদান করেন। ঐশজ্ঞানের বিভায় আইন্তন ভবিষ্যতের বিষয় নিজে জানতে পারবেন, মানুষকে জানতে পারবেন। পিতার আশীর্বাদে তিনি মৃত মানুষকে পুনর্জীবিত করার ক্ষমতা অর্জন করেন। পালাগানে পরম পিতার প্রতিশ্রুতি–

বিশশত বচ্ছরের ফরমান লেইখা দিমু তোমারে,
আমার হাতের শাস্ত্র আমি দিমু গো তোমারে।
তুমি চাইর বেদ চইদ্দো শাস্ত্র পারবা পড়িবারে,
হইছে কিনা হইব কথা পারবা কহিবারে;
মইরাছে এমন মুর্দা পারবা জিয়াইবারে।
এমন মর্দ নাইকা ভবে ভাঞ্জি দিতে পারে,
তুমি যাইয়া লও জনম ঐ ফ্রন্সিস ভক্তের ঘরে।[১৭৮]

ঈশ্বরের আশ্বাস পেয়ে আইন্তন ফ্রান্সিসের ঘরে জন্ম নিতে রাজি হন ভেরনিকার গর্ভে আশ্রয় নেন। জন্মের পর তাঁর পিতামাতা তাঁকে গির্জায় নিয়ে দীক্ষাস্নাত করেন এবং "আইন্তন বইলা নাম" রাখেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাপ্তিস্মের পর পরই আইন্তন

১৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
১৭৬. প্রাগুক্ত
১৭৭. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
১৭৮. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

বিদ্যার্জনে যাবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করেন। পিতামাতা আইন্তনের এমন কথা শুনে খুবই মর্মাহত হন। তাঁরা তাঁকে নানাভাবে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। তিনি যাতে তাঁদের ছেড়ে না যান; বরং বাড়িতেই পড়ালেখা করার সব ব্যবস্থা করে দেবার আশ্বাস দেন। আইন্তন কিন্তু তাঁদের কোনো কথায় কান দেন না। উপরন্তু তিনি বলেন– "তোমরা কি চাও মোরে ঘরে রাখিবারে,/খুশি মন হইয়া বিদায় দেও গো আমারে।[১৭৯]

এখানে আইন্তন নিজে তাঁর পিতামাতাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে পরমেশ্বর তাঁকে এই জগতে পাঠিয়েছেন তাঁরই মহিমা প্রকাশের জন্য। অতএব তাঁর এই কাজে তাঁদের ব্যাঘাত সৃষ্টি করা উচিত নয়। তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনা মতো অনেকটাই পথ এগিয়ে এসেছেন। এখান থেকে তাঁর পিছিয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁকে বিদায়, এমনকি খুশি মনে বিদায় দেওয়াই তাঁদের একান্ত কর্তব্য। অন্যন্যোপায় হয়ে পিতামাতা তাঁকে পালকিতে করে এবং সঙ্গে কিছু ধনসম্পদ নিয়ে বিদ্যার্জনের জন্য যাবার অনুরোধ করেন। আইন্তন তাতেও রাজি নন। তিনি পিতার সম্পত্তির অংশীদার হতে চান না। সংসারের কোনো প্রকার সাহায্য তিনি বাঞ্ছিত মনে করেন না। তিনি পায়ে হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতে চান। তাঁর কথা–

> ধন কড়ি পারুম আমি না রাখিবারে,
> হস্তি ঘোড়ার কার্য নাই এই জগতের মাঝে।
> দুই পায়ে হাঁটিয়া যামু ইস্কুল পড়িবারে,
> খুশি মন হইয়া বিদায় দেও গো আমারে।[১৮০]

আইন্তনকে একা পথ চলতে দেখে দুই শয়তান তাঁকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করে। শয়তান তাঁকে পথ ভুলিয়ে অন্য রাস্তায় পাঠিয়ে বিভ্রান্ত করতে চায়। আইন্তনকে শয়তান যখন প্রস্তাব করে যে তাঁর 'ধর্মঘর' যেহেতু পিছনে ফেলে এসেছেন সেহেতু তিনি যেন শয়তানের কাছে 'ইস্কুল' পড়েন। আইন্তন জানেন এই কথা 'ছলনা কইরা শয়তান লাগছে কহিবারে'। শয়তানের ছলভরা কথায় কান না দিয়ে তিনি বিজ্ঞের মতো বলেন– "তোমার ধর্মঘর খানি থুইয়া আইছি পাছে,/আমার ধর্মঘর খানি আমার সামনে আছে।[১৮১]

দুই শয়তানকে বুদ্ধি এবং কথায় পরাজিত করার পর আইন্তন "মেস্তরি ঠাকুর" বা তাঁর শিক্ষকের কাছে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলেন, "ইস্কুল পড়তে আসলাম আমি রোমার ধর্মঘরে,/ মাস্টার হইয়া পড়ন শিখাও গো আমারে।"[১৮২] আইন্তন কিভাবে "মেস্তরি ঠাকুর" কে চিনতে পারলেন এই ভাবনায় তিনি বেশ আশ্চর্য হন। কেননা আইন্তন ছিলেন নিতান্তই এক শিশু।

---

১৭৯. প্রাগুক্ত
১৮০. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
১৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
১৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

শিক্ষকের কথায় তিনি যেন "দুধের বালক"। শিক্ষক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন– "কোথা থেকে আইছ রে ছেইলা কোথায় বাড়িঘর,/কি নাম তোমার পিতামাতার কিবা নামটি তর।"[১৮৩] তখন আইন্তন নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

> নিজগুয়াতে থাকি আমি নিজগুয়াতে ঘর,
> পিতার নামটি ফ্রান্সিস ভক্ত আমার নাম আন্তোনিয়ো;
> মার নাম ভেরনিকা ভইঙ্যা কইলাম তারে।[১৮৪]

আইন্তন জীবন সম্পর্কে সচেতন। তিনি জানেন ঈশ্বর তাঁকে যে কাজে পাঠিয়েছেন, সেই কাজ সমাধা করতে হবে। তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার। তাই তিনি শিষ্য হিসাবে তাঁর শিক্ষকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। শিক্ষক তাঁকে আরও দশজন বালকের সঙ্গে পড়ান। তাবে আইন্তন কিন্তু সাধারণ ছাত্র নন। তিনি অন্যদের চেয়ে জ্ঞান-বিদ্যায় অনেক পারদর্শী। অন্তরধ্যানে তিনি অনেক কিছু জানেন এবং বোঝেন। শিক্ষক মহাশয় নিজের এই প্রিয় ছাত্রটিকে তাঁর বুদ্ধির তারিফ করে বলেন–

> একটি হরফ যদি তোমারে দেই গো শিখাইয়া,
> দশটি হরফ বল তুমি অন্তরে জানিয়া।[১৮৫]

মাত্র সাতদিন লেখাপড়া করার পরই আইন্তন মেস্তুরি ঠাকুরকে তাঁর পরীক্ষা নেবার অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে শিক্ষক মহাশয় বলেন যে তাঁর পরীক্ষা নেবেন স্বয়ং "প্রভু নিরাঞ্জনে"। শিক্ষালাভের পর আইন্তন ঘরে ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পিতামাতার কাছে আবার বিদায় প্রার্থনা করেন। এবার তিনি বাড়ি ছেড়ে যেতে চান "শাস্ত্রের কারণে"। বিদায় পেয়ে আইন্তন ময়দানের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় জমি থেকে এক ছড়া কাওন ছিঁড়ে গুনতে থাকেন। এই সামান্য কাজে পরম পিতার মনে হয় "আইন্তন ভক্তে করছে গুনাহ্ ভরা ক্ষেতের মাঝে"। পিতার দরবারে এই অপরাধের মাফ নেই। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর পিতা আইন্তনকে ক্ষমা করতে রাজি হন। তবে তার জন্য তাঁকে শাস্তি পেতে হবে। পরম পিতার কথায়–

> যেই কাজ করছে আইন্তন ভরা ক্ষেতের মাঝে,
> বারো বচ্ছর খেওয়া বাইব ঐ লাহর দইরার মাঝে।
> এক রোজ থাকতে যামু আমি প্রভু নিরাঞ্জনে।
> সকলে যে দেয় খেওয়া নাও নৌকা দিয়া,
> আইন্তন ভক্তে দিব খেওয়া তার দুই হস্ত দিয়া।
> সকলরে যে করব পার তার দুই হস্তে উঠাইয়া,
> আমি যাইয়া হমু পার ঐ শিরেতে উঠিয়া।
> এমন কার্য যদি আইন্তন পারে গো করিবারে,
> তবে গুনাহর মাফ হইব আমার দরবারে।[১৮৬]

---

১৮৩. প্রাগুক্ত
১৮৪. প্রাগুক্ত
১৮৫. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
১৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

আইন্তনকে এখানে লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেওয়া হল। ভাগবানের শাস্তি তাঁকে মাথা পেতে নিতেই হবে। তিনি নৌকা নিয়ে নদীর ধারে চলে গেলেন। লোকজন তাঁর হাতে ওঠে পার হবার কথা শুনে তাঁকে 'ডাকাইত' বলে গালি, "তোমার সমান ডাকাইত নাই এই জগতের মাঝে।" আইন্তন এই অপবাদে খুব ভেঙ্গে পড়েন। তিনি পিতার কাছে নালিশ জানান। শেষে লোকজন তাঁর কথায় বিশ্বাস করে তাঁর হতে উঠেই নদী পার হয়। এইভাবে "একে দুইয়ে বারো বচ্ছর পূর্ণিত হইল"। পরমপিতা তাঁর কথামতো যাজকের বেশ ধরে নদী পার হতে আসেন। সবাইকে আইন্তনের হাতে করে পার করছেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর মাথায় চড়ে পার হতে চান। আইন্তন পরমেশ্বরকে চিনতে না পেরে তাঁকেও ভিক্ষুক বলে উপহাস করেন। শেষে তাঁর মনে হয় এই যাজক যদি ফিরে যায় তবে "কতদিন জানি জ্বইল্যা মরুম দোজখ আনলে।" শেষে নরকের ভয়ে আইন্তন ঈশ্বরকে মাথায় তুলে পার করার সময় তিনি কৌশলে তাঁকে আটকে রাখেন। পিতার ভয় পাছে নদী পার করার সময় আইন্তন তাঁকে চিনতে পারলে "রাখিতে না পারুম তারে এই জগতের মাঝে"। তাই আইন্তনকে তিনি জলের নীচে ডুবিয়ে রেখে নিজেই পার হয়ে যান। স্বর্গে ফিরে গিয়ে আইন্তনের দোষ ক্ষমা করে দেন। তারফলে "পাত্তালে ছিল আইন্তন ভাসিয়া উঠিল"।

আইন্তন নিজে নদী পার হবার পর পিতার হাতের শাস্ত্রের কথা তাঁর মনে পড়ল। তখন তিনি পিতাকে অনুরোধ করে বলছেন,

> তোমার হাতের শাস্ত্র পিতা দেও গো আমারে,
> যত্ন কইরা শাস্ত্র আমি লমু বারে বারে।[১৮৭]

তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে পিতা তাঁর দূতের হাতে শাস্ত্র দিয়ে আইন্তনের কাছে পাঠিয়ে দেন। দূত আইন্তনকে সাবধান করে বলেন যে, এই শাস্ত্র তিনি ঐরান জঙ্গলে হারাবেন। ঠিক তাই হল– আইন্তন শাস্ত্র পেয়ে মাথার কাছে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এই সময় দেবদূত এসে শাস্ত্র নিয়ে চলে যান। শস্ত্র হারিয়ে আইন্তন আবার কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর পুনরায় তাঁকে শাস্ত্র দিলে পরে "দুই হাত মেইল্যা শাস্ত্র তুইল্যা লইল তারে"। তারপর দেখি,

> পিতার হাতের শাস্ত্র খুইলা লাগছে পড়িবারে–
> শাস্ত্র না পইড়া শাস্ত্র ওয়াকিব হইল,
> পিতার হাতের শাস্ত্র অমনি পরানে ভরিল।[১৮৮]

পিতার হাতের শাস্ত্র পেয়ে আইন্তন মহা খুশি। তিনি সামনে এগিয়ে যেতেই এক নদী পেলেন। সেই নদী পার হবার জন্য তিনি দুই জেলেকে অনুরোধ করেন। তারা সাতদিন চেষ্টা করেও কোনো মাছ ধরতে পারেনি। শেষে তারা আইন্তনকে পার করে দিয়ে তাঁর কথামতো জাল ফেলতেই জালে প্রচুর মাছ উঠল। তারা আইন্তনের সম্বন্ধে ভাবছে– "কোন জানি দেবতা আইছে মন বুঝিবারে,/ নছিব মন্দ দেইখা আমরা না পারলাম চিনিবারে।[১৮৯]

---

১৮৭. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
১৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
১৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

পরে তারা জাল, নৌকা ও সম্পদ নিয়ে ঘরে ফিরে যায় আর পিতামাতা স্ত্রী-পুত্রের কাছে বিদায় নিয়ে আইন্তনের শরণ নেয়। তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে তারা বলে,

আগে যদি জানতাম গুরু তুমি এমন পীর,
আগে দিতাম দুগ্ধ কলা পাছে দিতাম শির।[১৯০]

জেলেদের এই কথায় আইন্তনের আসল পরিচয় ফুটে ওঠে। সত্যিই তিনি একজন বড় পীর। প্রভূত জ্ঞান আর গুণের সমন্বয়ে তিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন পিতার মহিমা প্রকাশের জন্য। মানুষকে প্রেম, দয়া আর ক্ষমা দিয়ে নতুন জীবনের দেখাবার জন্য তিনিই ঈশ্বরের অবতার।

কেশব ভক্ত

সাত বালকের সঙ্গে নিয়ে আইন্তন আরও সেবকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তিনি জানেন কাকে সেবক বলে মনোনীত করবেন। তাঁর মনে পড়ে কেশব ভক্তের কথা। কেশবের পরিচয় দিতে গিয়ে আইন্তন নিজেই বলেছেন,

কেশব নাকি বড় ভক্ত দুনিয়ার উপরে,
পাঞ্জি পুঁথি বয় তার বলদে বলদে।[১৯১]

কেশব শুধু বড় ভক্তই নয়, সে বেশ প্রতিপত্তিশালীও বটে। তার নিজের একটি বাজার আছে। সেখানে লোকজন বেচাকেনা করে। অনেক মানুষের আনাগোনায় তার আয় রোজগার নেহায়েত কম নয়। বাজারে সে সব মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন্তন সাত বালককে নিয়ে সারাদিন কেশবের বাজারে গান করেন। পরদিন তিনি একাই কেশবের খোঁজে তার বাড়িতে যান। সেই সময় কেশব ঘরে ছিল না। কেশবের মা আইন্তনের কাছ থেকে পিতা পুত্র ও পবিত্রাত্মার নাম শিখে নিলেন। সেই নামের জোরে তিনি শূন্যে অবস্থান নিয়েছেন। ঠিক সেই সময়ে দেখি– "দেশে দেশে গেছিল কেশব সেবক লওয়াইবারে,/সেবক লইয়া ফিরা আইল আপনারই ঘরে।[১৯২]

নিজেদের দল ভারি করার জন্য সেবক নিয়োগ করে কেশব ফিরে এসে মাকে ডাকতে থাকে। তার মা কোনো সাড়া দেয় না। সহসা সে দেখতে পায় তার মা শূন্যে উঠে গেছে। মার এই অবস্থায় সে হায় হায় করে ওঠে। মাকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করে–

একটি সেবক পারলাম না আমি শইন্যে উঠাইবারে,
তুমি মা শইন্যে বসলা আর কেমনই ঘরানে ?
সেই কথা ভাইঙ্গা কও আমার দরবারে।[১৯৩]

---

১৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
১৯১. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
১৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১৯৩. প্রাগুক্ত

তখন কেশবের মা তাকে আইন্তনের আগমনের কথা এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নাম শেখানোর ব্যাপারে সব সবিস্তারে বলে। কেশবের মা যখন বলে যে আন্তইন কেশবের বাজারে সেবক নিয়ে গান করছেন। সেখানে "বিক্রিগিরি কিছু নাই"। সব লোকজন বেচাকেনা বাদ দিয়ে গানে মত্ত। কেশবের মা এই কথা বলতেই–

অহঙ্কার কইরা কেশব আবার কোন কাম করে,
ছয় কুড়ি ছয়টি বাণ সাজাইয়া লইল বারে।
সেই বাণ ছাইড়া দিল রাত্র নিশাকালে,
গুন গুনাইয়া যায় বাণ আমার ঠাকুর বধিবারে।[১৯৪]

এখানে আমরা কেশবের অহঙ্কার আর ক্রোধের পরিচয় পাই। সে নিজের শক্তি জাহির করতে আইন্তনকে হত্যা করার জন্য বাণ ছোঁড়ে। সে ভাবে তার বাণের আঘাতে আইন্তনের অবধারিত মৃত্যু হবে। তাই সে আইন্তনের মৃতদেহ আনতে লোকজনদের পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু মৃত্যু তো দূরের কথা, আইন্তন কেশবের সব বাণ তাঁর পায়ের খড়ম দিয়ে প্রতিহত করেন। তারপর তিনি কেশব সম্বন্ধে তার লোকদের বলেন–

তাহার সমান ডাকাইত নাই ঐ ত্রিজগতের মাঝে,
এমন খবর কও গিয়া ঐ কেশব ভক্তের কাছে।[১৯৫]

লোকজনের মুখে এই কথা শুনে সে আরও রেগে যায়। সে তার বাজারে গিয়ে আইন্তনকে 'মাগনাইত্যা' বলে গালিগালাজ করে। শেষে দাম্ভিকের সুরে সে বলে–

ভিক্ষা মাইগ্যা খাছ তুই বেটা মোর নগরে বাজারে,
আমার মায়েরে তুইল্যা থুইছস ঐ শইন্যের উপরে।
তাহার যেমন নাম আছে এই দেহের মাঝে,
শত নাম দেখামু আমি আগুনের মাঝে।[১৯৬]

এই কথা বলে কেশব আগুনের বড় একটা কুণ্ড জ্বলিয়ে তাতে তার পাঁজি-পুঁথি সব ছুঁড়ে দেয়। সে ভাবে তার 'পাঞ্জি পুঁথি'র কোনো ক্ষতি হবে না। দাউ দাউ করে সাতদিন ধরে জ্বলল সেই আগুন। গানে বলা হয়েছে–

ওরে আটদিনের কালে কেশব কোন কাজই করে,
আর ঝাপ দিয়া পড়িল কেশব কুণ্ডের মাঝারে।
ওরে দুই হস্তে ছাই মাটি লাগছে লাড়িবারে,
আর যত ছিল পাঞ্জি পুঁথি পুইড়া হইল ছাই।[১৯৭]

এবার কেশবের সব দম্ভ শেষ হল। সে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে। এই ঘটনার জন্য সে নিজের কপালের দোষারূপ করে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে দুই হাতে আইন্তনের পা জড়িয়ে ধরে আর কেঁদে কেঁদে বলে–

---

১৯৪. প্রাগুক্ত
১৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
১৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

না জানিয়া করছি গুনাহ তোমার দরবারে,
আমার গুনাহ কর মাফ দয়ার ঠাকুরে।[১৯৮]

অনুতাপ আর নিজের দোষ স্বীকার করার পর আইন্তন তাকে ক্ষমা করেন। ক্ষমা লাভ করে কেশব নিজের সব কিছু ত্যাগ করে আইন্তনের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে। আইন্তন "সেন্টু বইল্যা নাম তার আবার ভুবনে রাখিল"। তখন সে আর কেশব নয়, এক নতুন মানুষ। আইন্তনের সেবক হয়ে সে তাঁর সঙ্গ নেয়। প্রভুর মহিমাকীর্তন গাইবার এক নতুন কারিগর হয়ে ওঠে। তার ফলে "ছিল তাহার সাতটি সেবক আটটি সেবক হইল"।

উপরান রাজা

আটজন সেবক সঙ্গে নিয়ে আইন্তন আবার পথে বেরিয়ে পড়েন উপরান রাজার উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যে আমরা পালাকারের মুখে উপরানের পরিচয় পাই–

বারো ভূতের পূজা করে ঐ মন্দিরের উপরে,
মুর্দা দিয়া দেয় পূজা ঐ মন্দিরের উপরে।[১৯৯]

আইন্তন উপরানের বাড়ির কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সে একটা মৃতদেহ মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। আইন্তনকে দেখে বলে যে বার ভূতের পূজা করার জন্যই সে মুর্দা নিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার করে এই কথা-ও বলে– "আগে যদি দেখিতাম তোমায় সেই রাজপন্থের মাঝে,/ তোমারে দিয়া দিতাম পূজা ঐ মন্দিরের উপরে।"[২০০] এইকথা শুনে আইন্তন উপরানের গালে ক্রুশের চিহ্ন এঁকে দিলেন। উপরান পূজার আসন পেতে তার আরাধ্য ভূতদের ডাকতে লাগল। ভূতেরা পূজা নিতে আসে ঠিকই, অথচ কোনো উপচার দেখতে পায় না। তারা উপরানের গালে ক্রুশের চিহ্ন দেখে বলে যে এই চিহ্ন না উঠানো পর্যন্ত তারা তার পূজা গ্রহণ করবে না। ভূতের কথা শুনে উপরান পাগলের মতো নিজের গাল ঘষতে লাগল। পালাকারের কথায় "ঘষিতে ঘষিতে গালে বহুত রক্ত নিকানিল"। তখন সে আইন্তনের কাছে গিয়ে বলে– "আমার পূজা ভঙ্গ হইল ঐ মন্দিরের উপরে, /জলদি কইরা কইছি চিন উঠাইয়া আন তারে।"[২০১] তারপর আইন্তন উপরানকে জিজ্ঞাসা করেন– মানুষ মেরে ভূতের পূজা দেবার অপরাধের ভাগিদার তার বাবা-মা বা স্ত্রী-পুত্রেরা হবে কি না। উপরান ঘরে গিয়ে সবাইকে জিজ্ঞাসা করে– "সদা একটি মানব সন্তান লাগছি বধিবারে, /ইহার নি সাথে আছ তোমরা ঘরগুষ্টি সকলে।"[২০২] তখন তাদের উত্তর– "সুকাম করলে আমরা তোমরা যামু তাহার পাশে,/বধি কামের সাথী নাই ভাইঙা কইলাম তারে।"[২০৩] তাদের কথায় উপরান হতাশ হয়। সে

১৯৮. প্রাগুক্ত
১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
২০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪
২০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
২০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
২০৩. প্রাগুক্ত

সিদ্ধান্ত নেয় যে পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র, ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পত্তি– ছেড়ে সে আইন্তনের অনুসারী হবে। আইন্তন তাকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করে নাম দেন আগষ্টিন। তারফলে "ছিল তাহার আটটি সেবক নয়টি সেবক হইল"।

পালাগানে আরও কিছু চরিত্র আছে যারা রক্ত মাংসের মানুষ নন। পরম পিতা এবং স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে পৃথিবীর মানুষের উপর অধিকার এবং আধিপত্য ফলান।

পালাগানে ঐতিহাসিক উপাদান

সাহিত্য আর ইতিহাস এক নয়। ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বন করে বা ইতিহাসের উপাদান নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে পারে। কিন্তু সাহিত্য ইতিহাস হতে পারে না। পালাগান প্রসঙ্গে একই কথা প্রযোজ্য। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রত্যহ যে ইতিহাস জন্মলাভ করে লোকসাহিত্যে তারই বাণীবদ্ধ রূপ দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের বাংলা লোকসাহিত্য, বিশেষ করে পালাগানগুলির মধ্যে ইতিহাসের উপাদান আছে ঠিকই তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই উপাদান যথার্থ ইতিহাস বলে গ্রহণ করা যায় না।

পালাগানের সাধু আন্তোনিয়ো একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। ইউরোপের এক সাধক পুরুষ বাংলাদেশের মানুষের কাছে গৃহীত হয়ে বিশ্বাসের পাত্র এবং আরাধ্য হয়ে উঠেছেন। তাঁর জীবনী-ভিত্তিক পালাগানের কিছু কিছু কাহিনি ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ইতিহাস কতটা সত্য সেটাই বিচার্য। এই কথা স্বীকার করতেই হয় যে আন্তোনিয়োর জীবনের কাহিনি আমাদের দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে তার মধ্যে বাংলার সেই সময়কার দুয়েকটি বিষয় আছে বলে মনে হয়। আক্ষরিক অর্থে কোনো পালাগানকে ঐতিহাসিক বলে গ্রহণ করা যায় না। সমালোচক ম্যথিউ হডগার্ট বলেছেন, "No ballad can be called truly historical, for none is reliable on matters of face. There is rarely any proof that such ballads have been written within living memory of the events they describe."[২০৪]

পালাগানের মধ্যে ঐতিহাসিক কাহিনি থাকলেও কোনো পালাগানই ইতিহাসের যথাযথ রূপান্তর হতে পারে না। মোট কথা, আন্তোনিয়ো পালাগানে আমরা যে আন্তোনিয়োর সাক্ষাৎ পাই তাতে প্রামাণিকতা বা ঐতিহাসিকতা খুঁজতে যাওয়া সমীচীন নয়। কেননা ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, "গীতিকায় জনশ্রুতিমূলক বিষয়-বস্তুর উপর অবলম্বন করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গীতিকার বিষয়-বস্তু সর্বদাই নির্ভর করিয়া কোনদিনই ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। ইহার কারণ ইতিহাসের

২০৪. M. J. C. Hodgart, Ibid., p. 16

ক্ষেত্র হইতে গীতিকার সীমায় উত্তীর্ণ হইবা মাত্র ঐতিহাসিক বিষয়সমূহ এক এক নূতন লৌকিক রূপ ধারণ করে, ইহার ঐতিহাসিকত্ব আর রক্ষা পাইতে পারে না।"[২০৫]

পালাগানের ভাষা

ভাষা বহমান স্রোতস্বিনীর মতো। চলার পথে প্রধান নদী থেকে যেমন শাখানদীর সৃষ্টি হয় বা তাতে উপনদী এসে মিলিত হয়, তেমনি ভাষার বহমান স্রোতেও নিত্য নতুন শব্দ এবং বাগ্‌ধারা এসে মেশে। লোকসাহিত্য লোকের মুখে মুখে প্রচার লাভ করে। মানুষ তার প্রচলিত ভাষা সর্বদাই নতুন করে নেবার পক্ষপাতী। পুরানো কথা বা ভাব প্রকাশের ধারা তাই সে পাল্টে নেয়। এই প্রসঙ্গে ড. ভট্টাচার্য আরও বলেছেন, "লোকসাহিত্যের ভাষায় প্রাচীনতা রক্ষা পাইতে পারে না। ইহা শ্রুতিপরম্পরায় সমসাময়িক রূপ লাভ করিতে করিতেই পরিবর্তিত হইতে থাকে– ...। তবে যে সকল অপরিচিত শব্দ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দ নহে– বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত গ্রাম্যশব্দ মাত্র।"[২০৬] তাই আমরা দেখি লোক-সাহিত্যের ভাষা সবসময় আধুনিক। তবে তার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট একটা এলাকার ভাষা ব্যবহৃত হতে পারে। আর সচরাচর তা-ই হয়। আঞ্চলিক ভাষাই লোকসাহিত্যের একটা বড় সম্পদ। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, "গীতিকার ভাষা জীবন্ত, ইহাতে কোনো কৃত্রিমতা নাই। তাহার ফলেই ইহার বাস্তব ধর্ম সর্বত্র রক্ষা পাইয়াছে। ইহা প্রত্যেক অঞ্চলেরই নিজস্ব প্রাদেশিক ভাষায় (dialect) রচিত। ইহা বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চলের কথ্যভাষা বলিয়া ইহা কথ্যভাষার সাধুরূপ হইতে দূরবর্তী।"[২০৭]

ড. ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে দেখি যে, তার ভাষা বাংলাদেশের একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা। ঢাকা এলাকার কথ্য ভাষায় রচিত এই পালাগানে বাস্তবতা রক্ষিত হয়েছে। বাংলা অক্ষরগুলোর মধ্যে অনেকগুলিই বাংলাদেশে বেশ ভিন্নরূপে উচ্চারিত হয়। উচ্চারণের এই হেরফের শিক্ষিত সমাজের চেয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। বাংলা বর্ণমালার মধ্যে বর্গের চতুর্থ বর্ণ যেমন- ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ যথাক্রমে- গ, জ, ড, দ, ব উচ্চারিত হয়। 'ঘর' না বলে হয়ত বলা হয় 'গর'। কিংবা 'ধার' হয় 'দার'। ভালো হয়ে যায় 'বালো'। অনেক সময় শ, স ব্যবহারের ক্ষেত্রে হয়ে যায় 'হ'। শিয়াল' হয় 'হিয়াল'। সত্য বা 'সাচ্চা কথা' হয় 'হাচ্যা কতা'। এখানে 'থ' হয়েছে 'ত'। তবে এই কথা স্মরণ রাখা দরকার বাংলা লেখার সময় কিন্তু এই রূপ ব্যবহৃত হয় না। লেখা হয় শুদ্ধভাবেই। বাংলাদেশের ঢাকা এলাকার কথ্য ভাষায় আরও বেশকিছু নিয়ম চোখে পড়ে। সেখানে চন্দ্রবিন্দুর (ঁ) ব্যবহার নেই বললেই চলে। তার পরিবর্তে যে অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু থাকার কথা সেই অক্ষরের পরবর্তী অক্ষর বর্গীয় এবং কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ অসংযুক্ত থাকলে সেই বর্গের

২০৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪২৩
২০৬. প্রাগুক্ত
২০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২

পঞ্চম বর্ণ সেই অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– চাঁদ হয় চান্দ, কাঁদা হয় কান্দা, চাঁদা হয় চান্দা, বাঁধা হয় বান্দা। অন্যদিকে যদি চন্দ্রবিন্দু যুক্ত অক্ষরের পরবর্তী অক্ষর বর্গীয় না হলে শব্দটি চন্দ্রবিন্দু ছাড়াই উচ্চারিত বা লিখিত হয়। মোটকথা অনেক সময় ঢাকার কথ্যভাষায় চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ বা ব্যবহার করা হয় না। 'সাঁঝের বেলা' তাই হয় 'সাজের বেলা', কিংবা 'বাঁচিব ভুবনে' খুব সহজেই হয়ে যায় 'বাচিব ভুবনে।' বাংলাদেশে 'আ' ধ্বনি প্রায় সবসময়ই 'অ্যা' উচ্চারিত করা হয়। তাই 'দিয়া' হয় 'দিয়্যা', করিয়া হয় 'করিয়্যা' হয় 'কইর‍্যা', বলিয়া হয় 'বইল্যা', আসিয়া হয় 'আইস্যা' ইত্যাদি।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের ভাষা প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয় না বললেই নয়। প্রথমত এই পালাগানে একই কথার অনেক পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। লোকসাহিত্যে বা মৌখিক রীতির সাহিত্যে পুনরাবৃত্তির একটা প্রয়োজনীয়তা থাকে। বিশেষ করে পালাগানের ক্ষেত্রে সেটা আরও বেশি। পালাগান স্মৃতিনির্ভর। মুখস্ত করে নিয়ে তারপর গায়েন গান পরিবেশন করেন। অনেক সময় গানের আকার এবং পরিধি বড় বলে সেটা মুখস্ত করতে অসুবিধা হবার কথা। তাই পালাগানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তবে সাধু আন্তোনিয়োর পালায় আমরা দেখি একই কথা এত বার ঘুরে ফিরে আসে যে, মাঝে মাঝে তা বিরক্তিকর বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, "এমন কথা দয়ার ভক্তে যখনই কইল', "কথা শুইনা দয়ার বিবি লাগছে কহিবারে", "এমন সময় আইন্তন ভক্তে কোন কাম করে", "ধীরে ধীরে দয়ার ভক্তে চইলা ম্যালা করে", "মধুর বচনে পিতায় লাগছে কহিবারে", "এমন কথা দয়ার ভক্তে মনেতে ভাবিয়া", "এমন সময় দয়ার ভক্তে কোন কাজ করে", "ভক্তে তো চইলা গেল আপনার ঘরে", "সেই কথা ভাইঙ্যা কও আমার দরবারে"– এমনই কিছু বাক্য বার বার পুনরাবৃত্ত হয়ে পালাগানটিকে ভারাক্রান্ত করেছে।

আবার পালার প্রতিটি অখ্রিষ্টান চরিত্র একইভাবে আইন্তন ভক্তের সামনে আসে। আইন্তনকে প্রথম দেখে সবাই একই ভাষায় কথা বলে। তাদের গালাগালি দেবার ধরন ও ভাষাও সবারই প্রায় একই রকম। যেমন–

> ভিক্ষা মাইগ্যা খাছ রে বেটা নগরে বাজারে,
> মাগনাইত্যা হইয়া আইছ তুমি পার হইবার তরে।[২০৮]

এই ধরনের কথা দুই জেলে, দারোয়ান, কেশব ভক্ত, উপরান রাজা– সবাই আইন্তনকে একইভাবে বলে। আবার আইন্তনের কাছে পরাজিত হবার পর সবাই একই ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করে–

> না জানিয়া করছি গুনাহ তোমার দরবারে,
> আমার গুনাহর কর মাফ দয়ার ঠাকুরে।[২০৯]

তাদের সবার আক্ষেপ জানাবার ভাষারও কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তাই তারা যেন একে অপরের কথা ধার করে নিয়ে আইন্তন ভক্তকে বলে–

---

২০৮. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
২০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

আগে যদি জানতাম গুরু তুমি এমন পীর,
আগে দিতাম দুগ্ধ কলা পাছে দিতাম শির।[২১০]

তারপর তারা সবাই পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পত্তি ছেড়ে আইন্তনের কাছে একসূত্রে নিজেদের ইচ্ছের কথা জানায়–

তুমি আমার নায়ের গুরু, আমি তোমার দাস,
তোমার পাছে হমু সেবক ছাইড়্যা দিমু বাস।[২১১]

আইন্তন ভক্তও তখন যেন আর ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ নন, রক্ত-মাংসের সাধারণ একজন মানুষ। তাঁর মধ্যে রাগ ক্ষোভ এবং পরশ্রীকারতা আছে। তাই আমরা শুনি পালাগানে প্রায়ই কোনো দুষ্ট মানুষকে শায়েস্তা করার পর তিনি বলেন–

তখন তো চাইছিলা মোরে প্রাণে বধিবারে,
এখন কেন হও কাতর আমার দরবারে?[২১২]

পরিশেষে তিনি তাদের প্রত্যেককে প্রতিবারই ক্ষমা করেন এবং খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। সেই দীক্ষার প্রণালী সবার ক্ষেত্রে একই রকম। পালাগানে বলা হয়েছে এই ভাবে–

এমন সময় আইন্তন ভক্তে কোন কাম করিল,
পিতা পুত্র পবিত্রাত্মার নামে তাগো বাপ্তাইস্ম করাইল।
আপনা হস্তের চাকু লইয়া টিকি যে কাটিল,
গলায় ছিল কাষ্ঠের মালা তারে কাইট্যা ফেলিল।
আছিল যে হিন্দু কূলে খ্রীষ্টান কূলে আনিল,
পিতা পুত্র পবিত্রাত্মার নামে বাপ্তাইস্ম করাইল।[২১৩]

এই বর্ণনার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তবুও বর্ণনার ভাষা বার বার একরকম হওয়ার ফলে তা একঘেঁয়েমির সৃষ্টি করে। একইভাবে আইন্তন ভক্ত কোথাও যাবার আগে বা কোনো কাজ করার আগে তাঁর কর্মকাণ্ডের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার মর্মার্থও একই–

এই বলিয়া আইন্তন ভক্তে কোন কাজই করে–
যাজকের সাজ বাজ গায়ে তুইল্যা লইল,
সোনার খরম জুতার বান্দন পায়ে তুইল্যা লইল।
মালিকের বেত আইন্তন হস্তে তুইল্যা লইল,
আজানু পাতিয়া ভক্তে সিদ্ধি কুরুশ করে।
মহাপ্রভুর নামটি ভক্তে মনে স্মরণ করে,
ধীরে ধীরে দয়ার ভক্তে চইলা ম্যালা করে।[২১৪]

আবার কারও কোনো সমূহ বিপদের সম্ভাবনা থাকলে সেটা আইন্তন আগেই বুঝতে পারেন। সেই বোধ থেকে তিনি ভবিষ্যত বিপদের জন্য হাহাকার করেন সর্বত্র একইভাবে–

---

২১০. প্রাগুক্ত
২১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
২১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
২১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
২১৪. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

হায় হায় কইরা আছাড় খাইয়া পড়ে–
হায় হায় বইলা আইন্তন শিরে দিল হাত,
আসমান ভাইঙা যেন পড়িল মাথাত।[২১৫]

এই হাহাকারের ভাষা যেমন আইন্তনের, তেমনি তাঁর পিতামাতার; একইভাবে কেশব ভক্তের, সাত বালকের বাবামায়ের, আবার কেশবের জননীরও। সর্বত্র একই রকম বর্ণনার কারণ হিসেবে বলা যায় পালাগানের গায়েনের ভাষার সীমাবদ্ধতা। পালাগানে ব্যবহার করার মতো উপযুক্ত শব্দাবলি হয়ত তাঁর ভাণ্ডারে নেই। সীমিত সংখ্যক শব্দকে পুঁজি করে রচিত সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা বলা যায় এই গানের উপর্যুপুরি পুনরাবৃত্তি। এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারলে এই পালাগানের সাহিত্যগুণ আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠত।

২১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

পঞ্চম অধ্যায়

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাব-সংশ্লেষ

বাঙালি একটি মিশ্র জাতি। নানা দেশের, নানা ভাষার, নানা ধর্মের এবং নানান সংস্কৃতির মানুষ এই ভূখণ্ডে এসে মিলে মিশে একাকার। আমাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য থাকলেও একটা ঐক্যের ধারা এই দেশের মানুষের মধ্যে চিরপ্রবহমান। ভাষা আমাদের সবাইকে একসূত্রে গেঁথে রাখলেও অঞ্চলভেদে বাংলা ভাষারও রকমভেদ রয়েছে। তবে বাংলা ভাষার জন্মের আগে থেকেও আমাদের এই দেশে বাঙালি জাতির একটা পরিচয় ছিল, সেটা আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। আর সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রহণীয় মনোভাবের পরিচয়। অন্য ধারা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আমাদের ভাষা-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধশালী করার পরিচয়। বাঙালির এই সার্বিক দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়ে যে সৃষ্টিশীল চেতনা এবং প্রেরণা কাজ করেছে– সেখানে আমরা সাধক আন্তোনিয়ো পালাগানের যাথার্থ্য খুঁজব। অর্থাৎ, সেই পালাগান যে আমাদের দেশের মধ্যেই উৎপত্তি লাভ করেছে এবং দেশের জল-হাওয়ায় তার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে; তার যথাযথ অন্বেষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

বাংলাদেশে খ্রিষ্টভক্তদের কাছে পাদুয়ার সাধক আন্তোনিয়ো অতি জনপ্রিয় একটি নাম। বিশেষ করে বৃহত্তর ঢাকা জেলার খ্রিষ্টবিশ্বাসী, এমনকি এই এলাকা ছেড়ে দেশে-বিদেশে পাড়ি-দেওয়া মানুষ যেখানেই থাকুন না কেন– আন্তানিয়োর প্রতি সবারই রয়েছে একটা প্রাণের টান, অন্তরের আবেগ। আমরা অস্বীকার করতে পারব না যে, বাংলাদেশে খ্রিষ্টান জনগণও কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতির শক্তিশালী ধারক ও বাহক। বাঙালির গীতিপ্রাণ সত্তা তাঁদের অন্তরেও সমানভাবে লালিত এবং প্রোথিত। তাইত সাধক আন্তোনিয়োর জীবনকেন্দ্রিক পালাগান রচনায় এক সময় তাঁরাও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের রচিত আন্তোনিয়ো পালাগানে আমরা বাংলা লোকসাহিত্যের অনুপুঙ্খ প্রতিফলন দেখি। এই দেশের মাটি ও মানুষের একান্ত প্রকাশে সেগুলো হয়ে উঠেছে আমাদেরই একান্ত নিজস্ব সম্পদ। সেখানে ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিধাটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

বাঙালি খ্রিষ্টানের ভক্তি এবং বিশ্বাস প্রকাশের ক্ষেত্রে লোকজ আয়োজন ও প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। বাইরের অভিঘাতে খ্রিষ্টধর্ম বঙ্গদেশে উৎপত্তি লাভ করলেও যাঁরা এই ধর্মকে ধারণ করেছেন– তাঁরা সবাই বাঙালি। তাঁদের ধর্মীয় সাধনার দিকটি কিন্তু এই দেশের মাটি ও জলের সঙ্গে মিশেই পরিপুষ্টি লাভ করেছে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের খ্রিষ্টভক্তগণ ইউরোপীয় ভাবটি গ্রহণ করেছেন ঠিকই; কিন্তু সেটা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন বাংলার লোকায়ত চেতনাকে। সেখানে খ্রিষ্টে আর কৃষ্ণে কোনো তফাৎ পাওয়া যায় না। সেখানে সাধক আন্তোনিয়ো পালা, ময়মনসিংহ গীতিকার পালাসমূহ এবং গাজির পালাগুলো অনায়াসে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। এক রীতি আরেক রীতিকে সমৃদ্ধ করে। বাঙালির এই দেওয়া নেওয়া এবং মিলবার ও মিলানোর প্রচেষ্টাই তার অন্তরধর্মের সত্যিকার পরিচয় ও যাথার্থ্য তুলে ধরে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে বাংলা সাহিত্যের অনুবর্তন

সাহিত্য কোনো ভূঁইফোড় বিষয় নয়, পরিচিত দেশমাটির আবহেই তার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে থাকে। আর লোকসাহিত্য আমাদের এই দেশমাটির একান্তই নিজস্ব সম্পদ। তার মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতি অনুপুঙ্খভাবে প্রকাশিত হবে– সেটাই স্বাভাবিক। আমরা জানি, সাহিত্য সচরাচর পূর্বাপর ঐতিহ্যকে ধারণ করেই বিকশিত হয়। সেই বিচারে আমরা দেখি, বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্মের আবির্ভাবের সময় থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তার একটা জোরালো ভূমিকা রয়েছে।

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে গিয়ে এদেশের খ্রিষ্টানুসারীরা দেশের প্রচলিত ভাষা ও সাহিত্যের রীতিকে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ধারায় আমরা দেখি যে তার উৎপত্তি ও প্রাথমিক বিকাশের ক্ষেত্রে খ্রিষ্টান মিশনারিদের সবচেয়ে বড় ভূমিকা ও একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে। ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্নান্দেজ এস. জে. রচিত 'খ্রিষ্টধর্মশিক্ষার কড়চাধর্মী' পুস্তিকাই হোক, কিংবা দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও লিখিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'ই হোক; বাংলা গদ্যের এক বিশ্বস্ত দলিল হিসাবে সেগুলোর ভূমিকা কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। অন্যদিকে বাংলা কাব্য ও গীতিসাহিত্যের ধারা থেকে খ্রিষ্টীয় জীবন-সাধনায় যে আলো নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তারও তুলনা মেলা ভার। এই বিচারে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে বঙ্গদেশের পূর্বাপর মৌখিক রীতির পালাগানের অনুবর্তন খুব সহজেই চোখে পড়ে। লোকসাহিত্যের নানা প্রভাবকে শিরোধার্য করে খ্রিষ্টান লোককবিদের এই প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার।

গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা পালাগানের শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে বলেছেন, "বাংলাদেশ হইতে এই পর্যন্ত যে সকল গীতিকা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে– প্রথমতঃ নাথ- গীতিকা, দ্বিতীয়তঃ মৈমনসিংহ-গীতিকা ও তৃতীয়তঃ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা।"[১] এই প্রসঙ্গে ড. ভট্টাচার্য আরও উল্লেখ করেছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামের তিন খণ্ড গ্রন্থের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাই 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র অর্ন্তভূক্ত। অবশ্য অনেক লোকসাহিত্য বিশারদ এবং সংগ্রাহক কর্তৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই এই আখ্যানধর্মী পালাগান সংগৃহীত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের পর যাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়, তিনি শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক। তিনি বাংলাদেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে গায়েন ও বয়াতিদের কাছ থেকে অসংখ্য পালাগান সংগ্রহ করেছেন। তিনি 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে মোট সাতটি খণ্ডে সেগুলি

---

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, পৃ. ৪১১

অত্যন্ত যত্ন ও নির্ভরযোগ্যতা সহকারে সম্পাদনা এবং প্রকাশ করেছেন। এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হাল আমলে পালাগান সংগ্রহ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শ্রী মৌলিকের সমকক্ষ আর কেউ-ই নেই। অন্যদিকে ঢাকা বাংলা একাডেমির প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের যে সংকলন শুরু হয়েছে; তার মধ্যে ময়মনসিংহ-গীতিকা ছাড়াও রয়েছে রংপুরের পালাগান, চট্টগ্রাম গীতিকা, বরিশালের পালাগান, খুলনার পালাগান– ইত্যাদি। মূলত এগুলি সবই পূর্ববঙ্গ গীতিকা। তবে এক্ষেত্রে শ্রী চিত্তরঞ্জন দেব মহাশয়ের মন্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। তিনি বলেছেন–

> এক অঞ্চলের গানের সঙ্গে আরেক অঞ্চলের গানের যেমনি রয়েছে সুরগত পার্থক্য, তেমনি বিষয়বস্তুতেও। ... এই গান যে শুধু পল্লীবাংলার নিরক্ষর জনসাধারণের অবসর ও বিনোদনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে তা নয়। এই গানের ভিতর একদিকে যেমন দেখতে পাওয়া যায় নিরক্ষর কবিকূলের কবিত্বশক্তির বিকাশ; অপর দিকে সমসাময়িক সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আর্থিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্যাদিও অস্বীকার করবার উপায় নেই।[২]

শ্রী চিত্তরঞ্জন দেবের কথামতো এক অঞ্চলের পালাগানের সঙ্গে আরেক অঞ্চলের পালাগানের সুরগত এবং বিষয়বস্তুগত পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে আঙ্গিক ও রূপগত বৈসাদৃশ্য খুব একটা চোখে পড়ে না। অনেক সময় মনে হয়, একটি পালার কবি হয়ত আরেকটি পালার রসদ গ্রহণ করেছেন বা অন্য কোনো পালাগান থেকে প্রভাবিত হয়েছেন। কোনো সৃষ্টিই কি সম্পূর্ণভাবে ঐতিহ্যমুক্ত হতে পারে? নতুন সৃষ্টিকে পুরনো ধারা কিছুটা হলেও অনুসরণ করতে হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেটা অহরহ ঘটতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "আঙ্গিকের দিক দিয়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এই গীতিকাগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কাহিনী বর্ণনার যে গতানুগতিক রীতি এদেশে প্রচলিত আছে, তাহা অনুসরণ করিয়াই এইগুলি রচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে ইহাদের পারস্পরিক প্রভাবও অনুভব করা যায়।"[৩]

এই বিচারে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে বাংলাদেশের অন্যান্য পালাগানের প্রভাব নিরূপণের প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। আমরা জানি, বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান এক নতুন ধরনের সাহিত্য প্রকরণ। কেননা বঙ্গদেশে এককালে কাব্য-কবিতা প্রধাণত দেবদেবীর লীলাখেলা তথা দেবতার মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত হওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে। বিশেষ করে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের ধারাটি অনেকাংশে ধর্মাবরণে আচ্ছন্ন ছিল। আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেখানে দেবদেবীর সঙ্গে মানুষের এক কাছে-দূরের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। অথচ আমাদের লোকসাহিত্যের এই সমস্ত পালাগানে দেখি ধর্মাচ্ছন্নতামুক্ত সহজ সরল মানবিক জীবনবোধ নিহিত। বলা যায় বাংলা সাহিত্যের দেবমাহাত্ম্যসূচক ধারা থেকে সরে এসে পালাগানের গায়ক এবং কবিগণ ধর্মীয় বাতাবরণমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সাবলীল কাহিনি রচনা করেছেন। নাথ-গীতিকার ধারাটি বাদ দিলে বাংলা পালাগানের মূল বিষয়বস্তু হিসেবে আমরা পাই মানব-মানবীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার এক অপার বাসনা। তার সঙ্গে পালাগানের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় একটি বিশেষ ভৌগলিক পরিবেশের

---

২. চিত্তরঞ্জন দেব, *বাংলার লোক-গীত-কথা*, প্রস্তাবনা, পৃ. ৩
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১১

জনগোষ্ঠীর জীবন প্রবাহের দ্বন্দ্ব এবং মানবীয় সহজাত প্রবৃত্তির কুণ্ঠাহীন উন্মোচন। তাই বাংলা পালাগানগুলি আমাদেরই সার্বিক জীবনবোধের একনিষ্ঠ দলিল হিসাবে গ্রহণীয়।

নাথ-গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান

আমরা আগেই জেনেছি, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বিচার করলে পালাগানের মধ্যে নাথ-গীতিকাগুলি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। নাথ-গীতিকার কাহিনি সম্পর্কে অল্পকথায় খুব সুন্দরভাবে বিবৃত করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "ইতিহাসের কোন বিস্মৃত যুগে এক রাজপুত্র মাতার নির্দেশে তরুণ যৌবনেই দুই নব পরিণীতা বধূ প্রাসাদে রাখিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই বৃত্তান্তটিই নানাদিক হইতে নাথ-গীতিকাগুলির মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহাই কেন্দ্র করিয়া সমগ্র নাথ-গীতিকার উদ্ভব।"[৪] আলোচনার সুবিধার জন্য নাথসাহিত্য বা নাথ-বিষয়ক রচনাগুলিকে পণ্ডিতেরা দুইভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে রয়েছে নাথগুরুদের অলৌকিক সাধন-ভজনের কাহিনি। এগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, যোগীসিদ্ধ পুরুষদের এই পুরাণকথা কিছুটা সম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। তারই ফলে সেগুলি সত্যিকার অর্থে পাঁচালি কাব্যের রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। আবার সে-সব কাহিনিতে কোনো গৃহস্থ-কল্যাণের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। সেগুলির মধ্যে বরং নাথ-আচার্যদের একটি উচ্চতর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা রয়েছে। এই পর্যায়ের বিষয় সম্পর্কে এ যাবৎ যে-সব গীতিকা প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে 'গোরক্ষ-বিজয়' এবং 'মীন-চেতনা' বা 'মীন চৈতন্য' প্রধান। গোরক্ষ বিজয়ের মূলভাবটি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন সুন্দরভাবে বলেছেন, "জীবন্মুক্ত শিষ্য কর্তৃক মোহমগ্ন গুরুকে চৈতন্যদান"।[৫] এই কাহিনির মধ্যে নায়ক চরিত্র অর্থাৎ গোরক্ষনাথ– এক ধরনের আধ্যাত্মিক প্রেরণার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রমণীর মোহপাশে আবদ্ধ নিজের গুরু মীননাথকে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করেছিলেন। 'গোরক্ষ-বিজয়' এবং 'মীন-চেতন' নাথ-গীতিকার রচয়িতা বা গায়ক হিসেবে ভীমসেন রায়, শ্যামদাস সেন এবং শেখ ফয়জুল্লা– এই তিনজনের নাম পাওয়া যায়।

'গোরক্ষ বিজয়' কাব্যে অনেক অবাস্তব এবং অলৌকিক কাহিনি মিশে আছে। কাব্যের অলৌকিকতার মধ্যে মীননাথের মাছের পেটে থেকে মহাজ্ঞান লাভ, রাক্ষসীর রূপ ধরে গৌরীর নরবলি গ্রহণ, গোরক্ষনাথের শিশুতে রূপান্তরিত হওয়া, তাঁর পত্নীর অলৌকিকভাবে গর্ভধারণ, তুড়ি মেরে মৃতকে বাঁচানো– ইত্যাদি প্রধান। ঠিক এমনই নানা আশ্চর্য ঘটনার সমারোহ আছে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের মধ্যে। এই পালাগানে সাধু আন্তোনিয়োর পরম পিতার আশীর্বাদে জন্ম থেকে শুরু করে ঐশজ্ঞান লাভ– প্রায় সব বিষয়ই অলৌকিক। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও আদেশে তিনি স্বর্গ থেকে এসে ফ্রান্সিস ভক্তের স্ত্রী ভেরনিকা বিবির গর্ভে আশ্রয় নেন। আশ্চর্যভাবে তিনি নদী পার হয়ে যান। খুব অল্পদিনের মধ্যে তিনি "চাইর বেদ চইদ্দো শাস্ত্র" অধ্যয়ন

৪. প্রাগুক্ত
৫. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড-অপরার্ধ, পৃ. ২৩৭

করেন। সামান্য বালক হওয়া সত্ত্বেও তিনি শয়তানে নানা প্রলোভন ও শক্তিতে সহজেই প্রতিহত করেন। আমরা আরও দেখি যে, বিভিন্ন সময় তিনিও বেশ কয়েকজন মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করেন। 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্যে গোরক্ষনাথ তাঁর পত্নীকে আশীর্বাদ করে বলেন– "এহি কর্পটি পাখলি কর জল পান,/ সিদ্ধা পুত্র জন্মিব দেখিবা বিদ্যমান।"[৬] এখানে গোরক্ষের কৌপিন ধোয়া জল পান করে বিরহিনী নাম্নী রাজকন্যা সত্যিই পুত্রবতী হন। তার সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে মিল না থাকলেও আমরা দেখি সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে ফ্রান্সিস ভক্তের ঘরে পুত্র-সন্তান জন্মের আভাস দিয়ে স্বর্গের দূত ভক্তকে বলেন,

> যেমন তেমন একটি পুত্র হইব তোমাগো ঘরে,
> না খাইবা পুত্রের কামাই দেখিবা নয়নে;
> পুত্রের উছিলায় ধন বাঁচিবা ভুবনে।
> আতুর আইন্যা নগদ দিবা বাইর বাড়ির দখ্‌খলে,
> আইন্তন বলিয়া নাম রাখিবা ভুবনে।
> এমন কার্য যদি তোমরা পার করিবারে,
> তবে শ্যেন একটি পুত্র হইব তোমাগো ঘরে।[৭]

গোরক্ষ-বিজয় 'মীন-চেতনা'-এ সমাজচিত্র, বিষয়বৈচিত্র্য এবং বাস্তবতা কোনোভাবেই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। নাথ-গীতিকার চরিত্রগুলিও সাদামাটা, তারা যেন রক্ত মাংসের মানব-মানবী নয়। গোরক্ষনাথও চরম অলৌকিক শক্তির অধিকারী হিসেবে যেন একজন অতিমানব রূপেই আমাদের সামনে উপস্থিত হন। তেমনিভাবে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে সমাজচিত্রের প্রতিফলন অনেকাংশেই সীমায়িত। ঘটনাগুলি ততটা বাস্তব বা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। পালাগানের চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে এক ধরনের বিশ্বাসবোধ কাজ করেছে। আইন্তন ভক্তের মধ্যে প্রায়ই ঐশ্বরিক শক্তি কাজ করে। তার ফলে তিনি যে-কোনো প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে পারেন। উল্লিখিত দুইটি নাথ-গীতিকায় এবং আমাদের আলোচিত আন্তোনিয়ো পালাগানে নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, তত্ত্বকথার অবতারণা এবং অলৌকিকতার প্রাচুর্য তাদের সাহিত্যগুণকে কিছুটা নিষ্প্রভ করেছে। তবুও ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'গোরক্ষ বিজয়' সম্পর্কে বলেছেন,

> কাহিনীটির প্রধান গুণ ইহার মানবিক আবেদন, এই গুণেই ইহা ধর্মীয় বা সম্প্রদায়িক সাহিত্যের অর্ন্তভুক্ত না হইয়া লোকসাহিত্যের অর্ন্তভুক্ত হইতে পারিয়াছে। ইহার মধ্যে সাধন-ভজন ও সাধক-সিদ্ধার কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহা মূল কাহিনীর স্বাভাবিক গতিপথ রোধ করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ ইহার প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন নাথধর্মের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের কীর্তন থাকিলেও মানব জীবনের একটি চিরন্তন দুর্বলতার কথাও প্রচার করা হইয়াছে।[৮]

আমরা বলতে পারি যে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য 'গোরক্ষ বিজয়' সম্পর্কে যতটা প্রণিধানযোগ্য, সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের বেলায়ও ঠিক ততটাই প্রযোজ্য। গোরক্ষ নাথের মানবিক দুর্বলতার মত সাধু আন্তোনিয়ো আক্রান্ত না হলেও প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করা বা প্রতিহত করার জন্য তিনি যেন সব সময় খড়্গহস্ত।

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
৭. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, পৃ. ৪১৩

নাথ-গীতিকার দ্বিতীয় ভাগে জলন্ধরি পাদের শিষ্য রাণী ময়নামতীর আদেশে তাঁর তরুণপুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের বিবাহোত্তর সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনি অবলম্বন করে অন্যান্য যে সমস্ত গীতিকা প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর মধ্যে জর্জ গ্রীর্য়াসন সংগৃহীত 'মানিকচন্দ্রের রাজার গান', সুকুর মামুদ রচিত 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস', ভবানী দাস রচিত 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' এবং মৌখিক সংগ্রহের বেশ কিছু 'গোপীচন্দ্রের গান', বা 'গোপীচন্দ্রের গীত'– ইত্যাদি প্রধান। এইসব গীতিকারও নানা পালাগানের রচনাকার বা গায়েন হিসাবে গানের পরিবেশনে রয়েছেন। তবে তাঁদের নাম অনেক সময় রচনাকার বা গায়ক বলে ভ্রম হতে পারে।

'গোপীচন্দ্রের গান' আসরে গাওয়া হত। 'গোরক্ষ বিজয়' এর চেয়ে 'গোপীচন্দ্রের গান' আরও বেশি জনপ্রিয় ছিল। তার কারণ, এই গানের মধ্যে মানবিক আবেদন ছিল অনেক বেশি। তবে 'গোপীচন্দ্রের গান' আদতে কোন পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত সেটা সঠিকভাবে নির্ণিত হয়নি। কেননা এই গান সত্যিকার ভাবে গীতিকা না ইতিকথা সেই বিষয়ে পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। তবে শ্রী বরুণকুমার চক্রবর্তী কোনো পক্ষে না গিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে বলেছেন, "গোপীচন্দ্রের গানে যেমন ইতিকথার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে, তেমনি গীতিকারও কিছু বৈশিষ্ট্য এতে লভ্য।"[৯] ইতিকথায় কিছু তথ্য, কিছু সত্য ও কিছু ইতিহাস থাকে। সেই বিচারে গোপীচন্দ্রের গানের নায়ক গোপীচন্দ্রকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। আবার শ্রদ্ধার বশে তাঁকে অতিমানবরূপেও চিত্রিত করা হয়েছে। অবশ্য ইতিকথায় দেবতাদের একটা ভূমিকা থাকে। এই গীতিকার চরিত্রগুলির মধ্যে গোপীচন্দ্রের জননী এবং হাড়িপার মধ্যে ঐশরিক শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। আবার আমরা দেখি যে, নায়ক চরিত্রে দেবত্ব আরোপ করা না হলেও তিনি বার বছর সন্ন্যাসধর্ম পালন করার ফলে তাঁর মধ্যে দেবোপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

তবে একথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, পালাগান বা গীতিকা হচ্ছে কাহিনিনির্ভর লোকসঙ্গীত। সেই বিচারে গোপীচন্দ্রের গান গীতিকা বলেই গৃহীত। একইভাবে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে দেবতার ভূমিকা রয়েছে। দেবতা অনেক সময় স্বর্গ থেকে পৃথিবীর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আবার মাঝে মাঝে তিনি মর্ত্যে নেমে আসেন মানুষের বা ভক্তের "মন বুঝিবারে"। পালাগানে আইন্তন নায়ক চরিত্র হিসেবে প্রতিভাত। তিনি দেবতা নন, তবে দেবতার "প্রধান সেবক"। তিনি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহভাজন। এই পালাগানেও ইতিকথার কিছু লক্ষণ দেখা যায়। তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বীকার করতেই হয়, আন্তোনিয়োর জীবনীভিত্তিক এই পালাগানও ইতিকথা পদবাচ্য হতে পারে না।

---

৯. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*, পৃ ১৪৫

গীতিকা মাত্রই সুরে গাওয়া হয়। গোপীচন্দ্রের গানের সঙ্গে যে বন্দনা যুক্ত হয়েছে সেটাই তার গীত হওয়ার উদ্দেশ্যকে প্রকট করে। আমরা এই গানের একটিতে লক্ষ্য করি যে ধর্মঠাকুরের বন্দনা করে দুর্লভ মল্লিক তাঁর 'ময়নামতী-হাড়িপা-গোবিন্দচন্দ্র' কাহিনি শুরু করেছেন। সেই পালাগানে আমরা দেখি–

> প্রথমে বন্দিলাম ধর্ম আদ্যের গোসাঞী
> যার অগোচরে কিছু ত্রিভুবনে নাঞী।[১০]

আন্তোনিয়ো পালাগানেও আমরা অনুরূপ বন্দনা পাই। অবশ্য পূর্ববঙ্গ গীতিকার সঙ্গে আন্তোনিয়ো পালাগানের সাদৃশ্যপূর্ণ বন্দনা নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াসী হয়েছি। আন্তোনিয়ো পালাগানের বন্দনায় দেখি যে, পালাকার প্রথমে ঈশ্বরের বন্দনা গাইছেন, কেননা ঈশ্বর এই বিশ্বভুবনে তাঁর স্থায়ী আবাস গড়েছেন। পরম প্রেমময় পিতা-ঈশ্বরের জয়গান পালাগানে আমরা শুনি– "পরথমে বন্দিয়া গামু প্রভু নিরাঞ্জন,/ তাহার ঠিকানা আমার এই যে ভুবন।[১১]

গোপীচন্দ্রের কাহিনিতে আমরা দেখি যে রাজা মাণিকচন্দ্রের রাজ্যে প্রজারা সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু প্রজাদের এই স্বচ্ছলতা নতুন দেওয়ানের কুচক্রে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায়। এমন কি ফকির-দরবেশও রেহাই পেলেন না এই দৈন্যদশা থেকে। তাঁদের সব বিক্রি করে রাজস্ব মেটাতে হল। রাজ্যে চরম আর্থিক অনটন দেখা দিল। গানে বলা হয়েছে, "সুখিত রাইয়ত প্রজা দুঃখিত হইল।" ঠিক একইভাবে আমরা দেখি যে, আন্তোনিয়োর পালার মধ্যেও শয়তানের কুচক্রে ফ্রান্সিস ভক্তের রাজ্যে প্রজাদের দুঃখের সীমা থাকে না। সবার জীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে আসে। পালাগানে আমরা শুনি–

> কি প্রকারে করুম রায়তী এই শহরের মাঝে,
> বারো বচ্ছর মেঘ নাই এই শহরের মাঝে।
> যেই শস্য বুনি আমরা জমিনের মাঝে,
> রইদ্দের তাপে সেই শস্য জ্বইলা যায় তারে।
> খুইট্যা খাইবার লোক তো নাই আপনাদের ঘরে,
> বিদায় পাইলে যাইতাম আমরা আর কোন শহরে।[১২]

গোপীচন্দ্রের গানে গোপীচন্দ্র স্বেচ্ছায় নয়, মায়ের ইচ্ছায় এবং একরকম পীড়াপীড়ির ফলেই সন্ন্যাস নিতে রাজি হন। তাঁর মায়ের অনেক প্রচেষ্টার পর ব্রহ্মজ্ঞান পেয়ে যখন গোপীচন্দ্রের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হয়। তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে এই পৃথিবীর সবই মায়া। গীতিকায় কবি বলেছেন,

> সংসার জলের বিন্দু সব মিছা মায়া
> এ তিন ভুবন দেখ আপনার কায়া।[১৩]

---

১০. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২
১১. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১
১৩. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

একইভাবে আইন্তনকে যখন পরমপিতা পৃথিবীতে গিয়ে ফ্রান্সিস ভক্তের ঘরে জন্ম নিতে বলেছেন, তখনও তিনি সেখানে যেতে চাননি। একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আইন্তনের মনে হয়েছে, “কলির ভবে সুখ নাই”। তারপরই তিনি বলছেন–

ঐ যে দুইনায় গেলে ধরব মোরে পিতা,
দুইনার মায়াজালে রে, কলির ভবের সাধ নাই রে।[১৪]

সংসার অনিত্য ভেবে গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস নিলেও তাঁর মধ্যে ভোগহীন ত্যাগময় জীবনের প্রতীতি জাগেনি। তারপরেও তিনি আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব এবং তথাকথিত কাছের মানুষ যে প্রয়োজনে কেউ কারও নয়, এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি তাই মায়ের সামনে বলেছেন–

ইষ্টমিত্র বন্ধু বান্ধব সব মিছা কায়
কাষ্ঠের পুত্তলা যেন বাদিয়া নাচায়।[১৫]

অন্যদিকে আইন্তন “মিছা দুইনার মাঝে” না যাবার কারণ দেখিয়ে বলেন–

ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ কইরা পন্থে দিব কাঁটা,
সবার মইদ্যে গেলে যমে ধরবে বাপের বেটা।[১৬]

কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে শ্রী অক্ষয়কুমার কয়াল সংগ্রহীত ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনির একটু রূপান্তরিত এবং খণ্ডিত পাঁচালির পরিচয় দিয়েছেন ড. সুকুমার সেন। এই কাহিনি দুর্লভ মল্লিকের বর্ণনার মতো হলেও তার মধ্যে একটু নবীনত্ব আছে। সেখানে এক জায়গায় বলা হয়েছে– “তোমার বরেতে হউক একটি ছায়াল,/ তবে ভিক্ষে মাগি খাব শুন সমাচার।[১৭] একইভাবে আন্তোনিয়ো পালাগানে আইন্তনের পিতামাতা নানা দুঃখ ও তপস্যার শেষে সুখ-শান্তির মুখ দেখলেন। তবে তাঁদের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি সন্তানহীনতার জন্য। সন্তানহীন নারীর বেদনা ভেরনিকা বিবির কথায় ও আচরণে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাই ভেরনিকা বিবি কাতর অনুনয় করে পরমপিতা পরমেশ্বরকে বলেছেন–

যেমন তেমন একটা পুত্র যদি হইত আমাগো ঘরে,
না খাইতাম পুত্রের কামাই দেখিতাম নয়নে;
পুত্রের উছিলায় ধন বাঁচিতাম ভুবনে।[১৮]

সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে রাজস্থানী-মিশ্রিত পশ্চিমা হিন্দী ভাষায় কবি লছমন বা লক্ষণ বিরচিত ‘গোপীচন্দলীলা’ নামে গোপীচন্দ্র-ময়নামতী কাহিনি বিষয়ক একটি কাব্যের পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে জলন্ধরি গুরু গোপীচন্দ্রকে অমর বর দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র তাঁকে ছেড়ে যেতে চান না। তিনি গুরুর সঙ্গ নিতে চান এবং তাঁর বাকি জীবন কাটাতে চান। তাঁর এই অভীপ্সার কথা জেনে গুরু বলেন,

---

১৪. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
১৫. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬
১৬. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
১৭. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫
১৮. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

রাজপাট দিয়ে ছোড় চরণ তুমহরে চিত্ত দীনা,
চেলা করি লো মোহিঁ ফিরূঁ মৈ জগমে হীনা।[১৯]

আন্তোনিয়ো পালাগানে আইন্তনের মহিমা, নিঃশর্ত ক্ষমা এবং পরম প্রেমের পরিচয় পাবার পর কেশব ভক্ত, উপরান রাজা, মুর্দা লোক, প্রমুখ আইন্তনের সঙ্গ নিতে চায়। তারা তাদের নতুন জীবনের কাণ্ডারী হিসেবে আইন্তকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করে। তাদের প্রত্যেকেই ঐকান্তিক আস্থা নিয়ে বলে,

তুমি আমার নায়েব গুরু, আমি তোমার দাস,
তোমার পাছে হমু সেবক ছাইড়া দিমু বাস।
তোমার পাছে হমু সেবক যা থাকে কপালে,
আর যদি কিছু বল ধর্মের দোহাই লাগে।[২০]

একইভাবে দুই জেলে যখন আইন্তনের আশীর্বাদ পেয়ে অনেক ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়, তখন তারাও আইন্তনের অনুসারী হবার কথা ব্যক্ত করে। তখন তারা ঠাকুরের কাছে কাছে শপথ করে বলে–

এই অবধি রাইজ্যপাট ছাইড়া দিলাম তারে,
ঘরে আছে পিতামাতা বিদায় করুম তারে।
ঘরে আছে স্ত্রী-পুত্র বিদায় করুম তারে,
সেবক হইয়া যামু দুই ভাই যা থাকে কপালে।[২১]

ময়মনসিংহ গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান

ময়মনসিংহ গীতিকাগুলির মৌল উপজীব্য বিষয়গত দিক থেকে নরনারীর প্রণয়-ভাবনা আর সুরের দিক থেকে সঙ্গীতময়তা। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার পূর্বভাগ বিশেষ করে কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা মহকুমা থেকে এই গীতিকাগুলি ড. দীনেশচন্দ্র সেনের ঐকান্তিক আগ্রহে সংগ্রহ করা হয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করা হয়। তাঁর সম্পাদনার আগে শিক্ষিত তথা পণ্ডিতমহলে এই গীতিকা নিয়ে তেমন কোনো কৌতূহল দেখা যায়নি। আগেই বলেছি ময়মনসিংহ গীতিকাগুলির প্রধান বিষয় হচ্ছে মানব-মানবীর প্রেম-প্রণয় কাহিনি। আবার সাধু আন্তোনিয়ো পালার মুখ্য উপজীব্য সাধু আন্তোনিয়োর অলৌকিক জীবন। এখানে পালাগানের নির্মোকে সাধু আন্তোনিয়োর সাধন-কর্মসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। তবে ময়মনসিংহ গীতিকার সঙ্গে তার বিষয়গত মিল না থাকলেও পালাগানের পরিবেশন রীতির দিক থেকে এবং রূপগত বৈশিষ্ট্যের আঙ্গিক থেকে কিছু মিল সহজেই চোখে পড়ে। নিশ্চয়ই কোনো একটি ধারা অন্য ধারা থেকে প্রভাবিত হয়েছে। এবারে আমরা এই দুই ধারার পালাগানের তুলনামূলক আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি।

১৯. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫
২০. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

বন্দনা: ময়মনসিংহ গীতিকা ও আন্তোনিয়ো পালাগান

পূর্ববঙ্গ থেকে অসংখ্য পালাগান সংগৃহীত হয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় প্রতিটি পালায়ই দেবদেবী বন্দনা আছে। এইসব পালাগানে দেবদেবীর লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়নি, বরং রক্ত মাংসের মানুষের কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। বিশেষভাবে এই সমস্ত পালাগানে নর-নারীর প্রেম তথা প্রণয়লীলাই প্রাধান্য পেয়েছে। পালাগান রচয়িতাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই ছিলেন। তেমনি পালাগানের শ্রোতাদের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই থাকতেন। তাঁরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পালাগানের রস-মাধুরী পান করতেন। তাই সেইসব পালাগানের বন্দনা অংশে আমরা একটি অসম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন ঘটতে দেখি। 'মহুয়া পালা'র বন্দনায় দ্বিজ কানাই বলছেন,

> উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাশ পরবত।
> যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর মালামের পাথথর ॥
> পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন স্থান।
> উরদিশে বাড়াই ছেলাম মমিন মুসলমান ॥[২২]

তেমনিভাবে 'পীর বাতাসীর পালা'য় কবি রজনী গোপাল বন্দনা অংশে পালাগনের আসরে উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর শ্রোতাকেই বন্দনা করার সঙ্গে সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রগুলির বন্দনা করেছেন,

> সভাজনে বন্দুম রে ভাই হেন্দু-মোছলমান।
> বন্দুম পার ছায়েব গাজী রে।
> মক্কা মদিনা বন্দুলাম মুঁই কাশী গয়া খান ॥[২৩]

অবশ্য আন্তোনিয়ো পালাগানের বন্দনা অংশে অসম্প্রদায়িক চেতনার সুর তেমনভাবে শোনা না গেলেও অন্যত্র তার অনুরণন শোনা যায়। যেহেতু সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান মূলতঃ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত, সেহেতু তার মধ্যে খ্রিষ্টধর্মালম্বী ও খ্রিষ্টীয় প্রেক্ষাপটই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই পালার শুরুতেই আমরা শুনি খ্রিষ্টবন্দনা ধুয়া বা ধ্রুবপদের মতো প্রতিটি বন্দনার পরই গাওয়া হয়। গায়ক যখন গেয়ে ওঠেন–

> আমি পরথমে বন্দিয়্যা গামু যীজুসের চরণে,
> আমার ঠাকুরের চরণে গো, যীজুসের চরণে।[২৪]

তখন আমাদের আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই বন্দনা গানের মাধ্যমে মানব মুক্তিদাতা যিশু-খ্রিষ্টের মহিমা-ই প্রকট হয়ে ওঠে। ভগবান যিশুর অলৌকিক জীবনের অনুধ্যান করে যে গায়ক এবং শ্রোতাসকল তাঁর ঐশরিক প্রসাদ পাবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন সেই আকুতি গোপন থাকে না। তাই গায়কের কণ্ঠে আমরা শুনি–

> পরথমে বন্দিয়া গামু আমরা প্রভু নিরাঞ্জন,
> তাহার ঠিকানা আমার এই যে ভুবন।[২৫]

---

২২. সুখময় ভট্টাচার্য (সম্পা.), *ময়মনসিংহ গীতিকা*, পৃ. ৪২
২৩. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, (সম্পা.), *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯
২৪. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
২৫. প্রাগুক্ত

অতপর রয়েছে স্বর্গীয় পিতা পরমেশ্বরের বন্দনা। এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তিনি যে তাঁর পবিত্র প্রেমের আশিসধারায় আমাদের নিয়তই সিক্ত করেন সেকথা বলার পর কবি খ্রিষ্টজননী কুমারী মারিয়ার চরণে প্রণতি জানান। তারপর স্বর্গের দেবগণের বন্দনা গাওয়ার পর ভূমিষ্ট হয়ে শ্রোতাদেরও প্রণাম জানান। এছাড়াও পিতামাতা, ওস্তাদ প্রমুখের বন্দনায় মুখর গায়ক উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন–

> পিতার পদ বন্দিয়া গামু আমরা করিয়া মিনতি,
> মা কুমারীর চরণে আমরা হইয়্যা যাব নতি ।
> স্বর্গেতে বন্দিয়া গামু আমরা স্বর্গের দেবগণে,
> ভূমিষ্ঠে বন্দিয়া গামু যত শ্রোতাগণে।
> তারপরে বন্দিয়া গামু আমরা পিতামাতার চরণ,
> যাহার গর্ভে জন্ম লইয়া দেখিলাম ভুবন।
>
> ওস্তাদের চরণে আমরা বইন্দা গামু মাঠে,
> সবার মধ্যে যে গুরু মন্দিরা দিছে হাতে।
> ..   ..
> দীক্ষাগুরু বন্দিয়া গামু শিক্ষাগুরুর ভায়,
> হস্তে ধইরা যেই গুরু শিখাইছে ডাইন বায়।[২৬]

'মদনকুমার ও মধুমালা পালা'র মধ্যে যেমন আছে দেব-দেবীর বন্দনা, তেমনি মা-বাবা, সভায় উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী, ওস্তাদের চরণ বন্দনায় কবি বলেন–

> পরথমে বন্দিয়া গাইলাম আদি নিরাঞ্জন।
> স্বর্গ মর্ত্ত্য বন্দিয়া গাইলাম যত দেবজন ॥
> মাও বন্দুম বাপ বন্দুম যত সভাজন।
> মিন্নতি করিয়্যা বন্দি ওস্তাদের চরণ ॥[২৭]

যাঁরা পালাগানের গায়েন তাঁদের অনেকেরই তথাকথিত বিদ্যা বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এক ধরনের অশিক্ষিত পটুত্ব আছে। ফলে নিজেদের আত্মজ্ঞান অনেক সময় তাঁদের অহমিকাশূন্য মানুষে পরিণত করে। তাই তাঁরা নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি জাহির করার কোনো রকম চেষ্টা করেন না। তাঁরা বলেন–

> সভাতে বন্দিয়া গামু সভার পঞ্চ ভাই,
> অতি মূর্খ জাইন্যা মোরে সভায় নিবেন ঠাই।
> একে একে পঞ্চ গুরু দেখি বিদ্যমান,
> কোন গুরু ভজিলে খণ্ডে হইবা পার।[২৮]

একই রকম বিনয়ভাব পরিলক্ষিত হয় 'কাজল রেখা পালা'য়। কবি অকপটে স্বীকার করছেন তাঁর সংকীর্ণ মানসিকতা, সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং দূরাচার মনোভাবের কথা,

২৬. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
২৭. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা.) *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৭
২৮. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

অল্পমুতি অল্পজ্ঞনী মুই দূরাচার।
এই সভায় গান গাইতে কি শক্তি আমার ॥
উস্তাদের চরণে আমার শতেক পন্নাম।
এক মনে সভাজন কর অবধান ॥[২৯]

একইভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ তাঁর 'লীলা কন্যা-কবি কঙ্ক পালা'য় নিজের অজ্ঞানতার কথা মেনে নিয়ে উচ্চারণ করেছেন,

না আছে কবিত্ব মোর না আছে বিদ্যা জ্ঞান।
সভাজন কর দয়া আমি তো অজ্ঞান ॥
সর্বশেষে বন্দি আমি শ্রীগুরু চরণ।
যাহার কৃপায় পর্বত লঙ্ঘে পঙ্গু জন ॥[৩০]

পিতামাতার বন্দনা করার সঙ্গে সঙ্গে গায়ক তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাইদের বন্দনা করেন। তবে তিনি নিশ্চিত যে গুরু ভাজনার চেয়ে মহত্তর আর কিছুই নেই। সাধক আন্তোনিয়ো পালাগানে গাওয়া হয়–

পিতা গুরু মাতা গুরু, গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই,
ইহার চেয়ে অধিক গুরু ভজিলে সে পাই।[৩১]

আশ্চর্যজনকভাবে আমরা ঠিক একই সুর শুনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 'লীলা কন্যা-কবিকঙ্কন পালা'য় কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ বন্দনা গেয়েছেন এইভাবে–

পিতা বন্দুম, মাতা বন্দুম, বন্দুম জ্যেষ্ঠ ভাই।
যান হইতে সুহৃদ এই ভুবনে নাই ॥[৩২]

খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস মতে খ্রিষ্টজননী কুমারী মারিয়া ভক্তেরও মা জননী। তিনি পিতা পরমেশ্বর এবং তাঁর পুত্র যিশুর কাছ থেকে ভক্তের জন্য প্রসাদ, করুণা এবং বরাভয় এনে দেন। পালাগানের ক্ষেত্রেও গায়েন তাঁর গান যাতে সুষ্ঠ এবং সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য মায়ের কাছে আবেদন জানান। মায়ের কাছে তাঁর সব আবদার–

আমি যদি লজ্জা পাই মা লজ্জা পাইবা তুমি,
তোমারই গান তুমি গাইবা মাগো উপলক্ষ আমি।
আইস মাগো মা কুমারী নাইমা দেও সাই বর,
গায়ে দিও জোর বল মা গলায় মধুর স্বর।[৩৩]

কুমারী মারিয়ার বন্দনার পাশাপাশি আমরা যখন 'কমলা পালা'র সরস্বতী আবাহন শুনি, তখন বুঝতে আর দেরী হয় না যে দেবী ভারতীর আশীর্বাদে এবং সানুগ্রহ উপস্থিতিতে গানের অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করবে। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের কুমারী

---

২৯. দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
৩০. সুখময় ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
৩১. দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
৩২. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৩৩. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

মারিয়া আর ময়মনসিংহ গীতিকার বাগ্দেবী সরস্বতী যেন সমার্থক। কাব্যভাষার মিল এবং ভাব প্রকাশের গভীরতা ও আন্তরিকতা পালাগানগুলিকে অমরত্ব দিয়েছে। কবি বলছেন–

আইস মাগো স্বরস্বতী তোমার গুণ গাই।
তোমার গান গাইতে আমি অমৃত মধু পাই ॥
তুমি হও মা তালযন্ত্র আমি বাইদ্যকর।
আজিকার আসরে মোর কণ্ঠে কর ভর ॥[৩৪]

কিংবা 'কঙ্ক ও লীলা পালা'র বন্দনায় কবি দেবী সরস্বতীকে কণ্ঠে ভর করে এবং জিহ্বাতে বসে গান গাইবার অনুরোধ জানাচ্ছেন,

ভালমন্দ নাহি জানি না চিনি আখর।
সরস্বতী মাগো মোর কণ্ঠে কর ভর ॥
জিহ্বাতে বসিয়া মোর তুমি গাও গান।
তোমার চরণে মাগো সহস্র প্রণাম ॥[৩৫]

সরস্বতী বন্দনায় হিন্দু কবিগণ অকুণ্ঠচিত্ত। জ্ঞান-বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে তাঁদের প্রণাম করতেই হয়। পালাগান করা অনেকের কাছে সম্মানের ব্যাপার। পালাগানের আসরকে তাই কবির মনে হয় 'দেবের আসর'। কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 'লীলা কন্যা-কবি কঙ্ক পালা'য় সরস্বতীর বন্দনা করে গেয়েছেন,

সরস্বতী মায়েরে বন্দি জুইড়্যা দুই কর।
যার দয়ায় পাইলাম এই দেবের আসর ॥
তুমি যদি ছাড় মাগো আমি না ছাড়িব।
বাজন্ত নূপুর হয়্যা চরণে লুটিব ॥[৩৬]

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান অথচ সাধু আন্তোনিয়োর বন্দনা থাকবে না এমন হতে পারে না। মা-মারিয়ার চরণে প্রণাম জানাবার পর গায়েন পালাগানের আরাধ্য সাধু আন্তোনিয়োর বন্দনা গান করেন। ভাওয়াল এলাকার খ্রিষ্টানদের মধ্যে, এমনকি গায়েন-বায়েনদের মধ্যে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান 'ঠাকুরের গান' বা ঠাকুরের গীত' বলে সমধিক পরিচিত। তেমনিভাবে সাধু আন্তোনিয়োও ভক্তদের কাছে 'ঠাকুর' হিসেবেই পরিগণিত। অতএব ঠাকুরের প্রতি যে গায়েনের অগাধ বিশ্বাস থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন তা কতই-না সুনিশ্চিত। সেই শ্রদ্ধারই পরিচয় পাই তাঁর গানে,

জানিবা না জানি গীত লইলাম বান্দিয়া,
এই গীত গাইব আমার ঠাকুর আসিয়া।
গায়েন বায়েন তোমরা শুইনা লও সাই বর,
হাতে লইও তারযন্ত্র গলায় মধুর স্বর।[৩৭]

---

৩৪. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
৩৫. দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
৩৬. সুখময় ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৩৭. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

ময়মনসিংহ গীতিকার বন্দনার সঙ্গে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের বন্দনার অনেক মিল পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গ গীতিকার নানা পালায় আমরা দেখি যে লোক-কবিগণ প্রথমেই দেবতার বন্দনা দিয়ে গান শুরু করেন। তারপর নানা অবতার এবং লৌকিক দেব-দেবীর চরণে তাঁদের বিনম্র প্রণাম জ্ঞাপন করেন। অনেক সময় যিনি পালাগান রচনা করেন তিনিই এই গান পরিবেশন করেন। আবার ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায় পালাগানের রচয়িতা এবং গায়েন আলাদা ব্যক্তি। সেই ক্ষেত্রে পালাগানের বন্দনায় সমান্য হেরফের দেখা যায়। রচয়িতার বন্দনা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করেও গায়েন তাঁর পছন্দমতো বন্দনা বানিয়ে গান পরিবেশন করেন।

তবে গায়েনদের মধ্যে একটা উদার অসাম্প্রদায়িক চেতনা গভীরভাবে কাজ করেছে। তাই তাঁদের কাছে ঈশ্বর, ভগবান, খোদা, আল্লা, যিশু, মুহম্মদ– সবাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করেন। গানের প্রয়োজনে তাঁরা মক্কা, মদিনা, গয়া, কাশী, জেরুসালেম– সব জায়গায় যেতে পারেন। আবার পিতামাতা, গুরুদেব, সভার জ্ঞানী-গুণীজন– সবাইকে তাঁরা নতমস্তকে প্রণাম জানাবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির জয়গানে মুখর হন। বিশ্ব-জগতের সবার সঙ্গে, সবকিছুর সঙ্গে তাঁদের এই একাত্মবোধ, সেটাই পালাগানের মাহাত্ম্য সূচিত করে। তাঁরা সবাই পরিপূর্ণ জীবনের অন্বেষণে নিবেদতিপ্রাণ সাধক।

প্রেক্ষাপট বর্ণনা: ময়মনসিংহ গীতিকা ও আন্তোনিয়ো পালাগান

ময়মনসিংহ গীতিকা মানব-মানবীর প্রেম ও ভাবাবেগ বিষয়ক পালাগান। অন্যদিকে সাধু আন্তোনিয়ো পালা হচ্ছে ধর্মের আধারে পরিবেশিত এক সাধক পুরুষের দিব্যজীবন ও ঐশানুভূতির শৈল্পিক বর্ণনা। তাই বিষয়গত দিক থেকে ময়মনসিংহ গীতিকার সঙ্গে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের কোনো মিল দেখা যায় না। তবে কাহিনির বর্ণনায় যে পারিপার্শ্বিকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তাতে উভয় ধারার পালাগানেই কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ময়মনসিংহ গীতিকার 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা'য় অলৌকিকতার প্রলেপ থাকলেও তার মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে। সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিস্তারিত বিবরণে পালাটি সমৃদ্ধ। নৌকা এবং নৌ-যাত্রার নানা বর্ণনা এবং অনুষঙ্গের উল্লেখ আছে এখানে। আমির সাধু নিজেকে নিছক কৃষক বা মৎসশিকারী বলে মেনে নিতে পারে না; বরং সে নিজেকে সওদাগরের সন্তান বলে ভাবতে গর্ববোধ করে। বাণিজ্যে যে লক্ষ্মীর বাস, সেই সত্যটি সে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারে না।

'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা'র কাহিনি ও ঘটনা পরম্পরায় আমরা দেখি যে, আমির সাধুর জীবন নানা অনিশ্চিয়তায় ভরা। সমস্যা আর সংগ্রাম ছাড়া তার জীবন যেন অর্থহীন। রহস্যে ভরা সমুদ্র তাকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাই সে বলে, "মুল্লুকে মুল্লুকে যাইব কইত্তে সদাইগরী"। আর তার সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য নানা সময়ে বিভিন্ন ধরনের বিপদসঙ্কুল যাত্রায় সে নৌকায় করেই যাবার পক্ষপাতী। তাই পালাগানে মাঝিমল্লা সহযোগে তার নৌ-যাত্রার আয়োজনে দেখা যায়,

খালাসি টেন্ডল সবে লইল রে সাজি।
দড় দেখি ছুয়াল লইল গৌরলধর মাঝি ॥[৩৮]

মাঝি মাল্লাদের সর্দার 'খালাসি টেন্ডল' নামে পরিচিত ছিল। নৌকা এবং জাহাজের হাল বাঁধার জন্য যে দড়ি ব্যবহৃত হত তাকে বলা হত 'ছুয়ান'। সমুদ্র যাত্রার বিবরণে বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়,

হু হু করিয়া ছুটে ডিঙা পালত পইড়ল টান।
পরিচয় ন রইল যাইছে ভান্ডি কি উজান ॥
এক ঢেউয়ে উড়ে রে ডিঙা আকাশ বরাবর।
আর ঢেউয়ে যায় রে ডিঙা পাতালর ভিতর ॥[৩৯]

সমুদ্রে যাবার সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথাও বলা হয়েছে আলোচ্য পালাগানে। ঝড়ের দাপটে নৌকায় যারা ছিল তাদের প্রায় সবার অবস্থা খুব খারাপ হয়। প্রচণ্ড ঢেউয়ের তোড়ে সবাই কখন যে জলের নীচে ডুবে যায় তার ইয়ত্তা নেই। এই সামুদ্রিক ঝড়ের মধ্যে দিয়ে মানুষেরা এগিয়ে চলা এবং প্রকৃতির নিষ্ঠুরতাকে সহ্য করা আলোচ্য পালাগানে ভিন্ন মাত্রা লাভ করে।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানেও নৌ-যাত্রা ও নৌকাযোগে ব্যবসা-বাণিজ্য করার প্রসঙ্গ অহরহ উত্থাপন করা হয়েছে। আইন্তন যেন একজন তীর্থযাত্রী। সবসময় নতুন সেবকের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো এবং গান করাই তাঁর প্রধান কাজ। তাই তিনি প্রায়ই নদীপথে যাতায়াত করেন। নদীর তীরে তিনি ভক্তদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। নদীর মধ্যে খেয়া পারাপারের জন্য তিনি সদরের আদেশ নিয়ে আসেন। আবার পালাগানে আমরা দেখি সওদাগরের চরিত্র। এমনকি স্বর্গের দূতও পরম পিতার আদেশে সওদাগরের বেশ ধরে ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন "শানের বান্দাইল ঘাটে"। এছাড়া আরও এক সওদাগর তার দুই ছেলেকে দূরদেশে উরগই শহরে বাণিজ্য করতে পাঠায়,

সদাগরে বলছে দুইটি ছেইল্যা বলিগো তোমাদের,
আমি চাই যে যাও গো তোমরা বাণিজ করিবারে।[৪০]

পিতার কথা শুনে তার দুই ছেলে বাণিজ্যে যাবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তাদের ঘর ছেড়ে যাবার আগ্রহ বা ইচ্ছা না থাকলেও তারা পিতার আদেশ অমান্য করতে পারে না। তারা মাঝি-মাল্লাদের নির্দেশ দিয়ে বলে–

ডিঙা সাজন কর তোমরা কালিদহ সায়রে,
আমরা দুইভাই যামু এখন বাণিজ করিবারে।[৪১]

যাত্রার সমস্ত আয়োজন যখন শেষ হল তখন তারা–

পিতা ধর্মের নামটি লইয়া ডিঙা দিল ছাইরা,
সাতদিন যাবত করল নাওয়া কালিদহ সায়রে।[৪২]

---

৩৮. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
৪০. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

সাতদিন যাবার পর আবার "ডিঙা বাইয়া দিল তারা ডাইনের গাঙের মাঝে"। এখানেও তারা "সাতদিন করল নাওয়া"। অবশেষে তারা গিয়ে পৌঁছল উরগই শহরে। বাণিজ্য করতে তারা কিন্তু খালি হাতে যায়নি; তাদের সঙ্গে ছিল নানা অস্ত্রশস্ত্র। তাই উরগই শহরে ডিঙা নোঙর করার পর "যত ছিল কামান বন্দুক সবই খালাস করিল"। এইভাবে বার বছর বাণিজ্য করার পর তারা দেশে ফিরে যাবার সঙ্কল্প করে। পালাগানে বলা হয়েছে–

> সদাগরে বলছে দারিমাঝি দারিমাঝি বলি গো তোমারে,
> বারো বছর করলাম বাণিজ্য উরগই শহরে।
> ধনকড়ি দিয়া ডিঙা বোঝাই করলাম তারে,
> আমরা চইলা যামু এখন আপনারই ঘরে।[৪৩]

ময়মনসিংহ গীতিকার আমির সাধু সওদাগর। বাণিজ্য করাই তার কাজ, উপার্জন। ব্যবসা করতে তাই সে উজানী নগরে যায়। তার নৌকা এসে ভিড়ে মছিলি বন্দরে। সে অনেক ধন উপার্জন করে এই বাণিজ্য থেকে। ভোলা সওদাগরও বাণিজ্য করতে মাছিলি বন্দরে যাত্রা করেছিল। এখান থেকেই সে শাফলা বন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছে। আন্তোনিয়োর পালায় সওদাগর পুত্র যায় উরগই শহরে। আমির সাধু নৌকা যায় মছিলি বন্দরে। বার বছর ব্যবসা করার পর ধনকড়ি দিয়ে নৌকা বোঝাই করে আন্তোনিয়োর গানের সওদাগর দেশে ফেরে। একইভাবে ময়মনসিংহ গীতিকার 'আসমানতারা পালা'য় রয়েছে এক সওদাগর। তার নাম হাচান বা হাসান সওদাগর। তার বিষয়ে আমরা শুনি–

> বুদ্ধিমন্ত মানুষ অইলো হাচান সদাগর।
> বাণিজ্য কইর্য্যা আনে রত্তন বহুতর ॥[৪৪]

আন্তোনিয়োর পালায় প্রথমে সাতদিন পরে আরও সাতদিন ডিঙা নিয়ে যাত্রা করার পর তাদের গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। চলতে পথে তারা অনেক দেশগ্রাম পার হয়ে যায়। তেমনিভাবে আমরা দেখি 'ক্যাশবতী কইন্যা' পালায় সওদাগর,

> বাইয়্যা চলে ডিঙ্গি নাও দিনে রাইত্তে ধইর্য্যা।
> কতনা দ্যাশ পার হইয়্যা পৌঁছাইলো লরণ দ্যাশে গিয়া ॥[৪৫]

'কমল সদাইগরের পালা'য় দেখা যায় কমল সওদাগর কাঁইচ্যা নদীর তীরে বাসন্তী নগরে বসবাস করে। সে একজন বিত্তশালী সওদাগর। ব্যবসা-বাণিজ্য করে সে প্রভূত সম্পদের মালিক হয়। এছাড়াও আরও অনেকগুলি পালায় সওদাগর চরিত্র ও নৌ-যাত্রা এবং বাণিজ্যের প্রসঙ্গ আছে। উদাহরণ স্বরূপ 'হরিণকুমার-জিরালনী কন্যার পালা'য় মুক্তা ব্যবসায়ী এক সওদাগর পুত্রের কাহিনি আছে। জলপথে যাত্রার সময় একদিন তার ডিঙা ডুবে যায়। সে সর্বস্ব হারিয়ে ঘরে ফিরে আনে। একইভাবে আমরা দেখি, 'সন্নমালার পালা'য় আছে আরেক সওদাগরের কাহিনি। সেখানেও সওদাগর বেশ ঘটা সহকারে তার যাত্রার আয়োজন

---

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৪৪. চিত্তরঞ্জন দেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

করে। অসীম সাহসিকতার মধ্যে সমস্ত বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যেও নৌকা এগিয়ে চলে। সওদাগরের নৌকার বর্ণনা দিতে গিয়ে পালাকার বলেছেন–

> বাও নাই বাতাস নাই ডিঙায় পাল উড়ে।
> ঢেউ নাই ঢুলুনি নাই ডিঙা উইড়্যা চলে ॥[৪৬]

এছাড়াও এই পালায় নৌ-বাণিজ্যের ব্যাপক বর্ণনা আছে। তার সঙ্গে জল দস্যুদের নানা অত্যাচার ও লুণ্ঠতরাজের কথাও আছে। এমনইভাবে ময়মনসিংহ গীতিকার নানা পালায় সওদাগর ও নৌবাণিজ্যের প্রসঙ্গ সাধু আন্তোনিয়োর পালার মতো ঘুরে ফিরে আসে। আর এই উভয় রীতিরা পালার মধ্যে এই সত্য প্রতিভাত হয় যে, নদীমাতৃক বাংলাদেশে আমাদের জীবনের এক ঘনিষ্ট অনুষঙ্গ হিসাবে নৌযাত্রা ঐতিহ্যবাহী।

আন্তোনিয়ো পালাগানে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার

'কমল সদাইগরের পালা'য় যখন বলা হয় "কপাল যহন ভাঙে তহন ডাঙায় কুকইরে খায়", তখন আন্তোনিয়োর পালার "নছিব মন্দ হইলে কপাল পুইর‍্যা যায়" সমার্থক বলে মনে হয়। আবার ময়মনসিংহ গীতিকার একই পালায় বলা হয়েছে–

> ট্যাকা পয়সার জাইন্য রে ভাই শীতের জুয়াইরা জল।
> খেনে আইসে খেনে যায় মানুষের ভাইগ্য একটা ছল ॥[৪৭]

যার মধ্যে আন্তোনিয়ো পালাগানের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। সেখানে আমরা গায়েনের কণ্ঠে শুনি–

> খাইলা না বিলাইলা ধন রাখিলা বান্দিয়া,
> চোরে লইয়া যাইব এই ধন রাত্তিরে আসিয়া।[৪৮]

এমন মন্তব্য গায়েন এই সংসারের অসারতা প্রতিপন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দান-ধ্যানের ব্যাপারেও অনুপ্রাণিত করতে চান।

প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার পালাগানের কবি-গানের সবাই সিদ্ধহস্ত। পালাকারগণ লোক-জীবনের নানা প্রসঙ্গ ও অনুসঙ্গ টেনে পালাগানে প্রবাদ-প্রবচন এবং বিশিষ্টার্থক শব্দাবলী প্রয়োগ করেছেন। এই কাজে ময়মনসিংহ গীতিকার মতো আন্তোনিয়োর পালার গায়েনও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আসলে তাঁরা সবাই একই উৎসধারার জল পান করেছেন বলে মনে হয়। 'কমল সদাইগরের পালা'য় কবি বাস্তবতাবোধের প্রমাণস্বরূপ বলেছেন, "সোনা রূপা নষ্ট জাইন্য তামা আর পিতলে।/ রাজা নষ্ট অবিচারে মধু নষ্ট জলে ॥"[৪৯]

৪৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।
৪৮. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৪৯. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

এই একই প্রবাদ ‘কুমার বারনারায়ণের পালা’য় একটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। অবিচারের ফলে শাসকের ন্যায়দণ্ড ভুলুণ্ঠিত হয়। এই সত্য পালাকার কবি আরও একটু এগিয়ে গিয়ে তাই বলেছেন,

> রাজার দোষে রাইজ্য নষ্ট নারীর দোষে ঘর।
> বিচার দোষ পরজা নষ্ট বিচারে কইরলে আপন পর ॥[৫০]

‘কুমার বারনারায়ণের পালা’র এই প্রবাদ সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে প্রায় একইভাবে ও বিষয়বস্তুতে বাণীরূপ লাভ করে। আন্তোনিয়োর পালায় বলা হয়েছে,

> রাজার দোষে রাইজ্য নষ্ট লোকে বলায় করে,
> আরে স্ত্রীর দোষে পুরুষ নষ্ট বাচ্চায় কেন মরে।[৫১]

কিংবা ‘কমল সদাইগরের পালা’য় মাতা-পুত্রের মধ্যে সম্বন্ধ বা একাত্মতা দেখানোর জন্য মাছ আর গভীর জলের প্রসঙ্গ এনে রচয়িতা বলেছেন,

> মাছে চিনে গভীর পানি, নাইয়া চিনে ধার।
> মায়ে জানে পুতের বেদন, জন্ম গর্ভে যার ॥[৫২]

এই কথাটির সঙ্গে আন্তোনিয়ো পালাগানের একটি অংশের আশ্চর্যরকম মিল দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে একই কথা বলা হয়েছে এইভাবে,

> মাছে চিনে গহীন জল যে পাখি চিনে ডাল।
> ঐ যে মায়ে জানে পুত্রের বেদন যাহার গর্ভে জনম।[৫৩]

আন্তোনিয়ো পালাগানে আমরা দেখি, উপরান রাজা প্রতিদিন একজন করে মানুষ মেরে বারো ভূতের পূজা করে। আইন্তনের কথায় সে তার পিতামাতার কাছে জানতে চায় যে, তারা তার এই পাপের সহভাগী কি না। তার উত্তরে উপরানের বাবা-মা সন্তানের আদর্শগত সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে পুত্রের সঙ্গে পিতামাতার সম্বন্ধকে নিশ্চিত করে আরও গভীর ও জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদের কথায় কোনো ভণিতা নেই–

> সুপুত্র হইলে ভবে করে যে সুকাম,
> জাতি বাচে কূল বাচে, বাচে বংশের নাম।
> আবার কুপুত্র হইলে ভবে করে কুকাম,
> জাতি ডুবায় কূল ডুবায়, ডুবায় বংশের নাম।[৫৪]

ঠিক একইভাবে আমরা দেখি যে, ‘কুমার বারনারায়ণের পালা’য় এক ন্যায়পরায়ণ জমিদার নিজের পুত্রের অপকর্মের কোনো রকম দায় না নিয়ে ধর্মনিষ্ঠ সন্তান সম্বন্ধে বলছেন,

---

৫০. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
৫১. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭
৫২. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
৫৪. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪

কুপুত্র থাকনের থেইক্যা না থাকন ভালা।
এমুন পুত্র কেবল হয় রে কুলের সে কালা ॥[৫৫]

আবার আন্তোনিয়ো পালাগানে রাজাকে প্রজাতোষণকারী বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। তবুও আমরা এই রাজার মধ্যে ন্যায়বোধের পরিচয় পাই। আইন্তনের পিতার নামে দুই শয়তান নরহত্যার নালিশ জানালে রাজা দুঃস্কৃতিকারীর সঠিক পরিচয় ও অপরাধ সম্বন্ধে না জেনেই বলেছেন,

আপনা হস্তে কইরা যে খুন রাখছে আপন ঘরে,
এই বেটার গর্দ্দান লও তুমি ময়দান পাথারে।[৫৬]

আন্তোনিয়ো পালাগানের ঐরান রাজ্যের রাজার মতো 'কুমার বারনারায়ণের পালা'য় জমিদারও তাঁর কর্তব্যবোধ ও কূলমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। যে কোনো অবস্থায় তিনি ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী। সত্যের সামনে তিনি অকুণ্ঠচিত্ত ও আপোষহীন। মিথ্যার কাছে তিনি মাথা নোয়াতে কোনো মতেই রাজি নন। পালাগানে আমরা দেখি যে, তিনি নিজের ছেলেকে শাস্তি থেকে রেহাই দিতে চান না। সৎ পিতার অসৎ সন্তানের অপকর্মের যথাযথ সাজা হিসাবে মনে করেন,

ধইরা আইনা বলি দিলে শীতল হইব প্রাণ।
পরজা গণের সামনে তবে রইব আমার মান ॥[৫৭]

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে আইন্তন যখন খুব অল্প বয়সে লেখাপড়া করতে বাড়ি ছেড়ে চলে যান তখন তাঁর মা তাঁকে নানাভাবে নিবৃত্ত করতে চান। অনেক সাধনা করে তিনি পুত্রবতী হয়েছেন। তাই পুত্রের কাছে তাঁর অনুযোগ–

কতজন ভজনা কইরা পুত্র পাইয়াছি তোমারে,
তুমি পুত্র চইলা যাইবা কোন গুনাহর তরে।[৫৮]

ময়মনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালায় জননীর একই আর্তি আমরা আরও জোরালোভাবে শুনতে পাই। সেখানে রচয়িতা বলেন,

পরবুধ না মানে পরান কেমন থাকবাম ঘরে।
তুমি পুত্র ছাড়া গেলে আমি যাইয়াম মইরে ॥[৫৯]

পুত্রহীন কোনো মায়ের যত কষ্ট, তার চেয়ে বেশি কষ্ট যদি কোনো মায়ের সন্তান তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। সন্তানহারা জননীর শূন্যতাবোধ এবং অন্তরের হাহাকার সবাইকে ভারাক্রান্ত করে। একাকিনী মায়ের তখন শুধুই মনে পড়ে গর্ভে সন্তান ধারণ এবং সন্তানের শৈশব ও কৈশোর কালের কথা। হাজারো ঝামেলা এবং যন্ত্রণার সাক্ষ্য নিয়ে মা বেঁচে থাকেন। সন্তান যে মায়ের অঙ্গেরই অংশ, আর তার জন্য মায়ের কত যন্ত্রণা সেটা আর গোপন থাকে না। আন্তোনিয়োর পালাকারের কণ্ঠে তাই শোনা যায় মায়ের বঞ্চনা-বেদনার করুণ কাহিনি,

৫৫. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
৫৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪
৫৭. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
৫৮. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১
৫৯. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

অর্ধেক অঙ্গ পচে মায়ের গুয়ে আর মুতে,
ঐ যে আরেক অঙ্গ পচে মায়ের মাঘ মাইয়া শীতে।[৬০]

আন্তোনিয়ো পালাগানের মধ্যে বাণীবদ্ধ পুত্রহারা জননীর দুঃখ-ব্যথার সঙ্গে ময়মনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালার মায়ের কষ্টের কোনো তফাৎ নেই। সেখানেও জননীর যন্ত্রণার চিত্র খুবই জীবন্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রচয়িতা তাই পরম কষ্টের কথা তাঁর নিজের অন্তরের দরদ মিশিয়ে বলতে পারেন,

আধপিঠ খাইল মায়ের গুয়ে আর মুতে,
আধপিঠ খাইল দারণ মাঘ মাস্যা শীতে।[৬১]

আন্তোনিয়ো পালাগানে যারা প্রথমে আইন্তনের বিরুদ্ধে কথা বলে বা কাজ করে তারা সবাই অখ্রিষ্টান। তারা আইন্তনের পরিচয় জানে না। তাঁর অপার মহিমা এ গরিমা উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের সবাইকে ঐশ-শক্তির বলে বশ করে নিজের দলে নিয়ে আসাই যেন আইন্তনের প্রধান কাজ। এটাই তাঁর মতে "জাহির খেলানো"। আইন্তনের স্পর্শে এসে সবাই নতুন জীবন লাভ করে। তখন তাদের জীবনের আগেকার সবকিছু ছাড়তে হয়; বাদ দিতে হয়। তাদের যেন নিজের পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ ছেড়ে আইন্তনের সঙ্গে না যাওয়া ছাড়া কোনো গতি থাকে না। তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে পালাগানে বলা হয়,

আছিল যে হিন্দু কূলে খ্রীষ্টান কূলে আনিল,
পিতা পুত্র পবিত্রাত্মার নামে বাপ্তাইস্ম করাইল।[৬২]

খ্রিষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করে তাদের দীক্ষিত করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। আন্তোনিয়ো পালাগানে যেমন খ্রিষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি ময়মনসিংহ গীতিকার 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবির পালা'য় ইসলাম ধর্মের গুণাগুণ প্রচার করা হয়েছে, তাই আমরা দেখি, ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে এসে–

কুবুদ্ধি আছিল দেওয়ানের সুবুদ্ধি হইল।
কাফের আছিল দেওয়ান মোচছলমান হইল ॥[৬৩]

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে অনেক সময় অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। তবে মাঝে মাঝে লোক-কবি বা পালার গায়ক সীমিত পরিসরে বা অল্পকথায় পালাগানের কাহিনি উপস্থাপিত করেছেন। এক্ষেত্রে রচয়িতার সংযম শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। অল্পকথায় দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানকে কমিয়ে আনার ব্যাপারে আন্তোনিয়ো পালাগানের রচয়িতারা দীর্ঘ সময়ের অনাবশ্যক বিবরণ কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। আইন্তন ভক্তের জন্মের প্রসঙ্গে আমরা শুনি,

আইন্তন ভক্তের জনম হইল ভুবন মাঝারে;
একমাস দুই মাস তিন মাস হইল;
এক মাসের কালে মায়ে কিছু না জানিল।[৬৪]

৬০. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০
৬১. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
৬২. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩
৬৩. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৬৪. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

আর দেখতে দেখতে নয়, গানের ভাষায় খুব শীঘ্রই "দশমাস দশদিন মার পূর্ণিত হইল"। আবার আইন্তন ভক্ত যখন পরম পিতার শাপমুক্ত হবার জন্য বার বছর নদীতে খেয়া পারাপার করেন। বার বছর সময়কাল কত সহজে রচয়িতা পার করে দেন অল্প কয়েকটি চরণের মাধ্যমে। পালাগানে আমরা শুনি,

> এই কূলে যত লোক সেই কূলে গেল,
> সেই কূলে যত লোক এই কূলে আইল;
> একে দুইয়ে বারো বচ্ছর পূর্ণিত হইল।[৬৫]

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের মতো ময়মনসিংহ গীতিকার রচয়িতাগণ দীর্ঘ এক বছর, সাত বছর, বার বছর, ষোল বছরের ঘটনাকে এক লহমায় হ্রাস করে দিতে পারেন। 'মহুয়া' পালায় এইভাবে সময় কমিয়ে বলা হয়েছে, "এক দুই তিন করি ষোল বছর যায়।/ খেলা কছরত তারে যতনে শিখায় ॥"[৬৬] আবার 'মলুয়া' পালায় দীর্ঘ সময় সংক্ষিপ্ত করার প্রয়াসে গায়েন বলেন, "একমায় দুই মাস তিন মাস যায়।/ ছয় সাত আট করি বচ্ছর গোয়ায় ॥"[৬৭]

সময়ের ব্যবধানকে কমিয়ে আনার ব্যাপারে বাংলা অন্যান্য গীতিকার সঙ্গে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের এই সামঞ্জস্য লক্ষ্য করার মতো।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান

এক সময় বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই পালাগানের প্রচলন ছিল। এখনও সেই ধারা প্রবহমান আছে। তবে আগেকার মতো তা এত বেগবান নয়। পালাগান মূলত যাত্রাগানেরই মার্জিত রূপ। তবে যাত্রার কাহিনি প্রধান। অন্যদিকে পালাগান গীতি প্রধান। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার পালাগানের মধ্যে আঙ্গিকগত কিছু বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। তবে এইকথা ঠিক যে বিভিন্ন এলাকার পালাগানের এই আপাত আঙ্গিক বিভিন্নতা সেগুলির ভেতরকার মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। তার কারণ হিসেবে বলা যায় এইসব পালাগানের শিকড় বাংলার জনগণের মনের গভীরে প্রোথিত। গ্রামীণ মানুষের অন্তরের গভীরে যে সুরের আনাগোনা, তার মধ্যে সঠিক ভাব ও ভাষার যথার্থ মেলবন্ধনে সেগুলো রচিত।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ময়মনসিংহ গীতিকা নিয়ে আলোচনা করার পর আবার আলাদা করে পূর্ববঙ্গ গীতিকা নিয়ে আলোচনা অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। তবে ময়মনসিংহ গীতিকার মতো এত বিস্তারিত আলোচনা না করলেও এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রায় একই রকম আরও বেশ কিছু

---

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৬৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৬৭. মফিজুল ইসলাম (সম্পা.) *লোকসাহিত্য সংকলন-৪৬*, *রংপুরের পালাগান*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭

পালাগান বা গীতিকা রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে রংপুর জেলা ও তার পাশাপাশি এলাকা থেকে অসংখ্য পালাগান সংগৃহীত হয়েছে। এই অঞ্চলের পালাগান সংগ্রহের গোড়াপত্তন করেন জর্জ গ্রীয়ার্সন। এখানকার পালাগুলোকে বলা যেতে পারে এক ধরনের আখ্যান কাব্য। আঙ্গিকের দিক থেকে এগুলি অন্যান্য পালাগানের চেয়ে কিছুটা আলাদা। তবে এগুলি লোকসাহিত্য বলেই গৃহীত ও বিবেচিত। পল্লী বাংলার লোক-কবিরাই এগুলির আদি রচয়িতা। যেহেতু অন্যান্য পালাগানের মতো এই পালাগুলি মুখে মুখে রচনা করা হয়েছে, সেহেতু এগুলি মৌখিক রীতির সাহিত্য, জনগণের সম্পত্তি। অধিকাংশ পালাগানই কথক ঠাকুরের মুখ থেকে বা গানের আসর থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তাই এসব পালাগানের কোনো মুদ্রিত পুঁথি পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে রংপুরের পালাগানের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যও অন্যান্য পালাগানের চেয়ে আলাদা। আকারে এগুলি বেশ ছোট। একই আসরে গেয়ে শেষ করার পক্ষে এগুলি যথেষ্ট। এই এলাকার পালাগুলির বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে কাল্পনিক কাহিনি, অতিলৌকিক বিশ্বাস, দুঃসাহসিক কাজ, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ও প্রেম। কোনো কোনো পালায় অতিলৌকিকতাকে ধর্মীয় বিশ্বাসের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রংপুরের পালাগানের সঙ্গে বিষয়গত দিক দিয়ে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। বরং রংপুর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত নাথ-গীতিকার সঙ্গে আন্তোনিয়ো পালার সম্পর্ক আরও বেশি পরিদৃষ্ট হয়। রংপুরের বজরা নামক জায়গা থেকে মো. আজিজুল হকের কাছে প্রাপ্ত 'চান খাঁ মোন্‌ডল' পালার বন্দনা অংশে আন্তোনিয়োর পালার বন্দনার মিল আছে। এখানে গায়েন বলছেন,

প্রতমে বন্‌দোনা কঁরো মালেক পরোয়ার,
খোদার দোস্‌তো বন্‌দি কঁও মুই অচুল পয়কম্‌বর্।[৬৮]

আবার মো. হেলাল উদ্দিনের কাছে পাওয়া 'আজিভান কইন্যা' পালার,

এইগ্‌লা বন্‌দোনা কইতে নাইগ্‌বে অনেক্ষণ।
বন্দনা ছারিয়্যা গো এখন গীতে রাখ মন ॥[৬৯]

শুধু রংপুরই নয়, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে সংগৃহীত পালাগানগুলিও বাংলাদেশের লোক-জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলি ফুটিয়ে তুলতে পারঙ্গম। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং বরিশাল জেলায়ও পালাগানের প্রচলন ছিল এবং বর্তমানেও আছে। তবে শেষোক্ত দুই জেলার চেয়ে চট্টগ্রাম জেলা পালাগানের দিক দিয়ে আরও বেশি সমৃদ্ধ। আশ্চর্যের বিষয়, ঢাকা জেলার পালাগান নিয়ে তেমন কোনো সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। তবে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান কিন্তু শুরু হয়েছে ঢাকা জেলায়। ঢাকা থেকে খ্রিষ্টান বসতি যখন বাংলাদেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে, তখন এই গানও সেইসব জায়গায় প্রচলিত হয়। মোমেনশাহী গীতিকাধর্মী 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' কিংবা নোয়াখালির 'চৌধুরীর লড়াই' কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাধু আন্তোনিয়ো

---

৬৮. মফিজুল ইসলাম (সম্পা.) *লোকসাহিত্য সংকলন-৪৩*, *রংপুরের পালাগান*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০৩
৬৯. রওশন ইজদানী, *মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৬৮

পালাগানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে। তবে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের “পালাগীতিগুলির কাহিনী যেমন মনোরম, তেমনি তার বর্ণনার মুনশিয়ানা, তেমনি তার কবিত্ব, তেমনি সেসব পালাগীতি রচয়িতার গ্রাম্য কবিদের চরিত্র অঙ্কনের অসাধারণ ক্ষমতা। এগুলির ভাষা গ্রাম্য ও অমার্জিত, শব্দাবলী একান্ত আঞ্চলিক। ... এগুলি সত্যিকারের কাব্য। ... তাই এগুলি এত সুন্দর, এত চিত্তাকর্ষক, এত মধুর।”[৭০]

বৃষ্টি: পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও আন্তোনিয়ো পালাগানের সমন্বয়

প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ দেব-দেবীর নাম স্মরণ করে। বাংলাদেশের মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষ নানারকম মানত ও ব্রত করে থাকে। এই বিচারে পালাগানের ভূমিকা নির্ণয় করা যেতে পারে। শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক বলেছেন, “এককালে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান কৃষক সমাজে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অভিজ্ঞ গায়েন এইসব পালাগান গাহিয়া অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি নামাইতে পারেন।”[৭১] কমলা কন্যার পালা'র বন্দনা যদিও রচয়িতা দ্বিজ ঈশান রচনা করেননি, তবুও এই পালার সঙ্গে যে বন্দনা যুক্ত হয়েছে তাতে মনে হয় পালাটি যেন বৃষ্টির জন্য রচিত হয়েছে। পালার গায়েন বোধ করি দেশে অনাবৃষ্টির ফলে যে দুর্দশা শুরু হয়েছে তা থেকে সবাইকে নিষ্কৃতি দিতে চান। তাই তিনি গান করেন,

ও কানা মেঘারে তুই না আমার ভাই।
এক ফোঁটা পানি দে সাইলের ভাত খাই ॥
দেশে নাইরে বিষ্টি পানি ক্ষেতের মাটি ফাটা।
পিত্‌লা ঘট ভইরা দিলে লাগব মেঘের ঘটা ॥

সর্ব দেবগণে বন্দি আমি করিয়া মিন্নতি।
বিষ্টি নামাইয়া দেশে দূর কর দুগগতি ॥[৭২]

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের কাহিনিতেও অনাবৃষ্টির প্রসঙ্গ রয়েছে। শয়তান ফ্রান্সিস ভক্তকে শায়েস্তা করার জন্য তার রাজ্যে প্রচণ্ড খরা নিয়ে এল। কৃষকেরা তাই ঐরান রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে চায়। পালাগানের ভাষায়,

কি প্রকারে করুম রায়তী এই শহরের মাঝে,
বারো বচ্ছর মেঘ নাই এই শহরের মাঝে।
যেই শস্য বুনি আমরা জামিনের মাঝে,
রইদ্দের তাপে সেই শস্য জ্বইল্যা যায় তারে।
খুইট্যা খাইবার লোক নাই আপনার ঘরে,
চল চইল্যা যাই আমরা রাজার দরবারে।[৭৩]

এক সময় তারা রাজার অনুমতি নিয়ে ঐরান রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। অনাবৃষ্টির এই প্রসঙ্গ পূর্ববঙ্গের নানা পালাগানে ঘুরে ফিরে এসেছে। কৃষিনির্ভর জনগণের কাছে অনাবৃষ্টি একটি অভিশাপ হিসাবে প্রতিভাত।

৭০. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, (সম্পা.), *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, ৩য় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১৭৪
৭১. প্রাগুক্ত
৭২. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৭৩. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, সংকলনের তৃতীয় খণ্ডে বাংলাদেশে পালাগান সংগ্রহের সময়ের একটা অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। অনাবৃষ্টির সময়ে একদিন বৃষ্টির জন্য গান করছিলেন একজন গায়েন। গান করতে করতে রাত হয়ে যায়। আর ঠিকই এক সময় তুমুল বৃষ্টি শুরু হল।[৭৪]

ঠিক এমনই এক কাহিনি শুনিয়েছেন মার্ক ডি কস্তা তাঁর *অলৌকিক কর্মসাধক সাধু আন্তনী* নামক গ্রন্থে। ভাওয়াল এলাকায় তখন জ্যৈষ্ঠ মাস অতিক্রান্ত। অথচ কোথাও এক পশলা বৃষ্টি হয়নি। নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, কুয়া সব শুকিয়ে গেছে। মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির। চারিদিকে জলের হাহাকার। এমন সময় হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান সবাই এসে বললেন কালা গায়েনকে ঠাকুরের গান গাইলে বৃষ্টি হবেই হবে। কালা গায়েন কোনো বাড়িতে নয়, বরং বিলের ধারে খাল পাড়ে ঠাকুরের গীত গাইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আশে পাশের গ্রামের হাজার হাজার মানুষ গান করার সম্মতি দিলেন। তবে তাঁর অনুরোধ ছিল বৃষ্টি আরম্ভ হলে কেউ যেন গানের আসর থেকে চলে না যান, বরং গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজে হলেও সবাই সেখানে বসে থাকেন। সবাই তাঁর কথায় সম্মতি জানাল। শামিয়ানা বেঁধে গান শুরু করলেন কালা গায়েন। তখন কাঠ-ফাঁটা রোদ। সবাই ঘেমে নেয়ে উঠেছে। কিন্তু কারও মুখে টু শব্দটি নেই। আট পালা গান শেষ হতে না হতেই ঈশান কোণে এক টুকরা কাল মেঘ দেখা গেল। দেখতে দেখতে সেই টুকরা মেঘখণ্ড সারা আকাশ ঢেকে ফেলল। এক সময় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। ঠাণ্ডা হল ধরিত্রী।[৭৫]

পীর-গাজিপালা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান

বাংলাদেশের লোকায়ত পালাগানের একটি বিভাগ পীর-গাজিপালা। বিভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন নামে নানা পীর-ফকির ও গাজির মহাত্ম্য দেখা যায়। তাঁদের নামে নানা জায়গায় রয়েছে মাজার, দরগা। সেসব জায়গায় ভক্তেরা ধূপ-বাতি জ্বালান। সেখানে বছরের নির্দিষ্ট দিনে সম্মানসূচক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লোকসমাজে পীর-পূজার পাশাপাশি তাঁদের মাহাত্ম্যমূলক পীর-গাজিপালা গীত ও পীর-পাঁচালি রচিত হয়েছে। এগুলি ‘পীরলী’ গান বলে পরিচিত। সত্যিকার অর্থে এইসব গান লোকায়ত পালাগান হিসেবে বিবেচিত। আখ্যান বর্ণনা, চরিত্র সৃষ্টি, গীতিমাধুর্য ও কাব্যগুণে এইসব লৌকিক পালাগুলির সাহিত্যমূল্য অপরিসীম। পীর পালাগানের মধ্যে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যের কিছুটা ভাবাদর্শ লক্ষ্য করে বলেছেন, “মুসলিম কবিদিগের রচিত পীরমাহাত্ম্য-সূচক এক শ্রেণীর কাব্য আছে, মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ইহাদের বিষয়গত ঐক্য আছে। ইহার ক্ষুদ্রাকৃতি, পূর্ণ মঙ্গলকাব্যের রূপ ইহাদের নাই, ইহারা পাঁচালী নামে পরিচিত। এই বিষয়ে সর্বাধিক জনপ্রিয় রচনার নাম সত্যপীরের পাঁচালী। ... তাঁহার মাহাত্ম্য-প্রচারমূলক কাহিনি মঙ্গলকাব্যের ভাবাদর্শ অনুসারী রচনা।”[৭৬]

---

৭৪. মার্ক ডি'কস্তা, *অলৌকিক কর্মসাধক পাদুয়ার সাধু আন্তনী*, পৃ. ২০-২২
৭৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ১০৬
৭৬. দেবব্রত নস্কর, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেব: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, পৃ. ৫০৩

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে চব্বিশ পরগণা থেকে বেশকিছু পীর-গাজি পালা সংগ্রহ করেছেন ড. দেবব্রত নস্কর। সেগুলির মধ্যে 'মোবারক গাজির পালা'য় আমরা দেখি দিল্লীর প্রতাপশালী রাজা চন্দন সাহার রাজ্য বর্গীরা আক্রমণ করে। এক ফকির তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে বলেন। ফকিরের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা সেখান থেকে পালিয়ে ঢাকা চলে যান। সন্তানহীন রাজাকে ফকির এই আশ্বাস দেন,

বিপদে পড়িলে তুমি ডাকিবে মুক্তারণ,
আমার সাক্ষাত তুমি পাবে গো তখন।[৭৭]

তারপরই চন্দন সাহার ঘরে জন্ম হল মোবারক গাজির। তিনি সংসার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। এই মোবারক গাজির সঙ্গে আইন্তনের চরিত্রের মিল দেখা যায়। এই ফকির যেমন আল্লার ফেরেস্তা, তেমনই আন্তোনিয়ো পালাগানেও আছেন স্বর্গের দেব বা স্বর্গদূত। তিনি সন্তান জন্মের খবর নিয়ে ফ্রান্সিস ভক্তের কাছে আসেন। তখন তাঁর মুখে শুনি–

দুস্কে পইরা যেইবা লয় পরম পিতার নাম,
হস্তে ধইরা করেন উদ্ধার এই তো পিতার কাম।[৭৮]

আবার আইন্তন ঠাকুর যখন চলার পথে নদীর সামনে এসে মাঝিকে পার করে দেবার অনুরোধ জানিয়ে বলেন–

পার কর পাটুনী ভাই সঙ্গে কড়ি নাই,
যাহার সঙ্গে ছিল কড়ি সেই পার হইল ভাই।
আর খালি হাতে যেইবা ছিল রইয়া গেল এই পার,
পার কইরা তারে তুমি কর গো উদ্ধার।[৭৯]

ঠিক এমনই ভাবধারায় 'মোবারক গাজির পালা'য় মোবারক গাজি পাটনীকে নদী পার করে দেবার অনুনয় করেন। তবে তাঁর কাছে কোনো টাকা-কড়ি নাই বলে তিনি জানান। পালাগানে শুনি–

শুন পাটুনি তোমায় কই　　　মোর কাছে কড়ি নাই
　　এই পাগটি রাখিয়া যে যাই।
দুঃখী মোর পার হবে　　　পারের কড়ি দিয়া যাবে
　　এই কথা তোমারে জানাই ॥[৮০]

আবার 'মানিক পীরের পালা'য় মানিক পীর কালেশ্বর সওদাগরের বাড়িতে এসে জিগির জানালে সওদাগরের স্ত্রী রঞ্জনা বিবির এক সখি ভিক্ষা নিয়ে পীরের কাছে গেলে তিনি বলেন,

ভিক্ষার ফকির নয় মা আমারা ভিক্ষা নাহি নেব,
রানী রঞ্জনার হকেত খানা খেয়ে দোয়া দিয়ে যাব।[৮১]

আন্তোনিয়ো পালাগানে আইন্তন ঠাকুর যখন কেশবের খোঁজে তার বাড়িতে যান তখন তাঁর জিগির শুনে কেশব-জননী ভেবেছেন যে আইন্তন ভিক্ষার জন্য এসেছেন। তাই তিনি তাঁর পুত্রবধূকে ভিক্ষা দিয়ে আইন্তনের কাছে পাঠান। আইন্তন বলছেন,

---

৭৭. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৭৯. দেবব্রত নস্কর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৪
৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩
৮১. দেবব্রত নস্কর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬

ভিক্ষার তো না যাজক আমি ভিক্ষা লইয়া যাই,
নামের ভিখারী আমি নাম পাইলে যে চাই।[৮২]

একই পালায় দয়াল মানিক পীর তাঁর ভাই গজকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরছেন আর 'নাম জাহির' করছেন। একসময় তিনি ভীষণ ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় মুরদ নামে এক ভক্তের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। মুরদ আর তার স্ত্রী সাতদিন যাবৎ অনাহারে আছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

মানিক পীর ভাই গজকে নিয়ে সেথায় আসে,
অন্ন দাও বলে মানিক দ্বারে ভিক্ষা যাচে।[৮৩]

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর দূতকে যাজকবেশে ফ্রান্সিস ভক্তের কাছে পাঠান। তিনিও ভক্তের বাড়িতে গিয়ে জিগির দিয়ে ভিক্ষা চেয়ে বলেন,

অন্নের পিয়াসে পরান আমার ছটফট করে,
কিছু খানা দিয়া পরান রক্ষা কর মোরে।[৮৪]

এখানে সাধু আন্তোনিয়ো আর দয়াল মানিক একই অবস্থার মানুষ। তাঁরা দুই জনই মানুষের দেওয়া অন্নবস্ত্রে জীবন ধারণ করেন। তাঁরা খোদার অবতার, সংসারবিবাগী পীর।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান: লিখিত ধারায়

লিখিত সাহিত্য এবং লোকসাহিত্য দুইটি ভিন্নধারায় এগিয়ে চলে। তবে বাংলা লোকসাহিত্যের গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের অনেক ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন রয়েছে। সচরাচর লিখিত সাহিত্য থেকে লোকসাহিত্য রসদ জোগাড় করে না। লোকসাহিত্য থেকে অহরহ উপকরণ সংগ্রহ করে লিখিত সাহিত্য রচিত হচ্ছে। বাংলা লৌকিক পালাগানের আদর্শে অনেক আখ্যানকাব্য ও কাব্যধর্মী সাহিত্য রচিত হয়েছে। অতএব বাংলা পালাগান বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান এক ধরনের লোককাব্য। আর আমাদের আগে উল্লিখিত কাব্যগুলো মৌলিক। সেগুলি লেখকদের সচেতন শিল্প-সাধনার ফল। তাঁরা অনেকেই জনজীবন থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন এবং জনপ্রিয় সেসব কাহিনির উপর দাগ বুলিয়েছেন। অন্যদিকে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান মৌখিক রীতির হলেও তার মধ্যে শিল্পকুশলী রচয়িতার স্বীকরণ শক্তির বলে লিখিত কাব্যসহিত্যের কিছু অনুষঙ্গ সযত্নে প্রতিস্থাপন করেছেন। তার ফলে এই পালাগানের বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন হয়নি, বরং কাব্যসঙ্গীতগুণে শিল্প-সুষমাময় হয়ে উঠেছে। তার ফলে শুধু ভক্তজনগণই সাধারণ সাহিত্যবোদ্ধা মানুষও সেসব পালাগানের রস আস্বাদন করতে পারেন।

৮২. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৮৩. দেবব্রত নস্কর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯
৮৪. সুব্রত গমেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আন্তোনিয়োকেন্দ্রিক ভক্তি-বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতা

আমরা জানি, অঞ্চলভেদে মানুষের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। আবার ধর্ম আলাদা হলেও একই এলাকার মানুষের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, খাবার-দাবার, পোষাক-পরিচ্ছদ, সম্পর্কের সম্বোধন– আলাদা হতে পারে। ধর্মের কারণে মানুষের মুখের বুলিও অনেক সময় বদলে যেতে দেখা যায়। এই ভাব-ভাষা ও বেশ-ভূষার স্বকীয়তা দেখি ঢাকা জেলার খ্রিষ্টবিশ্বাসী মানুষের মধ্যে। ঢাকা জেলার খ্রিষ্টানরা নিজেদের বাংলাদেশে আদি-খ্রিষ্টান বলে মনে করেন। এই বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মধ্যে এক ধরনের অহঙ্কারবোধ কাজ করে। ঢাকা জেলার খ্রিষ্টানগণ প্রধানত দুই অঞ্চলভাগে বিভক্ত– ভাওয়াল ও আঠারগ্রাম। যদিও তাদের ধর্ম এক, শুধু ভিন্ন আঞ্চলিকতার কারণে তাঁদের মধ্যে ভাষা, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির দিক থেকে কিছু তফাৎ পরিলক্ষিত হয়।

সাধু আন্তোনিয়োর তীর্থ

এই কথা ঠিক যে, ধর্মাচারণের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের খ্রিষ্টভক্তদের মধ্যে ঐকান্তিকতার কোনো অভাব ছিল না। নাগরী গির্জা প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর পার্শ্ববর্তী পানজোরা গ্রামে আরেকটি গির্জা নির্মাণ করা হয়। তবে তার সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না। ঐতিহাসিকদের অভিমত অনুসারে ১৭১৪ খ্রিষ্টাব্দের আগে কোনো এক সময়ে 'সাধু আন্তোনিয়োর গির্জা' নামে এই উপাসনাগৃহটি নির্মাণ করা হয়।[৮৫] খুব শীঘ্রই নতুন এই গির্জা এবং গির্জায় রক্ষিত সাধু আন্তোনিয়োর মূর্তি ঘিরে মানুষের মধ্যে প্রভূত উদ্দীপনা দেখা দেয়। এই গির্জা নির্মাণে ফলশ্রুতিতে নানা অলৌকিক কাহিনি লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এমনই কিছু অলৌকিক কাহিনি আজও জনগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাছাড়া সাধু আন্তোনিয়োর নামে মানত করে কিছু চাইলে সাধু আন্তোনিয়ো অবশ্যই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন বলে ভক্তদের ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল। তাই অনেক মানুষ পানজোরা গির্জায় মানত করতেন। ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের পর পানজোরা গির্জাটি অবহেলিত অবস্থায় জরাজীর্ণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন পর ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে ফাদার পিও সাধু আন্তোনিয়োর নামে ঐতিহ্যবাহী এই গির্জার পুনঃনির্মাণ করেন। বিংশ শতকের শুরুতে এই গির্জা নির্মাণের মধ্যে দিয়েই বাংলাদেশে সাধু আন্তোনিয়োর প্রতি খ্রিষ্টান সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এক নতুন দিগন্ত অবারিত হয়েছে। মানুষ সাধক আন্তোনিয়োকে তাদের জীবনের পরম প্রসাদদাতা হিসাবে এবং একান্ত আপনজন হিসাবে পেয়েছে।

---

৮৫. যেরোম ডি' কস্তা, *বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী*, পৃ. ৪৩

পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে এই গির্জা ও সাধু আন্তোনিয়োকে কেন্দ্র করে মানুষের ভক্তি-বিশ্বাস প্রকাশের তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। মি. অপূর্ব নিকোলাস ক্রুজ এই গির্জার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "অত্যন্ত চমৎকার স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত এ চ্যাপেলখানার নির্মাতা পর্তুগীজ মিশনারীগণ। অতপর পর্যায়ক্রমে বেড়েছে এর পরিসর, বেড়েছে ভক্তবৃন্দের দৃপ্ত পদচারণা। এখন প্রতিবছর নির্দিষ্ট দিনে সাধু আন্তনীর পর্ব পালন উপলক্ষে লোকের সমাগম হয় এখানে; যা বাংলাদেশের সবচাইতে বড় খ্রীষ্টান জমায়েত।"[৮৬] গত বছর এই পর্বে প্রায় লক্ষাধিক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য এই কথা বলা দরকার যে, আগেকার দিনের মতো মানুষের মধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধার আধিক্য দেখা যায় না। বর্তমানে এই তীর্থোৎসব অনেকাংশে মানুষের দেখা-সাক্ষাৎ ও মিলনমেলার অবয়ব ধারণ করেছে।

কালের আবর্তে সাধু আন্তোনিয়োর তীর্থস্থানটি বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর চত্বরটি যেন শুভবোধসম্পন্ন মানুষের মিলনস্থল। বর্তমানে এই চত্বরে সিস্টারদের আবাসস্থল, মেয়েদের উচ্চ-বিদ্যালয়, ছাত্রীনিবাস এবং একটি মাতৃ-সদন রয়েছে। নভেনা ও পর্বের সময় খ্রিষ্টযাগ উৎসর্গের জন্য সাধু আন্তোনিয়োর নামে অপূর্ব সুন্দর মঞ্চও নির্মাণ করা হয়েছে। এখন শুধু সাধু আন্তোনিয়োর পর্বের সময়েই নয়, সারা বছরই বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে খ্রিষ্টভক্ত ও বিশ্বাসী মানুষ পানজোরায় সাধু আন্তোনিয়োর গির্জায় আসেন। তাঁরা সবাই ভক্তি ভরে সাধু আন্তোনিয়োর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান। সাধু নামে নানা মানত করেন।[৮৭] বর্তমানে মহান সাধু আন্তোনিয়োর এই পুণ্যস্থানে গেলে মনে হয় আশেপাশে মানুষের বাড়িঘর এবং দোকান-পাট সবকিছুর মধ্যেই যেন সেই মহামানবের পবিত্র স্পর্শ রয়েছে। মানুষ এই পরিবেশে গেলে নিজেদের মন-অন্তর থেকেই নিরাময় লাভ করে। অনেকেই মনে করে তাদের প্রায় সবার জীবনেই নতুন এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তন যেমন পারমার্থিক তেমনি বৈষয়িকও।

সাধু আন্তোনিয়োর সম্মানে নভেনা বা নবাহ

লাতিন ভাষায় 'নভেনা' শব্দের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'নবাহ'। নভেনা অর্থ হচ্ছে 'নয় সংখ্যা' বা 'নয় সংখ্যক'। খ্রিষ্টধর্মে ভক্তি-বিশ্বাস প্রকাশপূর্বক পর পর নয়দিন প্রার্থনা করাকে বলা হয় নবাহ বা নভেনা। নবাহ করার সময় ভক্ত তাঁর উদ্দিষ্ট দেবতার কাছে সাধু-সাধ্বীর মধ্যস্থতায় বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। এই কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, নভেনার সময় ভক্ত সরাসরি সাধু-সাধ্বীর কাছে প্রার্থনা করেন না, বরং তিনি সেই সাধু-সাধ্বীর মাধ্যমে ঈশ্বর বা যিশুর কাছে মিনতি জানান। কাথলিকপন্থী খ্রিষ্টানদের মধ্যে নবাহ করার রীতি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

৮৬. অপূর্ব নিকোলাস ক্রুজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৮৭. প্রাগুক্ত

ঢাকার ভাওয়াল অধ্যুষিত খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে সাধু আন্তোনিয়োর নভেনা ও বিশেষ প্রার্থনা করার প্রচলন রয়েছে। অবশ্য নবাহের মাধ্যমে ভক্তগণ যে সাধুর উদ্দেশে আয়োজন, সেই সাধকের জীবনাদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করতে প্রয়াসী ও সচেষ্ট হন। নবাহ নয় দিন ধরে চলে বলে প্রতিদিনের জন্য আলাদা আলাদা মূলভাব গ্রহণ করা হয়। সেই বিষয়বস্তু অনুসারে নভেনায় উপাসনা, প্রার্থনা, ভক্তিগীতি ও প্রবচন হয়ে থাকে। প্রতিদিনই বিষয়বস্তু অনুসারে একজন অভিজ্ঞ প্রচারককে ধর্মভাষণ বা উপদেশ দেবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। নভেনার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট কাঠামো রয়েছে। সচরাচর সব জায়গায় সেই একই আদল অনুসরণ করা হয়। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে সাভার কমলাপুর গির্জায় নয় দিনের জন্য যে মূলভাবগুলো গ্রহণ করা হয়েছিল, সেগুলো নিম্নরূপ–

১. পরিবারের গন্ধরাজ সাধু আন্তোনিয়ো

২. খ্রিষ্টীয় ভক্তির অলঙ্কার সাধু আন্তোনিয়ো

৩. অলৌকিক কর্মসাধক সাধু আন্তোনিয়ো

৪. শিশু-যিশুভক্ত সাধু আন্তোনিয়ো

৫. বিনম্রতার আদর্শ সাধু আন্তোনিয়ো

৬. পরম জ্ঞানী সাধু আন্তোনিয়ো

৭. দরিদ্রের অনুরাগী সাধু আন্তোনিয়ো

৮. নির্ভীক বাণী-প্রচারক সাধু আন্তোনিয়ো

৯. একান্ত বিশ্বস্ত সাধু আন্তোনিয়ো

সাধু আন্তোনিয়োর নবাহ ঘিরে মানুষের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না। শুধু পানজোরা গির্জায় নয়, কাতুলী ও কলাবাড়িয়া এবং অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রেও নভেনার আয়োজন করা হয়। অনেকে আবার সাধু আন্তোনিয়োর স্মরণে মঙ্গলবারের বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং অংশগ্রহণ করেন। ফাদার আলবার্ট টমাস রোজারিও বলেছেন, "বর্তমানে নয় বা পর পর তেরোটি মঙ্গলবার সাধু আন্তনীর প্রতি বিশেষ ভক্তিসভা পালন করার রীতি প্রচলিত আছে।"[৮৮]

সাধু আন্তোনিয়োর পর্ব পালন

সাধক আন্তোনিয়োর পর্ব পালন নাগরী গির্জার জন্য একটি সবচেয়ে বড় আয়োজন। আগে সাধু আন্তোনিয়োর নির্ধারিত পর্বদিন, অর্থাৎ ১৩ই জুন পালিত হত। অনেক আগে থেকেই ভাওয়ালের বিভিন্ন গির্জায় নভেনা ও পর্বের দিনগুলি ঘোষণা করা হত। বিংশ শতকের শুরু থেকেই পানজোরায় এই পর্ব পালনের রীতি শুরু হয়েছে বলে মনে করেন পংকজ প্লাসিড রড্রিক্স। নাগরীর খ্রিষ্টীয় নানা ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোকপাত করে তিনি একটি প্রবন্ধে গোড়ার দিকে আন্তোনিয়োর পর্ব পালনের একটি সুন্দর চিত্র

৮৮. আলবার্ট টমাস রোজারিও, 'বিশ্ববন্দিত সাধু আন্তনি', স্মরণিকা, বক্সনগর সাধু আন্তনির নতুন গির্জার উদ্বোধন, ২০০৫, পৃ. ১৭।

অঙ্কন করেছেন। তাঁরই দেওয়া তথ্যে আমরা পাই যে, আন্তোনিয়োর পর্বের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা তীর্থ চত্বরে বাদ্যবাজনা বাজানো হত। গ্রামের লোকেরা ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল– সহযোগে উৎসবে মেতে উঠত। এমন কি আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করার জন্য নানা রকম পটকা ফাটানো হতো ও আতশবাজি পোড়ানো হতো। আশে পাশের বিভিন্ন গ্রামের ও ধর্মপল্লীর লোকজন সমবেত হয়ে গান, বাজনা ও নাচ করত। নানা রকম অনন্দ উৎসবের মধ্যে ধর্মবিষয়ক নাটকও মঞ্চস্থ হত। পর্বের দিন মহোপাসনার পর পুনরায় নাচ, গান ও বিভিন্ন বাদ্য বাজানো হত। সেই সময় সমগ্র পর্বের জন্য একজন পর্বকর্তা থাকতেন। তিনিই পর্বের সমস্ত আয়োজনে বড় ভূমিকা পালন করতেন। বর্তমানে অনেকেই পর্বকর্তা হয়ে থাকেন। পর্বকর্তা হবার মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে কোনো মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি জাহির করার মনোভাব থাকে। অন্যদিকে আয়োজকদের অর্থনৈতিক লাভ ও সুবিধা পাবার বিষয়ও জড়িয়ে থাকা অসম্ভব নয়। তবে জুন মাসে ঝড়-বৃষ্টি হয় বলে একটা সুবিধাজনক সময়ে পর্ব পালনের পরিকল্পনা থেকে প্রায়শ্চিত্ত কালের আগে এই পর্ব পালনের রীতি প্রবর্তন করা হয়। বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাধু আন্তোনিয়োর পর্ব ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম শুক্রবার, অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় পঞ্জিকা অনুসারে ভস্ম বুধবারের আগের শুক্রবার পালিত হয়ে আসছে।[৮৯] তাতে সব এলাকার এবং সব ধরনের মানুষেরই সুবিধা হচ্ছে বলে পর্বের আয়োজকগণ মনে করেন। কেননা এই পর্বে সমগ্র বাংলাদেশ থেকেই খ্রিষ্টান, এমনকি অখ্রিষ্টান ভক্তেরাও অংশগ্রহণ করে।

সাধু আন্তোনিয়োর পর্ব ঘিরে এই জমায়েত শুধুমাত্র খ্রিষ্টানদের জন্যই নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষেরই মিলনভূমি হচ্ছে পানজোরা তীর্থস্থান। সবার জন্যই সাধু আন্তোনিয়োর দ্বার অবারিত। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম অতুল বলেছেন, "পানজোরা আন্তনী ঠাকুরের পর্বটি বর্তমানে একটি আন্তঃধর্মীয় সর্বজনীন বিশ্বাসের রূপ লাভ করেছে। আন্তনী মূর্তির অলৌকিক আচরণের রহস্য ও মাহাত্ম্য প্রচারের সাথে সাথে ভক্তবৃন্দেরও সমাগম বাড়ছে। অনেকেই দোয়া-মানত কাজে লাগায়, তারা জোরে জোরে তাঁর মহিমা কীর্তন করছে।"[৯০] পরিষ্কার করে বলতে গেলে অন্তঃধর্মীয় এই সমাবেশে "শুধু খ্রীষ্টান নয়, হিন্দু মুসলমানরাও ছুটে আসে এ মহান সাধুর পর্বদিনে।"[৯১]

আন্তোনিয়োর কাছে মানত করা

সাধু আন্তোনিয়ো বাংলাদেশে খ্রিষ্টানদের কাছে সবচেয়ে জীবন্ত সাধু। তাঁর মধ্যস্থতায় খ্রিষ্টভক্তদের আবেদন ও প্রার্থনা ঈশ্বরের চরণে সবচেয়ে বেশি নিবেদিত হয়। পানজোরায় যেহেতু আন্তোনিয়োর তীর্থস্থান রয়েছে তাই পানজোরা গির্জায় অনেক আগে থেকেই মানত করার রীতি প্রচলিত আছে। সাধক আন্তোনিয়োর প্রতি মানত করার রীতি সম্পর্কে পংকজ প্লাসিড রড্রিক্স বলেছেন,

৮৯. পংকজ প্লাসিড রড্রিক্স, 'নাগরীর ঐতিহ্যময় ইতিহাস', স্মরণিকা, নাগরীতে নবনির্মিত গির্জার উদ্বোধন, ২০০৮, পৃ. ৩৭
৯০. উইলিয়াম অতুল, 'ঐতিহাসিক ভাওয়াল নগরী', নাগরী, ২০০১, পৃ. ৮
৯১. বিপুল এলিট গনছালভেজ, 'পরাণের গহীন ভিতরে সাধু আন্তনী', অরুণোদয়, ২০০১, পৃ. ১

> উনিশ শতকে অনেকেই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রার্থনা বরকে ও মানত পূরণ করতে বা মানত দিতে পানজোরা গীর্জায় আসত। লোকজন বিশ্বাস করত যে সাধু আন্তনীর নামে মানত করে কিছু চাইলে বা যাচনা করলে সাধু আন্তনী তা অবশ্যই তা পূরণ করবেন। তাই বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত দেখা যেত যে, আঠারগ্রামের আন্তনীভক্ত কাথলিকগণ বড় বড় নৌকা ভাড়া করে মানত পূরণ করার জন্য পানজোরা আসতেন। আগের দিনে অনেক মানুষই মাথার চুল সাধু আন্তনীর নামে মানত রাখত। বড় হয়ে যখন নিজের মুখে চুল কাটার কথা বলত তখন সাধু আন্তনীর গীর্জায় আসত এবং মূর্তির সামনে একগোছা চুল কেটে রেখে দিত। ... কেউ বা আমার সমাইনাবাতি মানত করত। মানত বাতি বাইরে একটি স্থানে জ্বালানো হত।[৯২]

মানত করার মধ্য দিয়ে সাধুর প্রতি ভক্তদের নির্ভরতা প্রকাশ পায়। আন্তরিক নির্ভরতা থেকেই খ্রিষ্টভক্তগণ আন্তোনিয়োকে তাঁদের ঘরের সাধক বলে করেন। ফাদার আলবার্ট টমাস রোজারিও বলেছেন, "সাধু আন্তনীর কাছে আমরা বিভিন্ন মানতও করে থাকি। কোনো অসুবিধা, সমস্যা-সংকটে পড়লেই আমরা সাধু আন্তনীর নামে মানত করে থাকি।"[৯৩]

ঠাকুরের গীত গাওয়ানো

খ্রিষ্টধর্মকে আশ্রয় করে বাংলাভাষায় অনেক গীত ও পালাগান সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলো আজ বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সম্পদ। এই প্রবহমানতার একটি প্রকৃষ্ট ও ঋদ্ধ ধারা হল 'ঠাকুরের গীত' বা 'সাধু আন্তোনিয়োর পালাগান'। খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়োকেন্দ্রিক এসব পালাগানে রয়েছে বাঙালি খ্রিষ্টীয় সমাজের একটি পরিপূর্ণ ও জোরালো জীবনচিত্র। এখানে ফুটে উঠেছে খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর জীবনবোধ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং যাপিত জীবনের সূত্রসমূহ। বাংলাদেশের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী, বিশেষ করে এই ধর্মানুসারী অন্তেবাসীদের জীবনচেতনা ও বিশ্বাসের অনেকটাই জুড়ে আছে সাধু আন্তোনিয়ো ভাবধারা, যার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে তাঁর নামে নিবেদিত ও গীত এই পালাগুলোতে। আজও নানা পালা-পার্বণে কিংবা বিভিন্ন উদ্দেশে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন মানত বা ব্রত করেন, তার প্রাপ্তিতে আন্তোনিয়োর পালাগান পরিবেশিত হয়। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি খ্রিষ্টবিশ্বাসী জনবসতি এলাকায় এই গানের রেওয়াজ রয়েছে। পালাগান গাওয়ানোর মাধ্যমে ভক্ত তাঁর ভক্তি-বিশ্বাস ও সাধুর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে। নাটোর জেলার ফাদার দিলীপ এস. কস্তা মনে করেন– "সাধু আন্তনীর জীবন ভিত্তিক পালাগানের প্রচলন অতি প্রাচীন ও জনপ্রিয়। খ্রীষ্টবাণী প্রচারে এই পালাগান ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে এবং খ্রীষ্টভক্তদের জীবনকে আধ্যাত্মিক অনুগ্রহদানে সিক্ত করেছে।"[৯৪]

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান গাইবার কোনো বিশেষ সময় নেই। বছরের যে-কোনো সময়ই ভক্তগণ এই পালা গাওয়াতে পারেন। সবাই নিজেদের সুবিধা মতো আয়োজন করে থাকেন। অনেকে পানজোরা তীর্থ বা পর্ব পালন করতে এসে হয়তো গানের মানত করেন, তবে প্রার্থনার সুফল পেলে তাঁর এখানে ধন্যবাদ জানাতে আসেন। কিন্তু পালাগান পরিবেশন করান নিজেদের বাড়িতে। পানজোরায় সাধু আন্তোনিয়োর তীর্থ ও তার আনুষ্ঠানিকতা সম্বন্ধে মি. অপূর্ব নিকোলাস ক্রুজ বলেছেন, "একটি বিষয়

৯২. পংকজ প্লাসিড রড্রিক্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৯৩. আলবার্ট টমাস রোজারিও, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৯৪. দিলীপ এস. কস্তা, 'খ্রীষ্টীয় লৌকিক সংস্কৃতি ও সাধু আন্তনী ভক্তি', অনুগ্রহ, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব ২০১৮, কাতুলী, পৃ. ৩

না বললেই নয় যে, তা হচ্ছে সারা বৎসরব্যাপী অত্র ভাওয়াল অঞ্চলে ও দেশের অন্যান্য স্থানেও সাধু আন্তনীর নিকট মানত হিসাবে তাঁর নিকট ধন্যবাদার্থে তাঁর জীবনীভিত্তিক পালাগান চলে। এই উপলক্ষ্যে এলাকায় বেশ কয়েকটি পালাগানের দল রয়েছে, যারা পেশাভিত্তিক 'সাধু আন্তনীর পালাগান' করে থাকে।"[৯৫]

সাধু আন্তোনিয়োর নামে রুটি-বিস্কুট বিতরণ

পাদুয়া নগরীতে যখন সাধু আন্তোনিয়োর নামে মহামন্দির নির্মাণ করা হয়, তখন সেখানকার গরীব একটি পরিবারের শিশু নির্মাণাধীন মহাগির্জার পাশেরই একটি জলাশয়ে ডুবে মারা যায়। এই ঘটনায় শিশুটির মা শোকে বিহ্বল হয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সাধু আন্তোনিয়োর কাছে মানতপূর্বক প্রার্থনা করেছিলেন যে, শিশুটি বেঁচে উঠলে তিনি শিশুটির সমান ওজনের রুটি গরিবদের মধ্যে দান করবেন। তাঁর সেই প্রার্থনব্রতে তুষ্ট হয়ে সাধু আন্তোনিয়ো তাঁকে দয়া করলেন। পরদিন সকালেই মেয়েটি বেঁচে উঠল। তাকে দেখে মনে হল– সে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। সত্যিই শিশুটির মা তাঁর মানত পূরণ করলেন। তিনি দীনদরিদ্র মানুষের মধ্যে তাঁর প্রতিজ্ঞা মোতাবেক রুটি বিতরণ করলেন। সেই প্রথা আজও ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া; এমনকি আমাদের বাংলাদেশেও খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

আন্তোনিয়োর কাছে প্রার্থনা করে ফলাফল পেলে বাংলাদেশেও ভক্তগণ রুটি বা বিস্কুট বিতরণ করে থাকেন। এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ফাদার আলবার্ট টমাস রোজারিও বলেছেন, "সাধু আন্তনীর নামে আশীর্বাদিত রুটি-বিস্কুট, যেটাকে আমরা বলি 'গোড়ালা', বিতরণ করার রীতিও রয়েছে। এই বিশেষ প্রথার উদ্ভবের পিছনে একটা আশ্চর্য ঘটনা আছে।"[৯৬] সেই বর্ণনায় আমরা পাই যে, দক্ষিণ ফ্রান্সের তুলোস নগরে এক মেয়ের একটি মুদি দোকান ছিল। সেই দোকানের উপার্জন দিয়ে সে তার পরিবার চালাত। একদিন সকাল বেলা দোকানে এসে সে দরজার তালা খুলতে পারছিল না। তখন একজন চাবিওয়ালা ডাকা হল। সে-ও কিছুই করতে পারল না। তখন চাবিওয়ালা তালাটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু মেয়েটি সাধু আন্তোনিয়োর কাছে প্রার্থনা করল যাতে দরজা না ভেঙে তালাটি খোলা যায়। তাহলে সে গরীবদের রুটি খেতে দেবে। ঠিকই তার পরেই তালা খুলে গেল।[৯৭] এই ভাবে সাধু আন্তোনিয়োর মহিমা সবার সামনে প্রকাশিত হলো।

সাধু আন্তোনিয়োর আলতার বানানো

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি খ্রিষ্টান পরিবারের ঘরে ঘরে আন্তোনিয়োর মূর্তি বা ছবি শোভা পায়। ঢাকা জেলার ভাওয়াল ও আঠারগ্রামের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত উভয় এলাকাতেই ভক্তদের ঘরে, অফিসে, দোকানে এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন খ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠানে

---

৯৫. অপূর্ব নিকোলাস ক্রুজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৯৬. আলবার্ট টমাস রোজারিও, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৯৭. প্রাগুক্ত

সাধু আন্তোনিয়োর মূর্তি থাকে বা ছবি টাঙানো থাকে। অনেকে আবার বাড়িতে আলাদা করে সাধু আন্তোনিয়োর সম্মানার্থে বেদীমঞ্চ নির্মাণ করেন। সেখানে সাধু আন্তোনিয়োর মূর্তি প্রতিস্থাপন করে প্রত্যহ সেখানে প্রার্থনা করেন। নাগরী মিশনের করান গ্রামের একটা বাড়িতে ঠিক প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষের সমান আকৃতির মূর্তি দেখেছি। পানজোরা এলাকায় এবং ভাওয়ালের আরও কিছু ধর্মপল্লীর খ্রিষ্টান বাড়িতে প্রবেশের প্রধান তোরণের উপরে আন্তোনিয়োর মূর্তি স্থাপন করতে দেখা যায়।

প্রতি মঙ্গলবার সাধু আন্তোনিয়োকে স্মরণ

আন্তোনিয়োর জীবনী অনুসারে আমরা জানি যে, তিনি ১৩ জুন ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তাঁকে সমাহিত করা হয় ১৭ জুন, মঙ্গলবার। সেদিন পাদুয়া নগরে সাধুর নামে নানা অলৌকিক কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। তাই আন্তোনিয়োর ভক্ত খ্রিষ্টান সম্প্রদায় বর্তমানেও প্রতি মঙ্গলবার তাঁর স্মরণে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মঙ্গলবারের প্রার্থনায় আন্তোনিয়ো জাগ্রত প্রসাদ দিয়ে ভক্তদের মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। বাংলাদেশেও একই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। শুধু নাগরীতেই নয়, আন্তোনিয়োর অন্যান্য তীর্থস্থাগুলিতেও মঙ্গলবার দিন তাঁর স্মরণে বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই প্রসঙ্গে ফাদার আলবার্ট টমাস রোজারিও বলেছেন, "সাধারণতঃ প্রতি মঙ্গলবার আমরা সাধু আন্তনীর প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখিয়ে থাকি। ... তাই যে সমস্ত জায়গায় সাধু আন্তনীর নামে গীর্জা রয়েছে, সেখান ভক্তেরা মঙ্গলবার তাঁর চরণে সমবতে হয়ে তাঁর দয়ার স্পর্শ লাভ করে।"[৯৮] এমন কি আন্তোনিয়োভক্ত মানুষের বাড়িতে বাড়িতেও একইভাবে উপাসনা হয়ে থাকে। আন্তোনিয়োর প্রতি মানুষের অপরিসীম ভক্তি ও বিশ্বাসের এই অর্ঘ্যডালি নিবেদনের রীতি খ্রিষ্টীয় কৃষ্টিরই এক আবশ্যকীয় উপাদান হয়ে উঠেছে। আর সেটা শুধু ভাওয়াল নয়, সমগ্র বাংলাদেশের সমস্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সাধু আন্তোনিয়োর নামে মানুষকে খাওয়ানো

ঈশ্বরের প্রসাদ ও করুণা পাবার জন্য মানুষের প্রতি ভক্তের কিছু দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিরন্নকে আহার দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, তৃষ্ণার্তকে জল দান, অসুস্থকে সেবা দান, গৃহহীন মানুষকে অর্ভ্যথনা জানানো, বন্দী মানুষকে দেখতে যাওয়া– যে-কোনো খ্রিষ্টানেরই জীবন যাপনের দাবি হওয়া দরকার। সাধু আন্তোনিয়োর ঐতিহ্যে আমরা দেখি, দরিদ্র মানুষকে রুটি খাওয়ানোর কথা বলা হয়ে থাকে। তাই কোনো বাড়িতে পালাগান পরিবেশিত হলে গরিব লোকদের ডেকে খাওয়ানোর কথা রয়েছে। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের 'দোয়া গীত' নামক অংশে সেই দীনহীন মানুষকে খাওয়ানোর কথা বলে হয়েছে। এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদ যে মানুষকে সুখ দিতে পারে না, সেই সত্যও তুলে ধরা হয়েছে। দোয়া গীতে পালাকার বলেন–

যেই খাও সেই বিলাও এই কর গো সার,
মরিলে না সঙ্গে যাইব এই সকল সংসার।

---

৯৮. আলবার্ট টমাস রোজারিও, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

দুই চক্ষু বুইজ্জা গেলে দুইনা অন্ধকার,
কোথায় থাকব তখন তোমার এই সুখের সংসার?
তাই অনাহারীকে দিও খানা পিপাসীকে পানি,
বস্ত্রহীনকে দিও বস্ত্র বেহেস্তের নিশানি।[৯৯]

পালাকারের মতে নিরন্ন মানুষকে আহার দিলে এবং অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়ালে ভক্তের পক্ষে স্বর্গসুখ লাভ সম্ভব। আমাদের দেশে দেখা যায় সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের মানতকারী কিন্তু অভুক্ত মানুষকে ডাকার বদলে সচরাচর তাদের পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের সম্মানে এক বিশেষ ভোজের আয়োজন করে থাকেন। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার পদগুলোও খ্রিষ্টীয় জনগণের স্বাদ ও পছন্দের দিকে খেয়াল রেখেই নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তবে একসঙ্গে মিলনভোজের এই আয়োজনে যার জন্য মানত করা হয় তাকে বিশেষ ব্রত পালন করতে হয়। আর সেইভাবে সব অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে।

সাধু আন্তোনিয়ো স্মরণার্থক বাণী

ভাওয়াল এলাকায় বিশেষ করে নাগরী ধর্মপল্লীর প্রায় প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালে সাধু আন্তোনিয়োর ছবি আঁকা দেখা যায়। সেই সব ছবির পাশে আন্তোনিয়োকে উদেশ্যে করে তাঁর মহিমাসূচক বাক্যাংশ লেখা থাকে। সেগুলোর মধ্যে আমার চোখে পড়েছে– "সাধু আন্তনির জয়" এবং "তোমার মহিমা হোক সাধু আন্তনি"। তবে সাধু আন্তোনিয়োর কাছে মঙ্গল প্রার্থনাই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। অধিকাংশ জায়গায় লেখা দেখা যায় "সাধু আন্তনি, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।" আবার কালীগঞ্জ এলাকায় চলতে ফিরতে রিক্সা বা অটোরিক্সার পেছনে লেখা 'সাধু আন্তনি সহায়', 'জয় সাধু আন্তনি', 'সাধু আন্তনির নামে' বা 'সাধু আন্তনির নামে চলিলাম'– প্রভৃতি ভক্তিমূলক লেখা দেখতে পাওয়া যায়। আর খ্রিষ্টান লোকেরাই সচরাচর সেসব বাহনের মালিক হয়ে থাকেন। চলার পথে এই সাধুর শরণ নিয়ে তিনি সবাইকে রক্ষা করেন বলে তাঁদের একান্ত বিশ্বাস।

সাধক নামে আন্তোনিয়োর মেলা

বাঙালির ধর্ম-সাধনার সঙ্গে তার সংস্কৃতি চর্চার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সাধু আন্তোনিয়োর তীর্থ এবং পর্ব অনুষ্ঠানের সময়ও নানা জায়গায় মেলা বসে। তবে এই কথা স্বীকার করতেই হয় যে, আন্তোনিয়োর তীর্থের চত্বরে কোনো মেলার আয়োজন করা হয় না। সেখানে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য যাতে কোনোভাবেই নষ্ট না হয় সেদিকে কড়া নজরদারি করা হয়। তবে উপাসনা-চত্বরের বাইরে বা আশে-পাশে মেলা বসানোর ব্যাপারে কারও কোনো আপত্তি থাকে না। পানজোরা পর্বোৎসবে দেখা যায় সাধু আন্তোনিয়ো চত্বরের বাইরে ফাঁকা জায়গায় মানুষ তাদের পসরা নিয়ে বসে পড়ে।

৯৯. আলেকজেণ্ডার গমেজ (জাভু), গায়ক, *সাধু আন্তনীর পালাগান*, বনপাড়া, ২০১৭, পৃ. ৯০

একইভাবে রাজশাহীতে কাতুলীর পর্বে ও এবং বরিশালের রাজাবাড়িয়ায়ও মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় নানা ধরনের মানুষের চাহিদা মোতাবেক নানা পণ্য বেচাকেনা হয়ে থাকে। আমি কয়েকটি মেলায় ঘুরে দেখেছি সেখানে গৃহস্থালির সমস্ত জিনিসপত্র, রান্নার সামগ্রী, প্লাস্টিক ও মাটির তৈরি খেলনা, খাবার-দাবারের স্টল ছাড়াও নানা ধরনের আনন্দদায়ক খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে। আন্তোনিয়োর মেলায় আবালবৃদ্ধবনিতা সবার উপস্থিতি চোখে পড়ে। খ্রিষ্টীয় সাধকের স্মরণদিনে বাঙালি জীবনের আনন্দানুষ্ঠান সর্বধর্মের মানুষের সমন্বয় সাধনের সত্যটিকেই সবার সামনে তুলে ধরে। সেসব মেলায় খ্রিষ্টানদের চেয়ে হিন্দু-মুসলমানের উপস্থিতিই বেশি চোখে পড়ে।

আন্তোনিয়ো নামের মাহাত্ম্য

বাংলাদেশে খ্রিষ্টানদের নামগুলো প্রায়শ বাইবেলভিত্তিক নাম এবং খ্রিষ্টীয় সমাজের সাধক-সাধিকার নামের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে রাখা হয়। বাংলাদেশে খ্রিষ্টানগণ তাঁদের পারিবারিক নামের সঙ্গে একটি খ্রিষ্টীয় এবং একটি দেশীয় বাংলা নাম রাখার পক্ষপাতী। তবে বিভিন্ন জায়গার খ্রিষ্টান নাম বিবেচনা করে সাধু আন্তোনিয়োর নামেই সবচেয়ে বেশি মানুষের নামকরণ দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে যদিও অনেকেই তাদের খ্রিষ্টান নাম রাখেন না, তবে আন্তোনিয়োর নামের প্রতি সবার আলাদা একটা শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। তারপরও আমরা খেয়াল করি যে, আগেকার দিনের নামকরণের মধ্যে আন্তোনিয়ো নামটিই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শোনা যায়।

সারা পৃথিবীতে আন্তোনিয়োর নামটির অনেকগুলি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ছেলেদের নামের মধ্যে বানান ও উচ্চারণভেদে আমরা পাই– আন্তোনিয়ো, আন্তোনিও, আন্তনিও, আন্তনি, আন্তনী, এন্টনী, টনি, এন্টোনিয়ান, এন্টো, এ্যান্থনী, এন্থনী, আইন্তন, আন্তুনি, আন্তন, এটিয়েন, আন্তোয়ান– এমনই নানা রূপ দেখা যায়। আবার অন্যদিকে মেয়েদের নামের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি– আন্তে, আন্তোনিয়েতা, আন্তোনিয়া– নানা রকম রূপভেদ। শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য কাথলিক অধ্যুষিত অঞ্চলেও খ্রিষ্টান সন্তান-সন্তোতির নাম আন্তোনিয়োর নামের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে গৃহীত হয়। অনেক সময় পিতামাতারা বিশ্বাস করেন যে, আন্তোনিয়োর নামের মাহাত্ম্যে তাঁদের সন্তান সন্তোতিও সাধুর মতোই পুণ্য-পবিত্র জীবনের অধিকারী হবে এবং ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করবে।

শুধু ব্যক্তি নামই নয় অনেক প্রতিষ্ঠানের নামও সাধু আন্তোনিয়োর নামে রাখা হয়। আমরা ইতিপূর্বে খেয়াল করেছি অনেক তীর্থমন্দির, গির্জা, স্কুল, হাসপাতাল, হস্টেল এই নামে প্রতিষ্ঠিত। শুধু তা-ই নয়; বাংলাদেশে খ্রিষ্টান এলাকায়, বিশেষ করে সাধক আন্তোনিয়োর তীর্থভূমির কাছে পাঁচটি জায়গায় সাধু আন্তোনিয়োর নামে রাস্তার নামকরণ দেখেছি। পানজোরা, মহিপাড়া,

কাতুলী, রাজাবাড়িয়া, কমলাপুর– প্রভৃতি তীর্থমন্দির ও উপাসনাগৃহের আশে-পাশের রাস্তা সাধুর নামে রাখা হয়েছে। পানজোরা তীর্থমন্দিরের প্রাচীরের গায়ে লেখা আছে 'সাধু আন্তনির বাউণ্ডারী'।

খ্রিষ্টান মালিকানাধীণ দোকানপাটও অনেক সময় সাধক আন্তেনিয়োর নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। নাগরী বাজারে সাধু আন্তোনিয়োর নামে বেশ কয়েকটা দোকান আছে। সেগুলোর মধ্যে খ্রিষ্টধর্মীয় স্মারক ও অন্যান্য উপাদানের দোকান, খাতাপত্রের দোকান, মুদি দোকান, কাঠের আসবাবপত্রের দোকান, একটা ছোট রেষ্টুরেন্ট এবং একটা চায়ের দোকানও আছে। আবার কালীগঞ্জের মঠবাড়িতে ওষুধের দোকান, আবসবাবপত্রের দোকান এবং পোষাকের দোকান সাধু আন্তোনিয়োর নামে রাখা আছে। এমনকি কালীগঞ্জের দড়িপাড়ায় যদিও খ্রিষ্টধর্মীয় কোনো প্রতিষ্ঠান আন্তোনিয়োর নামে নেই, কিন্তু রাঙামাটিয়া যাবার রাস্তায় রেলপথের ধারে একটি মুদির দোকান রয়েছে তার নাম 'সাধু আন্তনী স্টোর'। একইভাবে আবার সাভারের কমলাপুরে যেহেতু তীর্থস্থান আছে, সেহেতু সেখানে মুদির দোকান এবং কাপড়ের দোকানও আন্তোনিয়োর নামে আছে।

সাধু আন্তোনিয়োর নামে বিভিন্ন খ্রিষ্টধর্মপল্লীতে যুবকদের সমন্বয়ে নানা রকম ক্লাব গঠিত হয়েছে। ভাওয়াল ও আঠারগ্রামের এই ধরনের ছয়ুট ক্লাবের সন্ধান পাওয়া গেছে। যুব-সমাজের মধ্যে আন্তোনিয়োর গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বাড়ছে। তাই আমরা দেখি, সাভারের কমলাপুর যুবসমিতি প্রতিবছর ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর গ্রামগুলোর মধ্যে 'সাধু আন্তোনিয়ো ফুটবল টুর্নামেন্ট'-র আয়োজন করে। সেই ফুটবল খেলা ঘিরে এলাকায় একটি উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই ক্লাব থেকে পানজোরায় অনুষ্ঠিত তীর্থযাত্রায় সাভারের ভক্তদের যাতায়াতের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়।

ভাওয়াল খ্রিষ্টীয় সংস্কৃতি সমীক্ষা

ভাওয়াল অঞ্চলের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। সেটা খ্রিষ্টধর্মের সংস্পর্শে গড়ে উঠেছে। গান-বাজনায় ভাওয়াল সব সময়ই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সেখানে খ্রিষ্টীয় পালাগানগুলি খ্রিষ্টের বাণী প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ভাওয়ালের বৈঠকি গান এক সময় খ্রিষ্টানদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের এক বড় উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। চড়াখোলা, পিপ্রাশৈর, দড়িপাড়া, রাঙামাটিয়া ও মাল্লা দলের গায়েনদের প্রতিযোগিতা ছিল মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

শুধু ঢাকা জেলায়ই নয়; তৎকালীর রাজশাহী জেলার বনপাড়া মিশনের অধীনে ছিল দুইটি দল। বনপাড়া-কালিকাপুর-হারোয়া এই তিন গ্রাম সম্মিলিত ভাবে একটি দল এবং অন্যদিকে ভবানীপুর-শ্রীখণ্ডী এই দুইটি গ্রাম মিলে হত আরেকটি দল। দুই দলের মধ্যে বৈঠকি গানের প্রতিযোগিতা ছিল মানুষের আগ্রহ ও কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। বছরে অন্তত দুই বার এমন আয়োজন করা হত। আমি নিজের চোখে দেখেছি যে নাটোরের কালিকাপুর গ্রামের গায়েন যোসেফ ডেঙ্গু কস্তা এবং ভবানীপুরের সরকার যোসেফ ছৈয়াল কস্তার চাপান-উতোর উপভোগ করতে করতে মানুষ অনেক সময় আবেগপ্রবণ হয়ে যেত। পালাগানের

আসরের দলাদলি মাঝে মাঝে উপস্থিত জনতার মধ্যেও ছড়িয়ে যেত। প্রতিযোগী গ্রামের লোকদের মধ্যে এই আবেগ কোনোভাবেই ছোট করে দেখার বিষয় ছিল না। অবশ্য কয়েকদিন এমন উত্তেজনা থাকার পর আবার সেটা আপনি আপনিই প্রশমিত হতো।

ভাওয়াল এলাকায় গায়েনদের মধ্যে তুমিলিয়া মিশনের যোসেফ এবং আব্রাহাম নামের দুই ভাই, অরুণ কস্তা, জর্জ গমেজ, পিটার রিবেরু, নাগর গায়েন, এডবিন কস্তা আজও মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত সশ্রদ্ধ নাম। এ ছাড়াও এই এলাকায় বুধাই বুইদ্দা কোড়াইয়া, গোপাল কোড়াইয়া, বিছান্তি রোজারিও, পেদ্রু রোজারিও, দাগু গমেজ, আলফ্রেড পালমা, লুকাস পালমা– প্রমুখ ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় পালা গায়েন। অন্যদিকে সাভারের গায়েনদের মধ্যে মাণিক গমেজ, বিজয় কস্তা, ডমিনিক রোজারিও, আদম রোজারিও– গ্রহণযোগ্যতায় আজ পর্যন্ত তুলনাহীন। একইভাবে রাঙামাটিয়া মিশনের ছিলভেষ্টার ছিলু পালমা, ডগলাস দগু পালমা, ক্লেমেন্ট কেলু কস্তা, রবি রিবেরু, মিলন রোজারিও– প্রমুখ পালাকার শুধু ভাওয়াল নয়; এলাকার বাইরেও সুনামের সঙ্গে গান পরিবেশন করে যাচ্ছেন। তবে নাগরী মিশনের বাদু আন্তনি রোজারিও, বার্ণাড পোর্‌হা রোজারিও, সমর রোজারিও– সাধক আন্তোনিয়ো পালাগান গাইবার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত।

সেইসঙ্গে স্মরণ করতে হয় দড়িপাড়া গ্রামের জন রোজারিও, চড়াখোলা গ্রামের সুনীল পেরেরা, বোয়ালি গ্রামে অরুণ কোড়াইয়া, নাটোর বনপাড়া গ্রামের আলেকজাণ্ডার জাম্ভু গমেজ ও তাঁর ভাই সুব্রত গমেজ প্রমুখ– এখনও তাঁদের বলিষ্ঠ কণ্ঠের দৌলতে আন্তোনিয়ো পালাগান পরিবেশনের রীতিতে স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। তাঁদের গানে মানুষ আজও আন্তোনিয়ো ঠাকুরের প্রসাদ ও করুণা লাভ করে থাকেন। তাই তাঁদের প্রতি সব মানুষের এক অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবোধ থাকে।

আজও মানুষের মুখে শোনা যায় চড়াখোলা গ্রামের যিশুর লীলা, আগ্নেশের পালা, বৈঠকি গান, ঠাকুরের গান; পিপ্রাশৈর গ্রামের বৈঠকি গান, ঠাকুরের গান, যিশুর লীলা, ভেটুর গ্রামের সাধু যোহনের পালা, আগ্নেশের পালা, দড়িপাড়া গ্রামের আগ্নেশের পালা, লুদুরিয়া গ্রামের যিশুর লীলা, নাগরীর আগ্নেশের পালা এখনও মাঝে মাঝে নিজস্বতার ছাপ রাখতে পারে। সেই সঙ্গে নাটোরের বনপাড়ায় ঠাকুরের গান, বৈঠকি গান প্রচলিত থাকলেও আগ্নেশের পালা ও অন্যান্য পালা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে।

নাটোর জেলার আরও কিছু মিশন বোর্ণী, মথুরাপুর, ফৈলজানা, রাজাপুর– এমনই নানা জায়গায় পালাগানের রীতি এককালে বেশ জোড়ালো ছিল। বর্তমানে অনেকাংশেই সেগুলো স্তিমিত হয়ে গেছে। তবে আধুনিক প্রযুক্তির অভিঘাতে আমাদের লোকায়ত সাধনা ও সংস্কৃতি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবে বলে বিশ্বাস করি।

উপসংহার

সমাজ বাস্তবতার ধারা এবং মানবজীবনের সাধনার ফলে অনেক সময় জাতীয় জীবনে একটা বিশিষ্টতা গড়ে ওঠে। জাতীয় পর্যায়ের এই বৈশিষ্ট্যকে কোনো দেশের বা জাতির সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে। অতএব সংস্কৃতি হল মানবসভ্যতাজনিত উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ হচ্ছে মানুষের জীবনের ধরণ বিষয়ক উৎকর্ষ; তার জীবনচর্চার উৎকর্ষ। উৎকর্ষের প্রসঙ্গ এলেই সেখানে অবধারিতভাবে অনুশীলনের প্রসঙ্গ আসে। তাই সংস্কৃতি অনুশীলন সাপেক্ষ। এই প্রেক্ষাপট থেকে বলা যায় যে, কালের পরম্পরায় সংস্কৃতি প্রবহমান। যুগের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন ঘটে; ঘটে রূপান্তর। আবার দেখা যায়, নতুনত্বের পথে এগিয়ে যাবার সময় আস্তে আস্তে এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশের সংস্কৃতির চেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। এই ভাবেই পরিশেষে নিজস্ব একটা অবয়ব ধারণ করে। এই বিশিষ্টতা কোনো নির্দিষ্ট জাতির শিল্প-সাহিত্য, আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, পোষাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়া, চিন্তা-ভাবনা, ভক্তি-বিশ্বাস, পূজা-অর্চনা– মোট কথা, মানুষের ব্যক্তি-জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক-জীবন এবং সমাজ-জীবনের সমস্ত আচরণের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

একটি দেশের সামগ্রিক সংস্কৃতিকে আমরা জাতীয় সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করতে পারি। ক্ষেত্রবিশেষে জাতীয় সংস্কৃতি ব্যক্তিচৈতন্যসমৃদ্ধ শিষ্টজনের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু গোষ্ঠীবদ্ধ সামগ্রিক জীবনাশ্রয়ী সংস্কৃতির কাছে তার দায়বদ্ধতা অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে যূথবদ্ধ মানুষের একেবারে নিজস্ব জীবনাচরণের ধারাকে লোকসংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়। আর লোকসংস্কৃতির প্রাথমিক ভিত্তির উপরেই জাতীয় সংস্কৃতির উত্থান ও প্রসার ঘটে থাকে। লোকসংস্কৃতি যেহেতু একান্তভাবেই লোকজীবন আধারিত, সেহেতু সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্য যুগোপযোগী মাধ্যমরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। সেই ধারায় একটা স্বতন্ত্র সাহিত্য উপকরণ তৈরি হয়ে নানা স্তর পেরিয়ে উৎকর্ষ লাভ করে।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান এমনই একটি যুগোপযোগী লোকসাহিত্যের প্রকরণ হিসেবে বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই পালাগানে লোক-কবিগণ নানা সময়ে স্বতস্ফূর্তভাবে জীবনের শাশ্বত সত্যগুলিকে উপস্থাপন করার প্রয়াসী হয়েছেন। নিষ্ঠার সঙ্গে দেশীয় ঐতিহ্যকে একটা বিদেশি এবং নতুন ধর্মের সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পের যথাযথ মেলবন্ধনরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁদের সবার মিলিত প্রচেষ্টায় এই লোককৃতি আমাদের সমাজের এবং জাতির অমূল্য এক সম্পদ হয়ে উঠেছে। অতএব সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানকে বাংলাদেশে শুধু খ্রিষ্টান সমাজেরই নয়, গোটা দেশেরই ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করা যায়। সেখানে শুধু খ্রিষ্টবিশ্বাসী মানুষের কথাই উঠে আসেনি, বরং হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান সকলেরই যাপিত জীবনের এক অনুপুঙ্খ চিত্র সেখানে দেখতে পাওয়া যায়।

অবশ্য এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাধনায় বাঙালির চেয়ে বিদেশি প্রাজ্ঞজনেরাই প্রথম মনোনিবেশ করেছেন। আমরা অনেকেই সেই বিষয়টা খুব ভালভাবে অবগত নই। তাই প্রথম অধ্যায়ে আমাদের অন্বেষণের বিষয় হিসাবে আমরা নিয়েছি 'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ইউরোপীয় উত্তরাধিকার'। আলোচনার শুরুতেই বঙ্গদেশের সঙ্গে ইউরোপের সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সেই সুবাদে খ্রিষ্টধর্ম-প্রচারকদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার প্রয়াস এবং আমাদের দেশীয় ভাষায় ও ভাবে পুস্তক-পুস্তিকা রচনায় তাঁদের প্রচেষ্টা উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। আমাদের দেশে খ্রিষ্টান এবং অখ্রিষ্টান অনেক মানুষই জানেন না যে, বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারে জেজুইট ফাদারদের প্রচেষ্টা ছিল অপরিসীম। তাঁরাই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশীয় স্থাপত্যশৈলির মেলবন্ধনে বঙ্গদেশে প্রথম উপাসনাগৃহ নির্মাণ, স্থানীয় জনগণের বৌদ্ধিক বিকাশের লক্ষে তাঁরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শুরু, খ্রিষ্টীয় উপাসনা ও প্রার্থনার তাগিদে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি-পুস্তিকা রচনা ও অনুবাদ, খ্রিষ্টধর্মের সংস্কৃত্যায়ন বা দেশীয়করণের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের সমন্বয় সাধন, সমাজসেবার আকাঙ্ক্ষায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা; প্রচারকাজে ও ধর্মশিক্ষায় গানের ব্যবহার– এমনই নানা মহৎ আয়োজন যা আমাদের দেশ ও জনগণের জীবনে সুদূরপ্রসারী উপযোগিতা ও কার্যকরী ভূমিকা আনয়ন করেছে। আলোচ্য গবেষণায় সেই দিকটি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর সেই পথ-পরিক্রমায় অনিবার্যভাবে সাক্ষাৎ পাই বাংলা ভাষা-সাহিত্যের অন্যতম রূপকার দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও নাম্নী এক বিদগ্ধ বঙ্গ-সন্তানের। ইতিহাসে উপেক্ষিত ভূষণার এই রাজপুত্র মগদস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়ে ভাগ্যক্রমে খ্রিষ্টান এক মিশনারির সান্নিধ্যে আসেন। সেই খ্রিষ্টসাধকের সহায়তায় খ্রিষ্টীধর্ম এবং খ্রিষ্টীয় সত্যসমূহ আত্মস্থ করে বাঙালির কাছে নবোদ্যমে প্রচার করেন। তাঁরই উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জোয়ার আসে। তিনি গানের মাধ্যমে গীতিপ্রাণ বাঙালির মন ও মননে অনায়াসে যিশুখ্রিষ্টকে তাদের অন্তরের ধন ও আপনজন হিসাবে পৌঁছে দেন। আমাদের এই আলোচ্য গবেষণায় আমরা প্রথম আবিষ্কার করেছি যে, দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও-ই বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পালাগান রচনার প্রথম প্রয়াসী হয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, আলোচ্য গবেষণায় যে বিষয়টিকে ভিত্তি করে আমাদের আলোচনা, সেই আন্তোনিয়ো পালাগানের রচনা ও প্রচলনে তিনিই যে আদি-পুরুষ, সেই সত্যটিকেও আমরা অনায়াস দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থাপন করেছি। দোম আন্তোনিয়োর নিজের রচিত খ্রিষ্টগীতিকার মাধ্যমে প্রচারের ফলেই হাজার হাজার মানুষ সেই ধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আমরা এ-ও জেনেছি যে, দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও পর্তুগিজ ভাষা রপ্ত করে শুধু দোভাষীর কাজই করেননি, তিনি পুস্তক রচনার ক্ষেত্রেও এক নবদিগন্তের সূচনা করেছেন। অতএব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম গদ্যগ্রন্থ *ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ* রচনার কৃতিত্বও তাঁরই। এ ছাড়াও বিদেশি ধর্মপ্রচারকদের গ্রন্থরচনায় তাঁর যে অকুণ্ঠ সহায়তা ছিল সেই কথাও সুবিদিত। তাঁর ফলেই রচিত হয়েছে *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* এবং *বাংলা পর্তুগিজ অভিধান* জাতীয় মূল্যবান গ্রন্থসমূহ। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা বঙ্গদেশে প্রথমদিকের খ্রিষ্টানদের পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাই। সেই সঙ্গে বঙ্গদেশে পর্তুগিজদের অবদান সমীক্ষার সুযোগও লাভ করি।

খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সাধক আন্তোনিয়ো ও তাঁর জীবন পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পেরেছি যে, পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে জন্মগ্রহণ করে তিনি আফ্রিকার মরক্কো দেশে খ্রিষ্টের বাণী ও আদর্শ প্রচারের মনোবাসনা পোষণ করেছেন। কিন্তু ভাগ্যচক্রে তাঁর জাহাজডুবির ফলে তিনি ইতালির পাদুয়া নগরে এসে তাঁর সাধনকর্ম শুরু করেন। পাদুয়া নগরের এই সাধু অচিরেই দিকে দিকে উত্তম উপদেশদাতা হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। শুধু মানুষের কাছে যিশুর বাণী প্রচারই নয়, খ্রিষ্টীয় আদর্শ তুলে ধরার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী। তাই সমাজ-সংস্কারক হিসাবে তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করে সমাজের কুপ্রথা ও প্রভাব দূরীকরণে, দেউলিয়া আইন রদে এবং ভ্রান্তমতবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার ছিলেন। ভক্তদের বিশ্বাস ও ভালবাসার বদৌলতে তিনি 'আশ্চর্য কর্মসাধক' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাই মহাপ্রয়াণের পর আন্তোনিয়োকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'সাধু' বলে ঘোষণা করা হয়। সেই সাধু আন্তোনিয়োই আমাদের বঙ্গদেশে খ্রিষ্টবিশ্বাসের ধারক। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমাদের অনুধ্যানের বিষয় 'সাধু আন্তোনিয়োর জীবনচরিত ও বাঙালি খ্রিষ্টজনজীবনে তাঁর প্রভাব' খুবই প্রাসঙ্গিক। ইউরোপের খ্রিষ্টসাধককে অন্তরে ধারণ করে তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বাংলাদেশের ঢাকা জেলার ভাওয়াল এলাকায় গড়ে উঠেছে সাধক আন্তোনিয়োর সম্মানে এক তীর্থভূমি। নাগরির জনগণ ও জনজীবনে সাধক আন্তোনিয়ো এক জাগ্রত প্রসাদদাতারূপে ভক্তদের হারানো জিনিস ফিরে পেতে তাঁর কাছে কৃত মানত ও প্রার্থনা পূরণ করেন। সেখান থেকে আমাদের দেশের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত সমস্ত অঞ্চলে তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ভক্তি-বিশ্বাস প্রকাশের একটা সুনির্দিষ্ট রীতি। তাই আমরা দেখি সপ্তাহের মঙ্গলবার সাধু আন্তোনিয়োর প্রতি নিবেদিত বিশেষ সম্মানার্থ দিবস হিসাবে বিবেচিত। বাংলাদেশে তাঁর প্রতি ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবার ফলেই সাধক আন্তোনিয়োর নামে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আরও বেশ কিছু তীর্থস্থানের গোড়াপত্তন ঘটেছে। সেই সঙ্গে সাধক আন্তোনিয়োর নামে গির্জা এবং খ্রিষ্টীয় নানা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত হচ্ছে। এমন কি পবিত্র স্মারক হিসাবে সাধু আন্তোনিয়োর জিহ্বা সুদূর ইতালির পাদুয়া শহর থেকে বাংলাদেশে এনে প্রদর্শিত হয়েছে। সাধক আন্তোনিয়োকে ঘিরে বাংলাদেশের খ্রিষ্টানদের এই ভক্তি প্রদর্শনের রীতি তথ্যে ও তত্ত্বে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে উপস্থাপিত হয়েছে। এতদিন এই বিষয়টি বাংলাদেশে শুধুমাত্র খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে বর্তমান গবেষণার ফলে সাধক আন্তোনিয়োর ও তাঁর অবদানের তথ্যসমূহ বাংলা ভাষাভাষী সমস্ত মানুষের সামনে অবারিত হয়েছে। সেটা নিঃসন্দেহে এক শুভ উদ্যোগ।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান খ্রিষ্টীয় রীতিতে প্রচলিত ও পরিবেশিত একটি শক্তিশালী লোকজ উপাদান। আমাদের দেশীয় লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ এখানে নিহিত থাকলেও তার পূর্বাপর রীতিকে আন্তোনিয়ো পালাগান ধারণ করে আছে। তাই এই গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের ধ্যেয় বিষয় 'সাধক আন্তোনিয়ো পালাগানে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান'। এই পর্বের অনুসন্ধানে প্রথমত আমরা পালাগানের সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়, তার বিষয়বস্তু আলোকপাত, পালাগানের পূর্বাপর ঐতিহ্য নিরীক্ষণ এবং তার গঠন ও গীতিধর্মিতা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের অন্বেষাকে তথ্যবহুল করার অভিপ্রায়ে

আমরা বাংলা পালাগান ও ইউরোপীয় তথা ইংরেজি ব্যালাডের প্রেক্ষাপট ও প্রকারভেদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের পালাগানের ধারায় যে দিকটি সম্পূর্ণ অনালোকিত ছিল সেটি হচ্ছে খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় রচিত বিভিন্ন পালাগান নিয়ে আলোচনা। খ্রিষ্টীয় পালাগানের দীর্ঘ তালিকায় আমরা দেখি সবচেয়ে জনপ্রিয় পালা হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে– সাধ্বী আগ্নেশের পালা, যিশুর কষ্টভোগের পালা এবং রামুর পালা। উল্লেখিত এই পালাসমূহের মধ্যে যে একটি অন্তর্যোগ রয়েছে, সেটাও এই আলোচনায় যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও খ্রিষ্টীয় অন্যান্য পালাগানের মধ্যে উল্লেখ করার মত হচ্ছে যিশুর জন্মের পালা, কুমারী মারিয়ার পালা, সাধু যোসেফের পালা, সাধু যোহনের পালা, সাধু পিতরের পালা, মারিয়া মাগ্দালেনার পালা, সাধু পলের পালা, সাধু আগাপিতের পালা, সাধ্বী ফিলোমিনার পালা ইত্যাদি। তৃতীয় ধাপে সাধক আন্তোনিয়ো পালাগানের বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের লিখিত রূপ, ও মৌখিক রূপের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের প্রচেষ্টায় মৌখিক পালাগানের জনপ্রিয়তা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, আমাদের এই গবেষণাকর্মকে সার্থক করে তোলার প্রয়াসে ৭ – ১০ অক্টোবর ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে গাজিপুরের কুচিলাবাড়ি যিশুসংঘের নবজ্যোতি নিকেতন কেন্দ্রে প্রথমবারের মত সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের জাতীয় উৎসবের করি। সেই উৎসবে বাংলাদেশে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান পরিবেশনের সবগুলি দল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সেই আয়োজন থেকে জানা যায় যে, আমাদের দেশে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান পরিবেশনের মোট ১৮টি দল রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে মাত্র একটি দল লিখিত পালাগান পরিবেশন করে থাকে। বাকি ১৭টি দল অলিখিত পালাগান বা মৌখিক রীতির পালাগান গায়। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বঙ্গদেশে সাধু আন্তোনিয়োর জীবনী অবলম্বনে রচিত অলিখিত পালাগানের যে ধারাটি বর্তমানে প্রচলিত, সেই ধারাটির প্রর্বতক দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও।

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান শুধু লোকসাহিত্যের উপাদান হিসাবেই বিবেচ্য নয়। ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টানের কাছে এই গান ভক্তি-বিশ্বাস প্রকাশের এক জাগ্রত মাধ্যম। তাই গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে আমাদের অনুসন্ধান 'সাধক আন্তোনিয়ো পালা এবং বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টীয় সাধনার রূপ' শীর্ষক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগে আমরা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের সাঙ্গীতিক ও সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণে ব্রতী হয়েছি। এই প্রচেষ্টায় সাধক আন্তোনিয়ো পালাগানের সঙ্গীতময়তা আবিষ্কারের লক্ষ্যে তার সুর, ধুয়া, ধুয়া গাইবার উদ্দেশ্য, পালাগানের বন্দনা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পালাগানের সুরে বাংলাদেশের ভাটিয়ালি সুরের প্রাধান্য দেখা যায়। সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের ধুয়া গাইবার রীতি-নীতির মধ্যেও আমাদের দেশের অন্যান্য পালাগানের আদল এবং ধারা অনুসৃত হয়েছে। তবে সাধক আন্তোনিয়ো পালাগানের বন্দনায় আমরা আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের, বিশেষত ময়মনসিংহ গীতিকার অনুবর্তন লক্ষ করেছি। এই বিষয়টি ইতিপূর্বে কোথাও আলোচিত হয়নি। সেই বিবেচনায় এই গবেষণা ও তার প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যগুলো নতুনত্বের দাবি করতে পারে।

অন্যদিকে পালাগানের সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয়ের লক্ষ্যে আমরা পালাগানের ছন্দ, অলঙ্কার, প্রবাদ-প্রবচন, বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের ব্যবহার, প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস, সমাজচিত্র; চরিত্র চিত্রণ, ঐতিহাসিক উপাদান ও ভাষা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। বাংলা সাহিত্য প্রকরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমন আলোচনা আন্তোনিয়ো পালাগানকে সাহিত্যের, বিশেষ করে লোকসাহিত্যের আসরে এক অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হবে বলে মনে করি। একই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে আমাদের অভিনিবেশের লক্ষ ছিল সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে খ্রিষ্টীয় সাধনার স্বরূপ। তারই ফলশ্রুতিতে এই পর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান গাওয়ানোর রীতি, গান গাওয়ানোর জন্য মানত করা, মানত করার নিয়ম-কানুন, গানের জন্য বায়না করা, গানের খরচ, গায়েন-বায়েনদের ব্যয়ভার– ইত্যাদি বিষয়সমূহ লোকসাহিত্যের আলোচনা ও সমালোচনা শাখায় অদ্বিতীয়। সেই সঙ্গে পালাগান গাইবার পদ্ধতি ও রীতি-নীতি এই পর্যায়ের আলোচনায় আওতাভূক্ত হয়েছে। তার ফলে আমরা খ্রিষ্টীয় লোকজ রীতির একটি স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করি। সেই পথ ধরে যাঁরা পালাগান পরিবেশন করেন, তাঁদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেছি। পালাগানের গায়েন ও দলের বিভিন্ন সদস্য; বিশেষত দোহার ও পাইল দোহার, বায়েন প্রমুখের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর তাই সূত্র ধরে আন্তোনিয়ো পালাগানের কয়েকজন গায়েন, বিশেষত যোসেফ ডেঙ্গু কস্তা, সুব্রত গমেজ, সুনীল পেরেরা, আন্তনি রোজারিও (বাদু আন্তনি), বার্ণাড রোজারিও (পোর্‌হা) ও অরুণ কোড়াইয়ার জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রয়াসে আমরা খ্রিষ্টীয় লোককবিদের অন্তরালবর্তী জীবনের এক অজানা অধ্যায় আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছি।

আমরা জানি বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্ম ইউরোপ থেকে এসেছে। তার বিষয়বস্তু ও আধ্যাত্মিকতাও পাশ্চাত্য অনুষঙ্গের অনুসারী। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মের বিষয় নিয়ে বঙ্গদেশে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে, বিশেষত লোকসাহিত্যের যে অবয়ব লাভ করেছে; তার মধ্যে আমাদের দেশীয় লোকজ উপাদান রয়েছে। তাই গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে 'সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাব-সংশ্লেষ'। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে বাংলা সাহিত্যের অনুবর্তন নিয়ে অনুধ্যান করেছি। সেই নিরিখে গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান, নাথ-গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান, ময়মনসিংহ গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে বন্দনা এবং প্রেক্ষাপট বর্ণনা; পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান, পীর-গাজিপালা ও সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের তুলনামূলক আলোচনায় উদ্যোগী হয়েছি। আমরা অবাক হয়েছি খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় রচিত সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের সঙ্গে বঙ্গদেশে প্রচলিত অন্যান্য পালাগানের ধরণ ও উপস্থাপনের যে সাদৃশ্য রয়েছে, সেটা দেখে। মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে, শুধু ধর্মীয় প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সব মানুষের অন্তরাত্মায় যে মিলনাকাঙ্খার ধারা প্রবহমান তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানে। তাই আলোচনার সুবিধার জন্য সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের লিখিত রূপ নিয়েও অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে সাধু আন্তোনিয়োকেন্দ্রিক ভক্তি-বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই

পর্যায়ে সাধু আন্তোনিয়োর নামে তীর্থ, সাধু আন্তোনিয়োর সম্মানে নভেনা বা নবাহ, সাধু আন্তোনিয়োর পর্ব পালন, আন্তোনিয়োর কাছে মানত করা, ঠাকুরের গীত গাওয়ানো, সাধু আন্তোনিয়োর নামে রুটি-বিস্কুট বিতরণ, সাধু আন্তোনিয়োর আল্তার বানানো, প্রতি মঙ্গলবার সাধু আন্তোনিয়োকে স্মরণ, সাধু আন্তোনিয়োর নামে মানুষকে খাওয়ানো, সাধু আন্তোনিয়ো স্মরণার্থক বাণী, সাধক আন্তোনিয়ো মেলা, আন্তোনিয়ো নামের মাহাত্ম্য– প্রভৃতি বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশে বসবাসরত একটি নির্দিষ্ট জনজাতির শুধু ধর্মীয় নয়, বরং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দিকটিও ধরতে পেরেছি। তার ফলে তারা আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে উঠেছে। তাই বলা যায়, সাধু আন্তোনিয়োকে ঘিরে খ্রিষ্টসমাজের আধ্যাত্মিক চর্চার বিষয়টি গবেষণার মাধ্যমে উপস্থাপন করা বাংলাদেশে লোকজ ধারার রূপায়ণে এক নতুন সংযোজন।

লোকসাহিত্য সংগ্রহ একটি সাধনার বিষয়। লোকসাহিত্য সংকলন করাকে এক ধরনের আত্মত্যাগ বা স্বার্থত্যাগ বলা যেতে পারে। আস্তে আস্তে এক্ষেত্রে মানুষের অনুরাগ বাড়লেও তার মধ্যে লোকসাহিত্যের কৃত্রিম অনুরাগী বা সৌখিন অনুরাগীর সংখ্যা কম নয়। লোকসাহিত্যের যথাযথ অনুরাগী হতে হলে এই সাহিত্যের প্রতি শিক্ষাগত শৃঙ্খলার প্রয়োজন আছে। তার সঙ্গে মানুষের জীবনে এই সাহিত্যের প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করা দরকার। লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির সুষ্ঠভাবে সংরক্ষণ করাও একান্ত জরুরি। এক্ষেত্রে সবার সামনে লোকসাহিত্যের সত্যিকার স্বরূপ তুলে ধরাটাও অপরিহার্য। পাঠকসমাজে সুষ্ঠভাবে লোকসাহিত্যের উপস্থাপন করাই আমার মতে লোকসাহিত্য সংকলকের প্রধান কাজ এবং কর্তব্য। তাই এই কাজে ব্রতী হয়ে আমি নিজেই উপলব্ধি করেছি যে, লোকসাহিত্য সংগ্রহ একটা সাধনা। আরও বলতে গেলে এটা এক ধরনের আত্মত্যাগ। এখানে যেমন দরকার কর্মনিষ্ঠা, তেমনি প্রয়োজন নিজস্ব সংস্কৃতি তথা সংহত ও লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ।

এই বিশ্বাস ও মানসিকতা নিয়ে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান সংগ্রহে ব্রতী হবার ফলে দেখেছি যে, আমি নিজেই চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার সীমা অতিক্রম করে একটি ব্যাপ্ত মানসিকতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এই পালাগানে মহান সাধক আন্তোনিয়োর জীবনী একটা উপলক্ষ মাত্র। সাধক আন্তোনিয়োর আপাত সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপনে লোক-কবিগণ যে সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, সেটা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা একটা দায়িত্ব বলে মনে হয়। দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও একটা পালাগান প্রচলন করে দেবার পর অনেক বছর পেরিয়ে গিয়েছে। খ্রিষ্টধর্ম ও সনাতন ধর্মের অধীত জ্ঞান এবং বাংলাদেশের প্রচলিত একটা লোকমাধ্যমকে ব্যবহার করে নিজের শিল্প-কুশলতার যে বিস্তার তিনি ঘটিয়েছেন– তার গতি আজও রুদ্ধ হয়ে যায়নি। সেই সময়ে হয়ত বাংলা গীতিকা বা পালাগানের ধারাটি প্রচলিত ছিল এবং বেশ জনপ্রিয় ছিল। মানুষ গান-বাজনা খুব পছন্দ করতেন। চিত্ত-বিনোদনের জন্য তাঁরা পালাগানের আসরে আসতেন। প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত দোম আন্তোনিয়ো দা রোজারিও মানুষের সামনে গানের তথা পালাগানের মোড়কে খ্রিষ্টসাধক

আন্তোনিয়োর জীবনী পরিবেশন করলেন। তার ফলে মানুষের সঙ্গীত পিপাসা মিটল এবং তাঁরা নতুন এক কাহিনী বা গল্প শোনলেন। তাতে আন্তোনিয়োর আখেরে লাভ হল। মানুষ তাঁর প্রচারিত নতুন ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রয়াসে দোম আন্তোনিয়ো এমন ভাষা ব্যবহার করলেন যার ফলে এই কাহিনি আগে না শুনলেও তাঁদের কাছে আগন্তুক মনে হয়নি। কেননা রচয়িতা তখনকার প্রচলিত ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। গ্রামীণ ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষা অনায়াসে এই পালাগানে জায়গা করে নিয়েছে। নরকের বদলে দোজখ, খ্রিষ্টীয় পুরোহিতের জায়গায় পীর, কিংবা পানি, নিকলাইয়্যা– এমনই নানা ধারণা এবং শব্দাবলী মানুষের কাছে সহজেই গৃহীত হয়েছে। আন্তোনিয়ো প্রবর্তিত ভাষা আজ হয়ত পালাগানে পুরোপুরি শোনা যায় না। কেননা লোকসাহিত্যের, বিশেষত পালাগানের ভাষায় প্রাচীনত্ব রক্ষা করা যায় না। তার ভাষা পরম্পরাগতভাবে গুরু-শিষ্যের শ্রুতির ফলে পরিবর্তিত হয়। সেই সঙ্গে কিছু ধর্মগুরুদের সংকীর্ণ চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার ফলে লোককবিগণও ভাষার প্রয়োগে সচেতন হয়ে ওঠেন, যাতে তার ভাষা ধর্মের অচলায়তনে আঘাত না হানে।

শুধু ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, আন্তোনিয়ো পালাগানে উল্লেখিত কিছু কিছু প্রসঙ্গ– যেগুলো স্থানীয় মানুষের জানা ছিল, সেগুলো গৃহীত হয়েছে। তাই সাধক আন্তোনিয়োর জ্ঞানবুদ্ধির বহর জানানোর জন্য তাঁকে “চাইর বেদ চইদ্দো শাস্ত্র” পড়ানো হয়েছে। অহঙ্কারী কেশব ভক্তের পরিণাম যে খুব খারাপ হবে, তার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে রাবণ রাজা, চাঁদ সওদাগর, হরিশ্চন্দ্র রাজার সঙ্গে সঙ্গে মোছা পেকাম্বরের প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার অনুপুঙ্খ বর্ণনা আলোচ্য পালাগানে না থাকলেও যে মানুষ ও সমাজ-ব্যবস্থার কথা সেখানে বলা হয়েছে; তা বাংলাদেশেরই পরিচিত আবহ, মানুষ এবং সমাজ। এখানেও আমরা ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত চিরকালীন বাঙালি কবির মন ও মননের পরিচয় পাই। শুধু নিজের ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার মত কূপমণ্ডুক ও সাম্প্রদায়িক চিন্তা-ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে উদারনৈতিক এবং গ্রহণীয় ও সহনীয় মন-মানসিকতার কবিকূল বাঙালির মধ্যে ছিল আমাদের এই অভিসন্দর্ভে সেই সত্যটা আমরা অবাক বিঃস্ময়ে আবিষ্কার করি।

নিছক ধর্মপ্রচারের জন্য এবং সাধু আন্তোনিয়োর প্রতি খ্রিষ্টভক্তদের ভক্তি প্রদর্শনের জন্য রচিত এই পালাগান কালের সোপান বেয়ে আজও ভক্ত মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। আজকের দিনেও মানুষ সাধু আন্তোনিয়োর নামে মানত করে। মানত পূর্ণ হলে গায়েন ডেকে পালাগান গাওয়ায়। বর্তমানে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ভক্তের আকূতি শোনে না বলেই তাঁরা আন্তোনিয়োর চরণে প্রণত হন। পালাগানের দলের ব্যস্ততা সেই কথা-ই বলে। গায়েন-বায়েন এবং হাজারো ভক্তের দাবী মানুষ জীবনের যে-কোনো পরিস্থিতিতে আন্তোনিয়োর কাছে প্রার্থনা করবেন। আন্তোনিয়োর গান

গাওয়াবেন। ব্যক্তিপূজার বহিঃপ্রকাশ নয়, লোকমাধ্যমকে আত্মস্থ করে সাধক আন্তোনিয়োর প্রতি মানুষের যে চাওয়া-পাওয়া তা অতীতে যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল, বর্তমানে তেমনি আছে আর ভবিষ্যতে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাঙালির সার্বিক সাধনায় ধর্মবোধ এবং শিল্পবোধ মিশে থাকে। অর্থাৎ গান-বাজনা, কাব্য-কবিতা, শিল্প-কলা– মোট কথা সুকোমল বৃত্তির সব ধরনের চর্চায় ধর্ম তার নিজস্ব আসন করে নেয়। পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ যে সাহিত্যের ঐতিহ্য আমাদের রয়েছে, তা থেকে লোকসাহিত্যের এই বিশেষ প্রকরণটি আলাদা নয়। শুধু ধর্মের গণ্ডির মধ্যে যদি এই পালাগান আটকে থাকে, তবে তা বৃহত্তর বা জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে না। অবশ্য বাঙালির সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনার ধারায় আমরা দেখি যে, সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান শুধু মাত্র খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই গৃহীত নয়, অন্য ধর্মাবলম্বী লোকের কাছেও যথেষ্ট সমাদর পায়। তাঁরাও অনেক সময় ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে এই সাধক পীর আন্তোনিয়োর কাছে মানত করেন। সেদিক থেকে দেখলে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান একটি সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তবুও এই কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, সব কিছু ছাপিয়ে সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান যদি বাংলা সাহিত্যের, বিশেষত লোকসাহিত্যের এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে গৃহীত হতে পারে; তবেই এই গানের সত্যিকার উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য চিন্তা-ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে। সেই কারণে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পশ্চিমা উত্তরাধিকার লক্ষণীয়। তাতে নানা জন প্রত্যক্ষভাবে এই দেশে এসেছেন এবং এখানকার ভাষা, সাহিত্য ও রীতিনীতির সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিয়েছেন। আবার অনেকেই হয়ত বঙ্গদেশে সরাসরি আসেননি, কিন্তু তাঁদের আদর্শ ও চিন্তা-ভাবনার দৌলতে পরোক্ষভাবে এখানকার মানুষকে প্রভাবিত করেছেন। সাধক আন্তোনিয়ো তাঁদেরই একজন। তাঁকে কেন্দ্র করে একইসঙ্গে ভক্তি ও বিনোদনের নানা অনুষঙ্গ তৈরি হয়েছে। আর সেগুলোর পরিমাণ এত বেশি যে, সেগুলো অনায়াসে জনজীবনে প্রভাব ফেলেছে। সাধক আন্তোনিয়োকেন্দ্রিক সাহিত্য বাংলা লোকসাহিত্যের ধারায় আঙ্গিকগত দিক থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাহিত্যের সৌন্দর্যতত্ত্ব বিচারে আমরা অভিনব এক রূপের সন্ধান পাই, যা এতদিন আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল। খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় রচিত এই সব লোকজ সাহিত্যিক উপাদান সংগ্রহ করে তার যথাযথ উপস্থাপনে আমাদের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি আরও ঋদ্ধ হবে বলে একান্তভাবে বিশ্বাস করি।

পরিশিষ্ট ১

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান

(গানের আসর থেকে রেকর্ডকৃত অংশবিশেষ)

পিরিছ বাড়ি (পিটার পিরিছ)

কালিকাপুর, বনপাড়া, নাটোর ৬৪৩০, বাংলাদেশ

১৫-১৬ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

গায়েন

যোসেফ ডেঙ্গু কস্তা (ওস্তাদ)

ও

সুব্রত গমেজ (শিষ্য)

দল

গাব্রিয়েল রোজারিও

অনিল এসেনসন

সুভাষ পিউরীফিকেশন

মনোহর রোজারিও

অনিল গমেজ

সংগ্রাহক

প্রদীপ পেরেজ

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান

আবাহন

(সুরে)
পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে,
আমেন।
আমার দয়াল যীশু আয়।
আমার দয়াল ঠাকুর আয়।
আমার স্বর্গের রাণী আয়।

বন্দনা

(সুরে)
পরথমে বন্দিয়া গামু আমরা প্রভু নিরাঞ্জন,
তাহার ঠিকানা আমার এই যে ভুবন।
স্বর্গেতে বন্দিয়া গামু আমরা স্বর্গের দেবগণ,
ভূমিষ্ঠে বন্দিয়া গামু সকল শ্রোতাগণ।
ওগো তারপর বন্দিয়া গামু আমার পিতামাতার চরণ,
যাহার গর্ভে জন্ম লইয়া দেখিলাম ভুবন।
ওস্তাদের চরণ গো আমরা বইন্দা গামু মাঠে,
সবার মধ্যে যেই গুরু মন্দিরা দিছে হাতে।
সভাতে বন্দিয়া গামু সভার পঞ্চ ভাই,
অতি মূর্খ জাইন্যা মোরে সভায় দিবেন ঠাঁই।
আইস মাগো ও কুমারী নাইমা দেও চাই বর.
গায়ে দিও জোর-বল মা গলায় মধুর স্বর।
জানিবা না জানি গীত লইলাম বান্দিয়া,
এই গীত গাইব আমার ঠাকুর আসিয়া।
বন্দনা ছাড়িয়া গো এখন গীতে রাখি মন,
তপস্যার পালা লইয়া করি আলাপন।

আলাপন

(সুরে)
নিরাঞ্জন ভাব রে ভাই নিরাঞ্জন ভাব।
নিরাঞ্জন ভাবিলে রে ভাই পরকাল পাব,
হায় হায় নিরাঞ্জন।
ওরে পরম পিতা পরমেশ্বর আমার পরম ঐ স্বর্গেতে,
আর কত রঙ্গে করছে খেলা আমার প্রভু নিরাঞ্জনে।
হায় হায় নিরাঞ্জন।

অপার তো মহিমা পিতার কে পারে বুঝিতে,
হায় হায় নিরাঞ্জন।
ভাগ্যিমান ফ্রান্সিস ভক্তে পয়দা হয় ভুবনে,
হায় হায় নিরাঞ্জন।
ভক্তে বলছে, 'দয়ার বিবি বলি গো তোমারে,
আমার মনে সাধ ছিল প্রভু ভজিবারে।

তপস্যার পালা

(কথায়)
আর এমন কথা দয়ার ভক্তে যখনই কইল,
কথা শুইনা দয়ার বিবি লাগছে কহিবারে।
আমার মনে সাধ ছিল প্রভু দেখিবারে,
আমি চইলা যামু এখন ঐরান জঙ্গলে।
এমন কথা দয়ার বিবি যখনই কহিল,
স্বামী-স্ত্রী দুইয় জনে একই মন হইল।

(সুরে)
ইহারে দেখিয়া কাঠুরিয়া ভাবে মনে মনে,
হায় হায় নিরাঞ্জন,
এই জংলা ময়দান হইল কেমনই ধরানে,
হায় হায় নিরাঞ্জন।

(কথায়)
আমরা দুই ভক্তে তপসা করি এই ঐরান জঙ্গলে;
তপস্যার কারণে জংলা ময়দান হইল তারে।
যত ছিল বাঘ ভাল্লুক এই জংলার মাঝে,
তপস্যার কারণে গেল আর কোন জঙ্গলে।

(সুরে)
রাজায় বলছে পালকি বেয়ারা আমি বলি গো তোমারে গো,
বলি গো তোমারে ।
পালকি সাজ করিয়া আন বাইর বাড়ির দখ্‌খলে গো,
বাইর বাড়ির দখ্‌খলে।
আমি চইলা যাব এখন ঐরান জঙ্গলে গো,
ঐরানই জঙ্গলে।

(কথায়)
সোয়ার গিয়া হইল রাজায় পালকির উপরে,
পালকি বেয়ারা চইলা গেল ঐরান জঙ্গলে।
পালকি থেইক্যা নাইম্যা রাজা ডাইনে বায়ে চায়,
যত ছিল ঝার-জংলা ময়দান দেখা যায়।

(সুরে)
রে গুরুর নাম জপিতে না দিল।
সামনে আছে দুইটি শয়তান সেই তো ভাঙ্গি দিল।।
রে গুরুর নাম জপিতে না দিল।

কিন্তু নিরাবদি ভক্তে যদি লয় ধর্মের নাম,
হস্তে ধরে করিব উদ্ধার এইতো আমার কাম।
এমন কথায় পরম পিতায় যখনে কহিল,
আছার পিছার খাইয়া সয়তান যায় মেলা দিয়া।

দুস্কের পালা

(কথায়)
আর লোকজন চইলা গেলে শইন্যে বাড়ি-ঘর,
ধন-সম্পদ পইড়া থাকব পইড়া থাকব ঘর।
তবে ভক্তে ধর্মের নামটি ছাইড়া দিব তারে,
গর্দানে ধইরা নিমু তারে দোজখ আনলে।
অন্নের জ্বালা বড় জ্বালা যাহার গায়ে লাগে,
এক চক্ষে আসে নিদ্রা আরেক চক্ষে জাগে।

(সুরে)
এই বলিয়া দয়ার বিবি লাগছে কান্দিবারে,
বিবি কান্দে গো।
দুইটি নয়নের জল গো দেয় গো বরিষণ,
বিবি কান্দে গো।

(কথায়)
নিদানে পইড়া গেছিলাম আমি দোস্তের দরবারে,
নছিব মন্দ দেইখা দোস্তে সয়াল না দিল মোরে।
কি করিব কোথায় যাব না দেখি উপায়,
আমাগো নছিবের লেখা খণ্ডান না যায়।
এই বলিয়া দুই ভক্তে জুইড়াছে রোদন,
ঝুংকার দিয়া উঠল পিতার ঐ রত্নসিংহাসন।

(সুরে)
আইল স্বর্গের দেব জয়ধ্বনি দিয়া গো,
আইল স্বর্গের দেব যীজুস নাম লইয়া।

(কথায়)
যাজক বেশে স্বর্গের দেব চইলা মেলা করে,
দেবে তো চইলা গেল ঐ ভক্তেরই বাড়িতে।
খাড়া গিয়া হইল ভক্তে বাইর বাড়ির দখ্‌খলে,
পিতার নামে বলল জিকির বাইর বাড়ির দখ্‌খলে।

(কথায়)
গোকূল নগর বাইন্দা আনল সেই শহরের মাঝে,
নিজগুয়া বইলা নাম রাখিল ভুবনে।
হস্তি ঘোড়া বাইন্দা রাখল ভক্তে বাইর বাড়ির দখ্‌খলে,
মহানন্দে করল বসতি ঐ নিজগুয়া শহরে।

(সুরে)
এমন কথা পরম পিতায় যখনে কহিল,
কাতর হইয়া স্বর্গের দেব কহিতে লাগিল।
কোন্ জানি ভক্ত রাখছ তোমার বহুতর নিদানে,
দুঃখে পইড়া তোমার নাম সে লয় বারে বারে।

জন্মের পালা

(কথায়)
আর যেমন তেমন একটা পুত্র যদি হইত আমাগো ঘরে,
না খাইতাম পুত্রের কামাই দেখিতাম নয়নে।
পুত্রের উছলায় ধন বাঁচিতাম ভুবনে,
মিসকিন খাওয়াই দিতাম বাইর বাড়ির দখ্খলে।

(সুরে)
আর দয়া কর, আসো গো দয়াল যীজুস,
দয়া করিয়া মোরে দাও গো এই বরদান।

(কথায়)
পিতায় বলছে আইন্তন ভক্ত বলি গো তোমারে,
আমার প্রধান সেবক ফ্রান্সিস গো আপনি;
পুত্র তো দেই নাই ভক্তেরে এই জগতের মাঝে,
তুমি যাইয়া লও জনম ঐ ফ্রান্সিস ভক্তের ঘরে।
জন্মের কথা পরম পিতায় যখনই কইল তারে,
হায় হায় বইলা আইন্তন আছাড় খাইয়া পড়ে।
হায় হায় বইলা আইন্তন কিরে দিল হাত,
আসমান ভাইঙা যেন পড়িল মাথাত।

(সুরে)
কলির ভবের সাধ নাই রে।
পিতা যাব না যাব না কভু আমি,
কলির ভবসায়রে রে, এ জনমে রে।
ঐ যে দুইনায় গেলে ধরব মোরে পিতা,
দুইনার মায়াজালে রে, এ জনমে রে।

(কথায়)
আর যাব না যাব না প্রভু মিছা দুইনার মাঝে,
দুইনায় গেলে তোমার নামটি যাব যে ভুলিয়া।

(সুরে)
আইন্তন ভক্তের জনম হইল ভুবন মাঝারে।
জনম হইল ভুবন মাঝারে গো।

(কথায়)
আর দশমাস দশদিন মার পূর্ণিত হইল,
মঙ্গল মত হইয়া ঠাকুর ভূমিষ্ঠে গড়াইল,
দেখিয়া পুত্রের মুখ পরাণ জুড়াইল।

(সুরে)
ধর্ম দ্বারা যাজক সাহেব যখনে কহিল,
ভাল মন্দ ভক্তে কিছুই না কহিল।
খানার বাসন লইয়া ভক্তে যা গো মেলা দিয়া,

ইস্কুলের পালা

(কথায়)
কত ভজনা কইরা পুত্র পাইয়াছি তোমারে,
তুমি পুত্র চইলা যাইবা কোন গুনাহ্‌র তরে।

(সুরে)
কবে যাবা রে ও আমার মন, কবে যাবা যীজুস দরশন।
আইন্তন ভক্তে চইলা গেল ময়দান ঐ পাথারে রে।
খাড়া গিয়া হইল ভক্তে রাজপন্থের মাঝে।

(কথায়)
আইন্তন বলছে দুইটি শয়তান শোন আমর কাছে,
তোমার ধর্মঘর খানি ধুইয়া আইছি পাছে,
আমার ধর্মঘর খানি আমার সামনে আছে।

(সুরে)
মন লহর দরিয়ার মাঝে মনার বসতি গো যীজুস,
কি নাম লওয়াইতে পার তুমি।

(কথায়)
আর আইন্তন ভক্তে পড়ে ইস্কুল রোমার ধর্মঘরে,
সাতদিন যাবত পড়ল ইস্কুল রোমার ধর্মঘরে।

(সুরে)
গুরু চিন না রে, চিন না রে,
হায় হায় চিন না রে মন সঙ্গের প্রাণের ধন।
তোমার দেহের মাঝে রয় ধন, সদা ঘুরে প্রাণ, গুরু চিন না।।

(কথায়)
আর খাড়া গিয়া হইল ভক্তে ময়দান পাথারে,
কিনা কার্যি করছে আইন্তন শুইনা লও চাই কানে।
গিরস্তে বুনছে কাওন তার জমিনের মাঝে,
একটি ছড়া কাওন লইছে তাহা গুনিবারে।

(সুরে)
দয়াল যীজুস কও কেনে পাপ জনম হইল আমার,
জনম হইল আমার, জনম হইল আমার।
আহা হারে, আহা হারে, আহা হারে হারে,
দয়াল যীজুস।

(কথায়)
আর্শীবাদ পাইয়া ভক্তে কহিতে লাগিল,
আন্তন বলছে গো পিতা মাতা বলিগো তোমাদের।
স্কুল পড়িয়া এসেছি আমি আপনারই ঘরে,
পিতা মাতা হইয়া আর্শিবাদ দিয়েছ যে আমারে।

পাটনীর পালা

(সুরে)
আর পাপীর উপায় কি, ওগো রসের মালিক গো,
অধমের উপায় বলো কি।

(কথায়)
নাও নৌকা লইয়া ঘাটমাঝি চইলা মেলা করে,
ঘাটমাঝি চইলা গেল আপনার ঘরে।

(সুরে)
পার কর দীননাথ, পার কর মোরে,
ভয় পাইয়া ঠেইক্যা রইলাম ভবের জঞ্জালে।
পার কর পাটুনী ভাই সঙ্গে কড়ি নাই।
যাহার সঙ্গে ছিল কড়ি সেই তো হইল পার।
আর খালি হাতে যেইবা ছিল রইয়া গেল এই পার।

(কথায়)
এই কূলে যত লোক সেই কূলে গেল,
সেই কূলে যত লোক এই কূলে আইল।
এক দুইয়ে বারো বচ্ছর পূর্ণিত হইল,
এমন সময় পরম পিতায় কোন কাম করে।
যাজক বেশে পরম পিতায় চইলা মেলা করে,
যাজক যাজক বল সবে যাজক আউলিয়া,
ঘাটে ঘাটে দিয়া নাও দেখছে নীরব হইয়া।

(সুরে)
মন বাইয়া যাও রে, হায় রে সোনার নাও পবনের বৈঠা,
আর বাইতে পারলাম না মন বাইয়া যাও।

(কথায়)
এমন কথা পরম পিতায় মনেতে ভাবিয়া,
পাত্তালের ভুবনে আইন্তনরে দাবাইয়া রাখিল।
পরম পিতায় চইলা গেল তার পরম ঐ স্বর্গেতে,
বসলেন যাইয়া পরম পিতায় সিংহাসনের মাঝে।
সিংহাসনে বইসা পিতার ইয়াদ হইল মনে,
পিতায় বলছে আইন্তন ভক্ত বলি গো তোমারে।
তোমার গুনহ্‌র মাফ হইল আমার দরবারে,
ভাসান দিয়া উঠ তুমি এই দরিয়ার কিনারে।
এই দোয়া করল পিতায় এই জগতের মাঝে,
পাত্তালে ছিল আইন্তন ভাসিয়া উঠিল।

(সুরে)
এই বলিয়া দয়াল আন্তন কোন বা কি কাম করে,
ফকিরের সাজ বাজ তার গায়ে পড়িয়া লইল।
মহা প্রভুরনামটি তার মনে স্মরণ করে—
ধীরে ধীরে ভক্তে আমার যায় গো মেলা দিয়া।

শাস্ত্রের পালা

(কথায়)
আইন্তন বলছে প্রভু পিতা, বলি গো তোমারে,
তোমার হাতের শাস্ত্র পিতা দেও গো আমারে;
যত্ম কইরা শাস্ত্র আমি লমু বারে বারে।
এই বইলা আইন্তন ভক্তে জুইরাছে রোদন,
ঝুংকার দিয়া উঠল পিতার রত্ম সিংহাসনে।
দেবে বলছে আইন্তন ভক্ত, ভক্ত গো–
এই শাস্ত্র হারাইবা তুমি ঐরান জঙ্গলে,
গুনাহ্‌গার হইবা তুমি পিতার দরবারে।
এমন সময় আইন্তন ভক্তে কোন কাম করে,
পিতার হাতের শাস্ত্র খানা লাগছে পড়িবারে।
শাস্ত্র না পইড়া শাস্ত্র ওয়াকিব হইল।

(কথায়)
আর সিতানে কিতাব রাইখ্যা নিদ্রা যায়,
স্বর্গে থেইক্যা পরম পিতায় তাহা দেখতে পায়।
স্বর্গের দেবের সঙ্গে কথা লাগছে কহিবারে,
পিতায় বলছে স্বর্গের দেব দেখছনি নয়নে;
কাল-নিদ্রা যায় ভক্তে ঐরান জঙ্গলে।
এখন চইলা যাও তুমি ঐরান জঙ্গলে,
আমার হাতের শাস্ত্র তুমি নিয়া আইস তারে;
গুনাহ্‌গার হইব সে আমার দরবারে।
নিদ্রা থেইকা জাইগা ভক্তে ডাইনে বায়ে চায়,
পিতার হাতের শাস্ত্র না পাইয়া করে হায় রে হায়।
আইন্তন বলছে প্রভু পিতা, পিতা গো–
তোমার হাতের শাস্ত্র পিতা হারাইলাম জঙ্গলে,
গুনাহ্‌গার হইলাম আমি তোমার দরবারে।
শাস্ত্রের বদলে শাস্ত্র তুমি দেও গো আমারে,
যত্ন কইরা দাও লমু বারে বারেঃ
কইলজা ফাইড়া শাস্ত্র রাখিমু পরাণে।

(সুরে)
মন বান্দিয়া লও ওরে তুলিয়া লও রে ছান্দি,
দুঃখীর পরানের ধন।
পিতার হাতের শাস্ত্র অমনি পরাণে ভরিল,
আইন্তন বলছে প্রভু পিতা আমি বলি গো তোমারে।
আর কি ধন দিলা তুমি এই দেহের মাঝারে,
আর সত্য কিনা মিথা ধন আমি খুঁইজ্যা লমু তারে।

(কথায়)
পিতার হাতের শাস্ত্র দেবে	সপিয়া দিল গো তারে,
দুই হস্ত মেলিয়া শাস্ত্র ভক্তে	তুইলা লইল তাহারে।
দেবে বলছে গো আন্তন ভক্ত	বলিগো তোমারে,
এই শাস্ত্র হারাইবা তুমি	ঐরান জঙ্গলে মাঝে।

জাউলার পালা

(সুরে)

রে জানিয়াা লও রে ভাই, চিনিয়া লও রে ভাই।
দলায় যীজুসের নাম প্রাণে আর মনেতে রে জানিয়া লও রে।।
আইন্তন ভক্তে পার হইয়া গেল দরিয়ার সেই কূলে,
রে জানিয়া লও রে।

(কথায়)

এমন সময় দুটি জাউলায় কোন কাম করে,
পিতা পুত্র পবিত্রাত্মার নামে জালের রশি লইল হাতে;
পরম পিতার নামে জাল ফালায় দইরার মাঝে।

(সুরে)

ওরে সোনার লহরী তরী বাইজ্জা রইল জালে হে।
জালের রশি ধইরা দুই ভাই লাগছে টানিবারে হে,
সোনার লহরী তরী।
লরিতে না পারে দুই ভাই উঠাইব কেমনে হে,
সোনার লহরী তরী।।

(কথায়)

আইন্তন ভক্তে চইলা গেল দরিয়ার কিনারে,
দুইটি জাউলার সঙ্গে কথা লাগছে কহিবারে।
তোমাগো না ইষ্টিকুটুম আছে জালুয়া নগরে,
দশভাই ডাইক্যা আন জাল উঠাইবারে।

(সুরে)

ওরে কাইন্দা কাইন্দা দুইটি জাউলায় হায় গো, লাগছে কহিবারে, আরে ও জানিয়া লও।
ভাল বল বা পিতা বল হায় গো, কেহ কারও নয়, আরে ও জানিয়া লও।
ঐযে দিন থাকিত পাইলাম না গো, পন্থের পরিচয়, আরে ও জানিয়া লও।
ইষ্টি বল কুটুম বল হায় গো, সঙ্গে যেতে না আছে আরে ও জানিয়া লও।
ইজ্জত যায়না ধুইলে বান্দার হায় গো, খাইসলত যায় না মইলে, আরে ও জানিয়া লও।

(কথায়)

যেই ধন দিছে আমাগো প্রভু নিরাঞ্জনে;
ওমর ভইরা বইসা খাইলে না পারুম ফুরাইতে।
এই অবধি রাইজ্যপাট ছাইড়া দিলাম তারে,
ঘরে আছে স্ত্রী-পুত্র বিদায় কমু তারে;
সেবক হইয়া যামু দুই ভাই যা থাকে কপালে।

(সুরে)

ভক্তে বলছে গো দুইটি সেবক বলিগো তোমাদের,
তোমারা এখন থাক আমার রোমার ধর্ম ঘরে।
আর আমি চইলা যাইব এখন সেবক লওয়াইবারে,
এই বলিয়া ভক্তে আমার কোন বা কি কাম করে।
ভক্তে চইলা গেল দেখ এবার ময়দান পাথারে,
আসন পাতিল দয়াল আন্তন বট বৃক্ষের তলে।

সাত বালকের পালা

(সুরে)
গুরু ভজ পন্থে চল সাধুর সনে রইয়া,
হেলায় তো না লইলা না প্রভুনাম দিন যায় বইয়া।
আর দিন থাকিতে লইলা না প্রভু নাম দিবার আলিসে,
জন্ম যে তরঙ্গের নদী পার হইবা কিসে।

(কথায়)
ঘিরনা কইরা বসল তারা আসনের মাঝে,
গাহানা যে করে ঠাকুর ময়দান পাথারে।
যত আছে ধেনু বাছুর ময়দান পাথারে,
সকলে বইসা রইল ঐ গাহানের মাঝে।

(সুরে)
যেই গাহেনা কইরা ছিল ময়দান ঐ পাথারে গুরুর নাম।
আরে ঘরে থাইকা পিতামাতায় শুনিল কর্ণেতে, গুরুর নাম।
আরে উল্টা হস্তে থাপ্পর মারল গালের মাঝারে, গুরুর নাম।

(কথায়)
আর এমন কথা দেউরিদার যখনই কইল,
পিতামাতায় চইলা গেল সেই ঘরের মাঝে।
সেই ঘরের নিকটে যাইয়া চক্ষু মেইলা চায়,
আর দেখিয়া শূয়োর মেরা করছে হায় রে হায়।

(সুরে)
দয়াময়, দয়াময় ... মায়ে কান্দে পুত্র বলে।
অর্ধেক অঙ্গ পচে মায়ের গুয়ে আর মূতে, মায়ে কান্দে পুত্র বলে।
ঐ যে আরেক অঙ্গ পচে মায়ের মাঘ মাইসা শীতে, মায়ে কান্দে পুত্র বলে।

(কথায়)
আশীর্বাদের পানি আলগোছে ছিটাইয়া দিল,
ছিল তারা শূয়োর মেরা মানুষ হইল।
মালিকের বেত লইয়া তিনডা ঠোকা মারল,
আর শূয়োর মেরা ছাইড়া তারা বাহির হইল।

(সুরে)
আর দেখাও গো নয়ন ভরিয়া গো গুরুজী,
ধরি চরণ দেও গো দেখাইয়া।
আইন্তন বলছে পিতামাতা আমি বলি গো তোমারে,
তোমার পুত্র লইয়া যাও তুমি আপনারই ঘরে।

(কথায়)
এমন কথা দয়াল আন্তন যখনে কহিল,
ধর্ম দ্বারা পিতা মাতা কহিতে লাগিল।
সাত পুত্র সপে দিলাম তোমার হাতে হাতে,
আর তো না নিব গো পুত্র আপনারই ঘরে।

কেশবের পালা

(কথায়)
আইন্তন বলছে সাতটি সেবক, বলি গো তোমারে,
চলো চইলা যাই আমরা সেবক লওয়াইবারে।

(সুরে)
তোমার দোয়া লইয়া চইলা যামু আবার,
তোমার কিরপা লইয়া চইলা গো যামু আবার।

(কথায়)
ভিক্ষা দেইখ্যা আইন্তন ভক্তে লাগছে কহিবারে,
ভিক্ষার তো না যাজক আমি ভিক্ষা লইয়া যাই,
নামের ভিখারী আমি নাম পাইলে সে চাই।

(সুরে)
অহঙ্কার না কইর বান্দা পাইবা অপমান।
এক অহঙ্কার কইরা ছিল রাবণ অধিকারী,
হায় হায় রাবণ অধিকারী।
হনুমান বানরে ধ্বংসে তার সোনার লঙ্কাপুরী।
অহঙ্কার না কইর গো বান্দা পাইবা অপমান।
আরেক অহঙ্কার কইরা ছিল মোছা পেকাম্বর,
হায় হায় মোছা পেকাম্বর।
তিন বারো ছত্তিরিশ বছর কাটে তার ডিম্বের ভিতর।
অহঙ্কার না কইর গো বান্দা পাইবা অপমান।
অতি উচু না হইও বাতাসে ভাঙিব,
হায় হায় বাতাসে ভাঙিব।
অতি ছোট না থাকিও ছাগলে মোড়াইব।
অহঙ্কার না কইর গো বান্দা পাইবা অপমান।

(কথায়)
এমন সময় আইন্তন ভক্তে কোন কাম করে,
পিতার হাতের রোজারী মেলা হস্তে তুইলা লইল।
পিতার নামে ধরাইয়া দিল কুণ্ডের মাঝে,
কেশব ভক্তের সঙ্গে কথা লাগছে কহিবারে।

(সুরে)
ওরে আটদিনের কালে কেশব কোন কামই করে,
আর ঝাঁপ দিয়া পড়িল কেশব কুণ্ডের মাঝারে।
ওরে দুই হস্তে ছাই মাটি লাগছে লাড়িবারে,
আর যত ছিল পাঞ্জি পুঁথি পুইড়া হইল ছাই।

(কথায়)
আগে যদি জানিতাম আমি তুমি এমন পীর–
আগে দিলাম দুগ্ধ কলা পাছে দিতাম শির।
তুমি আমার নায়ের গুরু আমি তোমার দাস,
তোমার পাছে হমু সেবক ছাইড়া গৃহবাস।

উপরান রাজার পালা

(কথায়)
এমন কথা উপরান রাজায় যখনই কইল,
ধর্ম দ্বারা বইলা আইন্তন লাগছে কহিবারে।
একটি দেবতার পূজা আমি না পারলাম করিতে,
তুমি বারো দেবতার পূজা কর মন্দিরের উপারে।

(সুরে)
কিনা পূজা পাতল উপরান মন্দিরের উপরে রে,
পামর মন চর্তুগামী।
আরে মায়া কইরা কইয়া উপরান লাগছে ডাকিবারে রে,
পামর মন চর্তুগামী।
আরে বারো ভূতে সাইজ্জা আসে মুর্দা খাইবারে রে,
পামর মন চর্তুগামী।

(কথায়)
সুপুত্র হইলে ভবে করে যে সুকাম,
জাতিঁ বাচে কূল বাঁচে বাঁচে বংশের নাম।
আবার কুপুত্র হইলে ভবে করে কুকাম,
জাতি ডুবায় কূল ডুবায় ডুবায় বংশের নাম।
পুত্রজন থাকলে ভবে বাইচ্যা খাইতে পারে,
মরণকালে হয় ছেমা শিয়রের উপরে।

(কথায়)
কথা শুইনা স্ত্রী-পুত্রে লাগছে কহিবারে,
সুকাম করলে আমরা যামু তাহার পাশে;
বধি কামের সাথী নাই ভাইঙা কইলাম তারে।

(সুরে)
যাজক যাজক বইলা যায় ম্যালা দিয়া,
উপরান রাজায় চইলা গেল আইন্তন ভক্তের কাছে।
ধরিল আইন্তনের পায়ে ক্লেশেতে জড়াইয়া,
কাইন্দা কাইন্দা উপরান রাজায় লাগছে কহিবারে।

(কথায়)
না জানিয়া করছি গুনাহ তোমার দরবারে,
আমার গুনাহ্‌র কর মাফ দয়ার ঠাকুরে।
পিতা পুত্র পবিত্রাত্মার নামে বাপ্তাইস্ম করাইল,
আগষ্টিন বইলা নাম তার ভুবনে রাখিল।

(সুরে)
ছিল তাহার আটটি সেবক নয়টি সেবক হইল,
নয় সেবকের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল।
ভক্তে বলছে গো নয়টি সেবক বলিগো তোমাদের,
চল চইলা যাই গো আমরা সেবক লইবারে।

মুর্দার পালা

(কথায়)
আশীর্বাদের পানি মুর্দার গায়েতে ছিটাইল,
মইরা গেছিল একটি বেটা চক্ষু মেইলা চাইল।
মালিকের বেতে আইন্তন তিনডা টোকা মারল;
আর সঙ্গে সঙ্গে মুর্দা বেটা উঠিয়া দাঁড়াইল।
মুর্দার বলছে দয়ার গুরু আমি বলি গো তোমারে,
কালনিদ্রা যাই আমি এই দরিয়ার কিনারে।
নিদ্রা থেইকা জাগাইছ তুমি কিসের কারণে ?
কথা শুইনা আইন্তন ভক্তে লাগছে কহিবারে,
কালনিদ্রা যাও তুমি এই দরিয়ার কিনারে।
নিদ্রা থেইক্যা জাগাইছে তোমারে আমার প্রভু নিরাঞ্জনে,
এখন চইলা যাও তুমি তোমার আপনার ঘরে।
এমন কথা আইন্তন ভক্তে যখনই কইল,
কাইন্দা কাইন্দা মুর্দার বেটা লাগছে কহিবারে।
আগে করছে কান্নাকাটি পিছে গোবরের ছিটা,
ঘর বাড়ি কইরা দিছে এই জগতের নীচে।
আর তো যাব না আমি ঐ আপনার ঘরে,
সেবক হইয়া যামু আমি যা থাকে কপালে।
তুমি আমার নায়ের গুরু আমি তোমার দাস,
তোমার পাছে হমু সেবক ছাইড়া দিমু বাস।

(সুরে)
আছিল যে হিন্দু কূলে খ্রীষ্টান কূলে আনিল,
আর পিতা পুত্র পবিত্রাত্মার নামে তারে বাপ্তাইস্ম করাইল;
আরে দো আন্তন বলিয়া নাম তার ভুবনে রাখিল।
আইন্তন বলছে দো আন্তন আমি বলি গো তোমারে,
আর সাত সেবক সঁইপ্যা দিলাম তোমার হাতে হাতে।
আর গাহেনা যে করবা তুমি দাশে আর মুল্লুকে,
দোয়া ফরমাইবা তুমি দো আন্তনের নামে।
এই বলিয়া আইন্তন ভক্তে কোন কামই করে,
আর সাত সেবক সঁইপ্যা দিল দো আন্তনের হাতে।
গাহেনা যে করে ঠাকুর দাশে আর মুল্লুকে,
আর দোয়া ফরমায় যে আবার দো আন্তনের নামে।
আর সেই থেকে ঠাকুরের গান দুইনায় পয়দা হইল,
এমন সময় আইন্তন ভক্তে কোন কামই করে,
আরে কেশব উপরান লইয়া গেল সেবক লওয়াইবারে।
আরে আসন করল আইন্তন ভক্তে রোমার ধর্মঘরে,
বল জয় ভক্তের জয়, সবে মিলে একই প্রাণ বল ভক্তের জয়।

(কথায়)
আজানু পাতিয়া ভক্তে আমার ক্রুশের চিহ্ন করে,
মহাপ্রভুর নামটি ভক্তে মনে স্মরণ করে।
ঠাকুর আমারা বড় অপরাধী তোমার দরবারে–
গাইট গোনা অপরাধ মাফ করিও আমারে।

সদাগরের পালা

(সুরে)
আরে ও কলির কাল আইল,
রাজা বেঈমান হইয়া ধর্ম না রাখিল, আরে ও কলির কাল।
রাজার দোষে রাইজ্য নষ্ট লোকে বলায় করে,
আরে স্ত্রীর দোষে পুরুষ নষ্ট বাচ্চায় কেন মরে ? আরে ও কলির কাল।

(কথায়)
স্বর্গের দেবের সঙ্গে পিতায় লাগছে কহিবারে,
এখন চইলা যাও তুমি ঐ বিলাত ভুবনে।
কিনা সুখে আছে আইন্তন বিলাত ভুবনে,
তাহার পিতার গর্দান যায় নিজগুয়া শহরে;
এমন খবর কইয়া আস আইন্তন ভক্তের কাছে।

(সুরে)
পিতার অপার লীলা বুঝন না যায়, পিতার অপার লীলা,
এই যে দুইজন মানুষ দেখছ রাজসভার মাঝে।
এই দুইজন মানুষ নয় গো এই জগতের মাঝে,
আর এই দুইজন তো লোকজন হইছে এই জগতের মাঝে;
এই দুইজন তো শয়তান দেখ এই জগতের মাঝে।

(কথায়)
গুরু গো, ও গুরু,
ছাইড়া দিয়া যাও গুরু এই জগতের মাঝে।
তোমার নামটি শুনি আমরা যেই শহরের মাঝে,
সেই শহর ছাইড়া যামু আর কোন শহরে।
এমন সময় দুই শয়তানে কোন বা কি কাম করে,
নাকেতে ঘসিয়া চিহ্ন উঠাইয়া নিল তারে।
মৃত্তিকা ছাড়িয়া শয়তান সইন্যে উড়াল দিল,
দুই শয়তান চলে গেল দেখ আর কোন শহরে।
এমন সময় রাইজ্যের রাজায় কোন বা কি কাম করে,
দুইটি বালক ছেড়ে দিল রাজা ত্রিজগতের মাঝে।
দুই বালকে চলে গেল তাদের আপনারই ঘরে,
মহানন্দে করে বসতি আপনারই ঘরে।
এমন সময় দয়াল আন্তন কোন বা কি কাম করে,
ধীরে ধীরে ভক্তে আমার যায় গো মেলা দিয়া।

(সুরে)
আইন্তন ভক্তে চইলা গেল বিলাত ঐ ভুবনে,
আসর করল আইন্তন ভক্তে রোমার ধর্মঘরে।

আমরা যত অপরাধী তোমার দরবারে,
রাইখ্য না অপরাধ তুমি মাফ কইর আমারে।
কেহর নাম না জানি আমরা কেহর নাম না শুনি,
সকল সঙ্কট কইরো পার কুমারীয়া রাণী।

দোয়া গীত

(সুরে)
যীজুস নাম পরম মধুর রে,
যীজুস নাম ঠাকুরের পরম মধুর রে।
পিতার প্রধান সেবক আইন্তন আপনে,
তাহার প্রধান সেবক দো আন্তন ভণে।
এক হৃদয় হইয়া মানতি করিও সকলে,
তাইলে আশা পূর্ণ করব দয়াল ঐ ঠাকুরে;
মরিলে না যাইব তোমার এই সকল সংসার,
আরে দুই চোখ বুজিয়া গেলে দুইনা হয় আধার।
খাইলা না বিলাইলা না ধন রাখিলা বান্দিয়া,
চোরে লইয়া যাইব এই ধন রাত্তিরে আসিয়া।
অনাহারীকে দিও খানা আর পিপাসীকে পানি,
আর বস্ত্রহীনে দিও বস্ত্র এই নীতি জানি।

ঠাকুরের নামে দিবা পয়সাকড়ি দান,
আরে ধনে বলে ভইরা রাখব এই সকল সংসার।
ধর্মশাস্ত্র দশ আজ্ঞা যেইবা পালন করে,
ভাগ্যিমান মানুষের কায়া পারব লইবারে।
পরের স্ত্রী পরের পুরুষ যেইবা লোভ করে,
লোহার মুঙ্গর হাতে লইয়া যমে ধাওয়া করে।
পিতামাতা ছাইড়া যেইবা রোজ খানা খায়,
পরের চালে মার ইটা পর তো হইয়া পরে,
আরে ঘরে মন্দ নয় রে মন্দ আপন ঘরে।

আর পুণ্যের পুষ্পে ভরা ডালি পাপের ভরা বালি,
আপনে ডুবিয়া মরবা যীজুস তো কাঙালি।
অজ্ঞানে পাপ করলে ভাই রে জ্ঞান হইলে সারে,
আরে জাইন্যা শুইন্যা করলে পাপ এই দুইনায় মরে।
আরে নিজে না বুঝিয়া যেইবা অন্যেরে বুঝায়,
এক ভেরীর পাছে যেমন আরেক ভেরী যায়।
সাধুজন তরিয়া গেল তার ভজনার বলে,
পাপীরে তরাইতে পারে সাধুগণের দলে।

আমরা বড় অপরাধী তোমার দরবারে,
মার্জনা অপরাধ তুমি মাফ কইর আমারে।
অজ্ঞান বালক হইয়া ধরছি তোমার নাম,
আরে দয়া কইরো দয়াল যীজুস গুনাহ্ কইরো মাফ।
কেহর নাম না জানি আমরা কেহর নাম না শুনি,
সকল সঙ্কট কইরো পার তুমি কুমারীয়া রাণী।
শোন গো সুজনের বান্দা শোন দিয়া হৃত,
এই পর্যন্ত পূর্ণ হইল বারো পালা গীত।
আর যীজুস নাম পরম... মধুর রে।

পরিশিষ্ট ২

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের গায়েন-বায়েন দলের তালিকা

১. অরুণ গায়েনের দল

বোয়ালি, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	অরুণ কোড়াইয়া (৬৫ বছর)	ঠাকুর	বোয়ালি, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
২	শ্যামল রোজারিও (৪৫ বছর)	পাইল দোহার	হাঁড়িখোলা, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৩	বিজয় রোজারিও (৫৪ বছর)	দোহার	বোয়ালি, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৪	সুবাস কস্তা (৪৩ বছর)	বায়েন	ভেটুর, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৫	অতুল রোজারিও (৪৪ বছর)	বায়েন	বোয়ালি, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৬	অনিল গমেজ (৪৭ বছর)	বায়েন	বোয়ালি, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৭	বাবুল গমেজ (৪৬ বছর)	দোহার	পিপ্রাশৈর, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৮	জন কোড়াইয়া (৫৪ বছর)	বায়েন	পিপ্রাশৈর, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৯	উৎপল রোজারিও (৫২ বছর)	দোহার	হাঁড়িখোলা, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

২. দগু গায়েনের দল

রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	ডগলাস পালমা দগু (৭২ বছর)	ঠাকুর	রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
২	ফিডালিস রিবেরু (৫৭ বছর)	পাইল দোহার	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৩	ডমিনিক রোজারিও (৫৬ বছর)	বায়েন	ভাসানিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৪	রাজু রোজারিও (৩৭ বছর)	দোহার	দড়িপাড়া, উলুখোলা, গাজিপুর
৫	যোসেফ কস্তা (৬১ বছর)	দোহার	রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৬	সুনীল দরেছ (৫১ বছর)	বায়েন	গাড়ারিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৭	সুধীর পিউরীফিকেশন (৪৯ বছর)	দোহার	ছাইতান, নাগরী, কালীগঞ্জ
৮	শ্যামল এসেনসন (৪৮ বছর)	দোহার	ছাইতান, নাগরী, কালীগঞ্জ

৩. সুব্রত গায়েনের দল

বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	যোসেফ ডেঙ্গু কস্তা (৮৭ বছর)	ওস্তাদ/গুরু	কালিকাপুর, বড়াইগ্রাম, নাটোর
২	সুব্রত গমেজ (৬৫ বছর)	ঠাকুর	বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর
৩	অনিল এসেনসন, ৪৪ বছর)	পাইল দোহার	ভবানীপুর, বড়াইগ্রাম, নাটোর
৪	লুইস বিশ্বাস (৪২ বছর)	বায়েন	বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর
৫	থমাস রোজারিও (৪৫ বছর)	বায়েন	কালিকাপুর, বড়াইগ্রাম, নাটোর
৬	নিকোলাস গমেজ (৫৬ বছর)	দোহার	বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর
৭	অনিল গমেজ (৫০ বছর)	বায়েন	বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর

৪. মানিক গায়েনের দল

কমলাপুর, সাভার, ঢাকা

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	মানিক গমেজ (৭২ বছর)	ঠাকুর	কমলাপুর, সাভার, ঢাকা
২	গোলাপ রোজারিও (৬৫ বছর)	পাইল দোহার	কমলাপুর, সাভার, ঢাকা
৩	রনেল রোজারিও (৫৫ বছর)	বায়েন	কমলাপুর, সাভার, ঢাকা
৪	বাপ্পি গমেজ (৫৬ বছর)	বায়েন	কমলাপুর, সাভার, ঢাকা
৫	সাগর রোজারিও (৫১ বছর)	দোহার	কমলাপুর, সাভার, ঢাকা
৬	বেনেডিক্ট রোজারিও (৫২ বছর)	দোহার	কমলাপুর, সাভার, ঢাকা

৫. বিজয় গায়েনের দল

কমলাপুর, সাভার, ঢাক

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	বিজয় কস্তা (৭০ বছর)	ঠাকুর	কমলাপুর, সাভার, ঢাকা
২	সেন্টু রোজারিও (৫৯ বছর)	পাইল দোহার	কমলাপুর, সাভার, ঢাকা
৩	যোসেফ রোজারিও (৬৫ বছর)	বায়েন	কমলাপুর, সাভার, ঢাকা
৪	সুবল রোজারিও (৫৪ বছর)	দোহার	কমলাপুর, সাভার, ঢাকা
৫	সুশান্ত ক্রুশ (৫৩ বছর)	বায়েন	কমলাপুর, সাভার, ঢাকা
৬	পরিমল ক্রুশ (৬০ বছর)	দোহার	কমলাপুর, সাভার, ঢাকা
৭	মিলন রোজারিও (৫৭ বছর)	দোহার	কমলাপুর, সাভার, ঢাকা

৬. ডমিনিক গায়েনের দল

ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	ডমিনিক রোজারিও (৬৯ বছর)	ঠাকুর	ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা
২	জ্যোতি গমেজ (৫৫ বছর)	পাইল দোহার	ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা
৩	সুনীল কোড়াইয়া (৫৬ বছর)	বায়েন	ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা
৪	শ্যামল গমেজ (৫২ বছর)	বায়েন	ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা
৫	সুকুমার গমেজ ৫৩ বছর)	দোহার	ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা
৬	দিলীপ ক্রুশ (৪৯ বছর)	দোহার	ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা

৭. আদম গায়েনের দল

ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	আদম রোজারিও (৭৪ বছর)	ঠাকুর	ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা
২	সুনীল গমেজ (৬৫ বছর)	পাইল দোহার	ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা
৩	পিটার কস্তা (৫৬ বছর)	বায়েন	রাজাসন, সাভার, ঢাকা
৪	পলিকার্প গমেজ (৬৪ বছর)	বায়েন	রাজাসন, সাভার, ঢাকা
৫	আন্তনি বটলেরু (৫৫ বছর)	দোহার	ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা
৬	আগষ্টিন পেরেরা (৫৪ বছর)	দোহার	ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা

৮. বাদু আন্তনির গায়েনের দল

তিরিয়া, কালীহঞ্জ, গাজিপুর

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	বাদু আন্তনি রোজারিও (৮২ বছর)	ঠাকুর	তিরিয়া, কালীহঞ্জ, গাজিপুর
২	সুবল পেরেরা (৬৫ বছর)	পাইল দোহার	তিরিয়া, নাগরী, গাজিপুর
৩	যোসেফ পিউরীফিকেশন (৫৪ বছর)	বায়েন	ছাইতান, নাগরী, গাজিপুর
৪	জ্যোতি রোজারিও (৫৬ বছর)	দোহার	ছাইতান, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৫	রঞ্জন রোজারিও (৪৯ বছর)	বায়েন	ছাইতান, নাগরী, গাজিপুর
৬	কান্দ্রা গমেজ (৫৮ বছর)	বায়েন	ভূরুরিয়া, নাগরী, গাজিপুর
৭	রঞ্জন পিউরীফিকেশন (৪৯ বছর)	দোহার	ছাইতান, নাগরী, গাজিপুর

৯. সমর গায়েনের দল

আড়াগাঁও, নাগরী, গাজিপুর

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	সমর রোজারিও (৬৪ বছর)	ঠাকুর	আড়াগাঁও, নাগরী, গাজিপুর
২	লিটন পিউরীফিকেশন (৫৫ বছর)	পাইল দোহার	ছাইতান, নাগরী, গাজিপুর
৩	সন্তোষ পিউরীফিকেশন (৬১ বছর)	বায়েন	ভূরুরিয়া, নাগরী, গাজিপুর
৪	বিজয় রেগো (৬০ বছর)	দোহার	চড়াখোলা, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৫	সুধীর পিউরীফিকেশন (৫৮ বছর)	বায়েন	ছইতান, নাগরী, গাজিপুর
৬	প্যাট্রিক কস্তা (৫৭ বছর)	দোহার	ভূরুরিয়া, নাগরী, গাজিপুর

১০. পোর্‌হা গায়েনের দল

নাগরী, কালীহঞ্জ, গাজিপুর

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	বার্নাড রোজারিও পোর্‌হা (৭৫ বছর)	ঠাকুর	নাগরী, কালীহঞ্জ, গাজিপুর
২	সঞ্জীব এসেনসন (৫৬ বছর)	পাইল দোহার	ছাইতান, নাগরী, গাজিপুর
৩	পিন্টু গমেজ (৬৫ বছর)	বায়েন	লুদুরিয়া, নাগরী, গাজিপুর
৪	পিতর রোজারিও (৬৪ বছর)	দোহার	ধনুন, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৫	প্রদীপ রোজারিও (৬৩ বছর)	বায়েন	করান, নাগরী, গাজিপুর
৬	আন্দ্রিয় রড্রিক্স (৬১ বছর)	দোহার	লুদুরিয়া, নাগরী, গাজিপুর

১১. সুনীল গায়েনের দল

চড়াখোলা, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	সুনীল পেরেরা (৭৫ বছর)	ঠাকুর	চড়াখোলা, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
২	লিনুস পালমা (৬১ বছর)	পাইল দোহার	চড়াখোলা, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৩	ফালু পালমা (৬৬ বছর)	দোহার	চড়াখোলা, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৪	সুনীল গমেজ (৬২ বছর)	দোহার	চড়াখোলা, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৫	লাকী পালমা (৬৫ বছর)	দোহার	চড়াখোলা, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৬	সুবাস দে (৫৫ বছর)	বায়েন	চড়াখোলা, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৭	রিপন দে (৫৩ বছর)	বায়েন	চড়াখোলা, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

১২. কেলু গায়েনের দল

সাতানীপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	ক্লেমেন্ট কস্তা কেলু (৭১ বছর)	ঠাকুর	সাতানীপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
২	পরেশ গমেজ (৫১ বছর)	পাইল দোহার	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৩	নিপু কস্তা (৫৬ বছর)	বায়েন	সাতানীপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৪	পঙ্কজ কোড়াইয়া (৫২ বছর)	দোহার	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৫	বকুল গমেজ (৫৮ বছর)	দোহার	রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৬	মিল্টন গমেজ (৫৪ বছর)	বায়েন	দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

১৩. রবি গায়েনের দল

জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজি

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	রবি রিবেরু (৭৪ বছর)	ঠাকুর	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
২	বাবলু রোজারিও (৫৯ বছর)	পাইল দোহার	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৩	পিটার রোজারিও (৫৪ বছর)	বায়েন	রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৪	শ্যামল কোড়াইয়া (৫৮ বছর)	বায়েন	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৫	অব্রাহাম রোজারিও (৫৩ বছর)	দোহার	রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৬	সুশীল পিরিছ (৫৭ বছর)	বায়েন	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

১৪. জাভু গায়েনের দল

বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	আলেকজেণ্ডার জাভু গমেজ (৬৮ বছর)	ঠাকুর	বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর
২	রঞ্জন গমেজ (৫০ বছর)	পাইল দোহার	বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর
৩	প্রদীপ গমেজ (৪৫ বছর)	বায়েন	বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর
৪	সুনীল বিশ্বাস (৫৮ বছর)	বায়েন	কালিকাপুর, বড়াইগ্রাম, নাটোর
৫	শ্রীবাস বিশ্বাস (৫৪ বছর)	বায়েন	কালিকাপুর, বড়াইগ্রাম, নাটোর
৬	অরুণ রোজারিও (৫৫ বছর)	দোহার	বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর
৭	স্বপন বিশ্বাস (৪৩ বছর)	বায়েন	কালিকাপুর, বড়াইগ্রাম, নাটোর

১৫. জন গায়েনের দল

দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	জন রোজারিও (৭৩ বছর)	ঠাকুর	দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
২	নিকোলাস কস্তা (৫৯ বছর)	পাইল দোহার	দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৩	প্যাট্রিক রিবেরু (৫১ বছর)	বায়েন	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৪	প্রশান্ত রিবেরু (৫৬ বছর)	দোহার	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৫	পঙ্কজ রিবেরু (৫৭ বছর)	দোহার	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৬	পবিত্র রিবেরু (৫৪ বছর)	বায়েন	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

১৬. ছিলু গায়েনের দল

রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	সিলভেষ্টার পালমা ছিলু (৮৫ বছর)	ঠাকুর	রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
২	রনি গমেজ (৫৫ বছর)	পাইল দোহার	দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৩	হারাধন দত্ত (৫৪ বছর)	বায়েন	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৪	মন্টু রিবেরু (৫৮ বছর)	দোহার	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৫	অজয় রিবেরু (৫৬ বছর)	দোহার	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৬	যাকোব কস্তা (৫২ বছর)	বায়েন	রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

১৭. মিলন গায়েনের দল

রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

ক্রম	সদস্যদের নাম ও বয়স	পালাগানের দলে ভূমিকা	ঠিকানা
১	মিলন রোজারিও (৬২ বছর)	ঠাকুর	রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
২	সুকুমার পালমা (৫৯ বছর)	পাইল দোহার	রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৩	আগষ্টিন রিবেরু (৫৪ বছর)	বায়েন	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৪	রবার্ট গমেজ (৫৩ বছর)	বায়েন	রাজনগর, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৫	রাফায়েল দরেস (৫০ বছর)	দোহার	দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৬	নির্মল রিবেরু (৪৯ বছর)	বায়েন	জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৭	পঙ্কজ পালমা (৫২ বছর)	দোহার	রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর
৮	মিল্টন গমেজ (৪৮ বছর)	বায়েন	দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

পরিশিষ্ট ৩

সাধু আন্তোনিয়োর জীবন-কর্ম-সৃষ্টি নিয়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রচনাবলি

ক. প্রবন্ধ-নিবন্ধ

১. অপু এস. রোজারিও, 'সাধু আন্তনীর জীবন ধ্যানে প্রবেশ', আশীর্বাদ, কমলাপুর যুবসমিতি, সম্পাদক: পাভেল রোজারিও, সাধু আন্তনীর পার্বণ সংখ্যা, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, সাভার, ঢাকা, ২০০৯।

২. অপূর্ব নিকোলাস ক্রুজ, 'ফিরে দেখা : নাগরী ধর্মপল্লী (১৬৯৫–২০০০)', নাগরী, নাগরী খ্রীষ্টান যুবসমিতি, গাজিপুর, ২০০০।

৩. অপূর্ব নিকোলাস ক্রুজ, 'ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ নাগরী মিশন', নাগরী, সম্পাদক: সুবীর খ্রীষ্টফার ক্রুশ, নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০০২।

৪. অলিন্দা পালমা, 'মহান সাধু আন্তনীর আশ্চর্য ক্ষমতা' অনুগ্রহ, সম্পাদক: ফাদার যোহন উত্তম রোজারিও, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, কাতুলী, পাবনা, ২০১৮।

৫. আগষ্টিন রোজারিও, 'কাতুলীতে সাধু আন্তনীর আশ্চর্য কাজের ঘটনা', অনুগ্রহ, সম্পাদক: ফাদার যোহন উত্তম রোজারিও, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, কাতুলী, পাবনা, ২০১৬।

৬. আন্তনী জে. রোজারিও, 'নাগরী গির্জার ঘন্টা ও লেংড়া ঠাকুরের মেলা', অরুণোদয়, সাধু আন্তনীর পার্বণ সংখ্যা, করান অরুণোদয় যুবসমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৬।

৭. আন্তনী সেন, ফাদার, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে সাধু আন্তনীর গীর্জা', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ১ সংখ্যা ২৭, ঢাকা, ২০০১।

৮. আবেল বি. রোজারিও, ফাদার, 'জয়ন্তী বর্ষ– দয়ার বর্ষ', স্মরণিকা, যাজকীয় রজত জয়ন্তী, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৬।

৯. আলবার্ট টমাস রোজারিও, ফাদার, 'একটি অতি জনপ্রিয় নাম সাধু আন্তনী', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬২, সংখ্যা ২৩, ঢাকা, ২০০২।

১০. আলবার্ট টমাস রোজারিও, ফাদার, 'পাদুয়ার সাধু আন্তনী: মণ্ডলীর দিগন্তে নতুন সূর্যোদয়', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ২৪, ঢাকা, জুন ২০০০।

১১. আলবার্ট টমাস রোজারিও, ফাদার, 'বিশ্ববন্দিত সাধু আন্তনী', স্মরণিকা, বক্সনগর সাধু আন্তনীর নতুন গীর্জার উদ্বোধন, বক্সনগর, নবাবগঞ্জ, ২০০৫।

১২. আলবার্ট টমাস রোজারিও, ফাদার, 'কমলাপুর প্রার্থনাগৃহের প্রতিপালক সাধু আন্তনী', আশীর্বাদ, সম্পাদক: পাভেল রোজারিও, সাধু আন্তনীর পার্বণ, ঢাকা, ২০১৬।

১৩. আলবার্ট টমাস রোজারিও, ফাদার, 'পাদুয়ার সাধু আন্তনী'. স্মরণিকা, বক্সনগর সাধু আন্তনীর গীর্জা, সম্পাদক: আলবার্ট টমাস রোজারিও, ঢাকা, ২০০৬।

১৪. আলবার্ট টমাস রোজারিও, ফাদার, 'বক্সনগরে সাধু আন্তনীর পর্ব পালন', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৫, সংখ্যা ২৫, ঢাকা, ২০০৫।

১৫. আশা এলিজাবেধ গমেজ, 'সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ১১, ঢাকা, ১৯৯৩।

১৬. ইগ্নাসিউস হেমন্ত কোড়াইয়া, 'লাখো খ্রিষ্টভক্তের প্রার্থনায় পালন পানজোরার মহান সাধু আন্তনীর পর্ব', সমবার্তা, বর্ষ ৩২, সংখ্যা ১, ঢাকা, ২০১৮।

১৭. উত্তম রোজারিও, ফাদার, 'পাদুয়ার সাধু আন্তনী ও তাঁর আশ্চর্য কাজ', অনুগ্রহ, সম্পাদক: ফাদার যোহন উত্তম রোজারিও, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, কাতুলী, পাবনা, ২০১৬।

১৮. উত্তম রোজারিও, ফাদার; নরেশ মার্ডী, 'পাদুয়ার সাধু আন্তনীর আশ্চর্য কাজ', অনুগ্রহ, সম্পাদক: ফাদার যোহন উত্তম রোজারিও, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, কাতুলী, পাবনা, ২০১৮।

১৯. উত্তম রোজারিও, ফাদার, 'সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা ও আশ্চর্য কাজের জীবন সাক্ষ্য', অনুগ্রহ, সম্পাদক: ফাদার যোহন উত্তম রোজারিও, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, কাতুলী, পাবনা, ২০১৮।

২০. এডমণ্ড এডোয়ার্ড গেডার্ট সিএসসি, ফাদার, 'নাগরী গির্জার তিনশত বছর (১৬৯৫-১৯৯৫)', প্রথম পর্ব, অনুবাদ: ফাদার নরেশ দাস সিএসসি, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ২৪, ঢাকা, ১৯৯৭।

২১. এডমণ্ড এডোয়ার্ড গেডার্ট সিএসসি, ফাদার, 'নাগরী গির্জার তিনশত বছর (১৬৯৫-১৯৯৫)', দ্বিতীয় পর্ব, অনুবাদ: ফাদার নরেশ দাস সিএসসি, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ২৫, ঢাকা, ১৯৯৭।

২২. এলড্রিক বিশ্বাস, 'মহান সাধু আন্তনীর জিহ্বা', শঙ্খ, দোয়ানী স্বপ্নের নীড় যুবসংঘ, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৮।

২৩. কমল কোড়াইয়া, ফাদার, 'তীর্থোৎসবপ্রিয় বাঙালী', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৯, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৮।

২৪. কমল কোড়াইয়া, ফাদার, 'বাংলাদেশে তীর্থস্থান', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

২৫. কমল কোড়াইয়া, ফাদার, 'সাধু আন্তনী যেন এক পরশমণি', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৫, সংখ্যা ৩, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৫।

২৬. কমল কোড়াইয়া, ফাদার, 'সাধু আন্তনীর পার্বণে শুভেচ্ছা', আশীর্বাদ, সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর যুবসমিতি, সাভার, ঢাকা, ২০১৫।

২৭. কমল কোড়াইয়া, ফাদার, 'সাধু আন্তনীর পার্বণে শুভেচ্ছা', আশীর্বাদ, সাধু আন্তনীর পার্বণ, সাভার, ঢাকা, ২০১৩।

২৮. ক্যাথরিন পিউরীফিকেশন, 'শতবর্ষের বায়স্কোপ ও সাধু আন্তনীর পালাগান', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বড়দিন সংখ্যা, ঢাকা, ২০১৫।

২৯. খ্রীষ্টফার রোজারিও, ফাদার, 'প্রার্থনা ও বিশ্বাসের ফল পানজোরার সাধু আন্তনীর মাধ্যমে ঐশ-অনুগ্রহ লাভ', নাগরী, সম্পাদক: লিনছন গমেজ, নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, ২০১০।

৩০. খ্রীষ্টফার রোজারিও, 'প্রার্থনা ও বিশ্বাসের ফল: পানজোরায় সাধু আন্তনীর মাধ্যমে ঐশ অনুগ্রহ লাভ', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৫, সংখ্যা ৩, ঢাকা, ২০০৫।

৩১. ছিরিল ডি'রোজারিও, 'পানজোরায় সাধু আন্তনী', নাগরী, নাগরী খ্রীষ্টান যুবসমিতি, গাজিপুর, ২০০০।

৩২. ছিরিল ডি'রোজারিও, 'পানজোরাকে সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান ঘোষণা', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৯, ঢাকা, ১৯৯৩।

৩৩. জনি যোসেফ কোড়াইয়া, 'আমাদের সাধু: সাধু আন্তনী', মিহির, সম্পাদক: প্রবীর কস্তা, সেন্ট পিটার যুবসংঘ, পাড়ারটেক, নাগরী, গাজিপুর, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ২০১০।

৩৪. জুডিথ জবা ডি'রোজারিও, 'পানজোরায় সাধু আন্তনীর তীর্থে ভক্ত-মানুষের মিলনমেলা', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৭, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ২০০৭।

৩৫. জের্ভাস রোজারিও, 'বিশপ মহোদয়ের বাণী', অনুগ্রহ, সম্পাদক: ফাদার যোহন উত্তম রোজারিও, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, কাতুলী, পাবনা, ২০১৬।

৩৬. জেরী রেমণ্ড গমেজ এসজে, 'যে বৃষ্টিতে ফসল ফলে: ধর্মোপদেষ্টা সাধু আন্তনী ও সমকাল নিয়ে কিছু ভাবনা', আশীর্বাদ, সম্পাদক: লিমেন্ট এস. রেগো, সাধু আন্তনীর পার্বণ, সাভার, ঢাকা, ২০১৩।

৩৭. জেন কুম কুম ডি'ক্রুজ, 'প্রতি ঘরে বর্ষিত হোক সাধু আন্তনীর আশীষধারা', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

৩৮. জ্যোতি এফ. কস্তা, ফাদার, 'আরাধ্য সংস্কারের প্রতি সাধু আন্তনীর ভক্তি', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৭০, সংখ্যা ২২, ঢাকা, ২০১০।

৩৯. জ্যোতি গমেজ, ফাদার, 'পানজোরাতে সাধু আন্তনীর পর্ব', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ১৯৮৮।

৪০. টমাস কোড়াইয়া, '১৩ জুন, সাধু আন্তনীর পার্বণ: বাস্তবতার আলোকে কিছু কথা', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ২০, ঢাকা, জুন ২০০৪।

৪১. টারজেন যোসেফ রোজারিও, 'মহাজ্ঞানী মহাত্যাগী সাধু আন্তনী', উন্মোচন, দক্ষিণ পানজোরা ক্ষুদ্রপুষ্প সংঘ, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৮।

৪২. ডেভিড গমেজ, ফাদার, 'সর্বজনপ্রিয় অলৌকিক কর্মসাধক পাদুয়ার সাধু আন্তনী', নাগরী, সম্পাদক: লিনছন গমেজ, নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০১০।

৪৩. ডেভিড গমেজ, ফাদার, 'মঙ্গলবাণী ঘোষণায় তীর্থস্থানের ভূমিকা', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ২, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৪।

৪৪. ডেভিড গমেজ, ফাদার, 'পানজোরা তীর্থস্থান: ঈশ্বর ও মানুষের মিলনভূমি', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

৪৫. ডেভিড গমেজ, ফাদার, 'পানজোরায় সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান: মঙ্গলবাণী ঘোষণার এক দীপ্তিময় কেন্দ্র', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৫, সংখ্যা ৩, ঢাকা, ২০০৫।

৪৬. ডেভিড গমেজ, ফাদার, 'পানজোরায় সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ৩, ঢাকা, ২০০৫।

৪৭. ডোরা ডি'রোজারিও, 'তীর্থযাত্রা এবং এর তাৎপর্য', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৯, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৮।

৪৮. তপন ডি' রোজারিও, ফাদার, 'এক চিলতে তীর্থকথা', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৭৬, সংখ্যা ৪২, ঢাকা, নভেম্বর ২০১৬।

৪৯. তপন ব্লেইজ রোজারিও, 'হে সাধু আন্তনী দাও ফিরিয়ে সেই দিন', আশীর্বাদ, কমলাপুর যুবসমিতি, সম্পাদক: পাভেল রোজারিও, সাধু আন্তনীর পার্বণ সংখ্যা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ৮, সাভার, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৬-৭।

৫০. তন্দ্রা ই. পিরিচ, 'বিপদের বন্ধু সাধু আন্তনী', অদ্যাবধি, সম্পাদক: প্রিন্স কস্তা, সূর্যতরুণ সংঘ, আড়াগাঁও, নাগরী, গাজিপুর, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, ২০১০।

৫১. তরেন যোসেফ পালমা, 'পানজোরাতে সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তদের ভক্তির স্রোতধারায় প্রার্থনা ও বিশ্বাসের ফল', স্মরণিকা, সাধু আন্তনীর পর্ব উদযাপন কমিটি, ২০১১, পৃ. ৬-৮.

৫২. তানিয়া কোড়াইয়া, 'প্রার্থনায় সাধু আন্তনী', স্মরণিকা, সম্পাদক: ফাদার আলবার্ট রোজারিও, ফাদার ডেভিড গমেজ, সিস্টার মেরী অমিয়া এসএমআরএ, নাগরীতে নব-নির্মিত সাধু নিকোলাসের গির্জার উদ্বোধন ও আশীর্বাদ, নাগরী ধর্মপল্লী, গাজিপুর, ১২ ডিসেম্বর ২০০৮।

৫৩. তাপস সাননিকোলাস, 'পুণ্যবান সাধু আন্তনী', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৫, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ২০০৩।

৫৪. থিওটোনিয়াস প্রশান্ত রিবেরু, ফাদার, 'পাদুয়ার মহান সাধু আন্তনী: আমাদের পরিবারের আদর্শ', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

৫৫. দিলীপ এস. কস্তা, ফাদার, 'পাল-পুরোহিতের বাণী' অনুগ্রহ, সম্পাদক: ফাদার যোহন উত্তম রোজারিও, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, কাতুলী, পাবনা, ২০১৬।

৫৬. দিলীপ এস. কস্তা, ফাদার, 'তীর্থযাত্রা: অন্তরে শুদ্ধতা ও পরিবর্তনের আহ্বান', অনুগ্রহ, সম্পাদক: ফাদার যোহন উত্তম রোজারিও, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, কাতুলী, পাবনা, ২০১৬।

৫৭. দিলীপ এস. কস্তা, ফাদার, 'খ্রীষ্টীয় লৌকিক সংস্কৃতি ও সাধু আন্তনী ভক্তি', অনুগ্রহ, সম্পাদক: ফাদার যোহন উত্তম রোজারিও, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, কাতুলী, পাবনা, ২০১৮।

৫৮. দীপক এফ. পালমা, 'পিটার ডমিনিক রোজারিও (দমেঙ্গু পণ্ডিত)', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

৫৯. দীপক এফ পালমা, পরিমল পালমা, 'বিশ্বাস ও মিলনে তীর্থোৎসব: পানজোরায় সাধু আন্তনীর পর্ব পালন', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ২০০০।

৬০. দীপক এফ. পালমা, পরিমল পালমা, 'বিশ্বাস ও মিলনের তীর্থোৎসব: সাধু আন্তনীর পর্ব পালন', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ২০০০।

৬১. দীপক এফ. পালমা, পরিমল পালমা, 'সাধু আন্তনীর পর্ব পালনে ভক্তদের প্রাপ্তি', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬২, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ২০০২।

৬২. দীপক এফ পালমা, পরিমল পালমা, 'পানজোরায় সাধু আন্তনীর পর্ব পালন', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ১৯৯৯।

৬৩. দীপক এফ পালমা, পরিমল পালমা, 'পানজোরাতে সাধু আন্তনীর পর্ব', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ১৯৯৬।

৬৪. দীপক এফ পালমা, পরিমল পালমা, 'সর্বধর্মীয় আন্তনী– ভক্তপ্রাণদের মিলনের এক তীর্থভূমি', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৮, ঢাকা, ১৯৯৩।

৬৫. দীপক এফ. পালমা, 'পানজোরায় সাধু আন্তরীর পর্ব: চাহিদা পূরণে তড়িৎ পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬২, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ২০০১।

৬৬. নন্দিতা বিশ্বাস, 'ধার্মিকের স্মৃতি আশীর্বাদের বিষয়', আশীর্বাদ, সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর যুবসমিতি, সাভার, ঢাকা, ২০১৫।

৬৭. নয়ন জি. রেজারিও, 'মহাজ্ঞানী সাধু আন্তনী', আশীর্বাদ, সম্পাদক: মিল্টন মাইকেল গমেজ, সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, ২০১০।

৬৮. নোবেল গমেজ, 'অলৌকিক কর্মসাধক আন্তনীর বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ', শঙ্খ, দোয়ানী স্বপ্নের নীড় যুবসংঘ, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৮।

৬৯. নেভেল ডি' রোজারিও, 'তেজগাঁও পবিত্র জপমালার গির্জা', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ১৩, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৪।

৭০. বাপ্পী চৌধুরী, 'পাদুয়ার সাধু আন্তনী', কলি, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৮।

৭১. বাবলু কোড়াইয়া, পানজোরায় পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৯, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ২০০৯।

৭২. বিপুল এলিট গনছালভেস, 'পাদুয়া থেকে পানজোরা: সাধক সাধু আন্তনীর বিশ্বাসের মিলনোৎসব', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬১, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ২০০১।

৭৩. বিশেষ প্রতিবেদন, 'পানজোরায় সাধু আন্তনীর পর্ব পালন: আমরা সবাই মহান সাধু আন্তনীর ভক্ত', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৯, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৮।

৭৪. পংকজ প্লাসিড রড্রিক্স, 'নাগরীর ঐতিহ্যময় ইতিহাস', স্মরণিকা, সম্পাদক: ফাদার আলবার্ট রোজারিও, ফাদার ডেভিড গমেজ, সিস্টার মেরী অমিয়া এসএমআরএ, নাগরীতে নব-নির্মিত সাধু নিকোলাসের গির্জার উদ্বোধন ও আশীর্বাদ, নাগরী ধর্মপল্লী, গাজিপুর, ২০০৮।

৭৫. পানজোরা পর্ব-উদ্‌যাপন কমিটি, 'পাদুয়ার সাধু আন্তনীর প্রতি বিভিন্ন লৌকিক বিশ্বাস ও ভক্তিরীতি, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

৭৬. পাপ্পু রুবেণ রোজারিও, 'ধ্যান সাধনায় সাধু আন্তনী', অরুণোদয়, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৮।

৭৭. পিউস ছেড়াও, 'উদ্ভাসিত মিলন-তীর্থ', নাগরী, সম্পাদক: সুবীর খ্রীষ্টফার ক্রুশ, নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০০২।

৭৮. পিউস পি. গমেজ, 'সেবক সাধক মহান সাধু আন্তনী', সৃষ্টি, সম্পাদক: জেরী পিটার রোজারিও, বাগদী আবির্ভাব যুবসংঘ, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৭।

৭৯. পিউস পি. গমেজ, 'পানজোরা মহান সাধক সাধু আন্তনী পার্বণ', সৃষ্টি, সম্পাদক: জেরী পিটার রোজারিও, বাগদী আবির্ভাব যুবসংঘ, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৮।

৮০. পিউস পি. গমেজ, 'আমাদের প্রিয় সাধু আন্তনী', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৭৮, সংখ্যা ২১, ঢাকা, ২০১৮।

৮১. পি. পি. সম্পদ, 'বক্সনগরে সাধু আন্তনীর পর্ব', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ২৭, ঢাকা, ১৯৭৭।

৮২. পুলক আন্তনী কস্তা, 'সাধু আন্তনীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ', সৃষ্টি, সম্পাদক: জেরী পিটার রোজারিও, বাগদী আবির্ভাব যুবসংঘ, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৮।

৮৩. প্লাবণ কস্তা, 'মহাত্যাগী সাধু আন্তনী', সৃষ্টি, সম্পাদক: জেরী পিটার রোজারিও, বাগদী আবির্ভাব যুবসংঘ, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৮।

৮৪. প্রদীপ পেরেজ, 'ঠাকুরের গানের জাতীয় উৎসব', অরুণোদয়, সাধু আন্তনীর পার্বণ সংখ্যা, করান অরুণোদয় যুবসমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৬।

৮৫. প্রদীপ স্ট্যানলী গমেজ, 'নাগরীর ইতিবৃত্ত', শঙ্খ, সম্পাদক: পঙ্কজ গমেজ, স্বপ্নের নীড় যুবসংঘ, দোয়ানী, নাগরী, গাজিপুর, বর্ষ ৫, বিশেষ সংকলন, ২০০৯।

৮৬. প্রশান্ত থিওটনিয়াস রিবেরু, 'পানজোরাতে সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব: পরিবার ও সমাজ জীবনের এর প্রভাব', স্মরণিকা, সাধু আন্তনীর পর্ব উদযাপন কমিটি, গাজিপুর, ২০১১।

৮৭. প্রশান্ত পাস্কাল পামার, ভারতবর্ষ ধর্ম ও জাতি এবং তীর্থযাত্রা', নাগরী, সম্পাদক: লিনছন গমেজ, নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০১০।

৮৮. ফিদেলিউস মার্ডী, 'সাধু আন্তনীর তীর্থ ও ক্রেডিট নির্বাচনী প্রচারণা', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৮, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ২০০৮।

৮৯. ফ্রান্সিস ডি'কস্তা, পানজোরায় সাধু আন্তনীর পর্ব পালন', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৪২, সংখ্যা ৯, ঢাকা, ১৯৮২।

৯০. ফ্র্যাংক কুইনলিভ্যান সিএসসি, ফাদার, 'টলেন্টিনুর সাধু নিকোলাসের ধর্মপল্লী, নাগরী', অনুবাদ: অমিয় জেমস এসেনসন, স্মরণিকা, সম্পাদক: ফাদার আলবার্ট রোজারিও, ফাদার ডেভিড গমেজ, সিস্টার মেরী অমিয়া এসএমআরএ, নাগরীতে নব-নির্মিত সাধু নিকোলাসের গির্জার উদ্বোধন ও আশীর্বাদ, নাগরী ধর্মপল্লী, গাজিপুর, ২০০৮।

৯১. বকুল চার্লস ডি কস্তা, 'অলৌকিক কর্মসাধক সাধু আন্তনী', অরুণোদয়, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৮।

৯২. বকুল এস. রোজারিও, 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ: বাংলায় খ্রিষ্টীয় সাহিত্যে অবিঃস্মরণীয় গ্রন্থ', স্মরণিকা, সম্পাদক: ফাদার আলবার্ট রোজারিও, ফাদার ডেভিড গমেজ, সিস্টার মেরী অমিয়া এসএমআরএ, নাগরীতে নব-নির্মিত সাধু নিকোলাসের গির্জার উদ্বোধন ও আশীর্বাদ, নাগরী ধর্মপল্লী, গাজিপুর, ২০০৮।

৯৩. বার্নাড তপন গমেজ, 'পিছন ফিরে দেখা', স্মরণিকা, বক্সনগর সাধু আন্তনীর নতুন গীর্জার উদ্বোধন, ঢাকা, ২০০5।

৯৪. বিকাশ রোজারিও, 'সর্বজনপ্রিয় অলৌকিক কর্মসাধক পাদুয়ার সাধু আন্তনী', অরুণোদয়, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৮।

৯৫. বেঞ্জামিন গমেজ, 'সাধু সাধ্বী', উন্মোচন, দক্ষিণ পানজোরা ক্ষুদ্রপুষ্প সংঘ, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৮।

৯৬. ব্রাইন গমেজ, ফাদার, 'শিশু গঠন ও সাধু আন্তনী', আশীর্বাদ, সম্পাদক: পাভেল রোজারিও, সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, ২০১৬।

৯৭. ভিনসেন্ট রড্রিক্স, 'নাগরী ও কিছু প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা', স্মরণিকা, সম্পাদক: ফাদার আলবার্ট রোজারিও, ফাদার ডেভিড গমেজ, সিস্টার মেরী অমিয়া এসএমআরএ, নাগরীতে নব-নির্মিত সাধু নিকোলাসের গির্জার উদ্বোধন ও আশীর্বাদ, নাগরী ধর্মপল্লী, গাজিপুর, ২০০৮।

৯৮. মন্টু গমেজ, 'সাধু আন্তনী', ফাদার সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সিএসসি (সম্পাদক), সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ২১, ঢাকা, জুন ১৯৯৪।

৯৯. মন্টু ডানিয়েল, আন্তনীর উপাখ্যান, নাগরী, সম্পাদক: সুবীর খ্রীষ্টফার ক্রুশ, নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২।

১০০. মাইকেল মন্টু ডি'কস্তা, 'ঈশ্বরের বন্ধু সাধু আন্তনী', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ২১, ২০০৪, ঢাকা।

১০১. মিতু মার্থা রোজারিও, 'ঈশ্বরের সেবক মহান সাধু আন্তনী', শঙ্খ, দোয়ানী স্বপ্নের নীড় যুবসংঘ, নাগরী, ২০১৮।

১০২. মিল্টন ডি' পালমা, 'পাদুয়ার সাধু আন্তনী', উন্মোচন, দক্ষিণ পানজোরা ক্ষুদ্রপুষ্প সংঘ, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৮।

১০৩. মুক্তা মেবেল রোজারিও, 'নম্রতার উজ্জ্বল আদর্শ মহান সাধু আন্তনী', সূর্যোদয়, সম্পাদক: সুহৃদ এসেনসন, সূর্যোদয় সংঘ, ছাইতান, নাগরী, গাজিপুর, সংখ্যা ১২, ২০০৯।

১০৪. মেরী অনিতা এসএমআরএ, সিস্টার; 'পানজোরা সাধু আন্তনীর তীর্থমন্দির এবং বিশ্বাসী ভক্তগণ', নাগরী, সম্পাদক: সুবীর খ্রীষ্টফার ক্রুশ, নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০০২।

১০৫. মেরী অনিতা এসএমআরএ, সিস্টার; বেনিগ্না এসএমআরএ, সিস্টার; মাইকেল এসএমআরএ, সিস্টার; 'পানজোরা সাধু আন্তনীর পর্বোৎসবে ভক্তদের বিশ্বাস ও ভক্তির স্রোতধারা', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ২, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৪।

১০৬. মেরী অমিয়া এসএমআরএ, সিস্টার, 'ভাওয়াল অঞ্চলে নাগরী ও পানজোরায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ইতিবৃত্ত', স্মরণিকা, সম্পাদক: ফাদার আলবার্ট রোজারিও, ফাদার ডেভিড গমেজ, সিস্টার মেরী অমিয়া এসএমআরএ, নাগরীতে নব-নির্মিত সাধু নিকোলাসের গির্জার উদ্বোধন ও আশীর্বাদ, নাগরী ধর্মপল্লী, গাজিপুর, ২০০৮।

১০৭. মেরী তৃষিতা এসএমআরএ, সিস্টার, 'পাপীর মন পরিবর্তনকারী সাধু আন্তনী', নেত্র, সম্পাদক: প্রলয় এসেনসন, উদয়ন সংঘ, উত্তর পানজোরা, নাগরী, গাজিপুর, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১১, ২০১০।

১০৮. মেরী তৃষিতা এসএমআরএ, সিস্টার, 'পাদুয়ার সাধু আন্তনী ও পানজোরাতে তাঁর জনপ্রিয়তার কিংবদন্তী', স্মরণিকা, সাধু আন্তনীর পর্ব উদযাপন কমিটি, নাগরী, গাজিপুর, ২০০২.

১০৯. মেরী তৃষিতা এসএমআরএ, সিস্টার, 'খ্রীষ্টপ্রসাদ প্রেমিক সাধু আন্তনী: খ্রীষ্টপ্রসাদীয় বর্ষে আমাদের আদর্শ', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৫, সংখ্যা ৩, ২৩-২৯ জানুয়ারি ২০০৫।

১১০. মেরী মার্গারেট এসএমআরএ, সিস্টার, 'পানজোরার সাধু আন্তনী', কলি, সম্পাদক: পংকজ গমেজ, সেবাসংঘ, নাগরী, গাজিপুর, সাধু আন্তনীর পার্বণ, ২০০৯।

১১১. মেরী মিতালী এসএমআরএ, সিস্টার, 'জীবন সাক্ষ্য', নাগরী, সম্পাদক: লিনছন গমেজ, নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

১১২. রবীন গমেজ এসডিবি, ফাদার, 'আঠারো গ্রাম ঐহিত্যের এক নতুন ফলক বক্সনগর সাধু আন্তনীর গীর্জা', স্মরণিকা, বক্সনগর সাধু আন্তনীর গীর্জা, সম্পাদক : আলবার্ট টমাস রোজারিও, নবাবগঞ্জ, ঢাকা, ২০০৬।

১১৩. রিংকু হিউবার্ট কস্তা সিএসসি, 'আশ্চর্য কর্মসাধক সাধু আন্তনী', আশীর্বাদ, সম্পাদক: মিল্টন মাইকেল গমেজ, সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর, ২০১০।

১১৪. লিটন ফ্রান্সিস গোমেজ, 'সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান : রাজাবাড়িয়া', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সম্পাদক: জয়ন্ত এস. গেমেজ, বর্ষ ৭৬, সংখ্যা ৪২, ঢাকা, নভেম্বর ২০১৬।

১১৫. রক রিচার্ড কস্তা, 'পাদুয়ার সাধু আন্তনীর জীবনী' (১১৯৫–১২৩১), নেত্র, সম্পাদক: ইভেন পালমা, উদয়ন সংঘ, উত্তর পানজোরা, নাগরী, গাজিপুর, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১০, ২০০৯।

১১৬. রণক ডি'ক্রুজ রচিত 'তোমার চরণ চুমিতে', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩, ঢাকা, জানুয়ারি- ফ্রেব্রুয়ারি ২০০৬।

১১৭. রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা, 'পানজোরা সাধু আন্তনীর তীর্থভূমির শুরুর কথা', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সম্পাদক: জয়ন্ত এস. গেমেজ, বর্ষ ৭৬, সংখ্যা ৪২, ঢাকা, নভেম্বর ২০১৬।

১১৮. রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা, 'খ্রীষ্টপ্রেমিক ও মহান সাধু আন্তনী', অরুণোদয়, সাধু আন্তনীর পার্বণ সংখ্যা, করান অরুণোদয় যুবসমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৬।

১১৯. রবার্ট টমাস কস্তা, পাদুয়ার সাধু আন্তনী', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫১, সংখ্যা ২১, ঢাকা, ১৯৯১।

১২০. রবি মাইকেল গাড়ী, রবীন ভাবুক, 'প্রাণের টানে অর্ধলক্ষাধিক আন্তনী ভক্তের সমাবেশ', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৭০, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ২০১০।

১২১. রবীন ডি'কস্তা, 'ইতিহাসের পাতায় নাগরী', স্মরণিকা, যাজকীয় রজত জয়ন্তী, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৬।

১২২. রিংকু হিউবার্ট কস্তা সিএসসি, 'অলৌকিক কর্মসাধক সাধু আন্তনী', আশীর্বাদ, কমলাপুর যুবসমিতি, সম্পাদক: পাভেল রোজারিও, সাধু আন্তনীর পার্বণ সংখ্যা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ৮, সাভার, ঢাকা, ২০১৫।

১২৩. রিচার্ড মুকুল গমেজ, 'নষ্টালজিয়া', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬২, সংখ্যা ২৩, ঢাকা, জুন ২০০২।

১২৪. রিন্টু গমেজ, 'একজন হলুদ সাধু', আশীর্বাদ, সম্পাদক: লিমেন্ট এস. রেগো, সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, ২০১৩।

১২৫. রিপন স্তেফান গমেজ, 'আধ্যাত্মিকতার গভীরতায় সাধু আন্তনীর জীবন ও কাজ', অরুণোদয়, সম্পাদক: লেনার্ড পিউরীফিকেশন, অরুণোদয় যুব-সুমিতি, করাণ, নাগরী, গাজিপুর, ২০১০।

১২৬. রুমি গমেজ, 'সাধু আন্তনী', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ২০, ঢাকা, জুন ২০০৪।

১২৭. লেনার্ড রোজারিও, ফাদার, 'আশ্চর্য কাজে সাধু আন্তনীর আধ্যাত্মিকতা', নাগরী, নাগরী খ্রীষ্টান যুবসমিতি, গাজিপুর, ২০০০।

১২৮. শরৎ গমেজ, 'পানজোরাতে সাধু আন্তনীর তীর্থভূমির ইতিকথা', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ২, ঢাকা, ২০০৪।

১২৯. শ্যামলী মণ্ডল, 'সাধু আন্তনী', শঙ্খ, সম্পাদক: নোবেল গমেজ, দোয়ানী স্বপ্নের নীড় যুবসংঘ, নাগরী, ২০১৮।

১৩০. সবুজ রিচার্ড রোজারিও, 'আমরা সবাই মহান সাধু আন্তনীর ভক্ত', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৯, ঢাকা, ১৯৯৮।

১৩১. সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও, 'পানজোরাতে সাধু আন্তনী: ইতিহাস ও প্রসার', স্মরণিকা, সাধু আন্তনীর পর্ব উদযাপন কমিটি, নাগরী, গাজিপুর, ২০১১।

১৩২. সাগরি রোজারিও, 'কাতুলীতে সাধু আন্তনীর স্কুল ও পর্বোৎসব', অনুগ্রহ, সম্পাদক: ফাদার যোহন উত্তম রোজারিও, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, কাতুলী, পাবনা, ২০১৬।

১৩৩. সুকুমার পিউরীফিকেশন, 'সবার সাধু: মহান সাধু আন্তনী', অরুণোদয়, সম্পাদক: উজ্জ্বল ডেনিস রোজারিও, অরুণোদয় যুব-সমিতি, করাণ, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৯।

১৩৪. সুকুমার পিউরীফিকেশন, 'ত্যাগী তাপস মহান সাধক আন্তনী', অরুণোদয়, সাধু আন্তনীর পার্বণ সংখ্যা, করান অরুণোদয় যুবসমিতি, নাগরী, ২০১৬।

১৩৫. সুকুমার পিউরীফিকেশন, 'খ্রীষ্টীয় ও সেবার জীবনের গভীরে যেতে হবে: পানজোরায় সাধু আন্তনীর পর্ব পালন', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬২, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ২০০২।

১৩৬. সুকুমার পিউরীফিকেশন, 'মহান সাধু আন্তনীর পার্বণ: জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মিলনোৎসব', শঙ্খ, সম্পাদক: পঙ্কজ গমেজ, স্বপ্নের নীড় যুবসংঘ, বর্ষ ৫, বিশেষ সংকলন, দোয়ানী, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৯।

১৩৭. সুকুমার পিউরীফিকেশন, 'সাধু আন্তনীর অলৌকিক কর্মসাধন ঈশ্বরের শক্তির বহিঃপ্রকাশ', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ৫, ঢাকা, ২০০৫।

১৩৮. সুব্রত সিএসসি, 'সর্বজনপ্রিয় অলৌকিক কর্মসাধক পাদুয়ার সাধু আন্তনী', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ২, ঢাকা, ২০০৪।

১৩৯. সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সিএসসি, ফাদার, 'মণ্ডলীর আচার্য পাদুয়ার সাধু আন্তনী', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ২১, ঢাকা, জুন ১৯৯৪।

১৪০. সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সিএসসি, ফাদার, 'জয়তু সাধু আন্তনী', সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ২১, ঢাকা, জুন ১৯৯৪।

১৪১. সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সিএসসি, ফাদার, 'উপেক্ষিত আইন্তনঃ প্রথম জীবন', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫১, সংখ্যা ৪৪, ঢাকা, ১৯৯১।

১৪২. সুমন কোড়াইয়া, 'পানজোরা তীর্থমন্দির– বিশ্বাসের শতবর্ষঃ ঐতিহাসিক পানজোরায় তীর্থোৎসব', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

১৪৩. সুমন কোড়াইয়া, 'পানজোরায় সাধু আন্তনীর সান্নিধ্যে ভক্তজনগণ', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৯, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ২০০৯।

১৪৪. সুমন জে. পিউরীফিকেশন, 'সাধু আন্তনীর পর্ব ও আমরা', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ৫, ঢাকা, ২০০৩।

১৪৫. সুশীল আই কস্তা, 'পানজোরায় সাধু আন্তনীর মহা তীর্থোৎসব', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৮, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ২০০৮।

১৪৬. সুনীল পেরেরা, 'বিপদের বন্ধু সাধু আন্তনী', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৭০, সংখ্যা ২২, ঢাকা, ২০১০।

১৪৭. সুনীল ডানিয়েল রোজারিও, ফাদার, 'সাধু আন্তনী যেন এক পরশমণি', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ৩, ঢাকা, ২০০৬।

১৪৮. সৌরভ টি. পালমা, 'পুণ্যকাজের প্রেরণা পুণ্যপুরুষ পাদুয়ার সাধু আন্তনী', উন্মোচন, সম্পাদকঃ কিশোর আর. গমেজ, ক্ষুদ্রপুষ্প সংঘ, দক্ষিণ পানজোরা, নাগরী, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২, ঢাকা, ২০০৯।

খ. কাব্য-কবিতা

১. অমিত গমেজ, 'সাধু আন্তনী', দিশারী, বক্সনগর সেন্ট এ্যান্থনীস ক্লাব, নবাবগঞ্জ, ২০১২।

২. আশীষ ডি'কস্তা, 'মহান তুমি সাধু আন্তনী', নেত্র, উদয়ন সংঘ, উত্তর পানজোরা, নাগরী, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১১, গাজিপুর, ২০০৮।

৩. উইনী কস্তা, 'সাধু আন্তনীর পর্বে হারিয়ে যাই', কলি, সম্পাদকঃ পংকজ গমেজ, সেবাসংঘ, নাগরী, সাধু আন্তনীর পার্বণ, ২০০৯।

৪. উদাস পথিক, 'সাধু আন্তনীঃ প্রেমময় জীবন গড়ার রবি', অনুগ্রহ, সম্পাদকঃ ফাদার যোহন উত্তম রোজারিও, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, কাতুলী, পাবনা, ২০১৮।

৫. এমিলিয়া চন্দ্রা গমেজ, 'মহান সাধু আন্তনী', স্মরণিকা, বক্সনগর সাধু আন্তনীর নতুন গীর্জার উদ্বোধন, নবাবগঞ্জ, ২০০৫।

৬. কুইনী গমেজ, 'প্রেমিক পুরুষ সাধু আন্তনী', কলি, সম্পাদকঃ পংকজ গমেজ, সেবাসংঘ, নাগরী, সাধু আন্তনীর পার্বণ, ২০০৯।

৭. জয় গমেজ, 'মহান সাধু আন্তনী', নেত্র, সম্পাদক: ইভেন পালমা, উদয়ন সংঘ, উত্তর পানজোরা, নাগরী, ২০০৯।

৮. জয় গমেজ, 'হে মহান সাধু আন্তনী', উন্মোচন, সম্পাদক: কিশোর গমেজ, ক্ষুদ্রপুষ্প সংঘ, দক্ষিণ পানজোরা, নাগরী, ২০০৯।

৯. জ্যাকসন বটলেরু, 'সত্যের সন্ধানী', আশীর্বাদ, সম্পাদক: লিমেন্ট এস. রেগো, সাধু আন্তনীর পার্বণ, সাভার, ২০১৩।

১০. তন্ময় এফ. পিউরীফিকেশন, 'সাধু আন্তনী', অরুণোদয়, সাধু আন্তনীর পার্বণ সংখ্যা, করান অরুণোদয় যুবসমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৬।

১১. তানিয়া কোড়াইয়া, 'প্রার্থনায় সাধু আন্তনী', কলি, সম্পাদক: পংকজ গমেজ, সেবাসংঘ, নাগরী, সাধু আন্তনীর পার্বণ, ২০০৯।

১২. পূজা গমেজ, 'হে মহান সাধু আন্তনী', নেত্র, সম্পাদক: প্রলয় এসেনসন, উদয়ন সংঘ, উত্তর পানজোরা, নাগরী, ২০১০।

১৩. পূজা গমেজ, 'হে মহান সাধু আন্তনী', নেত্র, সম্পাদক: ইভেন পালমা, উদয়ন সংঘ, উত্তর পানজোরা, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৯।

১৪. প্রমিল রোজারিও, 'আন্তনী', সৃষ্টি, সম্পাদক: জেরী পিটার রোজারিও, বাগদী আবির্ভাব যুবসংঘ, নাগরী, ২০১৭।

১৫. প্রিয়া পালমা, 'সাধু আন্তনী আমার কাছে তুমি', কলি, সম্পাদক: পংকজ গমেজ, সেবাসংঘ, নাগরী, সাধু আন্তনীর পার্বণ, ২০০৯।

১৬. প্রিয়া গ্লোরিয়া গমেজ, 'সাধু আন্তনী সবে করি জয়ধ্বনি', আশীর্বাদ, সম্পাদক: লিমেন্ট এস. রেগো, সাধু আন্তনীর পার্বণ কলাপুর, সাভার, ঢাকা, ২০১৩।

১৭. ফ্রান্সিস মানিক ফলিয়া, 'তত্ত্বকথা', নাগরী, সম্পাদক: সুবীর খ্রীষ্টফার ক্রুশ, নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, গাজিপুর, ২০০২।

১৮. বীথি মারীয়া রড্রিক্স, ' হে সাধু আন্তনী', নেত্র, সম্পাদক: প্রলয় এসেনসন, উদয়ন সংঘ, উত্তর পানজোরা, নাগরী, ২০১০।

১৯. বৃষ্টি রোজারিও, 'সাধু আন্তনী', সূর্যোদয়, সম্পাদক: সুহৃদ এসেনসন, সূর্যোদয় সংঘ, ছাইতান, নাগরী, ঢাকা, ২০০৯।

২০. ব্রাইন পালমা, 'হে সাধু আন্তনী', নেত্র, উদয়ন সংঘ, উত্তর পানজোরা, নাগরী, গাজিপুর, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১১, ২০০৮।

২১. মার্টিন রোজারিও, 'নাগরী ধর্মপল্লী', নাগরী, সম্পাদক: সুবীর খ্রীষ্টফার ক্রুশ, নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, ২০০২।

২২. মার্টিন সৌরভ গমেজ, 'প্রিয় আন্তনী', দিশারী, বক্সনগর সেন্ট এ্যান্থনীস ক্লাব, বক্সনগর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা, ২০০৭।

২৩. মেরী অমিয়া এসএমআরএ, সিস্টার, 'অলৌকিক কর্মসাধক সাধু আন্তনী', নাগরী, সম্পাদক: বিকি রোজারিও, নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৯।

২৪. মেরী মার্গারেট এসএমআরএ, 'মহান সাধু আন্তনী', সূর্যোদয়, সম্পাদক: সুহৃদ এসেনসন, সূর্যোদয় সংঘ, ছাইতান, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৯।

২৫. মেরী মার্গারেট এসএমআরএ, সিস্টার, 'মহান ত্যাগী সাধু আন্তনী', আশীর্বাদ, সাধু আন্তনীর পার্বণ কমলাপুর যুব সমিতি, কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, ২০১৫।

২৬. মেরী মার্গারেট এসএমআরএ, সিস্টার, 'সাধু আন্তনীর জীবনালেখ্য', আশীর্বাদ, সম্পাদক: পাভেল রোজারিও, সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, ২০১৬।

২৭. মেরী সুপ্রীতি, সিস্টার, 'সাধু আন্তনীর তীর্থভূমি পানজোরা', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৭৪, সংখ্যা ৩৫, ঢাকা, ২০১৪।

২৮. যীশু বাউল, 'তীর্থ উৎসব বিষয়ে চিন্তা', অনুগ্রহ, সম্পাদক: ফাদার যোহন উত্তম রোজারিও, সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, কাতুলী, পাবনা, ২০১৮।

২৯. রিগেন ফ্রান্সিস রোজারিও, 'ধন্য হে সাধু আন্তনী তুমি ধন্য', অরুণোদয়, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৮।

৩০. রুমি গমেজ, 'সাধু আন্তনী', সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ২১, ঢাকা, ২০০৪।

৩১. লেনার্ড যোসেফ পিউরীফিকেশন, 'সুমহান সাধু আন্তনী', নাগরী, সম্পাদক: বিকি রোজারিও, নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৯।

৩২. লেনার্ড যোসেফ পিউরীফিকেশন, 'মহান সাধু আন্তনী' অদ্যাবধি, সম্পাদক: প্রিন্স কস্তা, সূর্যতরুণ সংঘ, আড়াগাঁও, নাগরী, গাজিপুর, ২০১০।

৩৩. সোহেল ডি'কস্তা, 'সাধু আন্তনী', নীহারিকা, বাগদী খ্রীষ্টান যুবকল্যাণ সংঘ, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৮।

৩৪. সুমিত্রা ওএসএল, সিস্টার 'অত্যাশ্চর্য সাধু আন্তনী', শঙ্খ, দোয়ানী স্বপ্নের নীড় যুবসংঘ, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৮।

৩৫. স্মিতা গমেজ, 'হে প্রতিপালক', স্মরণিকা, বক্সনগর সাধু আন্তনীর নতুন গীর্জার উদ্বোধন, ঢাকা, ২০০৫।

৩৬. নেত্র, সম্পাদক: প্রলয় এসেনসন, উদয়ন সংঘ, উত্তর পানজোরা, নাগরী, গাজিপুর, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১১, ২০১০।

গ. গান-গীতিকা

১. 'আজিকে আমরা মিলেছি মহান তোমার পুণ্যধামে', রচনা: পারাবত ও সুর সংযোজনা, *সাধু আন্তনীর মহিমাগান*, ঢাকা, ২০১৫।

২. 'আন্তনী সাধু আন্তনী প্রভু যীশুর প্রিয় বলে', *গীতমালা*, সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর, সাভার ঢাকা, ২০১৫।

৩. 'আন্তনী তুমি পানজোরা ভূমি করেছ প্রভুর প্রসাদে পুণ্যময়', রচনা: পারাবত, *সাধু আন্তনীর মহিমাগান*, ঢাকা, ২০১৫।
৪. 'আহা মানব তিনি অতি মহান', *মহান সাধু আন্তনীর পর্বীয় খ্রীষ্টযাগের গীতিগুচ্ছ*, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৫।

৫. 'ওগো মহান সাধু তোমার কারণে', বাণী রচনা: প্রিন্স রোজারিও, সুর সংযোজনা: প্রিন্স রোজারিও, *গীতাবলী: খ্রীষ্টীয় গানের বই*, সম্পাদক: জয়ন্ত এস. গমেজ, ফাদার, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০।

৬. 'ওগো সাধক আন্তনী বেঁধেছ প্রেম বন্ধনে', *মহান সাধু আন্তনীর পর্বীয় খ্রীষ্টযাগের গীতিগুচ্ছ*, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৫।

৭. 'চল সবাই সাধু আন্তনীর পুণ্যভূমে যাই', *মহান সাধু আন্তনীর পর্বীয় খ্রীষ্টযাগের গীতিগুচ্ছ*, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৫।

৮. 'জগৎ জুড়ে খুশীর জোয়ার ছড়িয়ে গেছে হায়', বাণী রচনা: প্রিন্স রোজারিও, সুর সংযোজনা: প্রিন্স রোজারিও, *গীতাবলী: খ্রীষ্টীয় গানের বই*, সম্পাদক: জয়ন্ত এস. গমেজ, ফাদার, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০।

৯. 'তোমার মহিমা তোমার গরিমা', *গীতাবলী: খ্রীষ্টীয় গানের বই*, সম্পাদক: জয়ন্ত এস. গমেজ, ফাদার, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০।

১০. ‘ধন্য তুমি ধন্য তুমি সাধু আন্তনী’, বাণী রচনা: মার্টিন ডি’কস্তা, সুর সংযোজনা: মার্টিন ডি’কস্তা, *গীতাবলী: খ্রীষ্টীয় গানের বই*, সম্পাদক: জয়ন্ত এস. গমেজ, ফাদার, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০।

১১. ‘ধন্য তুমি সাধক তুমি আন্তনী’, *গীতমালা*, সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর, সাভার ঢাকা, ২০১৫।

১২. ‘পরম পিতার পুণ্য আধার স্বর্গ মেখলা’, বাণী রচনা: প্রিন্স রোজারিও, সুর সংযোজনা: প্রিন্স রোজারিও, *গীতাবলী: খ্রীষ্টীয় গানের বই*, সম্পাদক: জয়ন্ত এস. গমেজ, ফাদার, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০।

১৩. ‘পাদুয়ার প্রাণ পুরুষ তুমি সাধু আন্তনী’, *মহান সাধু আন্তনীর পর্বীয় খ্রীষ্টযাগের গীতিগুচ্ছ*, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৬।

১৪. ‘সাধু আন্তনী আমাদের তুমি করুণা আশিসে ভরো’, রচনা ও সুর সংযোজনা: পারাবত, *সাধু আন্তনীর মহিমাগান*, ঢাকা, ২০১৫।

১৫. ‘সাধু আন্তনী ওগো আন্তনী তোমার চরণে রাখি মোদের প্রণামী’, বাণী রচনা: ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তা, সুর সংযোজনা: সুবাস ডি’কস্তা, *গীতাবলী: খ্রীষ্টীয় গানের বই*, সম্পাদক: জয়ন্ত এস. গমেজ, ফাদার, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০।

১৬. ‘সাধু আন্তনী, কিসে কাটবে বল মোদের মায়ার বন্ধনী, *গীতাবলী: খ্রীষ্টীয় গানের বই*, সম্পাদক: জয়ন্ত এস. গমেজ, ফাদার, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০।

১৭. ‘সাধু আন্তনী তোমার দয়ায় আমায় করো গো ধন্য’, রচনা ও সুর সংযোজনা: পারাবত, *সাধু আন্তনীর মহিমাগান*, ঢাকা, ২০১৫।

১৮. ‘স্বর্গ-পৃথিবী মিলিয়ে দিয়েছ পানজোরা ভূমি ’পরে’, রচনা ও সুর সংযোজনা: পারাবত, *সাধু আন্তনীর মহিমাগান*, ঢাকা, ২০১৫।

১৯. ‘হে পবিত্র হে শুভ্র হে পবিত্রতার গন্ধরাজ’, *মহান সাধু আন্তনীর পর্বীয় খ্রীষ্টযাগের গীতিগুচ্ছ*, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৫।

২০. ‘হে মহাজ্ঞানী হে মহাত্যাগী সাধু আন্তনী’, বাণী রচনা: ফাদার তপন ডি’ রোজারিও, সুর সংযোজনা: মার্কাস নিপু গাঙ্গুলী, *গীতাবলী: খ্রীষ্টীয় গানের বই*, সম্পাদক: জয়ন্ত এস. গমেজ, ফাদার, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০।

২১. ‘হে মানবপ্রেমী সাধু আন্তনী চারিদিকে হোক তোমার জয়ধ্বনি’, বাণী রচনা: প্রিন্স রোজারিও, সুর সংযোজনা: প্রিন্স রোজারিও, *গীতাবলী: খ্রীষ্টীয় গানের বই*, সম্পাদক: জয়ন্ত এস. গমেজ, ফাদার, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০।

২২. ‘হে মহাজ্ঞানী শক্তিদাতা হে সাধু আন্তনী’ *মহান সাধু আন্তনীর পর্বীয় খ্রীষ্টযাগের গীতিগুচ্ছ*, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৬।

পরিশিষ্ট ৪
খ্রিষ্টসাধক আন্তোনিয়ো ভাবধারার আলোকচিত্র

জন্ম: ১৫ আগস্ট ১১৯৫ মৃত্যু: ১৩ জুন ১২৩১

আন্তোনিয়োর জন্মস্থান: লিসবন, পর্তুগাল (বর্তমানে সাধু আন্তোনিয়োর মহাগির্জা)

আন্তোনিয়োর মৃত্যুস্থান: পাদুয়া, ইতালি (বর্তমানে সাধু আন্তোনিয়োর মহাগির্জা)

সাধু আন্তোনিয়োর তীর্থস্থান: পানজোরা, কালীগঞ্জ, গাজিপুর (সাধু আন্তোনিয়োর গির্জিকা, ১৯০৬)

সাধু আন্তোনিয়োর তীর্থমন্দির: পানজোরা, কালীগঞ্জ, গাজিপুর (সাধু আন্তোনিয়োর গির্জিকার মূল বেদি, ১৯০৬)

সাধু আন্তোনিয়োর তীর্থোৎসবের মহা উপাসনা, পানজোরা, নাগরী, কালীগঞ্জ (৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

সাধু আন্তোনিয়োর তীর্থোৎসবে লক্ষ মানুষের উপস্থিতি

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের জাতীয় উৎসব: নবজ্যোতি নিকেতন, মঠবাড়ি, গাজিপুর
(১৮ জন গায়েন, ৭-১০ অক্টোবর ২০১৫)

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের জাতীয় উৎসব: নবজ্যোতি নিকেতন, মঠবাড়ি, গাজিপুর
(১৮ জন গায়েন ও তাঁদের দল, ৭-১০ অক্টোবর ২০১৫

দুই গুরু: সিলভেস্টার পালমা (বাঁয়ে) ও যোসেফ ডেঙ্গু কস্তা

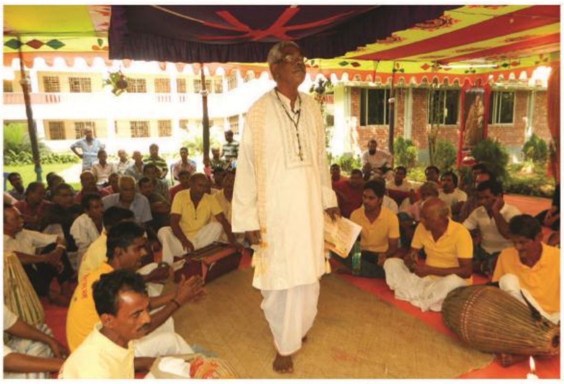

গায়েন: অরুণ কোড়াইয়া, বোয়ালি, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

গায়েন: সিলভেস্টার পালমা (ছিলু), রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

গায়েন: সুনীল পেরেরা, চড়াখোলা, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

গায়েন: ডমিনিক রোজারিও, রাজাসন, সাভার, ঢাকা

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগানের গায়েন সেলাম

গায়েন: ক্লেমেন্ট কস্তা (কেলু), রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

গায়েন: মানিক গমেজ, কমলাপুর, সাভার, ঢাকা

সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান পরিবেশনের নানা উপকরণ ও অনুষঙ্গ

পাঞ্জুরী বা খাউরা পায়ে নৃত্যরত গায়েন

পালাগানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রসমূহ

মন্দিরা

ধূপ ও ধুনা

সিদ্ধা বা দোয়াগীতের উপচার

খ্রিষ্টীয় অন্যান্য পালাগান

রামুর পালা

যিশুর কষ্টভোগের পালা

খ্রিষ্টীয় বৈঠকি গান

সাধ্বী আগ্নেশের পালা

বিভিন্ন স্থানে সাধু আন্তোনিয়ো পালার তথ্যানুসন্ধান

গায়েনের ঠাকুর প্রণাম: গায়েন ডগলাস পালমা (দগু), রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

গায়েন মিলন রোজারিও, রাঙামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

গায়েন আলেকজেণ্ডার গমেজ (জাণ্ড), বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর

গায়েন আদম রোজারিও, রাজাসন, সাভার, ঢাকা

গায়েন বাদু আন্তনি রোজারিও, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

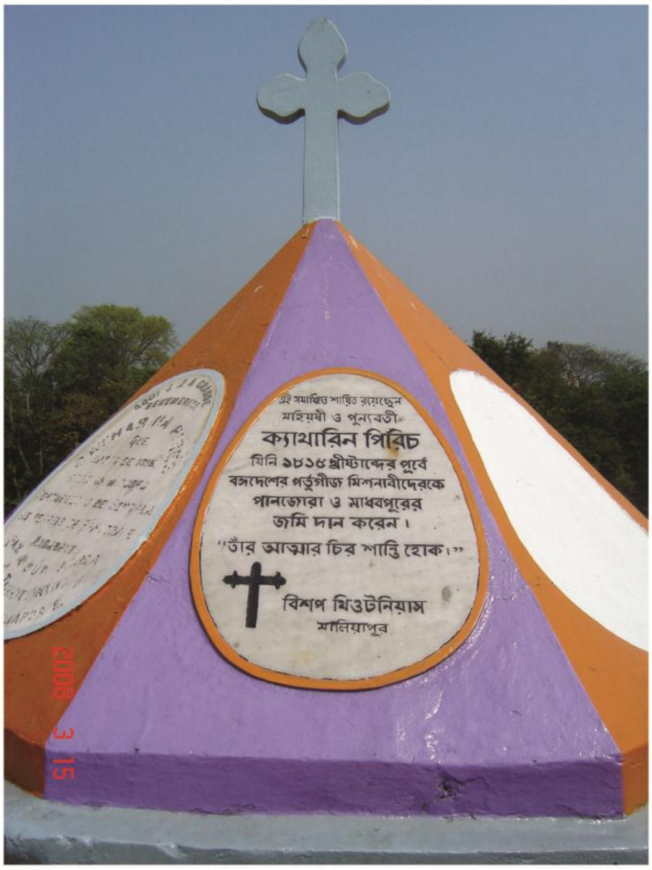

সাধু আন্তোনিয়ো তীর্থস্থানের জমি-দানকারিনী ক্যাথরিন পিরিছ-এর সমাধি,
পানজোরা, নাগরী (১৮১৮)

সাধু নিকোলাস টলেন্টিনুর নামে মাটির নির্মিত গির্জা, নাগরী

সাধু নিকোলাস টলেন্টিনুর প্রথম গির্জা, নাগরী (১৬৬৩)

বাংলাদেশে সাধু আন্তোনিয়োর রেলিক প্রদর্শনী, চট্টগ্রাম, ফেব্রুয়ারি ২০১৭

সাধু আন্তোনিয়োর রেলিক

গায়েন সুব্রত গমেজ, বনপাড়া, নাটোর

গায়েন রবি রিবেরু, জয়রামবের, কালীগঞ্জ, গাজিপুর

সাধু আন্তোনিয়োর পর্ব উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকা ও স্মরণিকা

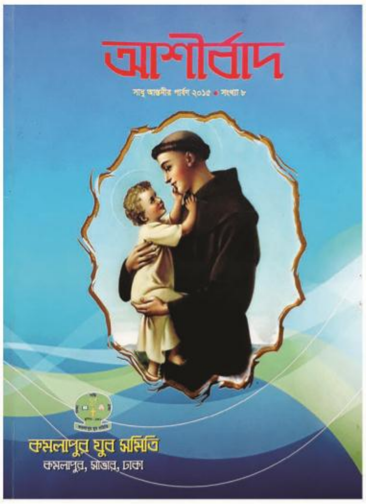

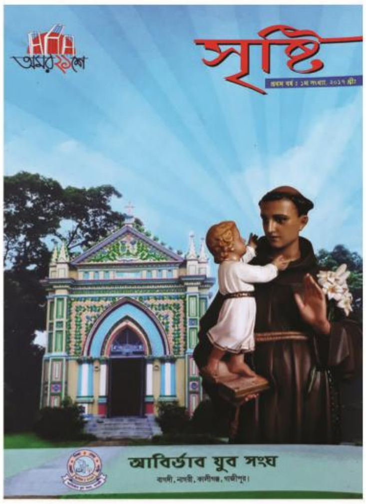

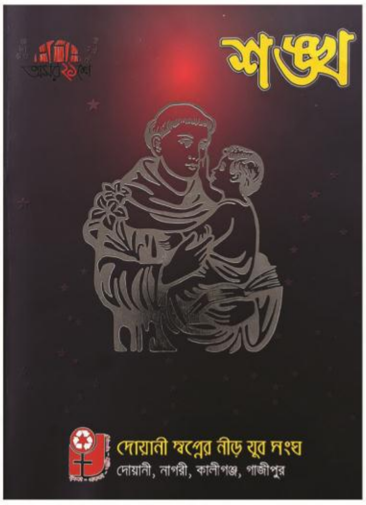

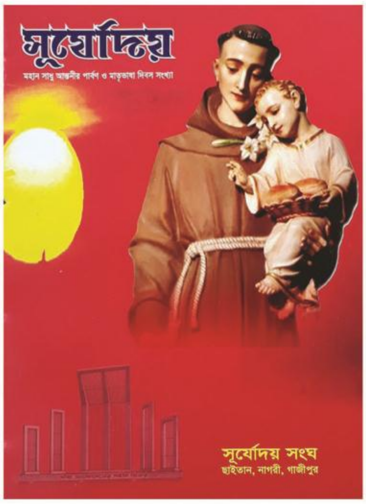

সাধু আন্তোনিয়োর পর্ব উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকা ও স্মরণিকা

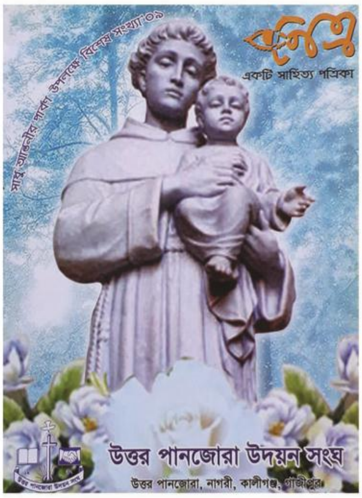

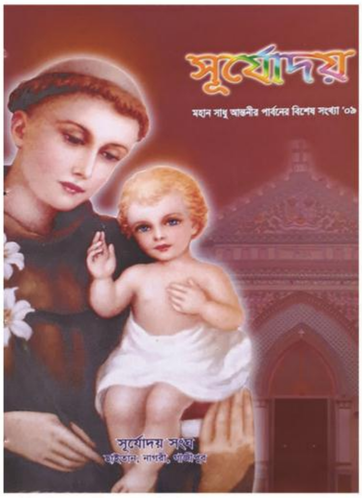

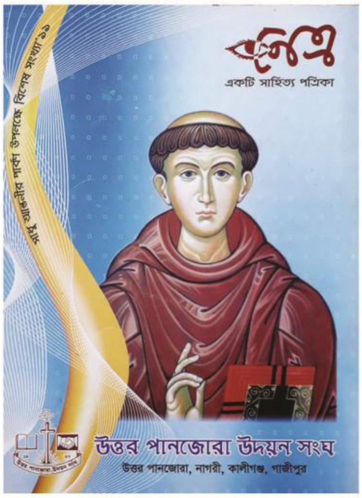

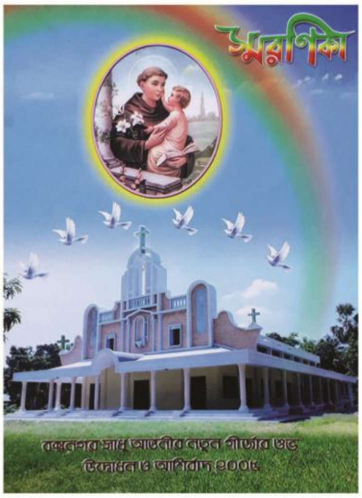

অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক গ্রন্থাবলি, পত্র-পত্রিকাসমূহ ও অন্যান্য উপাদানের তালিকা

১. প্রাথমিক উৎস

১.১. আসর থেকে ধারণকৃত ও লিখিত পালাগান

আন্তনি বাদু রোজারিও (গায়েন)। *সাধু আন্তেনিয়ো পালাগান*। নাগরী, গাজিপুর, ২০১৭।

আলেকজেণ্ডার জাম্ভু গমেজ (গায়েন)। *সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান*। বনপাড়া, নাটোর, ২০১৫।

সুব্রত গমেজ (গায়েন)। *সাধু আন্তোনিয়ো পালাগান*। বনপাড়া, নাটোর, ২০১৫।

১.২. পাণ্ডুলিপি ও খাতাপত্র

আগষ্টিন রোজারিও। সাধু আগাপিতের পালা। বোর্ণী, বড়াইগ্রাম, নাটোর, ২০০১।

আন্তনী রোজারিও। *সাধু আন্তনীর পালাগান*। নাগরী, গাজিপুর, লিও মধু অনুলিখিত খাতা, ২০১১।

কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী। রামুর পালা। পাদ্রিশিবপুর, বরিশাল, স্বপন গমেজ সংরক্ষিত খাতা, ২০০২।

_____ । মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রীষ্টঃ রামুর পালা। পাদ্রিশিবপুর খ্রীষ্টান ডেভেলপমেন্ট কমিটি, ঢাকা, ১৯৯৩।

ডমিনিক রোজারিও (দুঙ্গু পণ্ডিত)। *শ্রীগুরু আন্তনীর চরিতামৃত*। যোসেফ রোজারিও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, কালিকাপুর, নাটোর।

_____ । *শ্রীগুরু আন্তনীর চরিতামৃত*। অরুণ কোড়াইয়া সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, কালীগঞ্জ, গাজিপুর।

_____ । সাধ্বী আগ্নেশের পালা। কালীগঞ্জ, গাজিপুর, ১৯৪৮।

_____ । *সাধ্বী ফিলোমিনার পালা*। কালীগঞ্জ, গাজিপুর, ১৯৪৫।

_____ । কষ্টের গীত। ভবানীপুর গায়কদল, ভবানীপুর, রামাগাড়ী, নাটোর, ২০০০।

মন্টু বার্ণাড পালমা। সাধু পিতরের পালা। তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর, ২০০৩।

_____ । সাধু পৌলের পালা। তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর, ২০০৩।

_____ । সাধু যোহনের পালা। তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর, ১৯৮০।

_____ । সাধু পিতরের পালা। তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর, ২০০৩।

_____ । যীশুর জন্মপালা। তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর, ২০০০।

রবিন ডি'কস্তা। সাধু আন্তনীর লীলাকীর্তন। নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজিপুর, ২০০২।

সুনীল পেরেরা। মুক্তিদাতা যীশু (ধর্মীয় গীতিনাটক)। তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজিপুর, ১৯৯৮।

২. দ্বৈতীয়িক উৎস

২.১. সহায়ক গ্রন্থ

২.১.১. সহায়ক গ্রন্থ: বাংলা

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। *ফিরিঙ্গি বণিক্*। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩২৯।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। কলকাতা, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮।

আগষ্টিন গুয়ারনেরী ও সুব্রত এন্টন মণ্ডল। *পাদুয়ার সাধু এন্টনি*। কৃষ্ণনগর, কাথলিক মিশন প্রেস, ১৯৯৭।

আফসার আহমেদ। *গাজীর গান: শিল্পরীতি*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮।

আরতুরো স্পেজিয়ালে পিমে, ফাদার। *নোয়াখালী জেলার খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস*। যশোহর, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র, ১৯৮৫।

আশরাফ সিদ্দিকী। *লোক-সাতিহ্য*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৫।

——। *বাংলার মুখ*। ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ১৩৯৮।

আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*। প্রথম খণ্ড। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউজ, ১৯৬৫।

——। *বাংলার লোকসাহিত্য* । তৃতীয় খণ্ড। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউজ, ১৯৭৩।

——। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*। পঞ্চম সংস্করণ। কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কো. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭০।

——। *বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর*। প্রথম খণ্ড, কলকাতা, এ মুখার্জী, ১৯৬৬।

খালেক মাসুক রসুল। *নোয়াখালীর লোকসাহিত্যে লোক জীবনের পরিচয়*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২।

গোলাম মুরশিদ। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৬।

চিত্তরঞ্জন দেব। *বাংলার লোক-গীত-কথা।* কলকাতা, প্রকাশক, ১৯৮৯।

জয়ন্ত এস. গমেজ, ফাদার (সম্পা.)। *গীতাবলী: খ্রীষ্টীয় গানের বই*। ঢাকা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ২০১০।

জুলিয়ান গমেজ। *তিনশো বছর আগে*। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, সাধ্বী তেরেজার গীর্জা, ১৯৬৫।

ডেনিস দিলীপ দত্ত। *বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস*। কুমিল্লা, খ্রীষ্টিয়ান লিটারেচার সেন্টার, ১৯৮৫।

——। *উপমহাদেশে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস*। চাঁদপুর, খ্রীষ্টিয়ান লিটারেচার সেন্টার, ২০০০।

তারাপদ মুখোপাধ্যায়। *ইতিহাসে উপেক্ষিত*। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪।

দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা.)। *মৈমনসিংহ গীতিকা*। কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩।

দেবব্রত নস্কর। *চব্বিশ পরগণার দেবদেবী পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা।* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯।

নচিকেতা ভরদ্বাজ। *এক মৃত্যু: অনন্ত জীবন*। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৩।

পাস্কাল ফার্নান্দো ও তিমির সিংহ। *পাদুয়ার সাধু আন্তনি*। কলকাতা, খ্রিষ্টপূজন প্রকাশনী, ১৯৯৮।

পিটার যোসেফ গমেজ। *পশ্চিম বাংলায় পূর্ব-বাংলার ক্যাথলিক সম্প্রদায়*। কলকাতা, ক্রান্তি প্রেস, ১৯৬৯।

বরুণকুমার চক্রবর্তী, *গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৩।

——। *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৭।

বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য। *বাংলা গাথাকাব্য*। কলকাতা, মডার্ণ বুব এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২।

মনোজ বিশ্বাস। *পাদুয়ার সাধু আন্তনি*। কলকাতা, খ্রিষ্টপূজন প্রকাশনী, ২০০১।

মফিজুল ইসলাম (সম্পা.)। *লোক-সাহিত্য সংকলন-৪৩, রংপুরের পালাগান*। প্রথম খণ্ড। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫।

——। *লোক সাহিত্য সংকলন-৪৩, রংপুরের পালাগান*। দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫।

——। *লোক সাহিত্য সংকলন-৪৫, রংপুরের পালাগান*। প্রথম খণ্ড।, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।

মহম্মদ আব্দুল খালেক। *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান*। প্রথম প্রকাশ। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫।

মযহারুল ইসলাম। *ফোক্‌লোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন*। দ্বিতীয় সংস্করণ। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪।

মার্ক ডি'কস্তা। *অলৌকিক কর্মসাধক পাদুয়ার সাধু আন্তনী*। ঢাকা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ১৯৯০।

মোমেন চৌধুরী। *লোকসংস্কার ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭।

——। মোমেন চৌধুরী (সম্পা.)। *বাংলা একাডেমি ফোক্‌লোর সংকলন: ৫৭*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।

যেরোম ডি' কস্তা। *বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী*। প্রথম খণ্ড। প্রথম সংস্করণ। ঢাকা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ১৯৮৮।

যোসেফ রানা মণ্ডল, ফাদার। *রাঢ়-সমতটে খ্রীষ্টধর্ম*। যশোর, যীশুর পবিত্র হৃদয় গীর্জা, ২০১১।

রওশন ইজদানী। *মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৩৬৪।

রীণা দত্ত। *বাংলার কীর্তন ও লোকসঙ্গীত*। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, মডেল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৬।

লুইস প্রভাত সরকার। *বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়*। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, প্রভু যীশু গীর্জা, ২০০২।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। অষ্টম সংস্করণ। কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লি., ১৯৯৮।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও খ্রীস্তিয়াঁ মিংগো এস. জে. (অনু.), *মঙ্গলবার্তা বাইবেল*, ঢাকা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ২০১১।

সজনীকান্ত দাস (সম্পা.)। *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ*। কলকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৬।

সতীশচন্দ্র মিত্র। *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলিকাতা, দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৫।

সবিতা চট্টোপাধ্যায়। *বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক*। কলকাতা, নয়া প্রকাশ, ১৯৯৮।

সাধনা করালী। *খ্রিস্টীয় প্রসঙ্গ : বিবিধ ভাবনা*। কলকাতা, সিটাডেল, ২০১৫।

সিরাজুদ্দিন কাসিমপুর (সম্পা.)। *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩।

সুকুমার সেন (সম্পা.)। *কবিকঙ্কন-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*। দ্বিতীয় প্রকাশ। দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৩২।

—— । *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড পূর্বাব্দ। কলকাতা, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭০।

—— । *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড অপরার্ধ। কলকাতা, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৬৩।

সুখময় ভট্টাচার্য (সম্পা.)। *ময়মনসিংহ গীতিকা*। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৮২।

সুরেন্দ্রনাথ সেন (সম্পা.)। *ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ*। কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭।

সুশীল জন গোমেজ। *আঠারোগ্রাম*। ঢাকা, ভাষাচিত্র, ২০১০।

হর্ষ মল্লিক। *লোকসাহিত্য: খ্রীষ্টীয় প্রেক্ষাপট*। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (সম্পা.)। *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*। প্রথম খণ্ড। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭০।

—— । *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*। দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭১।

—— । *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*। তৃতীয় খণ্ড। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭১।

২.১.২. সহায়ক গ্রন্থ: ইংরেজি

Abdur Rahim Khondkar. *The Portuguese Contribution to Bengali Prose, Grammer and Lexiography*. Dacca, Bangla Academy, 1976.

A. K. Priolkar. *Printing Press in India*. Bombay, Marathi Samshodhana Mandala, 1958.

Ben-Amos, Dan (ed.). *Folklore Genres*. Austin, University of Texas Press, 1976.

Bruce A. Rosenberg. *The Art of American Folk Preacher*. New York, Norton, 1970.

Carol Ann Morrow. *Anthony of Padua: Finding Our Way*. Ohio, Messenger Press, 1999.

Carola Erika Lorea. *Folklore, Religion and the Songs of a Bengali Madman: A Journey Between Performance and the Politics of Cultural Representation*. Laiden, Brill Academic Pub., 2016.

Catherine Mary Anthony Woodcock. *Saint Anthony of Padua, the Miracle-Worker*, Stockbridge, Hard Press, 2012.

Charles Warren Stoddard. *St. Anthony: The Wonder-Worker of Padua.* Alianza, Tan Books & Pub, 1971.

Clementinus Deymann. *Skecth of the Life of St. Anthony of Padua.* San Francisco, R. Walcteitfel, 1885.

C. M. Antony. *Saint Antony of Padua: The Miracle Worker*. London, Longmans, Green and Co., 1911.

Dinesh Chandra Sen. *Folk Literature of Bengal*. Calcutta, University of Calcutta, 1920.

Francis Dent. *Saint Anthony of Padua and the Twentieth Century*. Colorado, Bibliographical Center for Research, 2010.

Gerould Gordon Hall. *The Ballad of Tradition*. Banglaore, Prism Book, 1993.

Henry Josson. *La Mission du Bengale,* tome I, Bruges, 1921.

Helen Walker. *Saint Anthony and the Christ Child*. San Francisco, Saint Ignatius Press, 1997.

H. H. Dodwell. *The Cambridge History of India.* vol. V, Cambridge, University Press, 1929.

Jack Wintz (ed.) *St. Anthony of Padua: His Life, Legends, and Popular Devotions*, Ohio, Franciscan Media, 2004.

Jack Wintz. *Anthony of Padua: Saint of the People*, Ohio, Messenger Press, 2005.

James Kinsley. *Scottish Poetry: A Critical Survey*. London, Cassel & Co. Ltd. 1955.

James Tod. *Annals and Antiquities of Rajasthan.* London, Smith Elder and Co., 1920.

J. J. A. Campos. *History of the Portuguese in Bengal*. Calcutta, Butterworth & Co., 1919.

Joseph A. Keller. *Miracles of Saint Anthony of Padua.* London, Aterna Press, 1899.

Jyoti F. Costa, Bulul A. Rebeiro. *The Catholic Directory of Bangladesh*. 12th Edition. Dhaka, Pratibeshi Prakashani, 2017.

Mabel Farnum. *Saint Anthony of Padua: His Life and Miracles*. New York, Didier, 1948.

Madeline Pecora. *St. Anthony: Words of Fire, Life of Light*. Boston, Pauline Books, 1995.

M. J. C. Hodgard. *The Ballads*. London, Hutchinson University Library, 1950.

Paul Puthanengady. *Popular Devotions in India*. Bangalore, National Biblical Centre, 1986.

P. J. Gomes. *A Community at the Crossroads: East Bengal Catholics in West Bengal*. Calcutta, Middleton Commercial Printing Works, 1969.

Raymund Pennafort. *Devotions to the Wonder Worker Saint Anthony of Padua*. Montreal, Franciscan Fathers, 1913.

Robert Groves. *The English Ballad*. London, Oxford University Press, 1927.

Robin Mayhead. *Understanding Literature*. Cambridge, Cambridge University Press, 1965.

S. A. Carvalho. *Bandel Church and Hoogly*. 5th edition, Krishnagar, 2013.

Sheilah Ling. *St. Anthony of Padua: Friend of All the World,* New York, Alba House, 1996.

Sushil Kumar De. *Bengali Literature in the 19th Century.* Calcutta, Firma K L Mukhopadhyay, 1962.

Thomas Anthony. *The Moral Concordances of Saint Anthony of Padua*. Whitefish, Kessinger Publishing, 2007.

Thomas F. Ward. *Saint Anthony: The Saint of the Whole World*. New York, Benziger Brothers, 1898.

Verrier Elwin. *Folk Songs of Chattisgarh.* Bombay, Oxford University Press, 1946.

William C. Crooke. *Introduction to Popular Religion and Folklore of Northern India.* Allahabad, Government Press, 1894.

William Henry Hudson. *An Introduction to the Study of Literature*. London, George G. Harrap & Co. Ltd. 1963.

Yves de Steenhault. *History of the Jesuits in Bengal*. Part I. Ranchi, Catholic Press, 1992.

২.১.৩. সহায়ক গ্রন্থ: ফরাসি

Antoine Du Lys. *Histoire de saint Antoine de Padoue, frère mineur: sa vie, son culte*, Broché, Paris, 1987.

Emilie Bonvin. *Saint Antoine de Padoue: Prières et neuva*ines, Poche, Paris, 1972.

Françoise Bouchard. *Saint Antoine de Padoue*, Broché, Paris, 1969.

Valentin Strappazzon. *Saint Antoine de Padoue : Docteur de l'Église et prédicateur populaire*, Broché, Paris, 2005.

২.২. সহায়ক প্রবন্ধ

২.২.১. সহায়ক প্রবন্ধ: বাংলা

অপূর্ব নিকোলাস ক্রুজ। "ফিরে দেখা: নাগরী ধর্মপল্লী (১৬৯৫-২০০০)"। 'নাগরী'। নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০০০।

আবেল বি. রোজারিও। "জয়ন্তী বর্ষ– দয়ার বর্ষ"। 'স্মরণিকা'। সাধু নিকোলাস গির্জা, নাগরী, ২০১৬।

আলবার্ট টমাস রোজারিও। "বিশ্ববন্দিত সাধু আন্তনি"। 'স্মরণিকা'। বক্সনগর সাধু আন্তনীর নতুন গীর্জার উদ্বোধন, ২০০৫।

উইলিয়াম অতুল। "তিহাসিক ভাওয়াল নগরী"। 'নাগরী'। নাগরী, গাজিপুর, ২০০১।

এলড্রিক বিশ্বাস। "মহান সাধু আন্তনীর জীবন্ত জিহ্বা"। 'শঙ্খ'। নোবেল গমেজ (সম্পা.) দোয়ানী স্বপ্নের নীড় যুবসংঘ, সাধু আন্তনীর পর্ব, ২০১৮।

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন। "দর্পণে মঠবাড়ী ধর্মপল্লী"। 'স্মরণিকা'। যাজকীয় অভিষেক, মঠবাড়ি, গাজিপুর, ২০০২।

দিলীপ এস. কস্তা। "তীর্থযাত্রা: অন্তরে শুদ্ধতা ও পরিবর্তনের আহ্বান"। 'অনুগ্রহ'। ফাদার যোহন উত্তম রোজারিও (সম্পা.), কাতুলী, পাবনা, ২০১৮।

——। দিলীপ এস. কস্তা। "খ্রীষ্টীয় লৌকিক সংস্কৃতি ও সাধু আন্তনী ভক্তি"। 'ধনুগ্রহ'। সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, কাতুলী ২০১৮।

পংকজ প্লাসিড রড্রিকস। "নাগরীর ঐতিহ্যময় ইতিহাস"। 'স্মরণিকা'। টলেন্টিনুর সাধু নিকোলাস-এর গীর্জা শুভ উদ্বোধন ও আশীর্বাদ, নাগরী, ২০১৮।

বিপুল এলিট গনছালভেজ। "পরাণের গহীন ভিতরে সাধু আন্তনী"। অরুণোদয়, নাগরী, গাজিপুর, ২০০১।

মেরী অমিয়া এসএমআরএ। "ভাওয়াল অঞ্চলে নাগরী ও পানজোরায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ইতিবৃত্ত"। 'স্মরণিকা'। টলেন্টিনুর সাধু নিকোলাস-এর গীর্জা শুভ উদ্বোধন ও আশীর্বাদ, নাগরী, ২০১৮।

যোসেফ ম. গমেজ। "রামুর পালার ইতিবৃত্ত"। 'রামুর পালা'। ঢাকা, পাদ্রিশিবপুর খ্রিষ্টান ডেভেলপমেন্ট কমিটি, ১৯৯৩।

লিটন ফ্রান্সিস গোমেজ। "সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান: রাজাবাড়িয়া"। 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'। বর্ষ ৭৬, সংখ্যা ৪২, ঢাকা, ২০১৬।

হিউবার্ট কস্তা সিএসসি, "অলৌকিক কর্মসাধক সাধু আন্তনী"। 'আশীর্বাদ'। সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর যুবসমিতি, সাভার, ঢাকা, ২০১৫।

২.২.২. সহায়ক প্রবন্ধ: ইংরেজি

Sayed Jamil Ahmed. "Mimicry and Counter-Discourse on the Palimpsest of Nagori: The Play of Saint Anthony and His Double, Sadhu Antoni". 'Asian Theatre Journal', Vol. 27, No. 1, Spring 2010.

Tapan De Rozario, Father. "Christian Mission and Evangelization in Bangladesh". Nazrul Islam (ed.), 'Bangladesh e-Journal of Sociology'. Vol. 8, No. 1, 2011.

২.৩. সহায়ক পত্র-পত্রিকা

২.৩.১. সহায়ক পত্র-পত্রিক: বাংলা

'অনুগ্রহ'। যোহন উত্তম রোজারিও সম্পা। কাতুলী, পাবনা, ২০১৮।

———। যোহন উত্তম রোজারিও সম্পা। সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব, কাতুলী, পাবনা, ২০১৬।

'অদ্যাবধি'। প্রিন্স কস্তা সম্পা। সূর্যতরুণ সংঘ, আড়াগাঁও, নাগরী, গাজিপুর, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, ২০১০।

'অরুণোদয়'। ডালিয়া গমেজ সম্পা। করান অরণোদয় যুব সমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০০১।

———। করান অরুণোদয় যুবসমিতি, সাধু আন্তনীর পার্বণ সংখ্যা, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৮।

———। করান অরুণোদয় যুবসমিতি, সাধু আন্তনীর পার্বণ সংখ্যা, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৬।

———। লেনার্ড পিউরীফিকেশন সম্পা। অরুণোদয় যুব-সুমিতি, করাণ, নাগরী, ২০১০, পৃ. ৩।

———। উজ্জ্বল ডেনিস রোজারিও সম্পা। অরুণোদয় যুব-সমিতি, করাণ, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৯।

———। করান অরুণোদয় যুবসমিতি, সাধু আন্তনীর পার্বণ সংখ্যা, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৬।

'আশীর্বাদ'। পাভেল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ২, সংখ্যা ২, ২০০৯, সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর, সাভার, ঢাকা।

———। মিল্টন মাইকেল গমেজ সম্পা। বর্ষ ৩, সংখ্যা ৩, সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, ২০১০।

———। লিমেন্ট এস. রেগো সম্পা। বর্ষ ৬, সংখ্যা ৬, সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, ২০১৩।

———। পাভেল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৮, সংখ্যা ৮, সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, ২০১৫

———। পাভেল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৯, সংখ্যা ৯, সাধু আন্তনীর পার্বণ, কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, ২০১৬।

'উন্মোচন'। কিশোর আর. গমেজ সম্পা। দক্ষিণ পানজোরা ক্ষুদ্রপুষ্প সংঘ, নাগরী, গাজিপুর, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১, ২০০৮।

———। কিশোর আর. গমেজ সম্পা। ক্ষুদ্রপুষ্প সংঘ, দক্ষিণ পানজোরা, নাগরী, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২, ২০০৯।

'কলি'। পংকজ গমেজ সম্পা। নাগরী, গাজিপুর, সেবাসংঘ, নাগরী, গাজিপুর, সাধু আন্তনীর পার্বণ, ২০০৮।

———। পংকজ গমেজ সম্পা। সেবাসংঘ, নাগরী, গাজীপুর, সাধু আন্তনীর পার্বণ, ২০০৯।

'দিশারী'। বক্সনগর সেন্ট এ্যান্থনীস ক্লাব, বক্সনগর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা, ২০০৭।

———। বক্সনগর সেন্ট এ্যান্থনীস ক্লাব। বক্সনগর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা, ২০১২।

'নাগরী'। নিপু হিউবার্ট পিউরীফিকেশন সম্পা। নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতির মুখপত্র, ২০০০।

———। সুবীর খ্রীষ্টফার ক্রুশ সম্পা। নাগরী খ্রীষ্টান যুবসমিতি, ২০০১।

———। সুবীর খ্রীষ্টফার ক্রুশ সম্পা। নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০০২।

———। লিনছন গমেজ সম্পা। নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০১০।

———। বিকি রোজারিও সম্পা। নাগরী খ্রীষ্টান যুব-সমিতি, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৯।

'নেত্র'। উদয়ন সংঘ, উত্তর পানজোরা, নাগরী, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১১, ২০০৮।

———। ইভেন পালমা সম্পা। উদয়ন সংঘ, উত্তর পানজোরা, নাগরী, গাজিপুর, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১০, ২০০৯।

———। প্রলয় এসেনসন সম্পা। উদয়ন সংঘ, উত্তর পানজোরা, নাগরী, গাজিপুর, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১১, ২০১০।

'নীহারিকা'। বাগদী খ্রীষ্টান যুবকল্যাণ সংঘ, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৮।

'মিহির'। প্রবীর কস্তা সম্পা। সেন্ট পিটার যুবসংঘ, পাড়ারটেক, নাগরী, গাজিপুর, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ২০১০।

'রোববার'। সৈয়দ মোশারফ আলী সম্পা। ২২ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ২০০০, ঢাকা।

'শঙ্খ'। পঙ্কজ গমেজ সম্পা। স্বপ্নের নীড় যুবসংঘ, দোয়ানী, নাগরী, গাজিপুর, বর্ষ ৫, বিশেষ সংকলন, ২০০৯।

———। নোবেল গমেজ সম্পা। দোয়ানী স্বপ্নের নীড় যুবসংঘ, নাগরী, ২০১৮।

'সৃষ্টি'। জেরী পিটার রোজারিও সম্পা। বাগদী আবির্ভাব যুবসংঘ, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৭।

———। জেরী পিটার রোজারিও সম্পা। বাগদী আবির্ভাব যুবসংঘ, নাগরী, গাজিপুর, ২০১৮।

'সূর্যোদয়'। সুহৃদ এসেনসন সম্পা। সূর্যোদয় সংঘ, ছাইতান, নাগরী, ঢাকা, ২০০৯।

'স্মরণিকা'। সাধু আন্তনীর পার্বণ উপলক্ষে প্রকাশিত, পানজোরা, নাগরী, গাজিপুর, ঢাকা, ২০০২।

———। আলবার্ট টমাস রোজারিও সম্পা। বক্সনগর সাধু আন্তনীর নতুন গীর্জার উদ্বোধন, ঢাকা, ২০০৫।

———। আলবার্ট টমাস রোজারিও সম্পা। বক্সনগর সাধু আন্তনীর গীর্জা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা, ২০০৬।

———। আলবার্ট রোজারিও সম্পা। সাধু নিকোলাসের গির্জার উদ্বোধন ও আশীর্বাদ, নাগরী, গাজিপুর, ২০০৮।

———। সাধু আন্তনীর পর্ব উদযাপন কমিটি। গাজিপুর, ২০১১।

———। যাজকীয় রজত জয়ন্তী। নাগরী, গাজিপুর, ২০১৬।

Dhaka University Institutional Repository

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'। জ্যোতি গমেজ সম্পা। বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ২৭, ঢাকা, ১৯৭৭।

———। জ্যোতি গমেজ সম্পা। বর্ষ ৪২, সংখ্যা ৯, ঢাকা, ১৯৮২।

———। জ্যোতি গমেজ সম্পা। বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৮, ঢাকা, ১৯৮৩।

———। জ্যোতি গমেজ সম্পা। বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৯, ঢাকা, ১৯৮৫।

———। জ্যোতি গমেজ সম্পা। বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৭, ১৯৮৮।

———। জ্যোতি গমেজ সম্পা। বর্ষ ৫১, সংখ্যা ৪৪, ঢাকা, ১৯৯১।

———। জ্যোতি গমেজ সম্পা। বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ১১, ১৯৯৩।

———। সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সম্পা। বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ২১, ঢাকা, ১৯৯৪।

———। সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সম্পা। বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ১৯৯৬।

———। সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সম্পা। বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ২৪, ঢাকা, ১৯৯৭।

———। সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সম্পা। বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৯, ঢাকা, ১৯৯৮।

———। সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সম্পা। বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ১৯৯৯।

———। সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬০, সংখ্যা ২৪, ঢাকা, ২০০০।

———। সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ২০০০।

———। সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬১, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ২০০১।

———। সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬১ সংখ্যা ২৭, ঢাকা, ২০০১।

———। সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬২, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ২০০২।

———। সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬২, সংখ্যা ২৩, ঢাকা, ২০০২।

———। সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ৫, ঢাকা, ২০০৩।

———। সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ২০০৩।

———। সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ২০০৩।

———। সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ২১, ঢাকা, ২০০৪।

———। সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ২, ঢাকা, ২০০৪।

———। সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ১৩, ঢাকা, ২০০৪।

———। সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ২০, ঢাকা, ২০০৪।

———। সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ২১, ঢাকা, ২০০৪।

———— । সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ৩, ঢাকা, ২০০৫।

———— । সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ৩, ঢাকা, ২০০৫।

———— । সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ৫, ঢাকা, ২০০৫।

———— । সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬৫, সংখ্যা ২৫, ঢাকা, ঢাকা, ২০০৫।

———— । সুনীল ডানিয়েল রোজারিও সম্পা। বর্ষ ৬৫, সংখ্যা ৩, ঢাকা, ২০০৫।

———— । কমল কোড়াইয়া সম্পা। বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩, ঢাকা, ২০০৬।

———— । কমল কোড়াইয়া সম্পা। বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ২০০৬।

———— । কমল কোড়াইয়া সম্পা। বর্ষ ৬৭, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ২০০৭।

———— । কমল কোড়াইয়া সম্পা। বর্ষ ৬৮, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ২০০৮।

———— । কমল কোড়াইয়া সম্পা। বর্ষ ৬৮, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ২০০৮।

———— । কমল কোড়াইয়া সম্পা। বর্ষ ৬৯, সংখ্যা ৭, ঢাকা, ২০০৯।

———— । কমল কোড়াইয়া সম্পা। বর্ষ ৭০, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ২০১০।

———— । কমল কোড়াইয়া সম্পা। বর্ষ ৭০, সংখ্যা ২২, ঢাকা, ২০১০।

———— । জয়ন্ত এস. গমেজ সম্পা। বর্ষ ৭৬, সংখ্যা ৪২, ঢাকা, ২০১৩।

———— । জয়ন্ত এস. গমেজ সম্পা। বর্ষ ৭৬, সংখ্যা ৪২, ঢাকা, ২০১৪।

———— । জয়ন্ত এস. গমেজ সম্পা। বড়দিন সংখ্যা, ঢাকা, ২০১৫।

———— । জয়ন্ত এস. গমেজ সম্পা। বর্ষ ৭৬, সংখ্যা ৪২, ঢাকা, ২০১৬।

২.৩.২. সহায়ক পত্র-পত্রিক: ইংরেজি

Malone Matt, S.J. (ed.). ‘America’. A Monthly Magazine of the American Jesuits, New York, USA, 2009.

Mario Conte (ed.). ‘Messenger of Saint Anthony’, A Monthly Magazine of the Conventual Franciscan friars of the Basilica of Saint Anthony in Padua, Italy.

২.৪. সহায়ক অভিধান ও কোষগ্রন্থ

২.৪.১. সহায়ক অভিধান ও কোষগ্রন্থ: বাংলা

এনামুল হক, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, স্বরোচিষ সরকার (সম্পা.)। *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৯।

কাজী আব্দুল ওদুদ (সঙ্কলিত)। *ব্যবহারিক শব্দকোষ*। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬।

বিমল রায়। *সংগীত শব্দকোষ*। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি, ১৯৯৬।

সন্তোষ মণ্ডল ও সিলভানো গারেল্লো। *খ্রীষ্টীয় পরিভাষা*। যশোহর, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২০০৮।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.)। *বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশে জাতীয় জ্ঞানকোষ* (খণ্ড ৫)। ঢাকা, বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

২.৪.২. সহায়ক অভিধান ও কোষগ্রন্থঃ ইংরেজি

H. H. Abrams. *A Glossary of literary Terms.* Bangalore, Prism Book Pvt. Ltd., 1993.

Maria Leach (ed.). *The Standard Dictionary of Folklore, Legend and Mythology*. vol. 1, New York, The Macmillan Company, 1949.

Philip W. Goetz, (ed.). *The New Encyclopedia*. vol. 1, Chicago, Encyclopedia Britannica, Inc., 1990.

The World Book Encyclopedia. vol.2, Chicago, Field Enterprises Educational Corporation, 1966.